জীবনী কোষ

১ম সংখ্যা

জীবনীকোষ

(ভারতীয়-ঐতিহাসিক)

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

১ম সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৪৩

মূল্য প্রতি সংখ্যা নিয়মিত গ্রাহকের জন্য এক টাকা
অপরের জন্য দেড় টাকা।

জীবনী কোষ

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সঙ্কলিত জীবন-চরিত বিষয়ক বিস্তৃত অভিধান। এইরূপ পুস্তক ভারতীয় অন্য কোনও ভাষায় এমন কি ইংরাজীতেও প্রকাশিত হয় নাই।

জীবনী কোষের প্রথম অংশ (ভারতীয় পৌরাণিক) ২২ সংখ্যায় ২২০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিক অংশের কয়েক সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। এই পৌরাণিক অংশে বেদ, সংহিতা, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য পুস্তকগুলির অধ্যায় পরিচ্ছেদ প্রভৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পৌরাণিক অংশের সম্পূর্ণ মূল্য উৎকৃষ্ট চামড়ার বাঁধাই দুই খণ্ডে পঁচিশ টাকা, ডাকমাশুলাদি দুই টাকা বার আনা। ইচ্ছা করিলে কিস্তিবন্দিতে বই লওয়া যাইতে পারে। যত টাকা পাওয়া যাইবে তত সংখ্যা বই পাঠান হইবে। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীসমূহের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। প্রাপ্তি স্থান (১) গ্রন্থকারের নিকট ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (২) চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। (৩) গুরুদাস চাটার্জ্জী এণ্ড সান্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া গ্রন্থকারের নিকট হইতে লইলে ডাকমাশুল লাগে না।

জীবনীকোষ

(ভারতীয়-ঐতিহাসিক)

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

১ম সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৪৩

প্রকাশক

শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ

২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

কলিকাতা

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

জীবনী-কোষ মুদ্রাযন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গপত্র

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষের ছয়আনীর জমিদার
বিদ্যোৎসাহী মহানুভব বিবিধ সদ্‌গুণালঙ্কৃত
শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
এম্ এ, বি-এল মহাশয়ের করকমলে
প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ
গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
সাদরে প্রদত্ত
হইল।

ভূমিকা।

চল্লিশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে যখন জীবনী-কোষের কাজ প্রথম আরম্ভ করি, তখন ইচ্ছা ছিল যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এই উভয় শ্রেণীর নাম সংবলিত একখানি অভিধান সংকলন করিব। ক্রমে কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম যে ঐরূপ একখানি গ্রন্থ সংকলন বহু সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ, তদ্ভিন্ন ঐরূপ একখানি বই আয়তনে এত বৃহৎ হইত যে, সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা হয়ত সম্ভব হইত না; তখন কয়েকজন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে দুইটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলাম। ঐ দুইখানির মধ্যে ভারতীয় পৌরাণিক খানি প্রথমে সমাপ্ত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছি। এক্ষণে ভারতীয় ঐতিহাসিক অংশ প্রকাশ করিতেছি। পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। ঐ সময়ে জীবনী-চরিত বিষয়ে একখানি ভাল অভিধানের অভাব বিশেষ অনুভব করিতাম। সেই অভাব বোধই আমাকে ঐ কার্য্যে প্রেরণা দান করে। ইতি-পূর্ব্বে বাবু উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চরিতাভিধান নামে একখানি ঐ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংকলন করেন। ঐ পুস্তকে তিনি ভারতীয় এবং বিদে-শীয় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সমুদয় শ্রেণীর নাম সংকলন করেন। বলা বাহুল্য তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত নাম বাছাই করিতে হইয়াছিল এবং আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক নামই বাদ দিতে হইয়া-ছিল। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" নামে একখানি নামাভিধান প্রণয়ন করেন। নাম হইতেই বইখানির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বহু পূর্ব্বে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতেও "বঙ্গভাষার লেখক" নামে ঐ শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৺ সুবল চন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত শব্দাভি-ধানেও অনেক জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঐরূপ এক বা একাধিক গ্রন্থের অভাব অনেকেই বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু কেবল জীবন চরিত বিষয়ক এমন একখানি অভিধান হয় নাই, যাহাতে

ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের লোকের নানাপ্রকার কার্য্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যাইতে পারে। আমার এই পুস্তকে সেই অভাবই দুর করিবার সামান্য চেষ্টা মাত্র করিয়াছি।

প্রথমে বইএর নাম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। এই পুস্তকটি "জীবনী-কোষ" নামক গ্রন্থের ভারতীয় ঐতিহাসিক অংশ। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন অনেক নামই পাওয়া যাইবে যেগুলি ঠিক 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি নন অর্থাৎ যাহারা অল্প দিন পূর্ব্বে পরোলকগত হইয়াছেন'। ইংরাজিতে বলিতে গেলে A Dictionary of Historical Names এবং A Dictionary of Biographies বলিতে যাহা বুঝায়, আমার এই ভারতীয় ঐতিহাসিক অংশ সেই শ্রেণীর গ্রন্থ হইবে। ইহাতে এমন নামও কিছু কিছু পাওয়া যাইবে, যাহাদের ঐতিহাসিকত্ব হয়ত সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ঐ সকল নামের পরিচয় বা বিবরণ নানা সূত্রে পাঠকগণের গোচরে আসে। সেই কারণেই কেবল ঐ শ্রেণীর নাম ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সাহিত্যে এমন অনেক নাম আছে, যাঁহারা হয় আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয়। তজ্জন্য ঐ সকল নাম (সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক না হইলেও) দিতে হইয়াছে। এই নাম নির্ব্বাচন বিষয়ে বাঙ্গালী অথবা বাঙলা দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট লোকের নামেরই প্রাধান্য দিয়াছি। অন্যান্য প্রদেশের যে সকল ব্যক্তির নাম সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের গোচরে আসিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক, কেবল সেই সকল নামই সন্নিবিশিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞদিগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থ রচিত হয় নাই। সাধারণ বাঙ্গালা পাঠক দেশের ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা কালে যে সকল নামের সংস্রবে আসিতে পারেন, সেই সকল ব্যক্তির পরিচয় সংক্ষেপে অথচ প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বাদ না দিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ নামের বিবরণ হয়ত অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হইতে পারে—যেমন অশোক অথবা আওরঙ্গজেব। তজ্জন্য বক্তব্য এই যে তাঁহাদের জীবন কাহিনী অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং এখনও তাঁহাদের জীবন সংক্রান্ত নানা তথ্যের সন্ধান হইতেছে। সে ক্ষেত্রে এই সকল বিবিধ তথ্যের সারাংশ প্রদান করা যুক্তি যুক্ত মনে করিয়াছি।

এই প্রকার একখানি গ্রন্থ রচনা যে কেবল একজনের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তজ্জন্য এই গ্রন্থ রচনা কালে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তিগণ নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার নিজ সংগ্রহের অনেক পুস্তক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাদি আনিবার অতিরিক্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয় তাহার নিজস্ব সুবৃহত গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকাবলী ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডাঃ নলিনাক্ষ্য দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক (Research Scholar) বন্ধুবর শ্রীযুত মনোমোহন ঘোষ M. A. ও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য M. A. নানা প্রকার মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করিয়া আমার অশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী এম এ, পি-আর-এস্ ও অধ্যাপক ইন্দুভূষণ মজুমদার এম এ নানারূপ তথ্যসংগ্রহ ও কোনও কোনও নামের বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত মুসলমান নামগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে অনেক পদস্থ মুসলমানের একাধিক নাম রহিয়াছে। যেমন সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি খেরাজ গিয়াসুদ্দিন আলির উপাধি প্রথমে ছিল আসফ্ খাঁ গুজরাট বিজয়ের পরে তিনি আব্বাস খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্থলে, ইতিহাসে যে নামের দ্বারা কোনও ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, অভিধানে সেই নামের সহিতই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অন্যান্য নানারূপ বিবরণ পাওয়া গেলেও জীবনাখ্যান হয়ত কিছুই পাওয়া যায় না, অথবা অতি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে যে প্রকার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই কেবল দিতে হইয়াছে। অনেক ঐতিহাসিক বিবরণের তারিখ সম্বন্ধে এখনও বিশেষজ্ঞগণের বিচার চলিতেছে। সে সব ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

পুস্তকান্তর্গত নাম ও তত্তৎ বিবরণ যথাসাধ্য প্রামাণিক গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এতবড় ব্যাপারে যে কিছু ভুল ত্রুটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও থাকিবে না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। সহৃদয় পাঠকগণ সেই ভুল ত্রুটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত হইব। যে সকল স্থান হইতে বিবরণ সংগৃহিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে, পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে। ঐ তালিকার অন্তর্গত সকল জায়গা হইতেই যে, বিবরণ সংগৃহিত হইয়াছে, তাহা নহে।' অনু-সন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য যে সকল বিভিন্ন পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা-দিতে ঐ নাম সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি হইয়াছে। সেই সকল পুস্তকাদির নামও দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার

জীবনীকোষ

ভারতীয়-ঐতিহাসিক

অ

অকলঙ্ক—তিনি একজন জৈন সন্ন্যাসী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হেম শীতল নামক একজন বৌদ্ধ নরপতির সমক্ষে কাঞ্চী প্রদেশস্থ বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন রাজা হেম শীতল বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং বৌদ্ধদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। তিনি মীমাংসা শাস্ত্রকার কুমারিলের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি "ন্যায় বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কুমারিলের সহিত তাঁহার ও সমন্তভদ্র নামক অপর একজন জৈন আচার্য্যের দার্শনিক মত বিষয়ে প্রবল বাদপ্রতিবাদ হয়। অকলঙ্ক "তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক" নামে "তত্ত্বার্থাধিগম" নামক গ্রন্থের একখানা টীকা লেখেন। তদ্ভিন্ন "অষ্টশতী" নামক একখানা পুস্তকও রচনা করেন। উহা পূর্ব্বোক্ত সমন্ত-ভদ্র রচিত "আপ্ত মীমাংসা" গ্রন্থের টীকা। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভিন্ন "লঘীয়স্ত্রয়," "স্বরূপ সম্বোধন" এবং "প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থ" (অথবা প্রায়শ্চিত্ত বিধি) নামক গ্রন্থগুলিও তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত হয়। কুমারিল দেখ।

অকালবর্ষ— তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি (তৃতীয়) গোবিন্দের পুত্র। এই গোবিন্দ প্রথম জগত্তুঙ্গ নামেও খ্যাত ছিলেন। অকাল বর্ষ ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। অকালবর্ষের অন্য নাম (দ্বিতীয়) কৃষ্ণ শুভতুঙ্গ। তিনি গুর্জ্জর, লাট, কঙ্কন, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, গঙ্গ, মাগধ প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র ইন্দ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অকালবর্ষের পুত্র জগত্তুঙ্গ, কেন রাজা হন নাই তাহার কোন বিবরণ জানা যায় না। দন্তীবর্ম্মা দেখ। (২) বল্লভ বংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের অন্য নাম।

অকিঞ্চন— ইহাঁর প্রকৃত নাম রঘুনাথ রায়। ইহাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনার সন্নিহিত চুপি গ্রামে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের জন্ম হয়। তাঁহার

পিতা বৰ্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্রের অনুগ্রহে দিল্লীর সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট রঘুনাথ সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল দেওয়ানের কার্য্য করিয়া, তিনি বিষয় কার্য্যে উদাসীন হইয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। শ্যামা বিষয়ক ও কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি অকিঞ্চন ভণিতাযুক্ত। ১২৪৩ সালের (১৮৩৬ খৃঃ অব্দ) ১৯শে ভাদ্র তিনি দেহত্যাগ করেন।

অকিঞ্চন দাস— (১) একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গান আছে। (২) তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য ভক্তি রসাত্মিকা" ও "শ্রীচৈতন্য-ভক্তি বিলাস"। প্রথমোক্ত গ্রন্থ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য উত্তর দাতা।

অখিল খাঁ, নবাব—মির আস্করীর উপাধি। খোরাসানের অন্তর্গত খোয়াক তাঁহার জন্ম স্থান। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ১১০৮) তাঁহার মৃত্যু হয়। আাক্কি দেখ।

অকেত সিংহ— তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পাওয়া যায় নাই। ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ কৃত "জাতক চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে তাঁহার শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

অক্কাদেবী—শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর তিনি শিষ্যা ছিলেন। রামদাস স্বামী ১৬০৩ শকের (১৬৮১ খ্রীঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামদাস স্বামী তাঁহার বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণ শিষ্যা অক্কাদেবীকে পারলিস্থিত রামবিগ্রহের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান। শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী ও কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম, তৎপরে শম্ভুজীর পুত্র শাহু, তাঁহারা সকলেই অক্কাদেবীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন। অক্কাদেবী মৃত্যুর পূর্ব্বেই, মহারাজা শাহুর অনুমতি অনুসারে, রামদাস স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র গঙ্গাধরকে রাম বিগ্রহের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অক্রূরচন্দ্র দত্ত— তিনি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোম্পানির আমলে তিনি কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রচুর ধন লাভ

হয়। বীরভূমের যুদ্ধব্যাপারে তিনি ইংরাজ সেনার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

অক্‌লাণ্ড, লর্ড—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম জর্জ ইডেন, আরল-অব-অক্‌লাণ্ড। George Eden, Earl of Auckland তিনি প্রথম লর্ড অক্‌লাণ্ডের পুত্র। ১৭৮৪খ্রীঃ অব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করেন এবং১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি ও টাঁকশালের অধ্যক্ষ হন। তিনি ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসন কালে প্রথম কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদ শাহ দুরাণীর পৌত্র শাহ সুজাকে বিতাড়িত করিয়া দোস্ত মোহাম্মদ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ সুজা পলায়নপূর্ব্বক লুধিয়ানা সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে মধ্য এশিয়াতে রাশিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে আফগান সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ঘটনা ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। দোস্ত মোহাম্মদ রাশিয়ার রাজ দূত বিটকিবিচকে (Vitkie-vitch) সাদরে গ্রহণ করিলেন। বিলাতি সরকার আফগান দরবারে রাশিয়ার প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লর্ড অক্‌লাণ্ড বিলাতি সরকারের আদেশে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা অক্টোবর দোস্ত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। একদল ইংরেজ সৈন্য শাহ সুজার পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দোস্ত মোহাম্মদ পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। শাহ সুজা ইংরেজের সাহায্যে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য কাবুলে শাহ সুজাকে সাহায্য করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু শাহ সুজার অকর্ম্মণ্যতায় অচিরে কাবুলে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৮৪১ খ্রীঃঅব্দের ২রা নভেম্বর ইংরেজ কর্ম্মচারী সার আলেকজাণ্ডার বর্ণেস (Sir Alexander Burnes) এবং ব্রিটিশ রাজদূত সার উইলিয়ম মেক্‌নটেন (Sir W. Macnaghten) ২৩শে ডিসেম্বর, দোস্ত মোহাম্মদের পুত্র আকবর খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। ৪৫০০ সৈন্য ও তাহার অনুচর বার হাজার লোক কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিহত হইলেন। মাত্র একজন লোক জালালাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ১২ই মার্চ্চ লর্ড অক্‌লাণ্ড এদেশ পরিত্যাগ করিলে, লর্ড এলেন

বরা (Ellenborough) বড়লাট হইলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড অকলাণ্ড পরলোক গমন করেন।

অক্ষপাদ—প্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শন সূত্র-কার। গোতম বংশে জন্ম বলিয়া তিনি গোতম বা গৌতম নামেও খ্যাত ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাপানী পণ্ডিত এইচ উইর (H. Ui) মতে খ্রীঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দিতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইটালিয়ান পণ্ডিত অধ্যাপক এল সুয়ালির (L. Suali) মতে তিনি ৩০০—৩৫০ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। ন্যায় সূত্রে বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর আক্রমণ দৃষ্টে ফরাসী অধ্যাপক ডাঃ এইচ জেকবি (Dr. H. Jacobi) বলেন অক্ষপাদ ২০০—৪৫০ খ্রীঃ মধ্যে কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিত সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৫০ খ্রীঃ অব্দ অক্ষপাদের সময় বলিয়া অনুমান করেন এবং ইহাই সমিচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার জন্ম স্থান গুজরাটের অন্তর্গত প্রভাস তীর্থে। আন্বীক্ষিকী বিদ্যার স্থাপয়িতা গৌতম আর অক্ষপাদ গৌতম এক ব্যক্তি নহেন। পূর্ব্বোক্ত গৌতম মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। অক্ষপাদের পিতার নাম সোমশর্ম্মা। তিনি শিবের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন। ন্যায় দর্শনে ৫২৮ সূত্র আছে। সূত্রগুলি পাঁচ অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় দুই আহ্নিকে বিভক্ত। তাঁহার মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ (অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য)। তাঁহার মতে আত্যন্তিক দুঃখ নাশই মুক্তি। অক্ষপাদের 'ন্যায়দর্শন সূত্র' গ্রন্থ কতদূর আদরণীয় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ বহুল টীকা ও টীকার টীকা। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম উল্লেখ যোগ্য। বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি-মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা, উদয়নাচার্য্যের ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা পরিশুদ্ধি, বর্দ্ধমান রচিত ন্যায়-নিবন্ধ প্রকাশ, শ্রীকণ্ঠ বিরচিত ন্যায়া-লঙ্কার, অভয়তিলক উপাধ্যায় রচিত ন্যায়বৃত্তি প্রভৃতি প্রধান।

অক্ষয়কুমার দত্ত—তিনি ১২২৭ সালের শ্রাবণ নবদ্বীপের সমীপ-বর্ত্তী চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। পিতা মাতা উভয়েই বিবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। ১২৩২ সালে পাঁচ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের হাতেখড়ি হয়। চুপী গ্রামে কোন পাঠশালা না থাকায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই। দুই বৎসর পরে গ্রামের এক গুরুমহাশয়ের

নিকট তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তিন বৎসরকাল তথাকার পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই তিনি পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এই অল্প বয়স হইতে পৃথিবী কত বড়, পৃথিবীর সীমা কোথায়, আকাশ কত দূর ইত্যাদি বিষয় জানিবার কৌতূহল তাঁহার মনে উদিত হয়। দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার কলিকাতা খিদিরপুরে পিতার নিকট আগমন করেন। তথায় জয়কৃষ্ণ সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট কিছুকাল পড়িয়া কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে খিদিরপুরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার স্বেচ্ছায় তথায় ভর্ত্তি হন। তখনকার হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, পাদরীদের স্কুলে পড়িলেই হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার পিতৃব্য পুত্র হরমোহন ঘোষ, তাঁহাকে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর, ইহার পূর্ব্বেই তের বৎসর বয়সে আগড়পাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত অক্ষয় কুমারের বিবাহ হয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। পরবৎসর পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের সঙ্গেই সঙ্গেই তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হইল এবং তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াও তিনি পাঠে বিরত হন নাই। গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তাঁহারই অনুরোধে অক্ষয়কুমার ইংরেজী খবরের কাগজ হইতে অনুবাদ করিয়া একটী রচনা প্রভাকরে ছাপিবার জন্য দেন। ইহাই অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বে কেবল তিনি "অনঙ্গমোহন" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৪৬ সালে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী সভা স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার ঐ সভার সভ্য হন এবং সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পরবৎসর এই সভার যত্নে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত

হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালায় পদার্থ বিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ১২৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থে তাঁহার রচিত "ভূগোল" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১২৪৯ সালে অক্ষয়কুমার টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। বার বৎসর কাল তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৬২ সালে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার শিরোরোগের সূত্রপাত হয়। তিনি ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। ভূগোলের পর ১২৫৮ সালে তাঁহার রচিত বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ এবং ১২৫৯ সালে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এই প্রচারের ফলে অনেকেই—বর্দ্ধমানের মহারাজা পর্য্যন্ত—মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করেন, এবং ভদ্র সমাজে মদ্যপানের প্রভাব অনেক কমিয়া যায়। ১২৫৯ সালে চারুপাঠের প্রথম ভাগ, ১২৬১ দ্বিতীয় ভাগ এবং ১২৬৬ সালে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতি ও পদার্থ-বিদ্যা যথাক্রমে ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৭ সালে উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১২৮৯ সালে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় "প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার" নামক তাঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সম্বোধন পদে 'মুনে'! 'দেবি' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মুনি!' 'দেবী!' লিখিবার রীতি তিনিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভূগোল, প্রাকৃতিক-ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, নীতি-বিদ্যা, শরীর-বিধান, তাড়িতবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার সময়ে, তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়া-

ছেন। তিনি শেষ বয়সে হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিগ্রামে 'শোভনোদ্যান নামক নিজ উদ্যান-বাটিকায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সময় তিনি বিষয় কর্ম্ম কিছু দেখিতে পারিতেন না। এই সুযোগে তাঁহার এক কর্ম্মচারী কয়েক সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যায়। শেষে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া চিঠি লিখিলে, ঐ ব্যক্তি উত্তরে লেখে,. "আমি বিধবা বিবাহ করিলে আপনি আমাকে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়াছিলেন, আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি জানিবেন।" এই সংবাদ জানিয়া তিনি তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। তিনি সর্ব্বদাই দরিদ্রের প্রতি দয়াবান ছিলেন। অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় জানিতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীসও, আমাদের ভারতবর্ষের মত, বহু দেবতার আরাধনা করিত, কিন্তু এখন তাহারা একেশ্বরবাদী। সেই সময় হইতেই তাঁহার মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী হইলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার পরে বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয় বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ ধারণা তাঁহার জন্মে। সুতরাং তিনি কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদি কারণ বিশ্ব-বীজের প্রতি তিনি পুনর্ব্বার আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৬ খ্রীঃ, ২৭ শে মে) তারিখে অক্ষয় কুমার পরলোক গমন করেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার দান অতুলনীয়। তিনি একাধারে কঠোর নীতিবান্, বিনয়ী ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। মাদক সেবনের অপকারিতা বিষয়ে তাঁহার সুতীব্র লেখনী সতত উদ্যত থাকিয়া দুর্নীতি দমনে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমারের জীবন-চরিত দ্রষ্টব্য।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—তিনি একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাত। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, মৃতজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ার সময়ে একজন ইংরেজ ধাত্রী আসিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করেন। তাঁহার পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। শিক্ষা সমাপনান্তে অক্ষয় কুমার রাজসাহীতে ওকালতী করেন। সাহিত্যে, কলা-বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়

পাওয়া যায়। স্বদেশী যুগে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ ওজস্বিনী বক্তৃতা হৃদয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি করিত। তাঁহার শেষ জীবনে সি, আই, ই উপাধি প্রদান দ্বারা ভারত সরকার তাঁহার গুণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। তাঁহার সত্যানুরাগের একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একবার একজন বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে পাঠ্য গ্রন্থকে কৃত্রিম পণ্যে পরিণত করিয়া দেবার জন্য, দেশের প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা অপেক্ষা, কাহারও স্বার্থের মর্যাদা রক্ষা করিয়া, একখানি স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তেজস্বী অক্ষয়কুমার তদুত্তরে জানাইলেন যে, আত্মবিক্রয় করিয়া স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার অসাধ্য, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অক্ষয়কুমারের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ফিরিঙ্গী বণিক, গৌড়লেখ মালা প্রভৃতি তাহার স্মৃতি অক্ষয় রাখিবে। ১৩৩৬ সালের ২৮শে পৌষ, তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়চন্দ্র—তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথ, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের সেন ও পালবংশীয় নরপতিদের পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্রবংশীয় নরপতিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র সেই চন্দ্রবংশীয় অন্যতম নরপতি ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র অধিকারী—ইনি একজন কথকথা ব্যবসায়ী ছিলেন। চন্দন নগরে তাঁহার বাস ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার B. L.—১২৮০ সালে (১৮৭৩ খৃঃ) তিনি চুঁচুড়া হইতে সাধারণী নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। তিনি নবজীবন পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন সাধারণী ও নবজীবন এক সঙ্গে বাহির হইত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক ছিলেন। তাঁহার যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত "গোচারণের মাঠ" নামক কবিতা পুস্তক অতি সুন্দর। বঙ্কিম বাবুর সময়ে "বঙ্গদর্শনের" তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন।

অক্ষয় নাথ—হঠযোগসিদ্ধ একজন প্রসিদ্ধ যোগী।

অক্ষয়ানন্দ— যশোহর জিলার হাতিয়াগড়ে মহিদানন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামে দুই পুত্র ছিলেন। গোড়াই গাজির সহিত তাঁহাদের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বকানন্দ

নিহত হন কিন্তু গোরাই গাজী ও (গোরাচাঁদপীর) ভীষণ ভাবে আহত হইয়া বালাণ্ডার নিকটবর্ত্তী হাড়োয়ায় আসিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। অক্ষয়ানন্দ জয়ী হইলেন বটে কিন্তু ভাইকে হারাইলেন।

অক্ষোভ্যমুনি—তিনি প্রসিদ্ধ দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি মাধ্বমতে ন্যায় শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

অক্‌সেনডেন (Mr. Oxenden—শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের পরে, মিঃ অক্‌সেনডেন ইংরেজ সওদাগরের পক্ষ হইতে, উপহার দ্রব্যাদি সহ রায়গড়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শিবাজী তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। মিঃ অক্‌সেনডেন ছত্রপতিকে একটী হীরার আংটী উপহার দেন প্রতিদানে একটী উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন। তিনি কুড়িটী প্রার্থনা জানাইয়া একটী আবেদন ছত্রপতি শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান এই কয়টী প্রার্থনায় শিবাজী সম্মতি প্রদান করেন। (১) ইংরেজেরা কেবল শতকরা আড়াই টাকা বাণিজ্য শুল্ক দিয়া তাঁহার রাজ্যে বাণিজ্য করিতে পারিবে। (২) তাহারা রাজাপুর, চাউল ও দাবোল বন্দরে স্থায়ী বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিতে পারিবে। (৩) ইংরেজদের মুদ্রা তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র চলিতে পারিবে। (৪) তাঁহার রাজ্যের উপকূল ভাগে যে সমস্ত ইংরেজদের জাহাজ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে, সে সমস্ত তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৫) হাবলী ও রাজাপুরের লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। শিবাজী হাবলী বন্দরের ক্ষতিপূরণ করিতে অসম্মত হন। তিনি কেবল রাজাপুরের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১০ হাজার পেগোডা দিতে সম্মত হইলেন এবং তাহাদের অন্যান্য প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

অখণ্ডানন্দ—খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দিতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি আচার্য্য অখণ্ডানুভূতির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত "তত্ত্বদীপন" অদ্বৈতবাদের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

অখিলেশ—(১) ভট্টিরাজের সহোদর অখিলেশ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। (২) প্রসিদ্ধ রাণা প্রতাপসিংহের সহোদর শক্তসিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে অখিলেশ অন্যতম। তিনি অন্তলা দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন।

অখোভক্ত—জনৈক গুজরাটবাসী।

অনুমান ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জাতিতে স্বর্ণকার ছিলেন। তদানীন্তন দেশীয় কবিদিগের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন। তিনি বেদান্ত বিষয়ে অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বোধ্য হইলেও তাঁহার কবিতা গুজরাটীদের বড় প্রিয়। তাঁহার কবিতার মুখ্য বক্তব্য জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় এবং বৈরাগ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে জীবনে সুখী হওয়া যায় না।

অগ্নিবেশ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'অগ্নিবেশ সংহিতা' 'অগ্নিবেশ নিদান' বা 'অঞ্জন নিদান' তাঁহারই রচিত। তিনি মহর্ষি আত্রেয় পুনর্ব্বসুর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। আত্রেয় পুনর্ব্বসু দেখ।

অগ্নিব্রহ্ম— তিনি মৌর্য্যভূপতি অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র সুমন। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অগ্নিভূতি—জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের (বর্দ্ধমানের) একাদশ জন প্রধান শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে গৌতম ইন্দ্রভূতি অন্যতম। এই গৌতমের অন্যতম ভ্রাতা অগ্নিভূতিও মহাবীরের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। অগ্নিভূতির তিন শতাধিক শিষ্য ছিল।

অগ্নিমিত্তা—একজন শিক্ষিতা বৌদ্ধ রমণী। তিনি ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। "দীপ বংশ" গ্রন্থের ১৫ সর্গে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অগ্নিমিত্র—তিনি মগধের শুঙ্গবংশীয় বিখ্যাত নরপতি পুষ্পমিত্রের পুত্র। তিনি বিদিশা প্রদেশে (বর্ত্তমান ভিলসা) রাজপ্রতিনিধিরূপে কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

অগ্রদাস—ইনি একজন ভক্তকবি। ইঁহার গুরুর নাম কৃষ্ণদাস। অগ্রদাস উত্তম কবি ছিলেন। তাঁহার বাণী "সকল দেবতার দেবতা ঈশ্বরকে ভজনা কর। যেদিন আনন্দে গেল তাহাতেই জীবনের সাফল্য।" তিনি বলেন 'হরিকে পাইবার জন্য তনুমন তাঁহার মধ্যে হারাইয়া ফেল।' তাঁহার শিষ্য নাভাজী ডোমের সন্তান। দরিদ্রতা নিবন্ধন বিধবা মাতাকর্ত্তৃক নাভাজী পরিত্যক্ত হইলে তিনি এই অনাথ বালককে লালন পালন করেন ও নূতন দৃষ্টি দান করেন। তাঁহারই আদেশে নাভাজী "ভক্তমাল" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) সন্ন্যাসীদের একটী সম্প্রদায়কে মড়ি কহে। সেইরূপ রামাৎ, নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদেরও এক একটী সম্প্রদায়কে দুয়ারা বলে। এইরূপ বাহান্নটী দুয়ারা আছে। এক

একজন তেজিয়ান পুরুষ এক একটী দুয়ারার প্রবর্ত্তক। অগ্রদাস সাধু অগ্রদাস নামক দুয়ারার প্রবর্ত্তক।

অঘম—ব্রাহ্মণাবাদের একজন লোহানা জাতীয় রাজা। সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণ নরপতি চচ (চঞ্চল) দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণাবাদ আক্রমণ করেন। রাজা অঘম নগরের বাহিরেই চচের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। চচ নগর অবরোধপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অঘম উপায়ান্তর না দেখিয়া কনৌজের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন; চচ শুনিতে পাইলেন যে নগরে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ঐন্দ্রজালিক আছেন। তাঁহারই মন্ত্র বলে নগর দীর্ঘকাল যাবত অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারিতেছেন না। সে জন্য চচ ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ঐন্দ্রজালিক শ্রমণকে বধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রেতাত্মা পাছে তাঁহার কোন অনিষ্ট করে, সেই ভয়ে তিনি বৌদ্ধ মন্দিরটীর সংস্কার সাধন করেন। অঘমের পুত্র বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি তাঁহাকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। ৬৪৮—৬৮৮ খ্রীঃ।

অঘোমাধব— একজন সিদ্ধাচার্য্য। অচিতি দেখ।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার —ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ গ্রামের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি যোগ্যতার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, বাৎসরিক তিন শত পাউণ্ড গিল্‌ক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৮৭৫ সালে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়ে প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া রসায়ন বিজ্ঞানের বহু আকাঙ্খিত "হোপ" পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনের কয়েকজন অধ্যাপকও তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি ডি, এস, সি উপাধি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর তখন নিজ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত প্রয়াস করিতে ছিলেন। তিনি অঘোর নাথের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে

শিক্ষা সংস্কার কার্য্যে আহ্বান করেন। অঘোর নাথ মহোৎসাহে শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরেই যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত নিজাম রাজ্যে বালক বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অবিলম্বে এই কার্য্যের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। তাঁহাকে সকলে "শিক্ষাগুরু" বলিয়া সম্মান করিত। তাঁহর উচ্চ আদর্শপূর্ণ জীবনের প্রতি সকলে শ্রদ্ধান্বিত ছিল। যদিও রসায়ন শাস্ত্রালোচনাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার কল্পনা শক্তির প্রাচুর্য্যেও তিনি মগ্ন থাকিতেন। বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার কয়েকটী কবিতা ভাষার সরলতায় ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে অতি সুন্দর। কিন্তু এসকলের বহু উর্দ্ধে ছিল, তাঁহার সহৃদয়তা। তিনি অতি সহজে সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। নিঃস্ব দুস্থ সকলের জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি সমান আদর করিতেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিত। তিনি সকলকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় দেখিতেন। পত্নী বরদা সুন্দরীর জীবন মাধুর্য্য ও করুণায় পূর্ণ ছিল। চারিটী পুত্র এবং চারিটী কন্যার পিতা হইয়াও বাহিরের বহু যুবককে তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছেন। নানা জাতি ও বিচিত্র দেশের ছাত্রগণ সংস্পর্শে তাঁহার গৃহে সামাজিক কোন সংস্কারই থাকিতে পারিত না। অঘোর নাথের গৃহ শিক্ষানিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল, কারণ সেখানে পণ্ডিত, মৌলবী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের নিত্য সমাগম হইত। তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত ঋষি-জনোচিত আকৃতির বিপুল প্রাণভরা হাসিতে যেন গৃহ ফাটিয়া যাইত। তিনি শেষ জীবনে যখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেন, তখন তিনি যুবকদের সহিত যুবা হইয়া মিশিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে—"বাংলার যুবকেরা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া অবনত হইয়া পড়িতেছে। সকলকেই তিনি আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিতেন। এই গৃহের আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁহার আটটী পুত্র কন্যা পিতা মাতার মহৎ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশ বিখ্যাত শ্রীমতী সরো-জিনী নাইডু তাঁহারই সন্তানদের অন্যতমা। ১৯১৫ সালের ২৯ শে জানু-য়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

অঘোর শিবাচার্য্য—তিনি একজন দাক্ষিণাত্যের ভক্ত। তিনি এবং অন্যান্য ভক্ত পত্তিরা গিরিয়ার, শিববাক্য, পত্তি-নাত্তু পিল্লে, পরণষোধি মুনিয়র, শিব-যাগিন প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণের

বিরোধী, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আচার ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধবাদী। তাঁহাদের মতে "কোন আচার বা নিয়মকে ধর্ম্ম বলা যায় না, ধর্ম্ম অন্তরের অনুভূতি, প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ-তার পরিচায়ক।"

অঙ্গদ—গুরু অঙ্গদ নানকের মৃত্যুর পরে ১৫৩৯ খ্রীঃ অব্দে শিখদিগের গুরু হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় জাতির ত্রিহুন বংশে, বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী গেণ্ডালের নিকট কাভুর নামক স্থানে ১৫০৪ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নানকের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। নানকের সঙ্গে থাকিয়া তিনি তাঁহার কার্য্যকলাপ যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বালা সিন্ধুর নিকট যাহা শুনিয়াছেন এবং নানকের নিকট যে সকল উপদেশ শুনিয়াছেন, সেই সমস্ত তিনি লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাহা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে স্বীয় গদিতে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া স্বীয় প্রিয় শিষ্য অমর দাসকে প্রচার কার্য্যে ও ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গুরু অঙ্গদ ১৫৫২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

অঙ্গিরস—(১) বৌদ্ধ শাস্ত্রে (ত্রিপি-টকের অন্তর্গত গ্রন্থাবলীতে) নিম্ন লিখিত বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষি-দিগের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বত্রই মন্ত্র কর্ত্তা ও মন্ত্র প্রবর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ঋষিদিগের নাম যথা—অট্‌ঠক, (অষ্টক), বামক, (বাম-দেব), বেস্‌সামিত্ত (বিশ্বামিত্র), যমতগ্নি, (জমদগ্নি), অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, (বাশিষ্ঠ অথবা বশিষ্ঠ), কস্‌সপ (কশ্যপ) ও ভগু (ভৃগু)। (২) বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে অনেক স্থলে গৌতম বুদ্ধকে অঙ্গিরস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধ দেখ।

অঙ্গিরা—তিনি অষ্টাদশ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবর্ত্তকদের অন্যতম ছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। অত্রি দেখ।

অঙ্গুলিমাল—তিনি কোশল রাজ প্রসেনজিতের কুল পুরোহিত ভার্গবের পুত্র। তাঁহার জন্মের পরে দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন যে, তিনি একজন ভয়া-নক দস্যু হইবেন। ভার্গবের ইচ্ছা ছিল এরূপ পুত্রের প্রাণ নাশ করেন। কিন্তু রাজা প্রসেনজিতের অনুরোধে তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হন। অঙ্গুলি-মালের পূর্ব্ব নাম ছিল অহিংসক। গুরুর আদেশে সহস্র লোকের অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন। অঙ্গুলিমাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় বিদ্যা লাভার্থ গমন করেন। অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। ইহাতে তাঁহার সহা-ধ্যায়ীরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতে সচেষ্ট হন।

তাঁহারা অঙ্গুলিমালের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া গুরুর বিদ্বেষ উৎপাদন করেন। গুরুর সন্দেহ হয় যে, অঙ্গুলিমাল তাঁহার পত্নীর সহিত গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত আছেন। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন যে, "যদি তুমি সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিয়া নিদর্শনস্বরূপ এক একটী অঙ্গুলি আনিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে বিদ্যা দান করিব। নতুবা করিব না।" গুরুর আদেশ পালনার্থ অঙ্গুলিমাল এক বনের মধ্যে কতকগুলি পথের সংযোগ স্থলের নিকটে অবস্থান করিয়া, মনুষ্য বধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত কোশল রাজ্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাজা প্রসেনজিত তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এদিকে বুদ্ধদেব তাঁহার মন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, ভিক্ষুবেশে সেই বন পথে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলিমাল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে বুদ্ধদেবকে থামিতে বলিলেন। বুদ্ধদেবও অঙ্গুলিমালকে স্বীয় স্থানে থামিতে বলিলেন। তখন বুদ্ধদেব তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট উপদেশে তাঁহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন বুদ্ধদেবের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া, অশ্রুজলে তাঁহার চরণ সিক্ত করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। এই সময়ে অঙ্গুলিমালের পিতা মাতাও তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজা প্রসেনজিত তাঁহাকে দমন করিবার সদুপায় অবলম্বন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট জেত বনে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব প্রথমে রাজাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, অঙ্গুলিমাল নামক এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে দমন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার পরামর্শের জন্যই আপনার চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। বুদ্ধদেব বলিলেন,—"মনে করুন, সে যদি ভিক্ষু হয়, তবে আপনি তাহাকে কি শাস্তি প্রদান করিবেন?" রাজা বলিলেন, "আমি তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা অর্পণ করিব।" রাজা যাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই, আজ তাহাই হইল। বুদ্ধদেব ভিক্ষুক বেশে অঙ্গুলিমালকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। রাজা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং নিজের মণিখচিত কটিবন্ধ খুলিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া রাজার নিকট স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা আবেগ ভরে বলিতে

লাগিলেন,—"ধিক্ আমার রাজ দণ্ডকে আমি কেবল দণ্ডদ্বারা লোকের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি, তাহাতে লোকের চরিত্র সংশোধন হয় না। লোকের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। আজ আপনি দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে, পরোপকারী নিস্পৃহ সাধুতে পরিণত করিলেন।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে স্বগ্রামে অঙ্গুলিমাল ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রসব বেদনায় কাতর এক রমণীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইল। যে নরঘাতক দস্যু ছিল, সে আজ পরদুঃখে বিগলিতাশ্রু হইল। আশ্রমে ফিরিয়া বুদ্ধদেবের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"যাও স্বীয় পুণ্যের ফল দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য কর।" অঙ্গুলিমাল বলিলেন, "আমার আবার পুণ্য !!! নরঘাতক দস্যুর আবার পুণ্য !!! বুদ্ধদেব বলিলেন, —"সেই পাপ তোমার পূর্ব্বজন্মের এই ভিক্ষু জন্মে অনুতাপের যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছ, তাহাদ্বারা তাহাকে বাচাও। তখন অঙ্গুলিমাল প্রসব বেদনা-ক্লিষ্টা সেই রমণীর নিকট যাইয়া কাতরে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করায় তাহার একটী পুত্র প্রসব হইল। লোকেরা তদবধি অঙ্গুলিমালের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিল। তিনিও পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিলেন।

অঙ্গুষ্ঠনাথ—নাথপন্থীদের চৌরাশী জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। আপাননাথ দেখ।

অঙ্গেয় মিঙ্গতো—তিনি মণিপুরের মহারাজ শূরচন্দ্র সিংহ ও কুলচন্দ্র সিংহের সময়ে অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের মণিপুর যুদ্ধে লিপ্ত বলিয়া তাঁহার দ্বীপান্তর হয়।

অঙ্গেয়সেনা— মণিপুরের রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের পঞ্চমী মহিষীর গর্ভজাত পুত্র। তাঁহার অন্যনাম ভুবন সিংহ ছিল। মণিপুরের যুদ্ধ ব্যাপারে ও কুইনটন প্রভৃতির হত্যাকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

অচেল কস্সপ (কশ্যপ)—সম্ভবতঃ নগ্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত কোনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। রাজগৃহ নগরে গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে কথোপকথন হয়।

অজল মঙ্গল—তিনি দরদ দেশের অধিপতি ও কাশ্মীর পতি অনন্ত রাজের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি একবার কতিপয় মেচ্ছ রাজার সাহায্য পাইয়া কাশ্মীর মণ্ডল আক্রমণ করেন। অনন্ত রাজের সেনাপতি রুদ্রপাল তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক স্বীয় প্রভুকে উপহার প্রদান

করেন। এই সময়ে অনেক ম্লেচ্ছ ভূপতি পরাজিত ও নিহত হন।

অচলমিশ্র—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত ফলিত জ্যোতিষের অচল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে।

অচিতি—একজন সিদ্ধাচার্য্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্বকালে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে ৭৬জন সিদ্ধের নাম উল্লেখ আছে, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন তাঁহারা সকলেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অচিন্তপুরী— দশনামী সন্ন্যাসীদের যে বাহান্নটী (৫২) মড়ি বা সম্প্রদায় আছে, এক একজন সিদ্ধ পুরুষ ঐ এক একটী মড়ির প্রতিষ্ঠাতা। অচিন্তপুরী এইরূপ একটী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

অচুজি—তিনি ইলবুর্গের সিন্ধবংশীয় নরপতি ছিলেন। তাঁহারা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়ে (১০৭৬-১১২৭) বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য দেখ।

অচেতনাথ—তিনি একজন নাথপন্থী পঞ্চম গুরু ছিলেন। নাথপন্থা নামে একটী বড় ধর্ম্ম সম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে। তারপর ক্রমশঃ পূর্ব্ব ভারতে, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে নাথ সম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিষ্য শাখার পুষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের নাথপন্থীদের নিকট যে গুরু পরম্পরা পাওয়া যায়, তাহাতেই অচেতনাথ পঞ্চম গুরু বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই গুরু পরম্পরাতে সাতজন গুরুর নাম লিখিত আছে।

অচ্যুত—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রস সংগ্রহ সিদ্ধান্ত।

অচ্যুত গোঁসাই—তিনি মহাপ্রভু অদ্বৈত গোঁসাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা অষ্ট ভ্রাতার মধ্যে তিনিই সদাচার সম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। অন্যান্যেরা সকলে দুরাচারী ছিলেন।

অচ্যুত দাস—(১) তিনি একজন কবি। তাঁহার কাব্যে ভাবী বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তাঁহার রচিত শূন্য সংহিতায় তিনি নিজেকে বুদ্ধের পঞ্চ শক্তির অন্যতম শক্তি বলিয়া প্রচার করেন। এবং বুদ্ধদেব শত্রু বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হইবেন। (২) তিনি গোপী ভক্তিরস বা কৃষ্ণলীলা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অচ্যুত পঞ্চানন—তাঁহার রচিত রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকুল পঞ্জিকা নামে এক কুলগ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন।

অচ্যুত মিহিরাচার্য্য—সাগর ভট্টের পুত্র। এই জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীপতি ভট্ট কৃত জ্যোতিষ রত্নমালা নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন। ১৫০০ শকে ইহা রচিত হয়। তিনি ভাস্বতী রত্নদীপিকা নামে এক করণ গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

অচ্যুত রায়—(১) তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজা ছিলেন। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে ভ্রাতা রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় দশবৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি ভ্রাতার ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁহার সময় হইতেই বিজয়নগর রাজ্যের অধোগতি আরম্ভ হয়।

অচ্যুত সেন—বগুড়া জিলার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানের ৩।৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাজবাড়ী মুকুন্দ নামে একটী স্থান আছে। দীর্ঘে দুইমাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুইমাইল ব্যাপিয়া এইস্থানে বহু অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন তাঁহারই বংশীয় একজনকে পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিবার জন্য সামন্ত নৃপতিরূপে এই-স্থানে স্থাপন করিয়া ছলেন। তাঁহার বংশধরেরা প্রায় দুইশত বৎসর এইস্থান শাসন করেন। তৎপরে এই বংশের শেষ নরপতি অচ্যুত সেনের সময়ে (১৩৫০ খৃঃ অব্দে) এই রাজ্য মুসলমান অধিকারে আসে এবং বংশ লোপ পায়।

অচ্যুতানন্দ—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে তথায় অনেক বৌদ্ধ দর্শন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধদের উপর নির্ম্মম উৎপীড়ন চলিতেছিল। তাঁহাদের অনেকে সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হন। সেই সকল বৌদ্ধদের মধ্যে জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অচ্যুতানন্দ তাঁহার "নিরাকার সংহিতা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে সংসার আসক্তি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। হৃদয়ে তন্ময় ভাব উপস্থিত হয়, এমন সময় মহাগুরু মহানন্দ আসিয়া গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সাধনার চরম লক্ষ্য সচ্চিদানন্দ, অনাদি নির্ব্বাণ। অচ্যুতানন্দের আর এক খানি গ্রন্থের নাম শূন্য সংহিতা। উপরোক্ত পঞ্চ মহাত্মা দ্বারা উৎকলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে বুদ্ধদেবের প্রত্যাদেশানুসারে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় রূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বৈষ্ণবাখ্যায় পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া সমর্থিত হইয়াছে।

অচ্যুতানন্দ গাঙ্গুলী—পিতার নাম শ্রীনিবাস গাঙ্গুলী। পিতা বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কিন্তু মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র অচ্যুতানন্দকে দেববিগ্রহ স্থাপন করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। পুত্রও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি সাঁওতাল পরগণায় কারবার করিয়া সম্পত্তিশালী হন। এই সময় একদিন দেওঘরের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে বসিয়া পিতার মনোবাসনা কিরূপে পূর্ণ করিবেন, বালগোপাল মূর্ত্তি কোথায় পাইবেন, এইরূপ চিন্তা-মগ্ন আছেন। এমন সময় জনৈক ব্রহ্মচারী একটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত বাল-গোপাল ও একটী শ্রীধর মূর্ত্তি লইয়া তথায় উপস্থিত হন ও মূর্ত্তি দুইটী তাঁহাকে প্রদান করেন। অচ্যুতানন্দ মহানন্দে বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। কোন পূজারী নিযুক্ত না করিয়া তিনি নানা কাজকর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যেও স্বয়ং দেব পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার পঞ্চাশ হাজার গরু ছিল। হেতমপুর দুর্গের পশ্চিমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "গাঙ্গুলী পুষ্করিণী" অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।

অচ্যুতানন্দ রাজা—(১) তিনি উড়িষ্যাদেশের একজন রাজা। তাঁহার পুত্র রসিক মুরারির চরিত্র অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যা বাসী কবি গোপী বল্লভ দাস "রসিক মঙ্গল" নামে এক-খানা কাব্য রচনা করিয়াছেন। (২) হুগলী জিলার আরামবাগের নিকট রণজী রায় নামে এক রাজা ছিলেন। অনুমান চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি, বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই পুত্রের নাম অচ্যুতানন্দ। তিনি শাক্ততান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন।

অজয় সিংহ—চিতোরের অধিপতি রাণা লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। সম্রাট আলা-উদ্দিন খিলিজি চিতোর আক্রমণ করিলে লক্ষ্মণ সিংহ ও তাঁহার অপর একাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কেবল অজয় সিংহ কতিপয় সৈনিক সমভি-ব্যাহারে কৈলবারা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মিবারের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত বিশাল আরাবল্লী পর্ব্বত মালার উপত্যকা দেশে শেরোনল্ল নামক একটী সমৃদ্ধ জনপদ আছে। তাহারই শীর্ষস্থানে কৈলবারা স্থাপিত ছিল। অজয় সিংহের পিতা লক্ষ্মণ সিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, অজয় সিংহের মৃত্যুর পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণে মৃত অরি-সিংহের পুত্র রাজা হইবে। একথা অজয় সিংহ ক্ষণকালের জন্যও ভুলেন নাই। তাঁহার পুত্র আজিম সিংহ ও সুজন সিংহ তেমন কর্ম্মঠও ছিলেন না।

অনেক অনুসন্ধানের পর অরিসিংহের পুত্র হামিরকে মাতুলালয় হইতে আনয়ণ করিলেন। তাঁহাকে প্রথমে পরমশত্রু ভিল সর্দ্দার মুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হামির ভিল সর্দ্দার মুঞ্জের ছিন্ন মস্তক স্বীয় পিতৃব্য অজয় সিংহকে উপহার প্রদান করিলেন। পিতৃব্য হামিরের বীরত্বে অতিমাত্র প্রীত হইয়া সেই ছিন্নমুণ্ড হইতে শোণিত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার কপালে রাজতিলক প্রদান করিলেন। হামির দেখ।

অজাতশত্রু—মগধের অধিপতি। খৃঃ পূর্ব্ব ৫৫৩ অব্দে তাঁহার পিতা বিম্বিসারের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি ৫৪০ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে বৈশালীর অধিপতি বজ্জি (বৃজি) জাতীয় নরপতিকে পরাস্ত করেন। বজ্জি বা বৃজি জাতিরা নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। তাহারা পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিব্বত মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করে। রাজগৃহনগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ৫৩৭ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে শাক্যসিংহ বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিলে, তিনি বুদ্ধের দেহাস্থির উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ৫৩৪ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে তাঁহারই যত্নে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়। এই সঙ্গীতিতে প্রায় পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকশ্যপ ইহাতে নেতৃত্ব করিয়া কোন্ বিষয়ের সূত্রগ্রাহীতব্য তাহা স্থির করিয়া দেন। এই সভাতেই কশ্যপ, আনন্দ ও উপালী কর্ত্তৃক বুদ্ধবচন ত্রিপিটক সাধারণ সমক্ষে প্রচারিত হয়। জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কোশল রাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা বিদেহ রাজকন্যা ছিলেন। অজাতশত্রুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, তাঁহার জননীর, স্বামীর স্কন্ধনিসৃত রক্তপান করিবার সাধ জন্মিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাঁহার স্বামী বিম্বিসার স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক সাধও পূর্ণ করিয়াছিলেন। দৈবজ্ঞেরা ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে "জাত বালক পিতৃঘাতি হইবে।" কথিত আছে রাজা অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পিতাকে আহার না দিয়া হত্যা করিবেন। তাঁহার জননী প্রতিদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। তিনি গোপনে কিছু অন্ন লইয়া যাইতেন। তাহাই আহার করিয়া বিম্বিসার জীবিত থাকিতেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া অন্ন লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়া দেন। তখন রাণী নিজের কেশদামের মধ্যে কিছু খাদ্য বস্তু লুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া কেশ বাঁধিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তখন রাণী পাদুকার অভ্যন্তরে খাদ্য

লইয়া যাইতে লাগিলেন। যখন ইহাও নিষিদ্ধ হইল, তখন স্বীয় গাত্রে মধু প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য লেপন করিয়া যাইতে লাগিলেন. বিম্বিসার তাঁহার দেহ লেহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেন। অজাতশত্রু অবশেষে রাণীর যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে অজাতশত্রুর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, পুত্রের ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে পিতৃস্নেহের উদয় হইল। তখন তাঁহার পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল এবং তখনই পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। হায়! পুত্রের জন্ম দিনেই পিতা অনাহারে বন্দীশালায় গতায়ু হইলেন। অজাতশত্রু এই সমস্ত দেবদত্তের পরামর্শে করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই দেবদত্ত বুদ্ধের মাতুল পুত্র ও বুদ্ধের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তিনি কয়েকবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। দেবদত্তের মৃত্যুর পরে রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যার জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া অবশেষে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবকের পরামর্শে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধ তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করেন। (এই পিতৃহত্যার বিবরণটী অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন—বুদ্ধের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য ইহা কল্পিত হইয়াছে। তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়)। ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায় নামক গ্রন্থের শ্রামণ্য ফল সূত্রে বুদ্ধের সহিত অজাতশত্রুর সাক্ষাতের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সূত্রে কথোপকথনচ্ছলে বুদ্ধদেব শ্রামণ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অবদান শতকে পাওয়া যায় যে অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিয়া কয়েকটি কেশ ও পাদনখ লাভ করেন। তিনি ঐ গুলির উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্তূপ পূজা নিষেধ করেন। (এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ "পূজারিণী" নামক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরে "নটীর পূজা" নামক নাটকে রূপান্তরিত করেন) জৈন সাহিত্যেও অজাতশত্রু বিম্বিসারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের উভয়কে অবলম্বন করিয়া অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছিল। জৈন "অঙ্গ" দিগের প্রায় প্রত্যেকটীর মধ্যেই একটী একটী "উপাঙ্গ" আছে। প্রথম অঙ্গের উপাঙ্গে পাওয়া যায় বিংভসার পুত্র রাজা কণিয় (অর্থাৎ অজাতশত্রু) জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ণভদ্র তীর্থে গমন করেন। রাজনৈতিক কারণে অজাতশত্রু ও তাঁহার মাতুল প্রসেন-

জিতের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অজাতশত্রু প্রথমে জয় লাভ করেন। পরে প্রসেনজিতের নিকট তিনি পরাজিত হন। কোনও কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় অজাতশত্রু প্রসেনজিতের জামাতা ছিলেন।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী— তাঁহার বাসস্থান বরিশাল জিলায়। পিতার নাম শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী। যৌবনে কিঞ্চিদধিক ৩২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও অকাল মৃত্যু ঘটায় শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অজিত কুমারের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যের গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যেরও তদ্রূপ রসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে তিনি পাশ্চাত্য নানা দেশের সাহিত্যের রস ও শক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন। এই জন্য বাংলা সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত, তিনি বিশ্ব সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঠিক দিকে হইতেছে কিনা, তাহা বুঝিবার মত শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা অনুবাদের সাহায্যে যেমন অজিতকুমারের পরিচয় ছিল, তদ্রূপ নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্ম্মের অভিব্যক্তি পাঠ করিয়া তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ও উদার ধর্ম্মালোচনার প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

অজিত কেশকম্বল (কম্বলি)—পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে পূরণ কস্সপ (কশ্যপ), মক্খলি গোসাল, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কাচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠি পুত্ত এবং নিগণ্ঠ নাতপুত্ত নামে ছয়জন পরিব্রাজক আচার্য্যের নাম পাওয়া যায় এই ছয়টি নাম প্রধানতঃ একত্রই উল্লিখিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ, তাঁহার শিষ্যবর্গ, অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্য ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদের নানা বিষয়ে আলোচনার বিবরণ বহুস্থলেই পাওয়া যায়। কেশ নির্ম্মিত কম্বল পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া অজিত ঐ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার মতে মৎস্য আহার ও মৎস্য বধ সমতুল্য পাপ। তিনি শিক্ষা দিতেন যে জীব ও উদ্ভিদ উভয়ের প্রাণ আছে। সুতরাং উভয়েরই বিনাশে সমতুল্য পাপ হয়। বুদ্ধের মাতুল পুত্র দেবদত্ত বুদ্ধের একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাদিগকে তীর্থক বলে। তিনি পূর্ব্বে কৃতদাস ছিলেন। প্রভুর অত্যাচারে তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক

গত্যন্তর অভাবে সন্ন্যাসী হন। তিনি ঊর্ণা নির্ম্মিত মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং মস্তক মুণ্ডিত রাখিতেন।

অজিৎ নাথ—তিনি জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে দ্বিতীয়। অযোধ্যা নগরে তাঁহার জন্ম হয় এবং শমেত শিখরে মৃত্যু হয়। তাঁহার গাত্র বর্ণ পীত, হস্তী তাঁহার বাহন ছিল। তিনি অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা জিতশত্রুর মহিষী বিজয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

অজিত নাথ ন্যায়রত্ন— নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ১৭৬১ শকে সাধক প্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই কাব্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট ইঁহার কাব্য ও অলঙ্কার এবং কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। এই সময়ে রাজপুরের শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, দিনাজপুরের মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও পাবনার যদুনাথ ন্যায়রত্ন এই তিনজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও কবি নদীয়ায় অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে অজিত নাথের কবিত্ব শক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দ্ব্যর্থ বাচক ও শ্লেষাত্মক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত এইরূপ অসংখ্য কবিতা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তৎকৃত মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে—খণ্ডব্যাকরণ, নাট্যপরিশিষ্ঠ গ্রন্থের টীকা, কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও তৎ সম্পাদিত বিশ্বদূত নামক সাপ্তাহিক পত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

অজিত সিংহ—(১) তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র। যশোবন্ত সিংহ ১৭৩৯ খ্রীঃঅব্দে ঢাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মহিষীদ্বয়—রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি নিঃসন্তান রাজার উত্তরাধিকারিণী হন। তৎপরে নাড়াজোলের রাজারা ইহার মালিক হন। রাণী শিরোমণি ও যশোবন্ত সিংহ দেখ। (২) গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে নরবর নামক স্থানের সর্দ্দার মানসিংহের তিনি পিতৃব্য। মানসিংহ একবার সিন্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অজিতসিংহ মানসিংহের পক্ষ সমর্থন করিয়া সিন্ধের সাহায্যকারী ইংরেজ সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই মানসিংহ পরে ইংরেজদের বশীভূত হইয়া স্বীয় পিতৃব্য অজিতসিংহকে ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। অজিতসিংহ পূর্ব্বে এই কথা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। মানসিংহ তাঁতিয়া টোপীকে ধরাইয়া

দিয়াছিলেন। (৩) অজিত সিংহ রাঠোর বংশীয় মারবারের রাজা যশোবন্ত-সিংহের পুত্র। ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় কন্যাকে সম্রাট ফেরোক শিয়ারের সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র অভয়সিংহ তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন, সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে ১৭২৪ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। (৪) দশম শিখ গুরু গোবিন্দ-সিংহের পুত্র। তিনি আওরঙ্গ-জেবের সেনাপতির হস্তে ১৭০১ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন, (৫) মারবার (যোধপুর) রাজ যশোবন্ত সিংহের অনেকগুলি পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অজিতসিংহ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স খুব অল্প ছিল। সেই জন্য আওরঙ্গ-জেব তাঁহাকে হস্তগত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মিবার, মারবার ও অম্বর এই তিন শক্তি মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় এবং তৎপরে ফেরুকশিয়ার কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পদচ্যুত হন। অনন্তর রফেউল দিরাজাৎ সম্রাট হন। তিনি অজিত সিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (৬) যোধপুর রাজ যশোবন্তসিংহের পুত্র। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে যশোবন্তসিংহকে কাবুলের শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। অজিত-সিংহ তখন নাবালক ছিলেন। আওরঙ্গ-জেব অজিতসিংহকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিতে যত্ন করেন। কিন্তু যশোবন্ত-সিংহের অমাত্যেরা আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করিতেন না। তাহারা অন্য দুইটি বালককে তাহার পরিবর্ত্তে আওরঙ্গজেবের অধীনে অজিতসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা পরিচয়ে রাখিয়া অজিত-সিংহকে উদয়পুরের রাণার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রক্ষা করিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ফেরোকশিয়ার অজিত-সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে অস্বী-কৃত হন।

অজিতসেন—মহীশূর রাজ্যান্তর্গত শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গোম্মত মূর্ত্তির স্থাপয়িতা চামুণ্ড-রায়ের অন্যতম গুরু।

অজিতাপীড়— কাশ্মীরের কর্কোটক বংশীয় রাজা বজ্রাদিত্যের পৌত্র ও ত্রিভুনাপীড়ের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম জয়াদেবী। তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজকীয় ষড়যন্ত্রে রাজা হইতে পারেন নাই। কিন্তু

অজিতাপীড় উৎপলকের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে উৎপলকের ভ্রাতা মম্ম তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। অজিতাপীড় ৮৩৮—৮৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উৎপলক দেখ।

:—তিনি কাশ্মীরের সামন্ত নৃপতি শ্রীশূর পালের পৌত্র ও রাজকের পুত্র। কাশ্মীর পতি উচ্চলের সময়ে ভোগসেন প্রভৃতি বিদ্রোহী হইলে তিনি পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন।

অঞ্জনা—কাশ্মীরের অধিপতি প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় প্রবরসেনের জননী। রাজা

কাশ্মীরের কর্কোটক বংশ

১। দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য (৬২১ খৃঃ—৬৫৭ খৃঃ)

মহ্লণ ২। দুর্লভক প্রতাপাদিত্য (৬৫৭ খৃঃ—৭১১ খৃঃ)

৩। চন্দ্রাপীড় বজ্রাদিত্য (৭১২—৭২০ খৃঃ) ৪। তারাপীড় উদয়াদিত্য (৭২০—৭২৩ খৃঃ) ৫। মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য (১ম) (৭২৩—৭৬০ খৃঃ)

৬। কুবলয়াপীড় (৭৬০ খৃঃ) ৭। বজ্রাদিত্য বপ্পিয়ক ললিতাদিত্য ২য় (৭৬১—৭৬৮ খৃঃ)

৮। পৃথিব্যাপীড় (৭৬৮—৭৭২ খৃঃ) ৯। সংগ্রামপীড় (৭৭২ খৃঃ) ১০। জয়াপীড় বিনয়াদিত্য ত্রিভুবনাপীড় (৭৭২—৮০৬ খৃঃ)

১১। ললিতাপীড় (৮০৬—৮১৮) ১২। সংগ্রামপীড় ২য় (৮১৮—৮২৬ খৃঃ) ১৪। অজিতাপীড় (৮৩৮—৮৫১ খৃঃ)

১৩। চিপ্পট জয়াপীড় বৃহস্পতি (৮২৬—৮৩৮ খৃঃ) ১৬। উৎপলাপীড় (৮৫৩ খৃঃ)

১৫। অনঙ্গাপীড় (৮৫১—৮৫২ খৃঃ)

প্রবরসেনের পিতা তোরমল তদীয় ভ্রাতঃ রাজা হিরণ্য কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। গর্ভবতী অঞ্জনা স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে এক কুম্ভকারের গৃহে যাইয়া এক পুত্র প্রসব করেন ও তথায় অজ্ঞাত বাস করিতে থাকেন এই পুত্রই পরে দ্বিতী প্রবরসেন নামে খ্যাত হন। তোরমল অবশেষে কারামুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে অঞ্জনাও সহগমন করিয়া পতির চিতায় প্রাণত্যাগ করেন।

অঞ্জনাচার্য্য— একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম কঙ্কোলাধ্যায়।

অঞ্জলি—বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুসংখ্যক শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ আছে। অঞ্জলি ছয়টি অলৌকিক গুণ ও মহতি দৈব-শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ বিনয়পিটকে তাঁহার অনন্য-সাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অন্য লোককেও এই গ্রন্থ হইতে শিক্ষা দিতে পারিতেন; তিনি অনু-রাধপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুণী সহ গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয় পিটক হইতে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

অঞ্ঞ কোণ্ডঞ্ঞ (অন্য কৌণ্ডিণ্য)—পঞ্চবর্গীয় বলিয়া উল্লিখিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অন্যতম। ভগবান্ গোতম বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ঐনামে অভিহিত হন। তাঁহার সাধারণ নাম কৌণ্ডিণ্য। বুদ্ধদেব তাঁহাকে "রতনজ্ঞ"দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ, ধম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটি ত্রিরতন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

অটলনাথ— দশনামী সন্ন্যাসীরা বাহান্নটী মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী এক একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাত্মা অটল নাথ এইরূপ একটী সম্প্র-দায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বোধল দেখ।

অটলবিহারী ঘোষ—তিনি বাল্য-কাল হইতেই তীক্ষ্ণধী ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একই বৎসরে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন এবং এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছোট আদালতে ওকালতী করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। দুরূহ তন্ত্রশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তিনি আইন ব্যবসায়ের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের আলো-চনা করিতেন এবং পরিশেষে অধিকতর আলোচনার নিমিত্ত তিনি ওকালতী পরিত্যাগ করেন। ছোট আদালতে ওকালতী করিবার সময় হাইকোর্টের স্বনামধন্য জজ্ সার জন উড্রফ সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে এবং ইঁহারা উভয়ে লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থসমূহের উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত হন। প্রধানতঃ অটল

বাবুর চেষ্টায় "আগমানুসন্ধান সমিতি" স্থাপিত হয়। সার জন উড্‌রফ এবং অটলবাবু উভয়েই এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। অটলবাবুর প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এযাবত এই সমিতি হইতে সারদাতিলক, প্রপঞ্চসার, কুলার্ণব, কৌলাবলীনির্ণয়, তন্ত্ররাজ ও তন্ত্রাবিধান প্রভৃতি ১৯খানি তন্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক দুর্ল্লভ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩৩২ সালের ২৭ শে পৌষ ৭২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অড্‌বঙ্ক— নাথ পন্থীদের "নবনাথ ভক্তিসার" নামক মারাঠি গ্রন্থে নবনাথের (নয়জন নাথ) উল্লেখ আছে। তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

অণ্ডাল—(১) পেরিয়া আলোয়ারের কন্যা। খৃঃ পূঃ ৩০০৫ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে পেরিয়া আলোয়ার একদা তুলসী চয়ন করিতে গিয়া তুলসী কাননে এই পরমাসুন্দরী অণ্ডাল নাম্নী কন্যাটীকে প্রাপ্ত হন; বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডাল অতিশয় ভক্তিমতী হন এবং বিষ্ণু ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না বলেন। অবশেষে বিষ্ণু তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অণ্ডাল অতি মধুরভাষিণী ছিলেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম ছিল গোদা। রঙ্গনাথের পত্নী ছিলেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম রঙ্গনায়িকা। (২) অণ্ডাল রামানুজের প্রিয় শিষ্য কুবেশের পত্নীর নাম। তিনিও স্বামীর ন্যায় অতিশয় ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। কুবেশ দ্রষ্টব্য।

অতিভদ্র— দেবর্ষি ভরত তাঁহার রচিত সঙ্গীত শাস্ত্রের ভূতলে বহুল প্রচারার্থ ধ্যান প্রভাবে ভদ্রনামক নটকে সৃষ্টি করেন। এই ভদ্র নটের পুত্র সুভদ্র, তৎপুত্র অতিভদ্র এবং তৎপুত্র বীরভদ্র।

অতিমুক্ত কমলা—উরুবিল্ব গ্রামবাসিনী একটী মহিলা। তিনি বুদ্ধের ষড়বর্ষব্যাপী তপস্যার সময়ে অন্যান্য গ্রাম্য মহিলাদের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করিতেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান— গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্বকালে (৯৮০ খৃঃ) ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে মহাতান্ত্রিক বৌদ্ধযতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ ছিল। অবধুত জেতারির নিকট তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞানবজ্র নামে অভিহিত হন। ঊনবিংশ বর্ষ

বয়সে তিনি দণ্ডপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনিই তাঁহাকে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি প্রধান করেন। তৎপর অতীশ সুবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করেন। অনন্তর বঙ্গাধিপতি নরপাল কর্ত্তৃক অতীশ বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে অতীশ মগধের বৌদ্ধ সুধীবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চশত অর্হতের মহাসাঙ্ঘিকা নামক সম্প্রদায়ের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময়ে তিব্বতরাজ হ্লা-লামা বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কারের জন্য অতীশকে স্বীয় রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিব্বতরাজ পত্র ও তৎসহ বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া তিব্বতে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত লোক দ্বারা প্রার্থনা জানাইলে, অতীশ উপঢৌকন গ্রহণ না করিয়া, তিব্বত গমনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে লামা প্রেরিত বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াংসন নিরতিশয় কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতীশ নৈরাশ্য ক্ষুব্ধ ভিক্ষুকে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিব্বত রাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। গিয়াংসন তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ সমীপে ঘটনা বিবৃত করিলেন রাজা অনুমান করিলেন যে সুবর্ণের পরিমাণ অধিক হইলে হয়ত অতীশের তিব্বত আগমনে আপত্তি থাকিবে না। তখন রাজ্যে সুবর্ণ খনি আবিস্কৃত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং স্বর্ণ সংগ্রহে গমন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুরাজাকর্ত্তৃক বন্দী হন এবং বন্দী দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাগিনেয় চ্যান চাবকে বলিয়া যান যে, যদি অতীশের নিকট লোক পাঠাও তবে আমার এই কথাগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইও। "বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের জন্য এবং তাঁহারই জন্য সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে গিয়া তিব্বত রাজা হ্লা-লামা গারলোগ রাজের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব পণ্ডিত মহাশয় যেন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।" চ্যানচাব মাতুল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া নাগচোর নামক একজন বিচক্ষণ পণ্ডিতকে অতীশকে আনয়ন উদ্দেশ্যে বহু পরিমাণ সুবর্ণ উপঢৌকন দিয়া ভারতে প্রেরণ করেন নাগচোরের নিকট হ্লা-লামার সঙ্কল্পের কথা ও তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কথা অবগত হইয়া, অতীশ তিব্বত যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিব্বত যাত্রার পথে অতীশের বহু করুণার ও অলৌশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তির দরবারে নৃপতিকর্ত্তৃক

আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থিত হন, এবং রাজাকে একটী হস্তী উপঢৌকন দিয়া বিনিময়ে একটী বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে সম্মত করান। রাজপুত্র পথপ্রভা ঐ সময়ে অতীশের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদনন্তর তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিলে বিশেষ সমারোহে তিনি রাজাকর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন। তিব্বতরাজ প্রজাবর্গকে যতী অতীশের ধর্ম্মোপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে আদেশ দিলেন। অতীশ ত্রয়োদশ বর্ষকাল তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে তিনি "বোধিপথ প্রদীপ," "চর্য্যাসংগ্রহ প্রদীপ" "সত্যদয়াবতার" প্রভৃতি শতাধিক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তনের পদ ছিল; একখানির নাম "বজ্রাসন বজ্রগীতি" একখানার নাম 'চর্য্যাগীতি' একখানার নাম "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্ম্ম গীতিকা।" তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও মাতৃভাষার পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১০৫৩ খৃঃ অব্দে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে লাসার নিকট নেথাল নামক স্থানে অতীশের মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। তিব্বতের প্রথম লামা পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোমতান তাঁহারই মন্ত্র শিষ্য ছিলেন এবং ১০৭৩ খৃঃ অব্দে ব্রোমতানই তাঁহার গুরুর চরিতাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—তিনি কলিকাতা সিমুলিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ তিনি টীকাসহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতায় ও গানে জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

অতুলরায়—৬ষ্ঠ শিখ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র গুরুদত্ত। তিনি পিতামহেরই ন্যায় ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীয় পিতার জীবিত কালেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই গুরুদত্তেরই দ্বিতীয় পুত্র অতুলরায়।

অত্তার—একজন সুফী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ কবি। এলাহাবাদের মহারাজ মাধোদাসজী নামক একজন বাঙ্গালী সাধু তাঁহার এবং অন্যান্য সুফী কবিগণের সুফী মত পোষক কবিতাবলী সংগ্রহ করিয়া "বোস্তান এ-মারফত" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে মৌলানা রুম, হাফেজ, নিয়াজ, খৌস, চিস্তি, ধুয়ালী, কলন্দর, শমসেতবরেজ, অত্তার, ফির-

দোসী, নিজামী, সাদী, খকানী ও খয়াম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের সুফী মত পোষক কবিতা সংগৃত হইয়াছে।

অত্যঙ্গ—রাঢ় দেশে সাবর্ণ গোত্রীয় সিদ্ধল গ্রামী ভবদেব ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বর্ম্মবংশীয় গৌড় নৃপতি হইতে হস্তিনীভট্ট নামে একটী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র স্মরিতবোধ ও স্মরিতবোধের পুত্র আদিদেব এই আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী মহাপাত্র সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন।

অত্রি—কথিত আছে সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু, পৌলিশ ও শৌনক এই অষ্টাদশজন জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ পুলস্ত্যকেও অন্যতম আচার্য্য মনে করেন কেহ বা লোমশ ও রোমশকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সকল সিদ্ধান্ত, তন্ত্র বা সংহিতা নামে অভিহিত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য বা বিলুপ্ত হইয়াছে। আচার্য্য বাপুদেব শাস্ত্রী বলেন, প্রাচীন সূর্য্য, ব্রহ্ম, শৌনক বা সোম এবং বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায়। ডাঃ ভাউদাজী বশিষ্ঠ, ব্যাস, ব্রহ্ম ও রোমক সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রাপ্তিস্থান—বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত—কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য। ব্যাস সিদ্ধান্ত-কাশী, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও কাশ্মীর। ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত মুদ্রিত হইয়াছে—কাশী, কাশ্মীর। রোমশ সিদ্ধান্ত— কাশী, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, যুক্তপ্রদেশ ও ইংলণ্ড। (২) মহর্ষি অত্রি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম অত্রি-সংহিতা বা আত্রেয়-সংহিতা।

অদ্বয়বজ্র—ইনি বহুসংখ্যক বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ সংকীর্ত্তনের পদকর্ত্তা ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা বজ্রাচার্য্য বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

অদ্বৈতচরণ আঢ্য—তিনি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকার কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রথমে পাক্ষিক, পরে সপ্তাহে তিনবার (১৮৪১ খৃঃ), তৎপরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দৈনিক হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অদ্বৈতাচার্য্য—বঙ্গের রত্ন মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্য ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় রাজ্যের রাজধানী নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুবেরাচার্য্য ও মাতা নাভা দেবী। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। বাল্যকালেই তিনি বিদ্যালাভার্থ শান্তিপুরে গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পিতাও

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরেই গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। কমলাক্ষ পূর্ণবাটী গ্রামের শান্তি দ্বিজের নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশেষে মাধবেন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হন। তখন তাঁহার নাম হয় অদ্বৈতাচার্য্য। এই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেশ মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হন। সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সহ অদ্বৈত মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। বৈষ্ণব তরঙ্গে তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল। শান্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশ গোস্বামী বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতাচার্য্য পিতার ন্যায় সদাচারী ও বৈষ্ণব ছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন গোপাল নামে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। নবদ্বীপে মহাপ্রভু তিনজনের দারু মূর্ত্তির অদ্যাপি প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। জয়কৃষ্ণ দাস কৃত "ভুবন মঙ্গল গীত" নামক গ্রন্থের মতে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মকাল কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা, মঙ্গলবার, অনুরাধা নক্ষত্র। ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈতপ্রকাশ মতে মাঘী-সপ্তমী।

অদ্বৈতানন্দ— ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। ইহাতে বেদান্ত দর্শনের মত সমর্থিত হইয়াছে। তিনি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হন। শান্তি বিবরণ, গুরু-প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহারই রচিত। তাঁহার অন্যনাম চিদ্বিলাস। তিনি কোণ্ডেলা গোত্রীয় প্রেম নাথের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম পার্ব্বতী দেবী। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম সীতাপতি ছিল। তাঁহার গুরু ভূমানন্দ সরস্বতী বা চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী কাঞ্চীর সারদা মঠের (কাম কোটী পীঠের) অধ্যক্ষ ছিলেন। গুরু স্বীয় শিষ্য অদ্বৈতানন্দকে মঠাধীশ নিযুক্ত করিয়া বারাণসী বাসী হন।

অদ্ভুতাচার্য্য – প্রসিদ্ধ অদ্ভুত রামায়ণের রচয়িতা। তাঁহার আসল নাম নিত্যানন্দ। অদ্ভুতাচার্য্য উপাধি। তাঁহার রচিত রামায়ণ উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। মিঃ বুকানন হামিল্টন তাঁহার রঙ্গপুর বিবরণীতে এই রামায়ণ সেই অঞ্চলে কিরূপ সুপ্রচারিত ছিল, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি পাবনা

জেলার অন্তর্গত সোনাবাজু পরগণার বরবরিয়া গ্রাম। কবি অদ্ভুতাচার্য্য প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থখানি দিঘাপাতিয়ার দানশীল কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়ের ব্যয়ে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। অদ্ভুতাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও লেখাপড়া কমই জানিতেন। শিক্ষিত না হইয়াও কেবল মাত্র স্বীয় প্রতিভাবলে বৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিশ হাজারের মত শ্লোক এই গ্রন্থে আছে। তাঁহার পিতার নাম কাশী আচার্য্য ও মাতার নাম মেনকা। মতান্তরে তাঁহার জন্মস্থান বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার এলাকায় খাট্টা পরগণার মধ্যে বরবরিয়া নামক গ্রাম।

অধম খাঁ—তাঁহার পিতার নাম মাহম অনগ। সম্ভবতঃ হুমায়ুনের জারজ পুত্র। তাঁহার মাতা মাহম আকবরের ধাত্রী ছিলেন। তিনি জন্ম হইতে সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত সম্রাট আকবরের সেবা করিয়াছেন। অধমখাঁ বৈরামখাঁর পতনের একজন প্রধান কারণ। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং আগ্রার নিকটবর্ত্তী একস্থানে একটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দমন করিয়া যশস্বী হন। তিনি মালবের রাজা বাহাদুরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে রাজসভায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আতগা খাঁকে তিনি নিহত করিলে, সম্রাটের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

অনঙ্গপাল—(১) বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে স্থানান্তরিত হইলে ইন্দ্রপ্রস্থ বহুকাল শোচনীয় অবস্থায় পতিত ছিল। তৎপরে বীলনদেব এই পরিত্যক্ত শ্মশান ভূমিতে পুনঃ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং অনঙ্গপাল নাম ধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে ৭৩৬ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (২) দিল্লীর তুয়ারবংশীয় শেষ নরপতি অনঙ্গপাল ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া মহারাজ শেষ অনঙ্গপালের সহিত কনৌজে রাঠোরদিগের ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে আজমীরের চোহান নরপতি সোমেশ্বর অনঙ্গপালের পক্ষাবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনঙ্গপাল সেজন্য তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে অনঙ্গপাল নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কনৌজ রাজ বিজয়পালের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিজয়পালেরই পুত্র স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদ। সোমেশ্বরের পুত্র বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ। সুতরাং জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র।

জ্যেষ্ঠ জয়চাঁদ মাতামহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। সেই জন্য অপুত্রক অনঙ্গপাল মৃত্যুকালে পৃথ্বীরাজকে দিল্লী রাজ্য দিয়া যান। (৩) তিনি লাহোরের রাজা জয়পালের পুত্র। তাঁহার পিতা তুইবার মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। অনঙ্গপাল রাজা হইবার কিছুদিন পরেই ১০০৭ খ্রীঃ অব্দে (হিং ৩৯৬) গজনীপতি সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। অনঙ্গপাল বিপুল বিক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হন। কিন্তু পরাজিত হইয়া অবশেষে কাশ্মীর প্রদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ১০১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৩৯৯) অনঙ্গপাল পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কাণ্যকুব্জ, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবর্গ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে হিন্দু রমণীগণ দেশের ও ধর্ম্মের শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বীয় গাত্রালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ অনঙ্গপালের বিপুল সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচলিত হন নাই। প্রথম দিন যুদ্ধে কিছুই হয় নাই। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের পর অনঙ্গপালের হস্তী আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। ইহাতে হিন্দুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়নপর হয়। সুলতান মামুদ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিয়া অনেককে অসিমুখে অর্পণ করেন। অনঙ্গপাল পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

অনঙ্গবজ্র---একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। তিনি অনেক তন্ত্রের পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৭০৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

অনঙ্গভীম (প্রথম)--তিনি উড়িষ্যার চোলবংশীয় একজন প্রাচীন নরপতি। প্রবাদ এই তাঁহার রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১১৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার সংকার্য্য দ্বারা স্বীয় নাম স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি ষাটটী দেব-মন্দির নির্ম্মাণ, চল্লিশটী কূপ খনন ও দেড়-শতাধিক জলাশয়ের সোপানাবলী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করান এবং শতাধিক গ্রাম ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রদান করেন। তিনি বাঙ্গালার সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন। অনঙ্গভীমের পুত্র রাজেন্দ্র এবং রাজেন্দ্রের পুত্র দ্বিতীয় অনঙ্গভীম।

অনঙ্গভীম (দ্বিতীয়)—তিনি প্রথম অনঙ্গভীমের পৌত্র ও রাজেন্দ্রের পুত্র। এই উড়িষ্যাপতির বিষ্ণু নামে এক বিখ্যাত বীর্য্যবান সেনাপতি ছিলেন।

অনঙ্গাপীড়—তিনি কাশ্মীরাধিপতি সংগ্রামপীড়ের পুত্র। শ্রীচিপ্পট জয়াপীড়ের সময়ে তাঁহার উৎপলক, মম্ম প্রভৃতি মাতুলেরা রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। পরে শ্রীচিপ্পট জয়াপীড়কে নিহত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে এক একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হন। মম্ম প্রবল হইয়া সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অচিরেই উৎপলকের পুত্র সুখবর্ম্মা কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হন। (৮৫০-৩ খৃঃ)

অনন্ত—(১) কাশ্মীরপতি সুস্সলের তিনি অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্রোহী পৃথ্বীহর কাশ্মীর আক্রমণ করিলে তিনি পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। (২) জনৈক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বৈষ্ণব। অচ্যুতানন্দ দেখ। (৩) তিনি একজন সংস্কৃত কবি। তিনি অধ্যাত্ম ও বাল্মীকি রামায়ণের মূল হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে কীর্ত্তনের জন্য রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হয়। ইহাতে অনুমান ১২০০ শ্লোক আছে। হনুমৎ প্রণীত মহানাটকের কতক আভাষ ইহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। (৪) প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পূর্ব্ব পুরুষ। (৫) প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের অন্যনাম। (৬) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না। (৭) ভারতচম্পু নামক একখানা কাব্যের রচয়িতা। গ্রন্থখানি দ্বাদশ স্তবকে বিভক্ত। গ্রন্থখানি রচনার কাল নির্ণয় হয় নাই। (৮) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের জীবনাখ্যান অবলম্বনে "বীরচরিত" নামক কাব্য রচনা করেন। (৯) জলন্ধর রাজকুমারী সূর্য্যমতীর পতি অনন্ত। কথিত আছে এই সূর্য্যমতীর মানসিক অশান্তি দূর করিবার জন্যই প্রসিদ্ধ কথা-সরিৎসাগর গ্রন্থ রচিত হয়।

অনন্ত আচার্য্য—তিনি একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত একটী মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এক অনন্ত আচার্য্য ছিলেন। (চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) বোধ হয় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

অনন্ত কন্দলী—(১) তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত আসামী ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কোচবিহারের প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী নরপতি নরনারায়ণের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। (২) তিনি আসামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা রামায়ণ গ্রন্থ আছে। তাঁহার

অপর নাম রাম সরস্বতী। তিনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অনন্তকায়— শাগলনগরের গ্রীক নরপতি মিলিন্দের অমাত্য। তাঁহার গ্রীক্ নাম এণ্টিওকাস (Antiochas)

অনন্ত দত্ত—বাঙ্গালার অধিপতি বল্লাল-সেন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি স্বীয় গুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপারে পূর্ব্বময়মনসিংহে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই বোধ হয় তৎপ্রদেশের প্রথম সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক।

অনন্ত দাস—(১) একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত প্রায় পঞ্চাশটী পদ পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে এক অনন্ত দাসের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্য শাখা গণনায় এক অনন্ত দাসের উল্লেখ আছে। তাঁহারা সকলেই এক ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত। (২) অপর একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

অনন্ত দেব— তিনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম আপদেব। কমাযুনরাজ বাজবাহাদুর চন্দ্র ব্রাহ্মণ অনন্তদেবকে আনাইয়া কাশীতে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটী স্মৃতি নিবন্ধ লিখাইয়াছিলেন।

অনন্ত দৈবজ্ঞ— (১) তিনি নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি জন্মপত্রিকা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (২) বিদর্ভ দেশে (বর্ত্তমান নাগপুর) ধর্ম্মপুর নামকস্থানে গর্গ গোত্রীয় অনন্ত দৈবজ্ঞ বাস করিতেন। ১৪৮০ শকে(১৫৫৮ খৃঃ) তিনি জাতক পদ্ধতি ও পঞ্চাঙ্গ সাধনোপযোগী মহাদেব কৃত কামধেনু নামক গণিতের টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় উভয় গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ ও রাম দৈবজ্ঞ, পৌত্র গোবিন্দ দৈবজ্ঞ, প্রপৌত্র মাধব দৈবজ্ঞ, ইহাঁরা সকলেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ তৎতৎ নামে দ্রষ্টব্য। নীলকণ্ঠ দেখ। (৩) কৌশিক গোত্রীয় বাজসনেয়ী অনন্ত দৈবজ্ঞ দেবগিরির (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) উত্তরদিকে টাপর নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা শ্রীকান্ত দৈবজ্ঞ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। ১৪৪৭ শকে (১৫২৫ খ্রীঃ) অনন্ত দৈবজ্ঞ সূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত পঞ্জিকা প্রস্তুত করণোপযোগী সুধারস নামক সারণি প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ দৈবজ্ঞ ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্রীঃ) মুহূর্ত্ত মার্ত্তণ্ড নামক বিচার বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। নারায়ণের পুত্র গঙ্গাধর ১৫০৮ শকে (১৫৮৬ খৃঃ) গ্রহলাঘবের মনোরমা নাম্নী টীকা রচনা করেন। (৪) অপর এক অনন্ত দৈবজ্ঞ গোবিন্দ দৈবজ্ঞ রচিত কুণ্ডমার্ত্তণ্ড

গ্রন্থের প্রভা নামে এক টীকা রচনা করেন। (৫) গণেশের ভ্রাতা অনন্ত দৈবজ্ঞ লঘুজাতক দীপিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

অনন্ত নাথ—তিনি চতুর্দ্দশ অতীত জৈন তীর্থঙ্কর। আদিনাথ (প্রথম তীর্থঙ্কর) দেখ। তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যার রাজা সিংহসেন ও রাণী সুযশা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অযোধ্যা নগরেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা লাভ হয় এবং এই স্থানেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার গাত্র সুবর্ণ বর্ণ ছিল। শ্যেন পক্ষী তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। তিনি শমেতশিখরে (বর্ত্তমান পার্শ্বনাথ পাহাড়) মোক্ষলাভ করেন। দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতে তাঁহার লাঞ্ছন ভল্লুক।

অনন্তপণ্ডিত—তিনি সম্রাট শাহ-জাহানের সময়ে (১৬২৭—১৬৫৮ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন সপ্তশতী নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন। ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভানু দত্তের রসমঞ্জরীর এক টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত মুদ্রারাক্ষস নাটকের তিনি গদ্যানুবাদ করেন।

অনন্ত পাল—কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের তিনি অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। হর্ষদেব দেখ।

অনন্ত বর্ম্মা—(১) মৌখারীবংশীয় এক শাখা বর্ত্তমান গয়া জিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তথায় রাজ্য ছিল। তাঁহাদের বংশাবলী—যজ্ঞবর্ম্মা, শার্দ্দূল বর্ম্মা ও অনন্ত বর্ম্মা। (২) মগধের মুখর রাজবংশীয় জনৈক রাজা। ঈশানবর্ম্মা দেখ। (৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম যোগচন্দ্রিকা। (৪) তিনি গৌড়বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্কের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। শশাঙ্কের পতনের পরে তাঁহার সেনাপতিরা রাজ্যের এক এক অংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনন্তবর্ম্মা বিক্রমপুরে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন।

অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ—তিনি কলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন এবং তিনি সুদীর্ঘ চৌষট্টি বৎসর (১০৭৮—১১৪২ খ্রীঃ অব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি উৎকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই প্রবল প্রতাপাম্বিত নরপতি বঙ্গদেশ ও আক্রমণ করেন কিন্তু বঙ্গদেশের অধিপতি পালবংশীয় নরপতি রামপালের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

অনন্তভট্ট—(১) একজন বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রের রচয়িতা। পীতাম্বর বিবাহপটলের নির্ণয়ামৃত টীকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (২) অনন্ত-পণ্ডিত নামক এক জ্যোতিষী ভাবফল

নামক জ্যোতিষী গ্রন্থের প্রণেতা। গঙ্গারাম ইহার এক টীকা রচনা করিয়াছেন। (৩) তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৭—১৬৫৭খ্রীঃ অব্দ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক অনুপসিংহের জন্য তীর্থরত্নাকর নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

অনন্ত মাণিক্য—স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি বিজয়মাণিক্য আটচল্লিশ বৎসর প্রবল পরাক্রমে দেশজয় ও রাজ্য শাসন করিয়া ৯৯০ সনে (১৫৭৬ খৃঃ) বসন্ত রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য রাজ্য লাভ করেন। তিনি চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৬৫তম ও ত্রিপুর হইতে অধস্তন ১১০তম নরপতি ছিলেন। বিজয় মাণিক্যের ডুঙ্কুর ও অনন্ত নামে দুই পুত্র জন্মে। তাহারা উভয়ে অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। বিজয়মাণিক্য দৈবজ্ঞের পরামর্শে ডুঙ্কুরকে, তাহার হস্তে কোন প্রকার রাজচিহ্ন ছিল না বলিয়া, উড়িষ্যার জগন্নাথদেব দর্শনে ও সেবনে প্রেরণ করেন এবং কনিষ্ঠ অনন্তকে রাজা মনোনীত করেন। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের জয়া নাম্নী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া গোপীপ্রসাদকে অনন্তের সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান। কিন্তু বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পরে তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া স্বীয় জামাতাকেই বধ করেন এবং স্বয়ং উদয়মাণিক্য উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপদ অধিকার করেন। স্বীয় কন্যা জয়াকে (অনন্ত মাণিক্যের স্ত্রীকে) একটী জায়গীর দিয়া চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনন্ত মাণিক্য দেড় বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে (৯৯২ সনে) নিহত হন।

অনন্ত মিশ্র—তিনি "জৈমিনী ভারত" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অনন্ত রাজ—তিনি কাশ্মীরের সংগ্রাম রাজের পৌত্র ও হরি রাজের পুত্র। তিনি সামন্ত রাজ জালন্ধর পতি ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সূর্য্যমতিকে বিবাহ করেন। সূর্য্যমতির গর্ভে কলসের জন্ম হয়। তিনি অতি শৈশবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একবার তাঁহার পিতৃব্য রাজ্য হরণার্থ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। তিনি লোটিকা মঠে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক রাজধানী অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। অনন্ত রাজের পিতামহী শ্রীলেখার প্রেরিত সৈন্য লোটিকা মঠে অগ্নি প্রদান করে। তাহার পিতৃব্য বিগ্রহরাজ সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আর একবার কম্পনাধিপতি ত্রিভুবন কাশ্মীর সিংহাসন অধি-

কার করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু সেইবারে অনন্তরাজ স্বয়ংই তাঁহাকে পরাস্ত করেন। অনন্তরাজ বড়ই তাম্বুল প্রিয় ছিলেন। পদ্মরাজ নামক তাম্বুলী তাঁহার এমনই প্রিয় পাত্র হইয়াছিল যে, সে রাজার অনুগ্রহে প্রভূত ধনের অধিকারী হয়। সে রাজাকেও মুকুট প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া বহু অর্থ ঋণ দান করে। রাণী সূর্য্যমতি সেই অর্থ প্রদান করিয়া রাজাকে ঋণ মুক্ত করেন। মন্ত্রী হলধরের কৌশলে এই সময়ে তিনি দুইটী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়া রাণী সূর্য্যমতির পরামর্শে, মন্ত্রী হলধর প্রভৃতির নিষেধ সত্বেও পুত্র কলসের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। তৎপুত্র কলস অতি নরাধম ছিলেন। এখন রাজা হওয়াতে তাঁহার দুষ্কার্য্যের পথ পরিষ্কার হইল। কলস, জয়া, প্রভৃতির পরামর্শে, পিতার বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইলেন। পিতা অনন্তরাজ অতি দুঃখে বিজয়েশ্বরে গমনপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সেখানেও পুত্রের ব্যবহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করেন। (১০২৮—১০৮১ খৃঃ)

অনন্তরাম— তিনি একজন প্রাচীন বঙ্গীয় কবি। তাঁহার রচিত ক্রিয়াযোগসার নামক একখানা গ্রন্থ আছে। মেঘনা নদের পশ্চিম কূলস্থিত সাহাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বংশাবলী এইরূপ—দুর্ল্লভ দত্তের পুত্র রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ, রঘুনাথের পুত্র অনন্তরাম। অনন্তরামের মাতামহের নাম রামদাস। (২) তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত শাহগঞ্জ নামক স্থানের জমিদার রাজা মানসিংহের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌএর কৈশোর বাগে আবদ্ধ ইংরেজদিগকে রাজা মানসিংহ ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী অনন্তরাম মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অনন্তরাম বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গদেশের বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন এবং তাঁহার বহু শিষ্য ও গানের সংগ্রহ ছিল। কথিত হয় রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন তাহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় নিস্পৃহ ছিলেন। তাহার তিন কৃতী পুত্রও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায়। অনন্তরাম বিষ্ণুপুর রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র ব্যবসায়ে প্রথমে ব্রতী হন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকথা করিবার প্রবৃত্তি লইয়া সঙ্গীত

বিদ্যা শিক্ষায় যত্নবান হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে সঙ্গীতে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করেন। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ রামসরকার ভট্টাচার্য্যের নিকট ইনি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ—তিনি খাঁটুরার রূপনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর। স্মৃতি শাস্ত্রে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা হাতীবাগানে তাঁহার টোল ছিল এবং শোভাবাজার রাজবাড়ীতে খুব প্রতিপত্তি ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও তাঁহারই জ্ঞাতি কালিকিঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

অনন্তরাম রায়—ক্ষেতলাল থানার (বগুড়া জিলা) অন্তর্গত ইদ্রাকপুরে বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে অনন্তরাম রায় নামে এক কায়স্থ রাজা ছিলেন। তাঁহার সনকা ও মেনকা নামে দুই রাণী ছিল। তাঁহাদের নামে দুইটী দীঘিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। অনন্তরাম বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় নবাব তাঁহাকে ডাকিয়া স্বীয় সমীপে আনয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার বিষয় আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

অনন্তরাম শর্ম্মা—তিনি পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার নামক অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনন্তলাল দাস—তিনি বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকপাড়া বা পাকপাড়া গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কাজ করিতেন। তিনি কাটোয়া অঞ্চল হইতে আসিয়া পাইকপাড়ায় বাস করেন। তাঁহার আমলেও নবাবী পাইকদল (মল্ল বা মালগণ) যুদ্ধের সময় পাইকপাড়া হইতে যাইয়া নবাবের পতাকাতলে উপস্থিত হইত। দাস মহাশয় এই পাইকদের রসদ সরবরাহ করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। প্রথমা স্ত্রী সবর্ণা অর্থাৎ কায়স্থ জাতীয়া এবং দ্বিতীয়া অসবর্ণা বা সুবর্ণবণিক জাতীয়া ছিলেন। শুনা যায় রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসজাত ও উভয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। একে নবাবের কর্ম্মচারী, তাহার উপর ধনশালী এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান ও ক্রিয়াবান্, এই জন্য তিনি তদঞ্চলের সকলের নিকট প্রবল প্রতাপেধু বলিয়া অভিহিত হইতেন। সুতরাং সমাজে চলিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণ পাইকপাড়া ও বাণিয়র গ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

অনন্তশ্রী—তিনি নেপাল দেশীয় জনৈক পণ্ডিত। জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রণীত

কার্য্যকারণ-ভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ। কুমারকলস নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত-রাজ লামার সহায়তায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনন্তশ্রী উক্ত লামার সহযোগীতায় উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থ সংশোধন করেন।

অনন্তাচার্য্য—(১) একজন দ্বৈতবাদী আচার্য্য। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যাদবগিরি প্রদেশের মেলকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তক—১। জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ২। প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ৩। ব্রহ্মপদশক্তিবাদ, ৪। ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণ, ৫। বিষয়তাবাদ, ৬। মোক্ষকারণতাবাদ, ৭। শরীরবাদ, ৮। শাস্ত্রারম্ভসমর্থন, ৯। শাস্ত্রৈক্যবাদ, ১০। সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ, ১১। সমাসবাদ, ১২। সামানাধিকরণ্য-বাদ, ১৩। সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন। এত দ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। (২) তিনি বোধহয় মহীশূর প্রদেশবাসী বলিয়া মহীশূর অনন্তাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন 'তিনি "ন্যায় ভাস্কর" নামক গ্রন্থ লিখিয়া মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকাদির মত খণ্ডন করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে শতকোটীরাম শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। (৩) অপর একজন অনন্তাচার্য্য খ্রীঃ দশম শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রামানুজাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি সস্ত্রীক শ্রীশৈলে যাইয়া বাস করেন। সেখানে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী জলাভাব নিবারণার্থ স্বহস্তে কোদালি দ্বারা বহুবর্ষ পরিশ্রম করিয়া একটি জলাশয় খনন করেন। তাহা আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নাম নাম "অনন্তসরোবর।" (৪) শোলা-পুরের অনন্তাচার্য্য ১৭৯৮ শকে (১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দ) হমালগী কৃত অনন্তফলদর্শনের টীকা ও আনাভট্টী জাতকের টীকা রচনা করেন। (৫) ১৮০০ শকে (১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দ) অনন্তাচার্য্য আপাভট্টী জাতক নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

অনন্তানন্দ—(১) ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরের আচার্য্য চূড়ামণির প্রাচীন কারিকা অনুসারে অনন্তানন্দ বসুবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার তনয় বিজয়ী। (২) তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। রাজ-পুতানার অন্তর্গত জয়পুরে আমেরের নিকট গলতায় এখনও তাঁহার মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনপরাধ ঘোষাল—একজন যাত্রা-ওয়ালা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাতজন যাত্রাওয়ালার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন এবং পালা রচনা করিতেন।

অনরি—"দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক

গ্রন্থে লিখিত আছে যে অনরিন নামক ব্রাহ্মণ যশোরেশ্বরীর পীঠ মূর্ত্তির জন্য এক শত দ্বার যুক্ত বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সম্ভবতঃ ইহা সুন্দর বনের প্রাকৃতিক বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়া থাকিবে।

অনাথপিণ্ডদ (পিণ্ডিক)—শ্রাবস্তী নগরের একজন ধনী বণিক। তাঁহার প্রকৃত নাম সুদত্ত। তিনি যেমন বিভবশালী ছিলেন, তেমনি দাতাও ছিলেন। সেইজন্য বহু সহস্র অনাথের পিণ্ডদাতা (আহার দাতা) বলিয়া তিনি পালি সাহিত্যে অনাথপিণ্ডদ (পিণ্ডিক) নামে অভিহিত হইয়া অমর হইয়াছেন। রাহুল প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দিবার পর বুদ্ধ গৌতম রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শীতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে বুদ্ধের সহিত অনাথপিণ্ডদের পরিচয় হয়। অনাথপিণ্ডদ তখন পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকট লইয়া রাজগৃহে আগমন করিতেছিলেন। বুদ্ধের অমৃতায়মান বাক্য ও উপদেশ শ্রবণে সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ হইতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসক শ্রেণীভুক্ত হন। বুদ্ধদেবও তাঁহার সৌজন্য ও ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রাবস্তী নগরে যাইয়া কিছুদিন বাস করিতে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী বুদ্ধবিহার নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদর্থে তিনি শ্রাবস্তীর রাজা জেতকুমারের সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও সহস্র হস্ত প্রশস্ত সম চতুষ্কোণ উদ্যান অষ্টাদশ কোটী সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিলেন, এবং তৎপরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া মধ্যভাগে গন্ধকুটীর, তাহার চতুর্দ্দিকে অশীতি মহাস্থবিরের বাসভবন, ধর্ম্মশালা, আসনশালা, ভিক্ষুদিগের আশ্রম, ভ্রমণস্থান, পুষ্করিণী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই তিনি নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী তিনশত ষাট মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তিনি বুদ্ধের বিশ্রামের জন্য প্রতি আট মাইল অন্তরে এক একটী বিশ্রামাগার লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে বুদ্ধকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি দূত প্রেরণ করিলেন। বুদ্ধদেবও শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী নগরে পদার্পণ করিলেন। বিহার উৎসর্গের দিন স্থির হইল। সেই দিনে যে বহু আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বিহার সমুদয় পত্রপুষ্প, মাল্য-পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল। শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদ পঞ্চশত শ্রেষ্ঠী কুমার সহ পতাকা হস্তে বহির্গত হইলেন।

শ্রেষ্ঠি কন্যা মহাসুভদ্রা ও চুল্ল (কনিষ্ঠ) সুভদ্রা পঞ্চশত শ্রেষ্ঠী কুমারীসহ বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া মস্তকে পূর্ণকুম্ভ ধারণপূর্ব্বক অভ্যর্থনার জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠী পত্নী পঞ্চশত পুরমহিলা সহ বিচিত্র ভূষণবস্ত্রে শোভিতা হইয়া পূর্ণ পাত্র হস্তে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সকলের পশ্চাতে শ্রেষ্ঠি অনাথ পিণ্ডদ কুমারগণ সহ গমন করিতে লাগিলেন। একদিকে বুদ্ধদেবও ভিক্ষুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া জেতবন অভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে উভয় দলে সাক্ষাৎ হইল। উভয় দল বিহারে প্রবেশ করিলে বুদ্ধদেবের অনুমতিক্রমে অনাথপিণ্ডদ সুবর্ণভৃঙ্গার হইতে বারি গ্রহণপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি এই বিহার সর্ব্বদেশীয় বুদ্ধ প্রমুখ আগত অনাগত সঙ্ঘকে দান করিলাম"। কথিত আছে ইহার জন্য তাঁহার চুয়ান্ন কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ জাতক জেতবনে উক্ত হইয়াছিল।

অনাথবন্ধু গুহ--তিনি ময়মনসিংহের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। মফস্বলের দেশনেতাদেরও তিনি অন্যতম ছিলেন। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধি বলে সমাজে উচ্চস্থান লাভ করেন। ওকালতী দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও তাহার সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি পিতার নামে ময়মনসিংহে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কাশীতে মাতার নামে জগদম্বা জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ময়মনসিংহে পত্নীর নামে রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সার্ব্বজনিক কাজের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি হইয়াছিল। সামাজিক কাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরনীয়তা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মনোযোগী ছিলেন তাহার সম্পাদিত "ভারত মিহির" বাংলা দেশের একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল। ইহা তিনি ১২৮২ সালে (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, স্বদেশানুরাগী ও নির্ভীক ছিলেন। দেশের লোকের যাহাতে ধনবৃদ্ধি হয়, এরূপ নানা চেষ্টার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মধ্যে সমাজসংস্কারের এক অভিনব তেজ ও শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে কাশীতে আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনিরুদ্ধ—(১) কর্ণাট দেশের রাজা বিপ্ররাজের পুত্র। তাঁহারই বংশধর

সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি। জীবগোস্বামী দেখ। (২) তিনি ১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দ) ভাস্বতীব্যাখ্যা নামে একখানা জ্যোতিষ করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (৩) তিনি পূর্ব্ব আসামের একজন বিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন। আসামের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করদেবের তিনি সমসাময়িক কিন্তু তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া অনিরুদ্ধ স্বীয় মত সংস্থাপণ করেন। তিনি জাতিতে কলিতা ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ডোম, হাড়ি, মোরাণ, কাচারী, ছুটিয়া প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকই বেশী ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইহারা মোয়ামারিয়া নামে খ্যাত হয়। আহম রাজ্য ধ্বংশেরও কারণ এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়। (৪) রাজা শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতোদন। তাঁহার মহানাম ও অনিরুদ্ধ নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অনিরুদ্ধের সাংসারিক জ্ঞান জন্মে নাই। ভ্রাতা মহানামের চক্রান্তে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল ও নাপিত উপালি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক তিনি অঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। (৫) একজন দার্শনিক গ্রন্থকার। তিনি অনুমান ১৪৫০ খ্রীঃ অব্দে সাংখ্যসূত্র নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

অনিরুদ্ধভট্ট— (১) রাজা বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির লোক। তিনি বরেন্দ্র ভূমিতে বেদার্থ ও স্মৃতি ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত স্মৃতি গ্রন্থের নাম পিতৃদয়িতা। (২) অনিরুদ্ধভট্ট নামে একজন সাংখ্য সূত্রের বৃত্তিকার খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দির শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) দাক্ষিণাত্যে অনিরুভদ্ধট্ট নামে এক বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "ছান্দোগ্য-মন্ত্রকৌমুদী।"

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— তাঁহার পূর্ব্বনিবাস হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া-গোপীনাথপুর গ্রাম। তিনি দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি প্রথমে হাওড়া ফৌজদারী আদালতে নাজিররূপে কার্য্য করেন। আদালতে কার্য্যকালেই অবসর সময়ে তিনি আইন পাঠ করিতেন। ইং ১৮৭০ সালে তিনি সিনিয়র গভর্ণণ্টে প্লীডার হন এবং অত্যল্পকাল পরেই হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তিনি বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং আইন পরিষদের (Faculty of Law) সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অনুজা—চতুর্ব্বিংশ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয়া স্ত্রী যশোদার গর্ভে অনুজার জন্ম হয়। তাঁহার আর একটী নাম প্রিয়দর্শনা ছিল। অনুজার স্বামীর নাম জমালি। তাঁহাদের শেষবতী (যশোবতী) নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল।

অনুপ গোস্বামী—তাঁহার অন্য নাম বল্লভ গোস্বামী। তিনি রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর অনুজ। শ্রীচৈতন্য এই তিন ভ্রাতাকে, বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

অনুপচন্দ্র—এই কবির রচিত একখানি মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

অনুপচন্দ্র দত্ত—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার অধীন শ্রীখণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। তাঁহার পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। অনুপচন্দ্র বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপ চাঁদের শিষ্য ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র শেষ বয়সে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া শ্রীখণ্ডে যাতায়াত করিতেন। তথায় তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশোদ্ভব দুর্গামঙ্গল দাসের অনুজ্ঞায় অনুপচন্দ্র গুরুর জীবদ্দশায় "প্রতাপচন্দ্র লীলারসপ্রসঙ্গ সঙ্গীত" নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রতাপচন্দ্রে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়াছেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দ ইহার রচনা কাল।

অনুপনারায়ণ মুন্সী—বগুড়ার মুন্সী, তরফদার ও মজুমদার জমিদার বংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মণরামের অনুপনারায়ণ, ব্রজকিশোর, রামকিশোর ও নবকিশোর নামে চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে অনুপনারায়ণ নাটোর রাজের সেরেস্তায় পারসীনবীশী করিয়া মুন্সী উপাধী প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তাঁহার বংশধরেরা মুন্সী জমিদার নামে খ্যাত হন। তিনি প্রসিদ্ধ ডাকাত পণ্ডিতসার সহিত লিপ্ত ছিলেন। তাহার দস্যুতা লব্ধ অর্থদ্বারা তিনি ধনশালী হন বলিয়া কথিত আছে। পণ্ডিতসার সহিত অনুপনারায়ণের সংশ্রব প্রমাণিত হইলে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ব্রজকিশোর নয় বৎসরের জন্য নাটোর জেলে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের বংশাবলী—অনুপনারায়ণের ঔরস পুত্র শিবনারায়ণ ও দত্তক পুত্র রামজয়। শিবনারায়ণের পুত্র মহেশনারায়ণ ও গিরিশনারায়ণ এবং রামজয়ের পুত্র রাধারমণ, চন্দ্রকিশোর ও ভবানীকিশোর। ভবানীকিশোরের পুত্র কালিকিশোর।

অনুপনারায়ণ শিরোমণি— তিনি বেদান্ত সূত্রের একটী বৃত্তি রচনা

করেন। তাহার নাম "সমঞ্জসা।" এই গ্রন্থ তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দভাষ্যই সমধিক প্রচলিত। শিরোমণির "সমঞ্জসা" বৃত্তি ততদূর প্রসিদ্ধ নহে।

অনুপসিংহ— বিকানীরের রাজা অনুপসিংহ আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর অধিকৃত হইয়াছিল। তথায় তৎপূর্ব্বে মুসলমান প্রবেশ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা তজ্জন্য সমস্ত পুঁথিপত্র নদীর জলে বিসর্জ্জন দিতেছিলেন। অনুপসিংহ তাহা বিকানীরের দুর্গে রক্ষা করেন। রাজপুতানায় ইহার ন্যায় এতবড় পুস্তকালয় আর নাই। দক্ষিণ দেশ হইতে অনুপসিংহ ছত্রিশ ক্রোড় দেবমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। বিকানীরের দুর্গে অদ্যাপি তাঁহাদের পূজা হয়। অনেক দেশের পণ্ডিত একত্রিত করিয়া তিনি একখানি প্রকাণ্ড "অনুপবিলাস," নামক স্মৃতি নিবন্ধ লিখাইয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজী ভট্টকে স্বীয় রাজ্যে লইয়া গিয়া একখানি পুঁথি লেখান। রাজার তত্ত্বাবধানে শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকা লেখা হয়। (২) মিথিলার রাজা কর্ণের পুত্র অনুপসিংহ একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহারই আদেশে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শিবতাণ্ডবীয়াঙ্ক-যন্ত্র-ব্যাখ্যা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) প্রতাপগ নামক স্থানের চৌহান বংশীয় রাজপুত নরপতি লক্ষ্মণ সিংহের তিনি অনুজ, ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মিঃ হিউম (Hume) এটোয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে ত্রিশটী কুল-মহিলা ও বালকবালিকা তাঁহার আশ্রয়ে ছিল। তৎকালে প্রতাপগের রাজা লক্ষ্মণসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা অনুপসিংহ ও জয়সিংহ এই অসহায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকা-দিগকে সঙ্গে লইয়া আগ্রায় পৌছাইয়া দেন।

অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য — তিনি আনন্দ গিরির বিদ্যাগুরু। তিনি সারস্বত সূত্রের সারস্বত প্রক্রিয়া নামক এক ব্যাকরণ, গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্য ভাষ্যের টীকা, ন্যায়দীপাবলীর উপর চন্দ্রিকা টীকা এবং প্রমাণমালার উপর নিবন্ধ টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষে ও চতুর্দ্দশ শতাব্দির প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলে।

অনুরুদ্ধ — ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদিগের অন্যতম। তিনি বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ লাভের সময়ে তাঁহার নিকটেই উপস্থিত ছিলেন।

এবং তাঁহারই পরামর্শে ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য, কুশিনারা (কুশীনগর) স্থিত মল্লগণের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই এক একটী বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু অধিকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অনুশূর — প্রাচীন বঙ্গের শূরবংশীয় নরপতি। তাহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সিংশব (বর্ত্তমান সিঙ্গা) নামক স্থানে ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ৯৩৬ খ্রীঃ—৯৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আদিশূর দেখ।

অন্ধুক ভট্ট— তিনি একজন জ্যোতিষের নিবন্ধকার ছিলেন। বঙ্গদেশের কোন জিলা বা গ্রাম ও কোন বংশের তিনি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

অন্নংভট্ট—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে তর্ক সংগ্রহকার অন্নংভট্ট দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— একজন সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম হালি সহর তাঁহার জন্মস্থান। তিনি একসময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার রচিত "আজ কেন চারিদিক হেরা মধুময়" সঙ্গীতটী অতি মনোহর।

অন্নপূর্ণাবাই— বাজীরাও পেশোয়ার প্রথমা মহিষী রুক্মাবাই ১৭৩০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, বাজীরাও পুনর্ব্বার ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে অন্নপূর্ণা বাইকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বগাবাই নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অন্নপূর্ণাবাই স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। (২) তিনি নাগপুরের রাজা তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলের প্রধানা মহিষী ছিলেন। নাগপুর-রাজ রঘুজী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে রাণীরা একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসী রাণীদের এই কার্য্য সমর্থন করিলেন না এবং তৎফলে নাগপুর রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। রাণীদের সমস্ত আপন সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।

অন্নাকির্লোস্কর— তিনি মহারাষ্ট্র দেশের আধুনিক সর্ব্বজন প্রিয় নাটক রচয়িতা। তাঁহার রচিত "সঙ্গীত শকুন্তলা" ও "রাম রাজ্য বিয়োগ" মারাঠা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সুপরিচিত। অভিনয়ের জন্য তিনি একটী মণ্ডলী স্থাপন করেন। এই মণ্ডলী ভারতের নানাস্থানে যাইয়া তাঁহার প্রণীত নাটক গুলির অভিনয় করিয়া থাকে। এই মণ্ডলী এখনও "কির্লোস্কর মণ্ডলী" নামে বিদ্যমান আছে। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অপ্পজি—তিনি জৈমিনী সূত্রের এক ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অপরাদিত্য—তিনি খ্রীঃ ১২শ শতাব্দিতে কঙ্গন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির একখানা উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করেন।

অপরার্ক—দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত একজন স্মৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থকার।

অপান নাথ—নাথ পন্থীদের সুধাকর চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে যে চৌরাশি জন সিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়া যায় তিনি তাঁহাদের অন্যতম। চৌরাশি জন সিদ্ধের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১। সিদ্ধনাথ, ২। বদ্ধপদ্ম নাথ, ৩। দৃঢ়নাথ, ৪। বীর নাথ, ৫। পবনমুক্ত নাথ, ৬। ধীরনাথ, ৭। শ্বাস নাথ, ৮। পশ্চিমতান নাথ, ৯। বাতায়ন নাথ, ১০। ময়ূরনাথ, ১১। মৎস্যেন্দ্র নাথ ১২। কুক্কুটনাথ, ১৩। ভদ্রনাথ, ১৪। অর্দ্ধপাদনাথ, ১৬। পূর্ণপাদনাথ, ১৭। দক্ষিণ নাথ, ১৭। শবনাথ, ১৮। অর্দ্ধনাথ, ১৯। ধনুষনাথ, ২০। পাদশিরানাথ, ২১। দ্বিপাদশিরানাথ, ২২। স্থিরনাথ, ২৩। বৃক্ষনাথ, ২৪। অর্দ্ধবৃক্ষনাথ, ২৫। চক্রনাথ, ২৬। তালনাথ, ২৭। উর্দ্ধ্ব ধনুষ, নাথ, ২৮। বামসিদ্ধনাথ, ২৯। স্বস্তিক নাথ, ৩০। স্থিতবিবেকনাথ, ৩১। উত্থিতবিবেকনাথ, ৩২। দক্ষিণতর্কনাথ, ৩৩। পূর্ব্বতর্কনাথ, ৩৪। নিঃশ্বাসনাথ, ৩৫। অর্দ্ধকূর্ম্মনাথ, ৩৬। গরুড়নাথ, ৩৭। ব্যাঘ্রনাথ, ৩৮। বামত্রিকোণনাথ, ৩৯। প্রার্থনানাথ, ৪০। দক্ষিণসিদ্ধনাথ, ৪১। পূর্ণত্রিকোণনাথ, ৪২। বামভুজনাথ, ৪৩। ভয়ঙ্করনাথ, ৪৪। অঙ্গুষ্ঠনাথ, ৪৫। উৎকটনাথ, ৪৬ বামাঙ্গুষ্ঠনাথ, ৪৭। জ্যোষ্ঠিকানাথ, ৪৮। বামার্দ্ধপাদনাথ, ৪৯। বামভুজনাথ, ৫০। ভুজপাদনাথ, ৫১। বামচক্রনাথ, ৫২। বামজানুনাথ, ৫৩। বামশাখনাথ, ৫৪। ত্রিস্তম্ভনাথ, ৫৫। বামপাদপাশ নাথ, ৫৬। বামহস্ত চতুষ্কোণনাথ, ৫৭। গোমুখনাথ, ৫৮। গর্ভনাথ, ৫৯। একপাদবৃক্ষনাথ, ৬০। মুক্তহস্তবৃক্ষনাথ, ৬১। হস্তবৃক্ষনাথ, ৬২। দ্বিপাদপার্শ্বনাথ, ৬৩। কন্দপীড়ননাথ, ৬৪। প্রৌঢ়নাথ, ৬৫। উপধাননাথ, ৬৬। উর্দ্ধসংযুক্তপাদ নাথ, ৬৭। অর্দ্ধশবনাথ, ৬৮। উত্তানকূর্ম্মনাথ, ৬৯। সর্ব্বাঙ্গনাথ, ৭০। অপাননাথ, ৭১। যোনিনাথ, ৭২। মণ্ডূকনাথ, ৭৩। পর্ব্বত নাথ, ৭৪। শলভনাথ, ৭৫। কোকিল নাথ, ৭৬। লোলনাথ, ৭৭। উষ্ট্রনাথ, ৭৮। হংসনাথ, ৭৯। প্রাণনাথ, ৮০। কার্ম্মুকনাথ, ৮১। আনন্দমন্দির নাথ, ৮২। খঞ্জন নাথ, ৮৩। গ্রন্থিভেদনাথ, ৮৪। ভুজঙ্গনাথ। নাথপন্থীরা এই সিদ্ধাচার্য্যগণকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

অপ্পয়দীক্ষিত বা অপ্পয্যদীক্ষিত—(১) রঙ্গরাজাধ্বরির পুত্র ও আচার্য্য দীক্ষিতের পৌত্র অপ্পয়দীক্ষিত কাঞ্চীর নিকটবর্ত্তী অডপ্পয়ন নামক গ্রামে

১৫২০ খ্রীঃ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষিত ও সুন্দরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগরের রাজা বেঙ্কটদেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন ব্যাকরণ সম্বন্ধে নক্ষত্রবাদাবলী, অলঙ্কার সম্বন্ধে কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা, পূর্ব্বমীমাংসার বিধিরসায়ন নামক টীকা, উত্তর মীমাংসার শিবার্কমণিদীপিকা পরিমল ও সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। তিনি শৈব হইলেও উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। সেইজন্য বৈষ্ণবেরাও তাঁহাকে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করিতেন। তিনি সর্ব্বসমেত একশত আটখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। (২) এই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত প্রজাপতিদাস কৃত পঞ্চসরা গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রশ্নসার নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। (৩) কর্ণাটদেশীয় একজন পণ্ডিত। সংস্কৃতে তিনি অনেকগুলি সারবান্ মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ও ন্যায়দর্শনে তাঁহার টীকা আছে। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

অপ্পয়দীক্ষিত—তিনি দক্ষিণী শৈবধর্ম্মের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা ও বৃত্তিবার্ত্তিক নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদের দাসবৎ অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট, এই জন্য তাঁহার কোন রচনাই উৎকৃষ্ট হয় নাই। বিজয়নগরের প্রথম বেঙ্কটপতির রাজত্ব কালে দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য চর্চ্চার একটা প্রবল উদ্যম দেখা গিয়াছিল। বেঙ্কটপতির রাজত্ব কাল ১৫৮৫—১৬১৪ খ্রীঃ অব্দ। অপ্পয়দীক্ষিত বেঙ্কটপতির সামন্তরাজ ভেলোরের নায়কের আশ্রিত ছিলেন। ইহাদ্বারাই তাঁহার সময় নিরূপিত হয়।

অপ্পাদেব - তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৬৬৮ শকের (১৭৪৬খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রহপীঠমালা নামক পুস্তক তাঁহার রচিত।

অবতারচন্দ্র লাহা—বঙ্কিম যুগের একজন প্রাচীন সাহিত্যিক। রস রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যৌবন কালে তিনি "আনন্দলহরী" নামক উপন্যাস রচনা করেন, পরিণত বয়সে "আমার ফটো", "শুভদৃষ্টি" প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। বিমানবিহারী স্পেনসার এদেশে আসিলে তাঁহার নিকট হইতে বেলুন লইয়া দুঃসাহসিক অবতারচন্দ্র বেলুন যাত্রায় উদ্যোগী হন। তিনি সুলেখক, সুরসিক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অমায়িক ছিল এবং চিরদিন তিনি পরোপকারী ছিলেন। ১৩৩৮ সনের ২রা

কার্ত্তিক ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

অবদ্অল্-কাদির-অল্ জীলী—তিনি ভারতের মুসলমানদের কাদিরী শাখার আদি গুরু। তিনি মহাপণ্ডিত, ক্ষমতা-শালী লেখক ও সুবক্তা ছিলেন। মুলতানের নিকট উছেনগরে ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। সফিনান-ই-আওলিয়া নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবন চরিত লিখিত আছে।

অবদগষবাস্থ—তিনি পাঞ্জাবের অধি-পতি ছিলেন। ২০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পারদদিগকে সিন্ধুদেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাঁহার নামীয় বহুসংখ্যক মুদ্রা গান্ধার ও শকস্থানে পাওয়া গিয়াছে।

অবধুতনাথ— নাথপন্থীদের মধ্যে একজন সিদ্ধযোগী। তিনি সাক্ষাৎ শিবাবতার ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে যাহা হইতেই যোগীধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং যোগীবংশ উৎপন্ন হইয়াছে ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ আছে। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র রেখা, ত্রিদণ্ড যোগপট্ট, অঙ্গে বিভূতি, রক্তবস্ত্র পরিধান, সর্ব্বদা পরম গুরুর ধ্যান, ইত্যাদি লক্ষণের ইহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। অচেৎ নাথ দেখ।

অবনিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—তিনি একজন প্রতিভাশালী বাদক ছিলেন। তবলা বাজনায় তাঁহার তুল্য শিল্পী তদানীন্তনকালে দেখা যায় নাই। গানের সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার চেষ্টা তাঁহার বাজনায় ছিল। অপর সাধারণ বাজনাদারের মত তবলায় অযথা কৃতিত্ব দেখাইবার প্রয়াস, গানকে তবলার শব্দ প্রভাবে নষ্ট করিয়া দিবার প্রয়াস এবং গায়কের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া গীতবাদ্যের রসকে নষ্ট করিয়া দিবার অযথা চেষ্টা অবনীমোহনের মধ্যে দেখা যাইতনা। তাঁহার অনুপম সঙ্গত একবার যাহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি চমৎকার মৃদঙ্গও বাজাইতে পারিতেন। ১৩৩০ সালে এই প্রতিভাশালী বাদকের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

অবনীশূর —তিনি বঙ্গের শূরবংশীয় নরপতি ক্ষিতিশূরের পুত্র। তাঁহার পিতার সময়েই উত্তর বঙ্গের পালবংশীয় নরপতিরা প্রবল হইয়াছিলেন; দেব-পাল শূরবংশীয়দিগকে সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত করেন। অবনীশূর সম্ভবতঃ ৮৪১-৮৭০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আদিশূর দেখ।

অবন্তী কুমার— তিনি উজ্জয়িনী নগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু জৈন প্রচারক সুহস্তীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে প্রায়োপবেশনে তিনি দেহরক্ষা করিলে

তাঁহার আত্মীয়েরা তাহার সমাধির উপরে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা বর্ত্তমানে শৈব সন্ন্যাসীদের অধিকারে আছে এবং 'কালের মন্দির' নামে খ্যাত।

অবন্তীপুত্র—মথুরার রাজা। বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকচ্চায়নের সহিত তাঁহার ধর্ম্মালোচনা হয়। তাহাতে অনুমান করা যায় যে তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

অবন্তীবর্ম্মা। (১) তিনি মগধের মৌখরি রাজবংশের একজন রাজা। ঈশান বর্ম্মা দেখ। (২) কনৌজের মৌখরি বংশীয় নরপতি। তাঁহারই পুত্র গ্রহবর্ম্মা, থানেশ্বরের নরপতি প্রভাকর বর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। গ্রহবর্ম্মা, মালবপতি দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক ৬০৬ খৃঃ অব্দে নিহত হন। গ্রহবর্ম্মা দেখ। (৩) কাশ্মীরের অধিপতি শ্রীচিপ্পট জয়াপীড়ের মাতুল ছিলেন উৎপলক। এই উৎপলকের পৌত্র ও সুখবর্ম্মার পুত্র অবন্তীবর্ম্মা, স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরের সাহায্যে কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি রাজা হইয়া প্রতিপক্ষদিগকে সমূলে বিনাশ এবং সৎকার্য্য দ্বারা সজ্জনদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি রাজসম্পদ অচিরস্থায়ী জানিয়া সমস্ত সম্পদ যাচকদিগকে দান করিয়া কেবল রাজচ্ছত্র ও চামর রাজৈশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ রক্ষা করেন। এই জ্ঞাতিপ্রিয় বর্ম্মা স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরবর্ম্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার সময়ে বিদ্যার চর্চ্চা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুপণ্ডিত মুক্তাকর্ণ, শিবস্বামী, কবি আনন্দবর্দ্ধন, রত্নাকর প্রভৃতি তাঁহার রাজসভায় যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। কথিত আছে কুলনন্দার নাথ নামক স্তুতি পাঠক স্বীয় প্রভুর সদুদ্দেশ্য স্মরণ করাইবার জন্য সভাগৃহের চত্বরে থাকিয়া সর্ব্বদা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিতেন।

অয়মবসর উপকৃতয়ে প্রকৃতিচলা
যাবদস্তি সম্পদিয়ম্।
বিপদি সদাভ্যুদয়িন্যাং পুনরুপকর্ত্তুং
কুতোঽবসরঃ॥

অর্থাৎ "হে নাথ, একান্ত অস্থির ঐশ্বর্য্য যাবৎ রহিয়াছে তাবৎকাল পর্য্যন্ত পরের উপকার করিবার সময় জানিবেন। কারণ বিপদ যখন সতত অনিবার্য্য, তখন আর উপকার করিবার অবসর কোথায়"? তিনি নিজ সহোদরদিগকে, শূরবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র রত্নবর্দ্ধনকে স্থায়ী রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। শূরবর্ম্মা অবন্তীবর্ম্মাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াই কাজ করিতেন, আদেশের অপেক্ষা করিতেন না। একবার অবন্তীবর্ম্মা ভূতেশ্বরের পূজা করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন

যে, শূরবর্ম্মার বিশেষ অনুগত লহর দেশীয় ধন্ব নামক ডামর অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহাতে তিনি পূজা না করিয়াই শূল বেদনার ভাণ করিয়া চলিয়া আসেন। শূরবর্ম্মা ইহা জানিয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, ধন্ব ডামরকে বধ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে শ্রীকল্লট-ভট্ট প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা বর্ত্তমান ছিলেন। কাশ্মীরে পূর্ব্বে খুব জলপ্লাবন হইয়া শস্যাদি নষ্ট হইত। সুয্য নামক এক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক বুদ্ধি কৌশলে খাল নালা প্রভৃতি কর্ত্তন করাইয়া দেশরক্ষা করেন। অবন্তীবর্ম্মা সাতাইশ বৎসর দুইমাস আঠার দিন রাজত্ব করিয়া কলিগতাব্দের ৩..৫৯ বৎসরে (৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে) পরলোক গমন করেন।

অবন্তী সুন্দরী—খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে রাজশেখর নামে এক কবি ছিলেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী অবন্তীসুন্দরী অলঙ্কার শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণা ছিলেন।

অবরি—নাথ সম্প্রদায়ের যোগিরা ভবানী দাস লিখিত 'ময়নামতীর গান' দেশ দেশান্তরে গাহিয়া বেড়াইত। এই গানগুলিতে যে সকল সিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

অবলোকিত— বৈদ্যশাস্ত্র প্রণেতা নাগভট্ট আচার্য্যের নামান্তর। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব—এক-জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁহারই আশ্রমে হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় ভগিনী রাজ্যশ্রীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজ্যশ্রী দেখ।

অবিনাশচন্দ্র দাস—(M. A. B. L. Ph. D.)—বাকুড়া জিলার হারনাথ দাসের পুত্র। অবিনাশচন্দ্রের পিতা স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টার ছিলেন এবং খুব সম্ভব সেই জিলার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র কৃষ্টি সাহিত্যিক ও বৈদিক ইতিহাসে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পলাশবন, অরণ্যবাস, কুমারা, সীতা প্রভৃতি সুপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। তদ্ব্যতীত Rig-Vedic India, এবং Rig-Vedic Culture নামে অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুইখানি ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হইয়া-ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি কিছুকাল স্বদেশ নামক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করেন, এবং তৎপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ Indian Mirror নামক কাগজেরও কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণপালের তিনি জামাতা ছিলেন। ইং ১৯৩৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার—(১) আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত কানপুরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গের বাহিরে যে সমস্ত মানব প্রেমিক, সাধুব্যক্তি চরিত্রবলে ও লোকহিতসাধন দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন লাহোরের অবিনাশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। চাকুরীর অবস্থায় তিনি দেশ-হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার "পিউরিটি সার্ভেন্ট" অর্থাৎ পবিত্রতার সেবক নামক একখানা ইংরেজী কাগজ ছিল। এই কাগজদ্বারা সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার, সামাজিক অপবিত্রতা ও পাপাচার দেশ এবং সমাজ হইতে দূর করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেন। পাঞ্জাবে ও পশ্চিমের সর্ব্বত্র পূর্ব্বে হোলীর সময় অশ্লীল গান ও গালাগালির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহা দমন করিবার জন্য তিনি "পবিত্র হোলী" প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাগজে নির্ভীকভাবে পাঞ্জাবের অনেক বিশিষ্ট লোকদের চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। এই তিন ভাষাতেই তিনি হৃদয়স্পর্শী ভগবদারাধন ও বক্তৃতাদি করিতে পারিতেন। শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎকৃত 'জপজীর' অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সুখ মণির' অনুবাদও 'উত্তরা' মাসিক পত্রে ক্রমশঃ বাহির হইত। তিনি সাধু ও ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি দরিদ্রদিগকে ঔষধ দ্বারা এবং আরও নানাপ্রকারে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। নানা স্থানের দুর্ভিক্ষের সময়েও তিনি প্রধান কর্ম্মী হইয়া দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন। যক্ষ্মা রোগীদের জন্য সিমলার পথে ধরমপুর নামক স্থানের স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্মী ছিলেন। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৩২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। (২) তিনি এলাহাবাদের একজন প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি 'বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী' সভার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্যোগে এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়।

অবিনাশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর সি-আই-ই— জয়পুরের তাজিম-ই-সর্দ্দার, রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন সি-আই-ই মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। তিনি জয়পুর ষ্টেট্ কাউন্সিলের সদস্য

ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও জয়পুর রাজ্যের কল্যাণের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন। জয়পুরে সংসারচন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্রের গৃহ বাঙ্গালী অতিথির জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তিনি সুদূর জয়পুরে থাকিয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে তাঁহার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভারতবর্ষে মাতৃ মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৩০৯ সালে ২৫ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন।

অবিনীত— তিনি কবি ভারবির কাব্যের টীকাকার। ৯২ শকে (৪৭০ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

অবিমুক্তাত্ম ভগবান্— খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। তিনি অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য। 'সংক্ষেপ-শারীরিক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার রচিত। অব্যয়াত্ম ভগবান দেখ।

অব্যয়াত্ম ভগবান্—তিনি একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য অবিমুক্তা ভগবান্।

অভয়— (১) উরস প্রদেশের অধিপতি অভয়, কাশ্মীরের অধিপতি কলশ রাজের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি একবার বিদ্রোহী হইলে কলশরাজ স্বীয় সেনাপতি মল্লকে তাঁহার দমনার্থ প্রেরণ করেন। মল্ল তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিয়া কাশ্মীরপতির গৌরব রক্ষা করেন। উরসপতি অভয়ের কন্যা বিভমতী কাশ্মীরেশ্বর হর্ষদেবের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভিক্ষাচর নামে এক কন্যা জন্মে। (২) জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র রচিত ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ নামক গ্রন্থে রাজা শ্রেণীকের পুত্র অভয় নামে একজন রাজকুমারের উল্লেখ পাওয়া যায়। (৩) সোমপ্রভ নামক অপর একজন জৈন গ্রন্থকারের 'কুমার পাল প্রতিবোধ' নামক কাব্যে বর্ণিত আছে রাজগৃহের রাজকুমার অভয় উজ্জয়িনী রাজ প্রদ্যোতকর্ত্তৃক কৌশলে বন্দী হন। (৪) মগধের একজন রাজকুমার তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় একাধিক সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকের নিকট গমন করেন। কিন্তু কোথাও সদুত্তর পান নাই। পরিশেষে ভগবান গৌতমবুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম উপদেশ লাভ করিয়া সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হন। তিনি রাজা বিম্বিসারের পুত্র ছিলেন। জীবক কোমারভচ্চ (কুমার ভৃত্য) নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে তিনি লালন পালন করিবার ব্যবস্থা করেন। জীবক কোমারভচ্চ দেখ

অভয়ঙ্কর গুপ্ত—তিনি মহারাজ ধর্ম্ম-

পালের সময়ে বিক্রমশীলা মঠের একজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি তথাকার ১১৪ জন পণ্ডিতের অন্যতম।

অভয়দত্ত—একজন ব্রাহ্মণ সামন্ত নৃপতি। তাঁহার পিতার নাম রবিকীর্ত্তি। ব্রাহ্মণেরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়াও অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। অভয়দত্তের রাজ্য বিন্ধ্য ও পারিযাত্র পর্ব্বতের মধ্যভাগ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অভয়দেব—( ) জনৈক জৈন গ্রন্থকর্ত্তা। তিনি জিনেশ্বর নামক জৈন আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি নয়টি জৈন অঙ্গের টীকা রচনা করেন। তৎরচিত ষষ্ঠ অঙ্গের টীকা খ্রীঃ ১০৬৪ অব্দে রচিত হয়। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (মতান্তরে ১০৬২ অব্দে) দেহত্যাগ করেন। (২) অভয়দেব নামে আরও অনেক জৈন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অপরিজ্ঞাত।

অভয়দেব সূরী—তিনি একজন জৈনাচার্য্য। ১০১৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শীলাঙ্গাচার্য্য বিরচিত আচারাঙ্গের বিলুপ্ত ব্যাখ্যার রচয়িতা। (২) জৈন আগম স্থানাঙ্গ-সূত্রের মতে সংখ্যান বা গণিত শাস্ত্রের দশমাংশের এক অংশের নাম রজ্জু। ১০৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইহার টীকা রচনা করেন। তিনি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত রাজগচ্ছ দলভুক্ত ছিলেন। তিনি জৈনাচার্য্য প্রদ্যুম্ন সূরীর শিষ্য এবং 'বাদমহার্ণব' নামক ন্যায়শাস্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য জিনেশ্বর সূরী।

অভয়নন্দী—নেমিচন্দ্র নামক জৈন গ্রন্থকারের অন্যতম গুরু। **নেমিচন্দ্র** ও চামুণ্ডরায় দেখ।

অভয়সিংহ—তিনি যোধপুরের রাণা অজিতসিংহের পুত্র। ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি পিতা অজিতসিংহ রাঠোরকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহের অধীনে তিনি কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৪০) সম্রাট মহম্মদশাহ তাঁহাকে সরবোলান্দ খাঁর স্থানে গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সরবোলান্দখাঁ সহজে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করিয়া অভয়সিংহকে পরাজিত করেন, পরে পরাজিত শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করিয়া রক্ষক বিহীন অবস্থায় একাকী মহারাজ অভয়সিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ বাসনা জ্ঞাপন করেন। অভয়সিংহ এই বীরকেশরীকে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার শ্বেত পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ স্থানে স্বীয় রত্ন খচিত শিরস্ত্রাণ স্থাপন করিয়া এই বিশিষ্ট অতিথির

প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। তৎপর তাঁহার পদোচিত সম্মান ও রক্ষী সহকারে তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। অভয়সিংহ গুজরাটে প্রবেশ করিয়াই মহারাষ্ট্রাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। পিলাজী গাইকোয়াড় সেই সময়ে বরোদায় বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অভয়সিংহ তাঁহাকে প্রতারণাপূর্ব্বক হত্যা করেন। ইহার ফলে তিনি কেবল গুজরাট হইতে তাড়িত হন তাহা নয়, তাঁহার নিজ রাজ্য যোধপুর রক্ষার জন্যও তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে বিষ প্রয়োগে অভয়সিংহ নিহত হইলে, তৎপুত্র বিজয়সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অভয়া—দাক্ষিণাত্যের একজন স্ত্রী কবি। তাঁহার ভগিনীগণও তাঁহার ন্যায় বিদুষী ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

অভয়াকর গুপ্ত— একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি রামপালের সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছলেন। তিনি 'বুদ্ধকপাল তন্ত্রের' একটী টীকা রচনা করেন।

অভয়াচরণ তর্কবাগীশ— বরিশাল জিলার অন্তর্গত কলসকাটিতে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সেই সময়ে কলসকাটিতে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার নামে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। উভয় পণ্ডিতের মধ্যে সদ্ভাব ত ছিলই না বরং বিরোধ ছিল। সেই জন্য উভয়েই দেশত্যাগী হন। রামমাণিক্য কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে এবং অভয়াচরণ ঢাকা নগরে স্থায়ী অধিবাসী হন।

অভিনন্দ—(১) একজন কাশ্মীরীয় কবি। তিনি "কাদম্বরী কথাসার" নামে একখানা কাব্য রচনা করেন। বলাবাহুল্য বাণ রচিত প্রসিদ্ধ কাদম্বরী গ্রন্থই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজশেখরের সমসাময়িক ছিলেন। (২) তিনি গৌড় নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠসার নামে তিনি মূল যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের একখানি সারসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

অভিনন্দন—জৈন ধর্ম্মের প্রচারক অতীত চতুর্থ তীর্থঙ্কর। তিনি অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সম্বর ও রাণী সিদ্ধার্থার পুত্র। তাঁহার গাত্রবর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। কপি তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। তিনি সমেতশিখরে (বর্ত্তমান পার্শ্বনাথ পাহাড়) নির্ব্বাণ লাভ করেন।

অভিনব—(১) তিনি কাশ্মীরস্থ বিশোক নামক নদীর পরপারে বাস করি-

তেন। কাশ্মীর রাজ্যে তিনি একজন রাজলিপিকর ছিলেন। তাঁহার পুত্র সংগ্রাম গুপ্ত। সংগ্রাম গুপ্তের পুত্র পর্ব্বগুপ্ত। তিনি কাশ্মীরপতি যশস্করের পুত্র সংগ্রামদেবকে নিহত করিয়া (৯৪৮ খৃঃ) কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। সংগ্রামদেব দেখ। (২) কাশ্মীরপতি সংগ্রামরাজের মন্ত্রী মদ্যা-মন্তকের ধাত্রীপুত্র অভিনব। তিনি অতিশয় বীর ছিলেন। সংগ্রাম রাজার অন্যতম মন্ত্রী তুঙ্গের নিধন কালে তিনিও নিহত হন (১০২৮ খৃঃ)। (৩) তিনি শলামা দেশীয় একজন ক্ষুদ্র ডামর সেনাপতি। কাশ্মীরপতি অনন্ত-রাজের সামন্ত নৃপাত, কম্পনাধিপতি ত্রিভুবন, কাশ্মীরের সিংহাসন লাভের আশায় বিদ্রোহী হইলে অভিনব ত্রিভুবনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে পরাজিত হন। (১০০৮—১০৮১ খৃঃ)

অভিনব গুপ্ত—খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে তিনি কাশ্মীরদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামহ সোচুক, পিতা শ্রীভূতিরাজ। ভট্টতোত ও ভট্টেন্দু তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি শৈব ও প্রত্যাভিজ্ঞাবাদী ছিলেন। তাহার বৃহৎ প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী, শিবদৃষ্ট্যালোচনা, ধ্বন্যালোকের উপর লোচন নামক টীকা প্রভৃতি পুস্তক তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। তিনি স্বীয় গুরু ভট্টতোত প্রণীত কাব্যকৌতুকের বিবরণ নামক টীকাও প্রণয়ন করেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রেরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরমার্থসার বোধ-পঞ্চদর্শিকা, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক, পর-ত্রিংশিকাভাষ্য, তন্ত্রবতধ্বনিক প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি গীতার ও একটী টীকা রচনা করেন। কেবল পাণ্ডিত্যে নহে, ভগবদ্ভক্তিতেও তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। ভগবানের আরাধনার কালেই তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আলোচন নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

অভিমন্যু— (১) তিনি একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত ও প্রশ্নপ্রকাশ নামক গ্রন্থের প্রণেতা। (২) কাশ্মীরের রাজা। ৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পতঞ্জলি কৃত পাণিনির মহাভাষ্য স্বীয় রাজ্যে প্রচলিত করান। (৩) কাশ্মীরপতি অভিমন্যু খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ২য় চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার আদেশে বিলুপ্তপ্রায় মহাভাষ্যের পুনঃ প্রচলন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারে এক এক খানি ব্যাকরণও রচনা করেন। অভিমন্যু তাঁহার নিজ নামানুসারে অ-ভি

মন্থ্য নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগর ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন।

অভিরাজা—ইনি ব্রহ্ম দেশে রাজা স্থাপয়িতা ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মহারাজওয়েঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহাতে আরও জানা যায় যে ইনি শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু হইতে ঐরাবতীর মধ্যপ্রদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। মতান্তরে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল। কান রাজথি ও কান রাজঙ্গী নামক দুই পুত্র রাখিয়া তিনি লোকান্তরিত হইলে, রাজ্য লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে ইহা স্থির হয় যে, যিনি অগ্রে একটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণে সমর্থ হইবেন, তিনিই রাজা হইবেন। কৌশল ক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক রাত্রে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুচরাদি সংগ্রহক্রমে স্বীয় পুত্র মুঙ্গসিতাকে অধিনায়ক করিয়া আরাকানে রাজ্য স্থাপন করেন।

অভিরাম গোস্বামী—চৈতন্য মঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দের গুরু।

অভিরামদাস—একজন বৈষ্ণব কবি। ভাগবতের অনুবাদ পদ্যে রচনা করেন। গোবিন্দবিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহারই রচিত। তাঁহার সময় অপরিজ্ঞাত।

অভিরাম দ্বিজ—(১) তিনি অশ্বমেধপর্ব্ব নামে এক পুস্তক রচনা করেন। ইহা জৈমিনি ভারত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। (২) ইনি 'শ্রীলক্ষ্মীব্রত পাঁচালী' রচনা করেন।

অভিরাম মিত্র—তিনি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থবংশীয়। তাঁহার রচিত একখানি চৌতুরী আছে।

অভ্যুদয়—তিনি লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিজাকল্যাণ, শিবগনাদারঙ্গী, পম্পশতক প্রভৃতি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১১৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

অমর—তিনি জৈনদের ভাবী ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর। এখন তিনি নবম গ্রেবেয়ক লোকে বাস করিতেছেন। জৈনপুরাণ মতে অতীতে যেমন চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথম তীর্থঙ্কর হইবেন পদ্মনাভ। তিনি পূর্ব্বজন্মে মগধের একজন রাজা ছিলেন। এখন প্রথম নরকে তিনি কুকর্ম্ম জনিত ফল ভোগ করিতেছেন। যখন কালচক্রের পরিবর্ত্তনে অবসর্পিনী যুগ অতীত হইয়া উৎসর্পিনী যুগ আরম্ভ হইবে, সেই "দুষম সুষম" কালে, ভাবী তীর্থঙ্কর

সকল আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথম পদ্মনাভ, তৎপরে দ্বিতীয় সুরদেব আবির্ভূত হইবেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাবীরের পিতৃব্য ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল সুপার্শ্ব। এখন তিনি দ্বিতীয় দেবলোকে বাস করিতেছেন। তৃতীয় তীর্থঙ্কর সুপার্শ্ব নামে খ্যাত হইবেন। পূর্ব্বজন্মে তাঁহার নাম উদায়ীজি ছিল. তিনি নরপতি কুণিকের পুত্র ও শ্রেণীকের পৌত্র ছিলেন। এখন তিনি তৃতীয় দেবলোকে বাস করিতেছেন। চতুর্থ তীর্থঙ্কর পূর্ব্বজন্মে পোতিল নামে খ্যাত ছিলেন। এখন তিনি চতুর্থ দেবলোকে বাস করিতেছেন এবং স্বয়ংপ্রভু নামে অবতীর্ণ হইবেন। পঞ্চম তীর্থঙ্কর সর্ব্বানুভূতি নামে অবতীর্ণ হইবেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি মল্লিনাথ নামক একমাত্র মহিলা তীর্থঙ্করের স্বামীর পিতৃব্য ছিলেন এবং তাঁহার নাম দৃঢ়াকেতু ছিল। এখন তিনি দ্বিতীয় দেবলোকে অবস্থান করিতেছেন। ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর দেবশ্রুত হইবেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে বিখ্যাত আনন্দের পিতা ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তিক শেঠ ছিল। তিনি এখন প্রথম দেবলোকে বাস করিতেছেন। সপ্তম তীর্থঙ্কর উদয়প্রভু হইবেন পূর্ব্বজন্মে তিনি শঙ্খশ্রাবক নামে খ্যাত ছিলেন এবং এখন দ্বাদশ দেবলোকে বাস করিতেছেন। আনন্দশ্রাবক এখন প্রথম দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনিই পেড়াল নামে অষ্টম তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। নবম তীর্থঙ্কর পোতিল। পূর্ব্বজন্মে তিনি সুনন্দাশ্রাবিকা নামে খ্যাত ছিলেন। এখন তিনি প্রথম দেবলোকে বাস করিতেছেন। পরে নবম তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। দশম তীর্থঙ্কর শতকীর্ত্তি নামে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই পূর্ব্ব জন্মে শতকশ্রাবক নামে খ্যাত ছিলেন। এখন তিনি তৃতীয় নরকে অবস্থান করিতেছেন. কৃষ্ণের মাতা দেবকী এখন অষ্টম দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনিই মুনি সুব্রত নামে একাদশ তীর্থঙ্কর রূপে অবতীর্ণ হইবেন। কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদেবতা এখন তৃতীয় নরকে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই অম্ম নামে দ্বাদশ তীর্থঙ্কর রূপে অবতীর্ণ হইবেন। হরসতাকি রাবণের গুরু ছিলেন। তিনি এখন পঞ্চম দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনি নিকসায় নামে ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। কৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেব এখন ষষ্ঠ দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনি নিস্পুলাক নামে চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। সুলসা নামে যে ব্যক্তি এক্ষণে পঞ্চম দেবলোকে বাস করিতেছেন, তিনিই নিম্মম নামে পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর হইবেন। কৃষ্ণের বিমাতা ও বলদেবের মাতা রোহিণী এক্ষণ দ্বিতীয় দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনি চিত্রগুপ্ত নামে

ষোড়শ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। মহাশুতক নামক শ্রাবকের স্ত্রী রেবতী এক্ষণ দ্বাদশ দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনি সুমাধি নামে সপ্তদশ তীর্থঙ্কর রূপে অবতীর্ণ হইবেন। যিনি সম্বরনাথ নামে অষ্টাদশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি প্রথমে সুভদ্র নামে ও পরে মগবতী নাম্নী সাধ্বী রমণী ছিলেন। এক্ষণে তিনি অষ্টম দেবলোকে বাস করিতেছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন দ্বারকাপুরীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অগ্নিকুমার নামক দেবতা হইয়াছেন, অবশেষে তিনি যশোধর নামে ঊনবিংশতি তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। পূর্ব্বজন্মে কুণিক জবকুমার নামে কৃষ্ণের এক আত্মীয় ছিলেন। এক্ষণে তিনি দ্বাদশ দেবলোকে বাস করিতেছেন। বিজয় নামে তিনি বিংশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। রাবণের সময়ে নারদ নামে একজন শ্রাবক ছিলেন। তিনি এক্ষণে পঞ্চম দেবলোকে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মল্লিনাথ বা মলয়দেব নামে একবিংশ তীর্থঙ্কর হইবেন। অম্বড় পূর্ব্বজন্মে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। এখন তিনি দ্বাদশ দেবলোকে বাস করিতেছেন। তিনি দেবজিন নামে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন। স্বয়ং বুদ্ধ এখন শ্রেষ্ঠ দেবলোকে বাস করিতেছেন; তিনি ভদ্রজিন নামে চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইবেন।

অমরচন্দ্র—(১) খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বৈয়াকরণিক। তিনি এবং অরিসিংহ নামক অপর একজন, পণ্ডিত এই উভয়ে মিলিয়া কাব্য কল্পলতা নামক একখানা সটীক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ নামক গ্রন্থে অমরচন্দ্র নামক এক কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (২) বালভারত নামক একখানা কাব্যের রচয়িতা এক অমরচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি অনুমান খ্রীঃ ১২৫০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

অমরচাঁদ বারোয়া—তিনি বণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাণা রাজসিংহের সময়ে মিবারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ নিঃস্বার্থ মন্ত্রী জগতের ইতিহাসে খুব বেশী দৃষ্ট হয় না। মিবারের রাণা রাজসিংহের সময়ে যে সমস্ত অনর্থ রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছিল, অমরচাঁদ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজসিংহের পরে অরিসিংহের সময়ে তিনি মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত হন। এই সময়ে দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। অমরচাঁদ অতিশয় প্রচণ্ড স্বভাব ও অদম্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বহু সর্দ্দার রাণা অরিসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এবং তৎস্থলে সৈন্ধবী বেতনভোগী সৈন্য

নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারাও বেতন না পাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজ্যের এই সঙ্কট কালে অরিসিংহ বৃদ্ধ মন্ত্রী অমরচাঁদকে পুনঃ মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিলেন অমরচাঁদের বুদ্ধিবলে, মাধোজি সিন্ধিয়ার কবল হইতে মিবারের উদ্ধার সাধন হইল। অথচ এই আত্মত্যাগী মন্ত্রীরই মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য অপরের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। অরিসিংহ দেখ।

অমরদাস—গুরু অমরদাস শিখদিগের তৃতীয় গুরু। ১৫৫২ খ্রীঃ অব্দে গুরু অঙ্গদ পরলোক গমন করিলে তিনি ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি প্রচার করেন যে, সংসার ত্যাগী উদাসিগণ কর্ম্মকুশল সংসারাসক্ত শিখ সম্প্রদায় হইতে পৃথক। এই ঘোষণা প্রচার এবং আরও নানা প্রকারে শিখধর্ম্ম যাহাতে কলুষিত না হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি "ভালে" নামক ক্ষত্রিয় কুলে ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ২২ বৎসর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

অমরবিজয়—ইনি পুঞ্জের পুত্র এবং পদারতের পৌত্র। তিনি গঙ্গাকূলবর্ত্তী কোরাগর নগরের প্রামার অধিপতির দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন। রাজ্যলিপ্সা তাঁহার অন্তরে প্রচণ্ড বলবতী হইয়াছিল। সেই বলবতী রাজ্যলিপ্সার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য, দুর্দ্দান্ত অমরবিজয় শ্বশুর গোত্রের ষোল হাজার প্রামারকে সংহার করিয়া কোরাগর অধিকার করেন। ইহা হইতেই কোরা কামধ্বজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

অমরমাণিক্য—স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি অমরমাণিক্য দেবমাণিক্যের পুত্র ও ত্রিপুরার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বিজয়মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তিনি চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫৮ এবং ত্রিপুর হইতে ১১৩ তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাল ১০০৪ বাংলা হইতে ১০১৫ বাংলা (১৫৯৭ —১৬০৮ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত। তিনি জয় মাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি রঙ্গনারায়ণকে বধ করিয়া পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই সময়ে রাজমালায় (ত্রিপুরার ইতিহাস) দ্বিতীয় বার রচিত হয়। তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়মাণিক্যের মত অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সামন্ত নৃপতিবর্গকে খননকারী কুলী প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফ তৎকালে ত্রিপুরার অধীন ছিল। তরফের অধিপতি এই আদেশ অমান্য করায় অমরমাণিক্য দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে

তরফ আক্রমণ করেন। তরফপতি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমরমাণিক্য সেই জন্য শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া জয় করেন। ভুলুয়ার রাজা (বর্ত্তমানে নোয়াখালী জিলা) কর প্রদানে অসম্মত হইলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষ-রূপে শাস্তি দিয়া কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপ (বর্ত্তমান বরিশাল) আক্রমণ ও জয় করিয়া প্রভূত ধনলাভ করেন। ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ ১০১৬ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া, মহারাজ অমরমাণিক্যের সেনাপতি ইষা খাঁ কর্ত্তৃক শোচনীয় রূপে পরাজিত হন। অমরমাণিক্য আরাকান আক্রমণ করেন। আরাকানরাজ প্রথমে সন্ধি করিয়া রক্ষা পান। কিন্তু অল্পকাল পরেই পর্তুগিজদের সাহায্যে পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হন। এই যুদ্ধে অমর মাণি-ক্যের তিন পুত্র যুদ্ধে গমন করিয়া পরস্পর কলহে লিপ্ত হওয়ায় ত্রিপুর বাহিনী পরাস্ত হয়। আরাকানী সৈন্য ও পর্তুগিজ দস্যুরা রাজধানী উদয়পুর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া লুণ্ঠন করে। অমরমাণিক্য পলায়নপূর্ব্বক ভৈতৈয়া নামক স্থানে (বর্ত্তমানে কৈলাসহরের অন্তর্গত) গমন করেন। এই পরাজয়ে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি ১৬১১-খ্রীঃ অব্দে অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী সহমৃতা হইলেন। তিনি যেমন বীর ছিলেন, তেমন দাতাও ছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজধর মাণিক্য পিতৃসিংহা-সনে আরোহণ করেন।

অমরসিংহ— প্রসিদ্ধ অমরকোষ নামক প্রসিদ্ধ কোষ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে সম্ভবত তিনি প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তমদেব অমরকোষের পরিশিষ্ট স্বরূপ ত্রিকাণ্ডশেষ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কালিদাসের অনেক পরবর্ত্তী। কথিত আছে উরুবিল্ব গ্রামে (বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া) তিনি একটী বৌদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অমরসিংহের গ্রন্থ তিনটী কাণ্ডে অর্থাৎ অংশে—(পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ) বিভক্ত ছিল বলিয়া তাহার নাম ত্রিকাণ্ড ছিল। পুরুষোত্তমদেব অমর কোষ অভিধানে অনেক নূতন শব্দ যোজনা করিয়া তাঁহার পরিশিষ্ট স্বরূপ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া তাহার নাম 'ত্রিকাণ্ড শেষ' হয়। (২)পঞ্জাবাঞ্চলে জৈন মত হইতে বহির্গত "ঢুণ্ঢক পন্থা" নামক এক মত প্রচলিত ছিল। অমরসিংহ

টুঁচক পণ্ডিতগণের প্রধানাচার্য্য ছিলেন। (৩) সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ও বিহারের জমিদার কুমারসিংহের তিনি অনুজ ভ্রাতা। তিনি প্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও পরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অমরসিংহ (প্রথম)—বীর কেশরী হিন্দু কুল গৌরব প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মিবারপতি প্রতাপসিংহের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। আট বৎসর বয়স হইতে পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি পিতার সঙ্গে সঙ্গেই যাপন করিয়াছিলেন। পিতার দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ অথবা কঠোর পরিশ্রমের সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অমরসিংহ পিতার মহনীয় চরিত্রের অনুকরণ করিয়াছিলেন তাঁহার চেষ্টা সম্যক ফলবতী হইয়াছিল যৌবনের মধ্যাহ্ন কালে ১৫৯৭ খ্রীঃ তিনি রাজ্য পরিচালনার গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করেন। ইহার আট বৎসর পরেই তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আকবর শাহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মিবারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাণা অমরসিংহ ইতিমধ্যে তাঁহার বিশাল রাজপুত বাহিনী লইয়া ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে দেবীর ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের সৈন্যের সম্মুখীন হন। রাণার পিতৃব্য বীরবর কর্ণের বীরত্বে মোগল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। জাহাঙ্গীর ইহাতে নিরস্ত না ।। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে আবদুল্লা খাঁর নেতৃত্বে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রণপুর নামক প্রশস্ত গিরিবর্ত্মে পুনরায় রাজপুত ও মোগল সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল. প্রায় সমুদয় মোগল সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল। রাজপুতদিগের মধ্যে দেবগড়ের সঙ্গাবৎ সর্দ্দার, দুদো, নারায়ণদাস, সূর্য্যমল্ল ও ঐশকর্ণ ইহাঁরা সকলেই এবং শিশোদীয় ও প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার শক্তাবৎ, সর্দ্দার পূর্ণমল্ল, রাঠোর হরিদাস, মদ্রিপতি কালাভূপত কস্তাবহবংশীয় কংহরদাস, বৈদলার চোহানবংশীয় কেশবদাস, রাঠোর মুকুন্দদাস ও জয়মলোট এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর এই পরাজয়ে আরও উত্তেজিত হইলেন। তিনি এবার অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সাগরজি নামক একটা রাজপুতকে রাণা উপাধি দিয়া চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই হতভাগ্য সাত বৎসর চিতোরে যাপন করিলেন কিন্তু কোন রাজপুত তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। অবশেষে হৃদয়ের যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। সেখানেও তাঁহার নিস্তার হইল না। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সভাস্থলেই যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। এই অপমানে অতিশয় ব্যথিত হইয়া জাহা-

ঙ্গীরের সম্মুখেই উদরে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহারই পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মহব্বৎ খাঁ নামে পরিচিত হইয়া জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তৃতীয়বার মিবার আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। এদিকে অমরসিংহও নিরস্ত ছিলেন না। তিনি ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলি দুর্গ মুসলমানদের হস্ত হইতে অধিকার করিয়া লইলেন। এমন সময়ে সেনাদলের চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ সর্দ্দারের মধ্যে কে আগে সৈন্য চালনা করিবে, ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। এযাবৎ চন্দাবৎ সর্দ্দারেরা প্রথমে সৈন্যচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন শক্তাবৎ সর্দ্দারেরা প্রবল হইয়া ঐ অধিকার দাবী করেন। রাণা অমরসিংহ ইহা মীমাংসার অন্য উপায় নাই দেখিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। অন্তলা দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তিনি বলিলেন—"যে দল আগে এই দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই দলই প্রথমে সৈন্য চালনায় অধিকার পাইবে"। ইহার সুফল ফলিল। অন্তলা দুর্গ অধিকৃত হইল এবং চন্দাবৎ সর্দ্দারেরা যেমন পূর্ব্বাবধি এই সম্মান পাইয়া আসিতেছিলেন এবারও তাঁহারা সেই সম্মান লাভ করিলেন। কিন্তু শক্তাবৎ সর্দ্দারের এই দুর্গ অধিকার করিবার সময়ের জীবন দান বড়ই চমকপ্রদ। অন্তলা দুর্গের লৌহ কবাট অসংখ্য লৌহ শঙ্কুতে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং কোনও হস্তী মস্তক দ্বারা ইহা ভঙ্গ করিতে পারিতেছিল না। এই অবস্থায় শক্তাবৎ সর্দ্দার ঐ শঙ্কুতে স্বীয় পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া মাহুতকে তাঁহার দিকে হস্তী চালনা করিতে আদেশ দিলেন। মাহুত তাঁহার আদেশ অনুযায়ী হস্তী চালনা করিতেই কবাট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং শক্তাবৎ সর্দ্দারের মৃতদেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। সৈন্যশ্রেণী মহোল্লাসে দুর্গে প্রবেশ করিয়া মোগল সৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইবারও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মোগলবাহিনী পরাজিত হইল। তিনি ভয় পাইলেন। তাহার মনে হইল মিবারপতিকে পরাজয় করিতে না পারিলে তাঁহার মঙ্গল নাই। সেজন্য এবার তিনি স্বীয় পুত্র পারভেজকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে আরাবল্লীর ক্ষেমনগর গিরিবর্ত্মে রাজপুতদিগের সহিত মোগলবাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিশাল মোগল অনীকিনী কয়েকটা রাজপুত সর্দ্দারের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ছত্রভঙ্গ হইয়া মোগল সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজকুমার পারভেজ অতিকষ্টে শত্রুর কবল হইতে মুক্তি পাইলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া

পারভেজের পুত্রকে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। আশা ছিল এবার জয়ী হইবেন ; কিন্তু এবারও ফল ভাল হইল না। পারভেজের পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হইলেন। মহব্বৎ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর হইতে সপ্তদশবার অমরসিংহকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং সপ্তদশবারই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে আর পারিলেন না। জাহাঙ্গীর স্বীয় পুত্র খুরমকে বিপুল সৈন্যসহ অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ জয় করিয়া রাণার প্রধান প্রধান সেনাপতিরা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার লোকাভাব ঘটিল এবং তৎফলে ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দের যুদ্ধে রাণা অমরসিংহ পরাজিত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি পুত্র কর্ণের হস্তে রাজভার সমর্পণপূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন-চৌকির গিরি গহনে প্রস্থানপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করেন। তাঁহার ন্যায় উদার ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সামন্ত নরপতি ও সর্দ্দারেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন।

অমরসিংহ (দ্বিতীয়)—মিবারের রাণা জয়সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অমরসিংহ ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অন্তিম সময়। তাঁহার অত্যাচারে মোগল রাজত্বের অবসান উপস্থিত। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজেব পরলোক গমন করিলেন। রাজ সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। অমরসিংহ জ্যেষ্ঠ মোয়াজিমের পক্ষাবলম্বন করেন। জাজো নামক স্থানে আজিম ও মোয়াজিমের যুদ্ধে আজিম ও তাহার পুত্র দিদারবখ্‌ত নিহত হন। মোয়াজিম, শা আলম বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট হইলেন। এদিকে মোগলদিগের অত্যাচারে রাজপুত নৃপতিবর্গ দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। মাড়বার ও অম্বর নৃপতিদ্বয় মিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই রাণা অমরসিংহের কর্ম্মচারী সুবলদাস পুরুমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ফিরোজশাকে পরাস্ত করিয়া আজমীরে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে বাহাদুরশাহ পরলোকগত হইলেন এবং ফিরোকশিয়ার সম্রাট হইলেন। মাড়বারের অজিতসিংহ তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া নিজের সাক্ষরিত সন্ধিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপত্তি লাভে সচেষ্ট হইলেন। অমরসিংহ ইহাতে কিছু মাত্র বিচলিত

হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। এদিকে আওরঙ্গজেবের মন্ত্রী অত্যাচারী ইনায়েতউল্লা খাঁ ফিরোকশিয়রের মন্ত্রী হইয়া হিন্দুর উপর জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন করিলেন। রাণা অমরসিংহ ইহা অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত যে সন্ধি হইল তাহাতে জিজিয়া কর আর কখনও স্থাপিত হইবে না বলিয়া লিখিত হইল। অমরসিংহ একজন সুদক্ষ ও উন্নতমনা রাজা ছিলেন। ভারতের এই সার্ব্বজনীন বিপ্লব এবং মোগল রাজ্যের অবসান সময়ের ঘোর অরাজকতার মধ্যেও স্বীয় উন্নতি সংসাধনে বিমুখ ছিলেন না। তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সংগ্রামসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অমরসিংহের কন্যাকে জয়পুররাজ জয়সিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন। অমরের দৌহিত্র ও জয়সিংহের পুত্র মাধবসিংহ।

অমরসিংহ(তৃতীয়)—তিনি মিবারের রাজা ভীমসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভীমসিংহের মৃত্যুর পরে তিনি মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অমরসিংহ থাপা—গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহ থাপা ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী বিশাল রাজ্য খণ্ডে গুর্খাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে রণজিৎসিংহ অতি-কৌশলে কাঙ্গাড়া দুর্গ অধিকার করিয়া অমরসিংহ থাপাকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করেন।

অমরসূরী—একজন জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি অম্বর চরিত্র নামক একখানা কথা গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ বর্ণিত ঘটনাবলীর উপর শৈব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

—ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অমরুশতক নামে তাঁহার একখানা কোষ কাব্য আছে। যাবতীয় কোষ কাব্যের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার সমুদয় শ্লোকই আদিরস মিশ্রিত। তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। অনেকের মতে অমরু শতক গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ তাঁহার রচিত নয়। তাঁহারই নাম লইয়া অন্যান্য অপ্রসিদ্ধ কবিরা ঐ শ্রেণীর গাথা রচনা করেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার পিতার নাম দ্বারকা নাথ দত্ত। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একাধারে অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের পরিচালক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানা নাটক ও প্রহসন আছে। 'নাট্য মন্দির' নামক একখানা মাসিকপত্রিকা তিনি কিছুকাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ কয়েকখানি বাঙ্গালা উপন্যাসকে নাটকাকারে রচনা করিয়া তিনি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে অপরিণত বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমলানন্দ— ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি 'বেদান্ত কল্পতরু' নামক একখানা দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্ত দর্শনেরই মত সমর্থিত হইয়াছে। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। অমলানন্দের গুরুর নাম অনুভবানন্দ ছিল। অমলানন্দের বেদান্ত কল্পতরু ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং বিস্তাবত্তায় অসাধারণ ছিল। 'শাস্ত্র দর্পণ' ও 'পঞ্চাদিকা দর্পণ' নামক তাঁহার অপর কয়েকখানা গ্রন্থও আছে। তিনি যাদববংশীয় মহাদেব, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজার সমসাময়িক ছিলেন।

অমিতগতি—তিনি 'সুভাষিত রত্নসন্দোহ' নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ধনর নগরের পরমার বংশীয় নরপতি বাকৃপতির (মুঞ্জ) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ ৯৯৪ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। ঐ গ্রন্থে তিনি দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের পালনীয় নিয়মাবলী ও তৎসহ ঐ সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন।

অমিতপ্রভ—তিনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। ত্রিশটাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রাট তাঁহার 'যোগরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে অমিতপ্রভের বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'যোগশতক টীকা'।

অমিতা—তিনি শাক্যনরপতি সিংহহনুর কন্যা এবং রাজা শুদ্ধোদনের ভগিনী ও বুদ্ধদেবের পিতৃস্বসা ছিলেন। অমিতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকলের ঘৃণার পাত্রী হইয়া পড়েন। চিকিৎসাতে কোন ফল দর্শে নাই, এজন্য তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ের পর্ব্বতগুহায় প্রচুর খাদ্যপানীয়সহ নিক্ষেপ করিয়া আসেন। পর্ব্বত গুহায় আবদ্ধ থাকিয়া অলৌকিক উপায়ে তিনি রোগমুক্ত হন। দৈবাৎ কোল নামক একজন রাজর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অমিতার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। রাজর্ষি অমিতাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান। রাজর্ষির ঔরসে ও অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সন্তানেরা পিতা মাতার অনুমতি ক্রমে কপিলাবস্তু নগরে গিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করিলে, শাক্যগণ অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করেন এবং শাক্যকন্যাগণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। অমিতার গর্ভজাত সন্তানেরা পিতার নামানুসারে কোলিয়বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অমিত্রঘাত— মগধরাজ বিন্দুসারের নামান্তর। (বিন্দুসার দেখ)। তাঁহার রাজসভায় গ্রীক নরপতি দ্বিতীয় টলেমী বেসিলিস নামক একদূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অমূল্যচরণ বসু—(ডাক্তার) তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি এম্, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি প্রধান উদ্যোক্তা এবং দেশীয় ঔষধ বিলাতী উপায়ে প্রস্তুত করিবার সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমৃতচন্দ্র—একজন জৈন গ্রন্থকার। ৯০৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পট্টাবলিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

অমৃতপ্রভ—তিনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। চন্দ্রাট তাঁহার প্রণীত 'যোগরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে অমৃতপ্রভের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অমৃতপ্রভের গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই।

অমৃতপ্রভা—(১) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজার কন্যা অমৃতপ্রভা স্বয়ম্বর সভায় কাশ্মীরের অধিপতি মেঘবাহনকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। মেঘবাহন দেখ। (১৫৪৯ খ্রীঃ অব্দ।) (২) তিনি ভুবনবিজয়ী কাশ্মীরপতি রণাদিত্যের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। তিনি অমৃতেশ্বর দেব নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। (৩) কাশ্মীরপতি বজ্রাদিত্যের মহিষী ও জয়াপীড়ের জননী। জয়াপীড় পাপে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, তাঁহার জননী অমৃতপ্রভা মৃত পুত্রের আত্মার সদ্‌গতি লাভের জন্য অমৃতকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অমৃতরাও কদমবন্দে—তিনি একজন বড় জমিদার ছিলেন। তাপ্তি নদীর তীরে কোকর মন্দ নামক স্থানে তাঁহার দুর্গ ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্রদের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার জন্য, শম্ভুজীর পুত্র ও শিবাজী ছত্রপতির পৌত্র রাজা শাহুকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শাহু মুক্ত হইয়া যাঁহাদের সাহায্যে রাজ্য অধিকার করেন। এই অমৃতরাও কদমবন্দে তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

অমৃতলাল বসু—তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা, প্রহসন ও কবিতা রচয়িতা, স্বদেশী যুগের বক্তা ও কর্ম্মী। বৃদ্ধ বয়সেও রসিক বক্তা এবং বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য সংগ্রাহক বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সরস বাক্য-

ছটায় সকলের প্রাণে রসধারা প্রবাহিত হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। তাঁহার বিবাহবিভ্রাট, কালাপানি, একাকার, সাবাস আটাশ, তাজ্জব ব্যাপার, রাজা-বাহাদুর, কৃপণের ধন, প্রভৃতি সামাজিক প্রহসন, হীরকচূর্ণ, তরুবালা, বিজয় বসন্ত প্রভৃতি নাটক তাঁহাকে সাহিত্য জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার রসিকতা খুব স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। ১৩৩৬ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমৃতলাল রায়—তিনি লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

অমৃতাকর--(১) কাশ্মীরের শৌণ্ডিক-বংশীয় নরপতি কুলকলঙ্ক অবন্তীনাথের অন্যতম মন্ত্রী। (২) তিনি কাশ্মীরপতি ক্ষেমগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। অমৃতাকরের পুত্র উদয়গুপ্ত ও একজন মন্ত্রী ছিলেন।

অমৃতানন্দ—(১) একজন বৌদ্ধ কবি। তিনি অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত নামক কাব্যের কয়েকটি লুপ্ত পরিচ্ছেদ নিজে রচনাপূর্ব্বক যোজনা করেন। অমৃতানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) একজন প্রাচীন কবি। তিনি 'নৈপালিয়-দেবতা-কল্যাণ-পঞ্চবিংশতিক' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন।

অমৃতোদন--মহাত্মা বুদ্ধের পিতৃব্য। তাঁহার পুত্র শাক্য পাণ্ডু। কোশলেশ্বর বিরুঢ়ক কপিলাবস্তু আক্রমণ করিলে, শাক্যপাণ্ডু পলায়নপূর্ব্বক সপরিবারে গঙ্গাতটে আসিয়া একটী রাজ্য স্থাপন-পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। কেহ কেহ বলেন হুগলীর অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া শাক্যপাণ্ডু কর্ত্তৃক স্থাপিত।

অমোঘ বজ্র—তিনি একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহার শিষ্যগণ 'মন্ত্র' সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এই সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জাপানে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

অমোঘবর্ষ—রাষ্ট্রকোটের নরপতি তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ (অন্য নাম সর্ব্বনৃপতুঙ্গ) ৮১৪খ্রীঃ অব্দ হইতে ৮৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৬১বৎসর রাজত্ব করেন। মান্যখেট নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহা নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান মালখেট। তিনি বেঙ্গী, অঙ্গ, বঙ্গ, মালব ও মগধ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া প্রভূত ধন ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ও অতিশয় বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন এবং তিনি 'রত্ন মালিকা' বা 'প্রশ্নোত্তর-মালা' নামে একখানা ক্ষুদ্র নীতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি জৈন

ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন এবং জিনসেন নামক একজন জৈন সাধুর শিষ্য ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে, পুত্র অকাল-বর্ষের হস্তেরাজাভার সমর্পণপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দন্তীবর্ম্মা দেখ।

অমোঘভূতি—তিনি কুণিণ্ড বংশীয় একজন নরপতি। যমুনার পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান 'বারিয়া' নামক স্থানের নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি খ্রীঃ পূঃ ১৫০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

—তাঁহার পিতার নাম ত্র্যম্বকজি। তিনি একজন সদাশয় লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র অম্বজি এক জন অত্যাচারী সেনাপতি ছিলেন; মাধোজি সিন্ধিয়া তাঁহাকে মিবারে স্থাপন করিয়া, রাণার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। এই ধূর্ত্ত অম্বজি কৌশল করিয়া রাণা ভীম-সিংহের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী জলিম সিংহকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। অম্বজি আট বৎসর মিবারে থাকিয়া এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহার সাহায্যে তিনি ভারতের একজন অগ্র-নায়ক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইতি-মধ্যে মাধোজি সিন্ধিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। মাধোজি সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীদের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে অম্বজিরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল। যে সিন্ধিয়ার অনুগ্রহে তাঁহার উন্নতি, তাঁহাকে অমান্য করিয়া তিনি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। অবশেষে সিন্ধিয়া তাঁহাকে একটা ছোট তাঁবুতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জলন্ত উল্কা দ্বারা তাঁহার হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি পুড়াইয়া দিলেন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। যাহা অবশিষ্ট, ছিল তাহাও জলিম সিংহ অধিকার করিলেন। এই জলিমসিংহকে এক সময়ে তিনি প্রতা-রিত করিয়াছিলেন। এইসব দুঃখে অম্বজি অচিরে দেহত্যাগ করেন।

অম্বট্‌ঠ)--পোক্‌খর সাদি (পুষ্করসাতি) নামক এক ব্রাহ্মণের শিষ্য অম্বটের সহিত ভগবান গৌতম বুদ্ধের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই আলোচনার বিবরণ 'দীঘ-নিকায়' নামক পালি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

অম্বপালি— বৈশালিনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ গণিকা। ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাহার আম্রকাননে কিছুদিন বাস করেন। অম্বপালি বুদ্ধদেবের উপ-দেশে ভোগসুখে বীতরাগা হইয়া তাঁহার সেই আম্রকানন বৌদ্ধভিক্ষু সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। থেরিগাথা নামক গ্রন্থে অম্বপালির রচিত একটি মনোহর দীর্ঘ গাথা আছে।

অম্বরওঝা—মৈত্রবংশীয় সোল ওঝার পুত্র। তিনি সাতটা নামক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

অম্বিকাচরণ মজুমদার— ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও জননায়ক। তিনি সুবক্তা ও দেশের অন্যতম সেবক ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্যার সুরেন্দ্র নাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক অন্দোলনাদি বিষয়ে তাঁহার রচিত একখানি ইংরাজি পুস্তক আছে। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেশসেবা হইতে বিরত হন নাই। বাং ১৩২৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অম্বিকা দেবী—তিনি আসাম প্রদেশের আহমবংশীয় নরপতি শিবসিংহের দ্বিতীয়া মহিষী। তাঁহার অন্যনাম দেওপাদী। প্রথমা মহিষী কুলেশ্বরীর মৃত্যুর পরে, শিবসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া প্রথমা মহিষীর ন্যায় তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। শিবসিংহ দেখ।

অম্বিকা বাঈ—ছত্রপতি শিবাজীর প্রথমা স্ত্রী সইবাঈ হইতে শম্ভুজী ও অম্বিকাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তরলে নামক স্থানের হরজিরাজে মহাদিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শিবাজী হরজিকে জিঞ্জির নামক স্থানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন।

অম্মবিষ্ণু বর্দ্ধন—তিনি বেঙ্গীর চালুক্য বংশীয় নরপতি বল্লভীগণ্ড বিজয়াদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ৯১৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯২৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিজয়াদিত্য ও বেট সামান্য কয়েকদিন রাজত্ব করেন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

অম্মাঙ্গা—তিনি চোলবংশীয় নরপতি রাজেন্দ্রচোলের কন্যা। বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি রাজরাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কুল্লোতুঙ্গ দেব (অন্যনাম রাজেন্দ্র চোল) কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

অয় (প্রথম)—তিনি প্রথমে শক নরপতিদের সামন্ত নরপতিরূপে পঞ্জাবের রাজা হন এবং তৎপরে স্বাধীন নরপতি হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অয়িলিস পঞ্জাবের রাজা হন।

অয় (দ্বিতীয়)—শক নরপতিদের সমসাময়িক পঞ্জাবের একজন রাজা। প্রথম অয়ের পরে অয়িলিস ও অয়িলিসের পরে দ্বিতীয় অয় রাজা হন।

অয়ম—তিনি শক নরপতি নহপানের মন্ত্রী ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক খোদিত জুন্নার গুহালিপিতে ছচল্লিশ সংবৎসরের উল্লেখ আছে। (সম্ভবত ১২৪ খ্রীঃ অব্দ)।

অয়িলিস—শক নরপতিদের সময়ে তিনি পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। প্রথম অয়ের পরে তিনি রাজা হন। তাঁহার পরে দ্বিতীয় অয় রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা প্রথমে শক নরপতিদের সামন্ত

নরপতি ছিলেন এবং পরে স্বাধীন নরপতি হন।

অযোধ্যানাথ পণ্ডিত—১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে আগ্রাতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পণ্ডিত কেদারনাথ সম্পদশালী ও সম্মানিত বণিক্ ছিলেন এবং কিছুকাল নবাব জাফরের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। মেধাবী অযোধ্যানাথ প্রথমে আরবী ও পার্শি শিক্ষা করিয়া পরে ইংরেজী অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে আইন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে ওকালতী করিতেন। দেশের সকল প্রকার সংকার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। জাতীয় মহাসভার তিনি অন্যতম নেতারূপে স্বদেশের কাজ করিয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দেশপ্রেমিক লোক সচরাচর দেখা যায় না। যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তিনিই প্রথম সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে (১২৯২ সাল) ৫২ বৎসর বয়সে এই জনপ্রিয় মনীষী মানবলীলা সংবরণ করেন।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদ—তিনি ঝান্সির রাণী লক্ষীবাইএর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা রাজ্যে প্রবেশ করিলে রাণী অযোধ্যা প্রসাদকে দিয়া কাপ্তান গর্ডনের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ পাইলে এই বিপদ কালে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ঠাকুর জাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। কাপ্তান গর্ডন উত্তর দিয়াছিলেন 'আমরা আপনাদের সাহায্য গ্রহণের ইচ্ছা করিনা। আমাদের বিষয় না ভাবিয়া আপনারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন।' ইহার কিছু কাল পরেই উন্মত্ত সিপাহারা ঝান্সীর সমস্ত ইউরোপীয়গণকে হত্যা করে।

অযোধ্যারাম সেন—(১) ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিলদায়িনীয়া গ্রামে লালা রামপ্রসাদ বাস করিতেন। তিনি তৎকালে বিক্রমপুর পরগণার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামগতি সেন একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার কন্যা আনন্দময়ীও পিতার কবিত্ব শক্তি ও পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। পয়গ্রাম নিবাসী অযোধ্যারাম সেনের সহিত ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আনন্দময়ী স্বীয় খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেনকে 'হরিলীলা' গ্রন্থ রচনা কালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আনন্দময়ীরও

অনেক কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। (২) 'শিশুবোধক' গ্রন্থে এক অযোধ্যারামের রচিত 'গুরুদক্ষিণা' নামক কবিতা অতি যত্নপূর্ব্বক পঠিত হইত। এই কবিতাটি অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। দুঃখের বিষয় তাঁহার অন্য পরিচয় দুষ্প্রাপ্য।

অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র—গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি 'গঙ্গার বন্দনা' নামক কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'সত্যনারায়ণ কথা' 'দাতাকর্ণ' ও 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

অযোধ্যারাম গোস্বামী— তাঁহার ডাক নাম আজুগোঁসাই। তাঁহার বাসস্থান হালিসহরের সন্নিকট কুমারহট্ট গ্রাম। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আজু গোঁসাই সংসারানাসক্ত বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হালিসহরে গমন করিলে, রামপ্রসাদ ও অযোধ্যারামকে আনাইয়া উভয়ের গানের লড়াই শ্রবণে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহাদের গানের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রকৃতই উপভোগ্য ছিল। রহস্য কবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে আজু গোঁসাইয়ের কবিত্ব প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল।

অযোধ্যারাম মিত্র—বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি বাঙ্গলার নবাবের অনুগৃহীত দেওয়ান ছিলেন। নবাব তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র রাজা পীতাম্বর মিত্র। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন।

অরণ্য—দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্যতম হস্তামলক, শঙ্করাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। এই হস্তামলকের শিষ্য বন ও অরণ্য। গোবর্দ্ধন মঠে বন ও অরণ্যের শিষ্য প্রণালী প্রচলিত আছে।

অরনাথ—তিনি অষ্টাদশ অতীত জৈন তীর্থঙ্কর। হস্তিনাপুরের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুদর্শনের পত্নী দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি গজপুরে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং শমেত শিখরে (বর্ত্তমান পার্শ্বনাথ পাহাড়) নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার গাত্র পীত বর্ণ, এবং নন্দ্যাবর্ত্ত চিহ্ন তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে তাঁহার লাঞ্ছন মীন ছিল। পরশুরাম অবতার তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

—নেপালের একজন রাজা। কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী অধীশ্বর জয়াপীড় নেপাল আক্রমণ করিতে যাইয়া অরমুড়ি কর্ত্তৃক বন্দী হন। পরে জয়াপীড়ের মন্ত্রী দেবশর্ম্মার আত্মবিসর্জ্জনে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া নেপাল বিধ্বস্ত করেন ও অরমুড়িকে বিনাশ করেন।

অরাড় কালীম (আরাড় কালাম)—গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক একজন শ্রাবক সন্ন্যাসী। তাঁহার তিন শতাধিক

শিষ্য ছিল। বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিয়া কিছুদিন তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করেন। একবার তিনি তাঁহার শিষ্য হইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে এইস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বুদ্ধদেব দেখ।

অরিট্‌ঠ (অরিষ্ট)—শ্রাবস্তী নগরী নিবাসী জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি শকুনি শিকারী ছিলেন। কোনও সময়ে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তিনি ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশাবলীর বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিতে থাকেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ নিষেধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন অপর ভিক্ষুগণ বাধ্য হইয়া সমুদয় বিষয় ভগবান্ বুদ্ধের গোচরে আনয়ন করেন এবং তিনি সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন।

অরিমত্ত—তিনি আসামের ধর্ম্মপালবংশীয় শেষ নরপতি রামচন্দ্রের পুত্র। কথিত আছে রামচন্দ্রের রূপবতী পত্নী ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগে অরিমত্তকে লাভ করেন। অরিমত্ত মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগ ভ্রমে রামচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই পিতৃহত্যার পাপ স্খালনের জন্য তিনি যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক কাহিনী কথিত হইয়া থাকে। তিনি একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া কামরূপ জিলার বৈদরগড় নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও তথায় সম চতুষ্কোণ চারি মাইল দীর্ঘ একটী বাঁধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কামতাপুরের (বর্ত্তমান কোচবিহার) রাজা ফেঙ্গুয়া অরিমত্তের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং অরিমত্তের স্ত্রী রত্নমালার সাহায্যে অরিমত্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। পরে তিনি রত্নমালাকেও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের কার্য্য করার জন্য বধ করেন। অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ পরে ফেঙ্গুয়াকে পরাস্ত করিয়া বধ করেন। জঙ্গালবলহু নামে অরিমত্তের অন্য এক পুত্র নয়াগাং জিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমুদ্র নামে নরপতি অরিমত্তের এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাহইতেই আসামের বারভূঁইয়াদের উদ্ভব হয়।

অরিসিংহ—(১) দ্বিতীয় প্রতাপসিংহের পুত্র রাজসিংহ রাজা হইয়া, মাত্র সাত বৎসর চিতোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পিতৃব্য অরিসিংহ তাঁহাকে অন্যায়রূপে নিহত করিয়া ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে তাঁহার কোন দাবী ছিল না। তিনি ষোড়শজন প্রধান সর্দ্দারের মধ্যেও ছিলেন না। তাঁহার স্থান তাঁহাদের নিম্নে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল। ইহা ছাড়া অরিসিংহের স্বভাবও অতি কর্কশ ছিল।

এই সকল কারণে সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হন এবং রতনসিংহ নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাজসিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। অচিরেই দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে রাণা অরিসিংহ জয়লাভ করেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার পরাজয় হয়। মাধোজি সিন্ধিয়া রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এক্ষণে সিন্ধিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে অমরচাঁদ বারোয়া নামক এক বণিক মন্ত্রী ও সেনাপতির বুদ্ধি-কৌশলে রাণা অরিসিংহ জয়ী হইলেন। কিন্তু ইহার অল্পকালপরেই তিনি হার রাজকুমার অজিতসিংহের হস্তে নিহত হইলেন। অতঃপর অরিসিংহের পুত্র হামির ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (২) চিতোরের অধিপতি রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দেবীর আদেশে দ্বাদশজন চিতোরের রাজা যুদ্ধে মস্তক প্রদান করিতে প্রস্তুত হন। তন্মধ্যে, তিনিই প্রথম রাজা হইয়া মস্তক প্রদান করিতে সম্মত হন। তদনুসারে তিন দিন রাজ্যশাসন করিয়া চতুর্থ দিনে তিনি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির বিপুল সৈন্য বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন। এই অরিসিংহ মৃগয়া করিতে যাইয়া চন্দামু-কুলের এক নিঃস্ব রাজপুতের অসামান্য বীর্য্যবতী ও রূপবতী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে চিতোরের উদ্ধার কর্ত্তা বীরবর হামিরের জন্ম হয়। হামির দেখ। (৩) একজন প্রাচীন কবি। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্রচিত কাব্যের নাম 'সুকৃত সংকীর্ত্তন'। উক্ত পুস্তক খানি ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে George Buehler কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। (৪) 'কাব্য কল্পলতা' নামক একখানি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

অরুণ—একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। কথিত আছে, তিনি সূর্য্যের নিকট এই গুহ্য বিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

অরুণ দত্ত—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বেত্তা। তাঁহার পিতার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত। তিনি বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা'র 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' নামে এক টীকা রচনা করেন। তিনি 'সুশ্রুতেরও' একখানি টীকা রচনা করেন।

অর্ঘমিত্র বা অর্দ্ধমিত্র—উত্তর পঞ্জাব প্রদেশের একজন রাজা। সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পারস্যপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সামন্ত নৃপতিরূপে রাজত্ব করিতেন।

অর্চ্চট—কাশ্মীর দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি পরে বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং 'হেতুবিন্দু বিবরণ' নাম দিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির 'হেতু-বিন্দু' গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যথা—স্বভাব, কার্য্য, অনুপলব্ধি ও ষড়লক্ষণ ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখিত আছে যে অর্চ্চট, ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ রোপণ করিয়া যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। ৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের পর তাঁহার আবির্ভাব কাল নিরূপিত হয়। জৈন দার্শনিক গুণরত্নস্বরী ১৪০৯ খ্রীঃ অব্দে, স্বীয় 'ষড্দর্শন-সমুচ্চয় বৃত্তি' গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চ্চট প্রণীত 'তর্কটীকার' উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খ্রীঃ অব্দে রত্নপ্রভস্বরী নামক অপর একজন জৈন দার্শনিক স্বীয় 'স্যাদ্বাদ রত্নাবতারিকা' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্চ্চটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অর্চ্চটের অপর নাম ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য।

অর্জ্জনি বেগম—রাজকুমার শাহরিয়ারের কন্যা। শাহরিয়ার নুরজাহানের (মিহির উন্নিসা) পূর্ব্ব পক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। অর্জ্জনি বেগম মিহির উন্নিসারই গর্ভজাত সন্তান।

অর্জভর—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আর্য্যভট্ট, আরবীয়গণের নিকট অর্জ-ভর নামে খ্যাত ছিলেন। আর্য্যভট্ট দেখ।

অর্জ্জুন—(১)কাশ্মীরাধিপতি সংগ্রাম রাজের একজন কর্ম্মচারী। মন্ত্রী তুঙ্গের বিদ্রোহ ও নিধন কালে তিনিও নিহত হন। (২) কাশ্মীরপতি রাজা উচ্চলের সেনাপতি ভীমাদেবের সহচর। (৩) চতুর্থ শিখ গুরু রামদাসের পুত্র। রামদাসের পৃথ্বীচাঁদ ও মহাদেও নামে আরও দুই পুত্র ছিল। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে পিতা রামদাসের মৃত্যুর পর তিনি গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। গুরু অর্জ্জুন একজন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। গুরু নানকের বাণী জীবন ও সমাজের কোন অবস্থায় কিরূপ ভাবে কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, তিনিই প্রথম তাহা অনুধাবন করেন। অমৃতসহরই তাঁহাদের প্রধান মিলন স্থান ছিল। তাঁহার সময়ে অমৃতসহর একটী সামান্য স্থান ছিল, এখন ইহা এক বহু জনাকীর্ণ নগর এবং তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। অর্জ্জুন পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের আকার দান করেন। তাঁহারই সময়ে গুরুকে বার্ষিক দক্ষিণা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং শিখগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করে। চণ্ডু নামক একজন বাদশাহী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে বন্দী করেন। কারাগারের অত্যাচারে ও কষ্টে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অর্জ্জুনের মৃত্যু সময়ে তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরেরও কম ছিল। সেই জন্য একদল শিখ তাঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিখই, বালক হরগোবিন্দকেই গুরু বলিয়া মানিয়া লইলেন। ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে অর্জ্জুনের জন্ম হয়, এবং ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (৪) উত্তর ভারতের চক্রবর্ত্তী সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের (অন্য নাম শিলাদিত্য) মন্ত্রী। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিনি বলপূর্ব্বক থানেশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চীনপতি 'উয়াং-হিউয়েন সি' ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং অর্জ্জুনকে বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া যান। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সহিত চীন সম্রাটের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। চীন সম্রাট ইতিপূর্ব্বে ৬৪৩ খ্রীঃ অব্দে একবার দূতের দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনকে উপহারাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনও তদনুরূপ উপহারাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৬৪৬ খ্রীঃ অব্দে চীন সম্রাট আবার দূতসহ উপহার প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা মগধে আসিবার পূর্ব্বেই হর্ষবর্দ্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হন। অর্জ্জুন হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে থানেশ্বরের সিংহাসন অধিকার করেন এবং চীন দূতের সঙ্গীয় অশ্বারোহীদিগকে ও সৈন্যকে বধ করিয়া উপহার গ্রহণ করেন। দূত ও তাঁহার সহগামীগণ অতিকষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। চীন সম্রাট ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এক পরাক্রান্ত সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারাই অর্জ্জুনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া যান। এই অর্জ্জুনই গৌড় বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (৫) কান্যকুব্জের অধীশ্বর রাজপাল, গজনীর সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সুলতান মামুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া স্বীয় রাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দেল্ল-রাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাতক বংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালকে বধ করেন।

অর্জ্জুনকোষ্ঠ—কাশ্মীরপতি ভিক্ষাচরের অন্যতম মন্ত্রী ও মল্লকোষ্টের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মল্লকোষ্ট রাজা সুস্সলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্রোহী গর্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহাতে সুস্সল অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুযোগ ক্রমে অর্জ্জুনকোষ্টকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরে তাঁহাকে শূলে আরোপিত করিয়া বধ করেন।

অর্জ্জুন দাস বা ক্ষেপাচাঁদ—তিনি একজন শিখ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ বড়ই অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি যখন আপনাকে

গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পাগলের ভাণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি জ্ঞান ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সকল সাধু সন্ন্যাসীরই সংবাদ রাখিতেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু তিনি এই সমস্ত সংবাদ ভালরূপ জানিতেন। তিনি হঠযোগে সিদ্ধও ছিলেন। তাঁহার যেমন প্রখর বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য, অনধিগম্য আধ্যাত্মিকতা ছিল, তেমনি অপরিসীম লোকানুরাগও ছিল। খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

অর্জ্জুন দাসজী—একজন রাজপুত ভক্ত এবং সমর্থক সাধক। তাঁহার গান ভক্তদের মধ্যে খুব সমাদৃত। ভজনীয়ারা এই সব সঙ্গীত ভক্তি সহকারে গান করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ জীবন দাসজী তাহার গুরু ছিলেন। তিনি গোণ্ডালের অধিবাসী ছিলেন।

অর্জ্জুন নাথ—রুদ্রকুল বংশীয় সত্যনাথের শিষ্য। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার বিচার হয়।

অর্জ্জুন মিশ্র—'ভাবদীপ' নামক মহাভারতের টীকার রচয়িতা। তিনি কুসুমাঞ্জলীরও টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে পূর্ব্বস্থলীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

অর্জ্জুন রাও—হারবংশীয় বীরবর অর্জ্জুন রাও, ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে গুর্জ্জরপতি সুলতান বাহাদুর কর্তৃক চিতোর আক্রমণ কালে অশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক আপনার পঞ্চশত সৈনিকসহ সমর শয্যায় শয়ন করেন।

অর্জ্জুন সিংহ—মিবারের রাণা ভীমসিংহের রাজত্ব কালে তাঁহার সামন্ত নরপতি চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর শত্রুতা ছিল। কোরাবার অধিপতি অর্জ্জুনসিংহ চন্দাবৎদের পক্ষীয় ছিলেন। শক্তাবৎ গোত্রের একটী অধস্তন শাখায় সংগ্রামসিংহ নামে এক বীর পুরুষ ছিলেন। ভীণ্ডিরদুর্গ চন্দাবৎগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া তিনি স্বীয় কুলপতি শক্তাবৎ সর্দ্দারের সহায়তার জন্য কোরাবার পতি অর্জ্জুনের ভূমিবৃত্তি আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার গবাদি পশু হস্তগত করিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র সেলিমসিংহ সংগ্রামসিংহের হস্তে নিহত হন। অর্জ্জুন এই সংবাদ শ্রবণে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া, কোরাবার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শিবগড়ে উপস্থিত হইয়া, সংগ্রামসিংহের বৃদ্ধ পিতা লালজিকে ও তাঁহার শিশু পুত্রদিগকে হত্যা করেন। এই হত্যা কাণ্ডের ফলে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদের মধ্যে ভীষণ বৈরীভাব জন্মে। তৎকালে

মন্ত্রী সোমজিও নিহত হন। (২) তিনি প্রখ্যাত নামা রাজা মানসিংহের পুত্র। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়ই তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

অর্দ্ধকূর্ম্ম নাথ—নাথ পন্থীদের চুরাশী-জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

অর্দ্ধপাদ নাথ—নাথ পন্থীদের চুরাশী-জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

অর্দ্ধবৃক্ষ নাথ—নাথ পন্থীদের চুরাশী-জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

অর্দ্ধসব নাথ—নাথপন্থীদের চুরাশীজন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তোফী—তিনি কলিকাতা রঙ্গালয়ের একজন প্রথিত-যশা অভিনেতা ছিলেন। অভিনয় শিক্ষাদান কার্য্যেও তিনি অতিশয় সুদক্ষ ছিলেন। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে তিনি দর্শকগণের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশের নানা জেলার গ্রাম্য ভাষায় কথোপ-কথনে তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল। ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৫ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অধ্বর্নাথ—নাথ পন্থীদের চুরাশীজন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। অপান নাথ দেখ।

অর্ণব—কেশব দৈবজ্ঞ কৃত 'নাবপ্রদীপ' নামক যাত্রা গ্রন্থের টীকাকার গণেশ দৈবজ্ঞ, তাঁহার টীকায় 'অর্ণব' নামক এক জ্যোতিষ গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানা যায় নাই।

অলংকার—কাশ্মীর রাজ জয়সিংহের (১১২৯—১১৫০) মন্ত্রী। তিনি স্বয়ং বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহ-দাতা ছিলেন।

অলক—কাশ্মীরপতি সুস্‌সলের সেনা-পতি পৃথ্বীহরের ভ্রাতুষ্পুত্র। অলক স্বীয় পিতৃব্যের সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অলকট্ কর্ণেল, (Colonel Olcott)—তিনি আমেরিকার লোক ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে ভারতবর্ষে থিয়সফিক্যাল সোসাইটী (তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতি) স্থাপন করেন, এবং এই সমিতির শাখা ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন করেন। তিনি মূলসভার সভাপতি ও 'থিয়সফিষ্ট' নামক পত্রিকার সম্পাদক রূপে আমরণ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় পত্রিকাখানি অতি

সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা সম্পাদন, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা ও অপর নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা তিনি নব্যশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় ও তাঁহার পবিত্র জীবন-প্রভাবে তিনি দেশের শিক্ষিত জন-গণের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সারমর্ম্ম যাহাতে জনসাধারণের বোধ-গম্য হয়, তজ্জন্য আজীবন বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেকটা সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। অলৌ-কিক ক্ষমতা বলে তিনি অনেক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করিতে সমর্থ ছিলেন। বহু রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই ঋষি তুল্য ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র প্রভাবে আপামর সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে আশী বৎসর বয়সে স্বীয় প্রধান কর্ম্মস্থল মাদ্রাজ নগরের আদিয়ার নামক স্থানে এই মহাত্মা মানবলীলা সংবরণ করেন।

অলখান—গুর্জ্জর দেশের অধিপতি; কাশ্মীর পতি শঙ্করবর্ম্মা গুর্জ্জর দেশ আক্রমণ করিলে, অলখান টক্ক নামক দেশটী তাঁহাকে প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন।

অলক্ষ ল—তিনি পুঞ্জের পুত্র ও পদার-তের পৌত্র। তিনি ক্ষীরোদা নামক একটী নগর স্থাপন করেন। অলক্ষ্ল একজন বীরপুরুষ ছিলেন। সিন্ধুনদের তটবর্ত্তী আটকে, মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার একবার যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ ক্ষীরোদীয় কামধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি পঞ্জাবের অধিপতি ছিলেন।

অলং সিথু—ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বঙ্গীয় পালকর বংশীয় কোন রাজা ব্রহ্মদেশে আসিয়া ব্রহ্মরাজ কনিষ্ঠের দুহিতার পাণিপ্রার্থী হন এবং প্রার্থনা পরিপূর্ণ না হওয়ায় আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজকন্যা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পালকর রাজের সহিত রাজ-দুহিতার বৈধ বিবাহ না হওয়ায় পাছে দৌহিত্রের রাজ্যলাভে বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় নরপতি কনিষ্ঠ মহাসমারোহে তাঁহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজা কনিষ্ঠের মৃত্যুর পর দৌহিত্র অলং সিথু রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১০৮৫ খ্রীঃ অব্দে অলং সিথু আরা-কান ও বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১১০৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। তিনি স্বীয় পিতৃকুল বঙ্গীয় পালকর রাজবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন।

অলট (অলক, অল্লট)—'কাব্য-প্রকাশ' নামক শব্দশাস্ত্র প্রণেতা। মম্মট দেখ।

সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের অধীনস্থ একজন সেনাপতি। তিনি স্বদেশে কোন হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, পলায়নপূর্ব্বক সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। দাহির তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় দাহিরের দ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়াও দাহির যখন তাঁহাকে মোহাম্মদ বিন কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অলফি দাহিরের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশ্মীরে উপস্থিত হন। দাহির দেখ।

অলবি—একজন কবি ও গ্রন্থকার। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে (১১৩৬ হিঃ) কাশ্মীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নামান্তর নির তাহির।

অলবি খাঁ (হাকিম)—সম্রাট মোহাম্মদ শাহ তাঁহাকে পারস্য হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬১) দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'জামাউল জাবামা' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

অল্‌বেরুণী—৮৯৫ শকে (৯৭৩খ্রীঃ) তিনি মধ্য এসিয়ার তুর্কিস্থানের অন্তর্গত খিব প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ও জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গজনির সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি পুরাণ, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে আরও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। জ্যোতিষেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার 'ভারত বিবরণ' গ্রন্থে বহু ভারতীয় জ্যোতিষীর নাম করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই সমুদয় জ্যোতিষীর অনেকের গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইয়াছে। Dr. Sachau অল্‌বেরুণীর গ্রন্থের জর্ম্মন অনুবাদ করিয়াছেন। ইহারই ইংরেজী অনুবাদ Al-Beruni's India. ১০৩৮ খ্রীঃ অব্দে অল্‌বেরুণীর মৃত্যু হয়।

অল্‌বোর (Allbour, Count)—তিনি গোয়ার পর্তুগিজ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মহারাজ শম্ভুজী ১৬৮৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অল্‌মস্থদি—তিমি একজন আরব দেশীয় ভ্রমণকারী। ৮৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কনৌজের রাজা মিহির ভোজের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে আমাদের অনেক সামাজিক বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উপবীত ধারণ করিতেন।

অলর্ক—কাশীর রাজা। তাঁহার পিতার নাম বৎসরাজ ও মাতার নাম মদালসা। মাতা ধর্ম্মপরায়ণা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্না ছিলেন। জননী পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। অলর্ক যোগ বলে রিপু দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ-কাল শান্তিতে রাজত্ব করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

অলিউল্লা, মৌলবী শাহ—পার[illegible] ভাষায় 'ফতেউল রহমান' নামক কুরাণের এক ভাষ্যের রচয়িতা। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন।

অলিকুর তান শিরা—ইন্দোরের রাজা মহলর রাও হোলকারের মন্ত্রী। তাঁহারই পরামর্শে হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

অলিমোহাম্মদ—তিনি হোসেন শাহের একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার উপাধি মজলিস-উল-মজালি-মনসুর। গৌড়নগরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত সোণা মসজিদ অলিমোহাম্মদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা গৌড়ের বিখ্যাত কীর্ত্তিচিহ্ন এবং গৌড়ীয় স্থাপ-ত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অলী আল্লাহ—তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ) সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

অল্ল—তিনি গুর্জ্জরপতি ভোজদেবের অধীনে গোপাদ্রির (বর্ত্তমান গোয়া-লিয়র) শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

[illegible] — গিহেলোট-বংশীয় নরপতি [illegible]ীয় খোমানের পুত্র। তাঁহার মাতা [illegible] [illegible]লেন। রাজ[illegible] নবধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হ[illegible]।

অ[illegible] বংশীয় সম্রাট 'ছন্দন ক[illegible]' কর্ত্তৃক কুসুমপুর অধিকৃত হইলে, তথা-[illegible]ার অধিপতি সান্ধর সর্ত্তানুসারে অন্যান্য [illegible]ঢোকনের সহিত অশ্বঘোষকেও [illegible] জত্ব[illegible] [illegible] প্রধান

অল্লাম—নাথপন্থীদের 'হঠযোগ [illegible] পিকা' গ্রন্থে যে মহাসিদ্ধ চৌদ্দজন নাথের উল্লেখ আছে। তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

অল্লামী—সম্রাট আকবরের মন্ত্রী শেখ আবুল ফজলের কবিজন সুলভ নাম ছিল অল্লামী।

অল্লুন—যশল্মীর পতি কেহুড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তনু ছিল। তনুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে অল্লুন চতুর্থ ছিলেন। অল্লুনের পুত্র দেবসি, তিরপাল, ভাওনি ও রাকিচো। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়াও দেবসির সন্তানেরা উষ্ট্র পালন বৃত্তি এবং রাকোচির সন্তানেরা বণিক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তাহারা যাহাতে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, ইহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য'। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কোনও নৃপতি যে স্বেচ্ছায় জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

অশোক (কাশ্মীরপতি)—তিনি কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী শচীনরের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শচীনরের খুল্লপিতামহ-... ছিলেন ... গণ্ডিস্তোত্র গাথা, ... প্রকরণ (নাটক), কল্পনা ... অলঙ্কার নামক বৌদ্ধ কথাগ্রন্থ, ... পুস্তকও অশ্বঘোষের রচিত ব... গৃহিত হয়। চীন ভাষায় অশ্বঘে... পাঁচখানি এবং তিব্বতীয় ভ... লেন ... অসংখ্য গৃহ প্রস্তুত করাইয়া তিনি শ্রীনগর নামে একটী নগরও স্থাপন করেন। ইহাই কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজধানী শ্রীনগর। তাঁহার সময়ে ম্লেচ্ছেরা কাশ্মীর আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র জলৌক রাজা হন।

অশোক আচার্য্য—একজন বৌদ্ধ আচার্য্য 'সামান্যদূষন-দিকপ্রকাশিকা' নামক ন্যায়গ্রন্থ তাঁহার রচিত। অসাধারণ প্রতিভাশালী চন্দ্রগোমীকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অশোক বল্ল— রাজপুতানার প্রাচীন নাম সপাদলক্ষ, এই স্থানের রাজা অশোক বল্লের খোদিত লিপি বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি দ্বিতীয় কণিষ্কের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

অশোক মল্ল—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'নিঘণ্টু সার'।

অশোর—রাজপুতনার রাঠোর বীর যশোবন্ত সিংহের সেনাপতি দুর্গাদাসের পিতা। দুর্গাদাস দেখ।

অশ্বগুপ্ত—হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী বত্তনীয় নামক আশ্রমে পরমজ্ঞানী বৌদ্ধ স্থবির অশ্বগুপ্ত বাস করিতেন। তাঁহারই আশ্রমে প্রসিদ্ধ নাগসেন কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

অশ্বঘোষ—(প্রথম) বৌদ্ধযুগের খ্যাতনামা সংস্কৃত কবি ও ধর্ম্মাচার্য্য। তিনি মধ্যযুগের কালিদাসেরই তুল্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধচরিত নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার জীবন কাহিনী আদৌ সহজ প্রাপ্য নহে এবং তিনি বাস্তবিক কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা এখনও পণ্ডিতগণের বিচার্য্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। চীন ও তিব্বত দেশীয় গ্রন্থ হইতে এবং একাধিক চীন পরিব্রাজকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে, অশ্বঘোষের জীবন চরিতের উপকরণ পাওয়া যায়। তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন, ইহাই একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। পার্শ্ব ও পূর্ণযশ নামে তাঁহার

দুইজন আচার্য্য ছিলেন। চীন দেশীয় বৌদ্ধসাহিত্যে যে সকল প্রধান প্রধান বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে পার্শ্ব ও পূর্ণযশকে অশ্বঘোষের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেবকে তাঁহার পরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন এবং বৌদ্ধমত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ কুলোচিত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাস্তিবাদ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। 'বুদ্ধভক্তিবাদ'ও প্রধানতঃ তিনিই প্রচার করেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার জন্ম স্থান লইয়াও মতভেদ আছে এবং সেই সংশ্রবে প্রধানতঃ অযোধ্যা (সাকেত) কাশী ও পাটলিপুত্র এই তিনটি স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত, মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী বলিয়া জানা যায়। চীনদেশীয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত অশ্বঘোষের জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন এবং সুমধুর সঙ্গীতাবলীর রচনা করিয়া, দেশে দেশে গান করিয়া বেড়াইতেন। বুদ্ধ চরিতের যে তিব্বতীয় অনুবাদ আছে, তাহার শেষাংশে এবং "বসুবন্ধুর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, অভিধর্ম্মকার কাত্যায়নী পুত্রের আহ্বানে অশ্বঘোষ গান্ধারে (বর্ত্তমান কাবুল) গমনপূর্ব্বক কাত্যায়নী-পুত্রকে অভিধর্ম্মের 'মহাবিভাষা' নামক টীকা রচনায় সাহায্য করেন। "হিউয়েন সাঙ"র ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে ঐ মহাগ্রন্থ রচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর, অশ্বঘোষ প্রধানতঃ কুসুমপুরে (পাটলিপুত্র অথবা পাটনা) অবস্থানপূর্ব্বক নবধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। য়ুয়েচী বংশীয় সম্রাট 'চন্দন কনিষ্ঠ' কর্ত্তৃক কুসুমপুর অধিকৃত হইলে, তথাকার অধিপতি সন্ধির সর্ত্তানুসারে অন্যান্য উপঢৌকনের সহিত অশ্বঘোষকেও প্রদান করেন। অশ্বঘোষের প্রধান গ্রন্থ 'বুদ্ধ চরিত' বাস্তবিক কত সর্গে শেষ হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ জানিবার উপায় নাই। চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত বুদ্ধ চরিত অষ্টাবিংশ সর্গে সমাপ্ত, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে সপ্তদশের অধিক সর্গ পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যেও প্রথম তেরটি সর্গই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহিত। অপর চারিটি সর্গ অত্যন্ত আধুনিক। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অমৃতানন্দ নামে এক পণ্ডিত, ঐ চারি সর্গ রচনা করিয়া, মূল গ্রন্থের সহিত যোজনা করেন। অমৃতানন্দ স্বয়ংই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মহামহো-

পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বুদ্ধ চরিতের একখানি অতি পুরাতন পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন সংস্কৃত উৎকৃষ্ট কাব্যসমূহের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' ও যে একখানি, তদ্বিষয়ে আদৌ মতভেদ নাই। অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী অনেক সংস্কৃত কবির কাব্যে তাঁহার কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। 'সৌন্দরনন্দ' নামে আর একখানি সংস্কৃত কাব্য অশ্বঘোষের রচিত। তদ্ভিন্ন বজ্র-সূচী, গণ্ডিস্তোত্র গাথা, শারীপুত্র প্রকরণ (নাটক), কল্পনা মন্দিতিকা, অলঙ্কার নামক বৌদ্ধ কথাগ্রন্থ, প্রভৃতি পুস্তকও অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া গৃহিত হয়। চীন ভাষায় অশ্বঘোষের পাঁচখানি এবং তিব্বতীয় ভাষায় এগার খানি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। শারীপুত্র প্রকরণ নাটকটির পুঁথির এক খণ্ডিতাংশ মধ্য এসিয়ার তুরফান প্রদেশে আবিস্কৃত হয়। উহা তাল পাতায় লেখা ছিল। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে ইহা বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অশ্বঘোষের নামান্তর মাতৃচেট বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করেন। সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় যে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া অশ্বঘোষও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত অনুমান করেন, কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির হয় নাই। (২) চীনদেশীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে এক অশ্বঘোষের নাম পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ চীন-দেশে গমন করিয়াছিলেন। (৩) কুষাণ রাজাদের অন্যতম সামন্ত নরপতি অশ্ব-ঘোষ ছিলেন। সম্ভবত ১১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি মগধে রাজত্ব করিতেন।

অশ্বজিৎ—সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব) গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলে, কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামে পাঁচ ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এক-বার তাঁহারা বুদ্ধদেবকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে যখন বুদ্ধ-দেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, বারাণসীতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন, তখন তাঁহারা তথায় আসিয়া আবার তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন বুদ্ধদেব দেখ।

অশ্বপতি—একজন ক্ষত্রিয় রাজা। কেকয় দেশে (বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশে) তিনি রাজত্ব করিতেন। তিনি এক সময়ে ছয়জন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৬।১ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

অশ্বপাদ—একজন শৈব সিদ্ধযোগী। তিনি কাশ্মীরপতি মাতৃগুপ্তের সম-সাময়িক ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য জয়ন্ত দ্বারা কাশ্মীর পতি দ্বিতীয় প্রবর সেনের নিকট সংস্কারের অনিত্যতা

সম্বন্ধে একলিপি প্রেরণ করেন। তৎফলে রাজা সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অশ্বমিত্র—জৈন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অন্যতম ধর্ম্মাচার্য্য। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা জৈন ধর্ম্মাচার্য্য মহাবীরের জীবিত কালেই তাঁহার মত খণ্ডন ও বিপরীত মত প্রচার করিতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ নিণ্‌হগ (নিহ্নব) নামে অভিহিত হইতেন। মহাবীর দেখ।

অশ্বসেন—প্রসিদ্ধ জৈন ধর্ম্মাচার্য্য পার্শ্বনাথের পিতা। তিনি বারাণসীর একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার—(১) প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'অশ্বিনী কুমার সংহিতা'। (২) 'রসরত্ন সমুচ্চয়' নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া একজন অশ্বিনীকুমারের নাম পাওয়া যায়। তবে কাহারও মতে উক্ত গ্রন্থ বাগ্‌ভটের রচিত।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—তিনি বরিশাল জিলার বাটাজোড় গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মুন্‌সেফরূপে যখন পটুয়াখালী মহকুমায় ছিলেন, সেই সময়ে ১২৬৩ বাংলার (১৮৫৬ খ্রীঃ ২৫ শে জানুয়ারী) ১১ই মাঘ পটুয়াখালীতেই তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নানা স্থানে বদলি হইয়া কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। এই স্থানে তিনি স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার এই স্থান হইতেই প্রবেশিকা, এফ, এ এবং বি, এ, পাশ করেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম এ, অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার মধ্যে অপূর্ব্ব সত্যানুরাগ বিকশিত হইয়াছিল। প্রবেশিকা, পরীক্ষার সময় তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র ছিল। সেই সময় ষোল বৎসরের কম বয়সে পরীক্ষা দিবার রীতি ছিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যাহা ঘটে তাহাই হইল। অশ্বিনীকুমার নির্ব্বিঘ্নে পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু বি, এ, পড়িবার সময় উক্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, অশ্বিনীকুমার ক্ষুব্ধ হইলেন। মিথ্যার দ্বারা তাঁহার জীবন কলঙ্কিত হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার চিত্ত গ্লানিতে পূর্ণ হইল। তিনি প্রথমে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট ঘটনাটি জ্ঞাপন করিয়া, ইহার প্রতিকারের জন্য, বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তিনি ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রেজিষ্ট্রার সাহেব কিছুই করিতে পারিলেন না, কারণ বিষয়টি তখন তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখানেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে মাত্র চারিটি পয়সা সম্বল লইয়া গৃহত্যাগী হইলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানে ধৃত হইয়া কৃষ্ণনগরে নীত হইলেন। ইহাতেও

নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ বালক নিরস্ত হইলেন না। এক বৎসর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কলেজে অনুপস্থিত রহিলেন। কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণনগরে যাঁহারা তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের জজ স্যার আশুতোষ চৌধুরী, এস্, কে লাহিড়ী (রামতনু লাহিড়ীর পুত্র শরৎ কুমার লাহিড়ী) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহারা সকলেই কোন না কোন কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানেই প্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়। অশ্বিনী কুমার এই প্রবীণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মপ্রবণতাকে জীবনের মহান্ আদর্শ করিয়া গ্রহণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৭৮ সালে বি, এ, পাশ করিয়া অশ্বিনীকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে এম,এ, পড়িবার জন্য প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে অধ্যাপক রো সাহেবের (Mr Rowe) তিনি অতি প্রিয় পাত্র হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রবল প্রভাব। স্বর্গীয় পরমহংস রাম কৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত কেশব সেনের বক্তৃতা শুনিতে মন্দিরে উপস্থিত হইতেন। এই ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনের প্রভাবেই অশ্বিনীকুমার সমাজ সংস্কার ও ছাত্র মহলে নীতি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। অশ্বিনী কুমারের পিতাও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগও অশ্বিনীকুমারের চরিত্র গঠনে ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রতি অনুরাগবর্দ্ধনে কম সহায়তা করে নাই। পিতা পুত্রে অনেক সময় শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইত। হিন্দুধর্ম্মের অবনতি দর্শনে ব্যথিত হৃদয় যুবক, এক ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। বহু লোক আকৃষ্ট হইল, অনেক বৃদ্ধও এই সভায় যোগ দিতে লাগিলেন।

অশ্বিনী কুমার ১৮৭৯ সালে এম,এ পাশ করিয়া এলাহাবাদে আইন পড়িতে যান, কিন্তু মায়ের অনুরোধে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বি,এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে পরমহংস রাম কৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সরল ধর্ম্মপ্রাণ সাধুর প্রভাবও অশ্বিনীকুমারের জীবনে কম কাজ করে নাই। আইন পরীক্ষার পর তিনি কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করেন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। এই যুবক এই প্রকারে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু, মহাত্মাদের সংশ্রবে আসিয়া, প্রচুর ধর্ম্মধন সঞ্চয়ে

অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতা ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া বরিশালে ওকালতি করিতে আসিলেন। অনেকে তাঁহাকে কলিকাতা থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; এমনও বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানে থাকিলে, কালে তিনি সমস্ত ভারতের অন্যতম নেতা হইতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রলোভন তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি স্বীয় জন্মভূমি বরিশালকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিলেন। সেই কালে বরিশালের নৈতিক আবহাওয়া বড় ভাল ছিল না। তিনি ঐ আবহওয়ার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইলেন, বরিশালে আসিয়াই তিনি একদল ব্রাহ্মযুবকের সঙ্গে মিশিলেন। তাঁহাদের লইয়া কীর্ত্তন আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠাদি আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত বক্তৃতাও আরম্ভ হইল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি 'পূর্ব্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র' আখ্যা পাইলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বরিশালে আগমন করিলেন। বরিশাল যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অশ্বিনী কুমার তিনজনকে গুরু বলিয়া-মানিতেন কেশব চন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব।

ওকালতি অশ্বিনীকুমারের ভাল লাগিল না। ওকালতি করিতে হইলে বহু মিথ্যা কথা বলিতে হয়। সে জন্য ওকালতি একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে বরিশালে রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি জিলা স্কুল সমিতির সভাপতিও ছিলেন। অশ্বিনী কুমারকে তিনি কমিটীর সভ্য করিয়া লইলেন এবং জিলা স্কুলে সকল ছাত্রের স্থান হয় না বলিয়া, তাঁহাকে একটী স্কুল স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি এই সুযোগে ওকালতি ছাড়িয়া স্কুল স্থাপন করিলেন। তৎপরে পিতার মৃত্যুর পরে ১৮৮৯ সালে পিতার নামে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর বিনা বেতনে তাহাতে কাজ করেন।

কর্ম্মযোগী অশ্বিনীকুমার নিজের সমস্ত শক্তিকে ছাত্রদের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাদের লইয়া কয়েকটী দল গঠন করিলেন। এক একটী দলের এক এক প্রকার কাজ নির্দ্দিষ্ট হইল। ছাত্রদের লইয়া যে আলোচনা হইত, তাহারই ফল স্বরূপ 'ভক্তিযোগ' 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' 'প্রেম' 'কর্ম্মযোগ, প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। কেবল ছেলেদের জন্য স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই। ১৮৮৭ সালে মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করিলেন। সমস্ত জিলার স্ত্রীশিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতদ্ব্যতীত প্রচুর অর্থ শিক্ষাবিভাগের হস্তে দিয়া মহিলাদের জন্য 'ব্রজমোহন পুরস্কারের' ব্যবস্থা করিলেন। প্রতি বৎসর ডাইরেক্টার সাহেব তাঁহার সুদ হইতে এই পুরস্কার' দিয়া থাকেন।

এই সকলের সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বিনী কুমার, ১৮৮৭ সালে স্থাপিত লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য, জনসাধারণ সভার (People's Association) সভাপতি, মাদকতা নিবারণী সভার সম্পাদক, প্রভৃতি বরিশালের সমস্ত সভাসমিতির সহিত যুক্ত হইলেন। এক কথায় তিনি বরিশালের সমস্ত সদনুষ্ঠানের ঋত্বিক ছিলেন।

১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দেশের একটা স্মরণীয় দিন। এই দিনে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রচার হয় এবং পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর হইতে দুই বঙ্গের পৃথক পৃথক কার্য্য আরম্ভ হয়। ফুলার সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে 'জন সাধারণ সভা' ভাঙ্গিয়া 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইল। সরকার (Government) ইহা বে-আইনি বলিয়া ভাঙ্গিয়া দেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, বিপদেই মানুষের শক্তির পরিচয়। এই দুর্ভিক্ষে অশ্বিনীকুমারের অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, সকলে মুগ্ধ হইল। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের পরে ঝালকাটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল নানা কার্য্যে তাঁহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। ১৯০৫ সালের কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তিনি সেইবারে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। দাদাভাই নওরোজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পরেই ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসিল। বলা বাহুল্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশ সভা ভাঙ্গিয়া দিল। অবশ্য বিনা রক্তপাতে সভা ভঙ্গ হয় নাই। এই উপলক্ষে সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। অশ্বিনীকুমারকে ১৯০৬ সালের সুরাট কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তার পর ১৯০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি বন্দী হইয়া লক্ষ্ণৌ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বন্দী হইয়াছিলেন। চৌদ্দ মাস পরে ১৯০৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনী কুমার মুক্তি লাভ করিলেন। ১৯১২ সালে অক্সফোর্ড মিশনের ষ্ট্রং সাহেবের মধ্যস্থতায় ব্রজমোহন কলেজটী সরকারের হস্তে দান করিতে বাধ্য হন। তার পরে স্কুলটী কলেজ হইতে পৃথক হয়।

১৯১৩ সালে ঢাকা প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির কাজ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্য লাভ উপলক্ষে কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সকল তীর্থ স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন: এবং বহু ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন / দেশে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। রাজা বাহাদুরের হাবলীতে, যে স্থানে প্রাদেশিক কনফারেন্স ভঙ্গ হইয়াছিল, সেই স্থানে ভিক্ষালব্ধ অর্থে টাউন হল নির্ম্মিত হইল। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহারই নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ১৯১৯ সালের ঝড়ে বরিশালের বহুস্থান বিধ্বস্থ হইল। তিনি আবার সেবাকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। পাঞ্জাব, বোম্বাই, আহমেদাবাদ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সাহায্য আসিতে লাগিল। ১৯২১ সালে বরিশালে আবার প্রাদেশিক কনফারেন্স বসিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া এবারও তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইলেন। এই সভার কার্য্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইবার ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া, তাহার সহিত টেক্‌নিকেল স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতি যোগ করিয়া দিলেন। ১৯২২ সালে আসামের চা বাগানের কুলির প্রতি অত্যাচার হেতু আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও ষ্টিমার কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়াও অশ্বিনী কুমার বরিশাল ধর্ম্মঘট সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক শেষ কার্য্য। ইহাতে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইল। বাধ্য হইয়া কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিলেন। এখানেই ১৩৩০ সালের ২১ শে কার্ত্তিক ৬৭ বৎসর বয়সে ভক্ত, জ্ঞানী ও কর্ম্মী, অশ্বিনী কুমার মহাপ্রস্থান করিলেন। একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ভারতাকাশ হইতে স্খলিত হইল। যেমনটী গেল তেমনটী আর কবে হইবে, যিনি অন্তর্য্যামী তিনিই জানেন।

অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, রায়সাহেব—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট কোনও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধু পিশিন রেলওয়েতে ওভারসিয়ার হইয়া বেলুচিস্থানে গমন করেন। তথায় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া, বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে সিকিম যুদ্ধে যাইয়া তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন, এবং পরে ব্রহ্মদেশে চীন পাহাড়ের যুদ্ধে গিয়াছিলেন। এখানে তিনি অনারারি

এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, একটী বৃহৎ রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৃটিশ কন্‌সাল মিঃ লিটন তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চীন সেনাধ্যক্ষ, চীন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ এবং ইয়োরোপীয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়সাহেব উপাধি প্রদান করেন।

অশ্মরথ—মহর্ষি অশ্মরথের পুত্র আশ্মরথ্য একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। আশ্মরথ্য দেখ।

অসঙ্গ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থবির ও ধর্ম্মাচার্য্য। তিনি খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতে (অথবা মতান্তরে ৫ম শতাব্দীতে) বর্ত্তমান ছিলেন। পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর এক ভ্রাতার নাম বসুবন্ধু। আবার অসঙ্গেরও আর এক নাম বসুবন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হয়। বোধি সত্ব মৈত্রেয় নাথ (নামান্তর অজিত নাথ) তাঁহার গুরু ছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বু-তোঁ (Buston) এবং তারানাথ লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে অসঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। অসঙ্গ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক হিউয়েনসাঙ অসঙ্গের অনেক গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান। অসঙ্গ কিছু কাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন। অসঙ্গ এবং তাঁহার গুরু বোধিসত্ব মৈত্রেয় নাথ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াও কেহ কেহ বলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে, অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি এই ছয় জনকে ভারতবর্ষের (জম্বুদ্বীপ) ছয়জন উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অসঙ্গই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধুকে মহাযান মতে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে বসুবন্ধু মহাযান মত প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। বসুবন্ধুর জীবনী লেখক পরমার্থ, খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অসঙ্গের অনেক গ্রন্থ মগধ হইতে চীনদেশে লইয়া যান। প্রথমে অসঙ্গ খুব সম্ভব সর্ব্বাস্তিবাদ মতাবলম্বী ছিলেন, পরে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ মত অনুসরণ করেন। তিনি যোগাচারবাদ ও বিজ্ঞানবাদের একজন প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন লেখকও ছিলেন। দর্শন সম্বন্ধীয় বিস্তৃত গ্রন্থগুলির কারিকা লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অসঙ্গ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান—যোগাচার্য্য ভূমী, মহাযান সম্পরিগ্রহ, প্রকরণ আর্য্যবাচা, প্রজ্ঞাপারমিতা সাধনা, মহাযানাভিধর্ম্ম, সঙ্গীতি শাস্ত্র, বজ্রচ্ছেদিকার টীকা, প্রজ্ঞাপারমিতার বিস্তৃত টীকা,

অভিসময়ালঙ্কার কারিকা ও মহাযানা লঙ্কার। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি কাহারও কাহারও মতে, মৈত্রেয় নাথের রচিত। গুহ্যসমাজ অথবা মহাগুহ্য তন্ত্র রাজ নামক একখানি তন্ত্রগ্রন্থও অসঙ্গের রচিত বলিয়া কথিত হয়। তাঁহারই সময়ে তন্ত্রমত মহাযান বৌদ্ধ মতের সহিত মিলিত হইতে আরম্ভ করে।

অসন্ধিমিত্রা—মৌর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি অশোকের অন্যতমা মহিষী। রাজ্যাভিষেকের ত্রিশ বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ২৪২ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন তাঁহার গর্ভেই কুণাল জন্মগ্রহণ করেন।

অসহায় আচার্য্য—তিনি মনুসংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনুসংহিতায় আর কোন ভাষ্যকারের নাম এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তিনি কুমারিল ভট্টেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। বোধ হয় তিনি খ্রীঃ পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পরে ভর্তৃযজ্ঞ মনুসংহিতায় একটী টীকা রচনা করেন। খুব সম্ভব তিনি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। এই সকল ভাষ্য ও টীকার সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক পরবর্ত্তী সময়ে মেধাতিথি তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩ ও ১৫৫ শ্লোকে মেধাতিথি অসহায় আচার্য্য ও ভর্তৃযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন।

অসিত—(১) অতি প্রাচীন কালে অসিত নামে একজন সংহিতা কার ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বরাহমিহির তাঁহার গ্রন্থে মহর্ষি অসিতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২) অসিত নামে আর একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। এই পরম জ্ঞানী অসিত হিমালয়ের পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। বুদ্ধদেবের জন্মের পরে, তিনি কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই নবজাত বালক কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন। (বাইবেলেও ঠিক অনুরূপ একটা ঘটনা পাওয়া যায়)। এই দুই অসিতই এক ব্যক্তি কিনা বলা সহজ নহে।

অসিধর ঠক্ক—কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের অন্যতম সেনাপতি। লোহরপতি কন্দর্প বিদ্রোহী হইলে, তাঁহার দমনার্থ হর্ষদেব অসিধর ঠক্ককে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি কন্দর্পের হস্তে পরাজিত হন।

অস্পবর্ম্মা—তিনি পাঞ্জাবের দ্বিতীয় অয় নরপতির অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় অয় নরপতি দেখ।

অহল্যা বাঈ—তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বলিবার পূর্ব্বে, যে রাজ্যের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার শ্বশুর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই আখ্যান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সেজন্য সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল। যে মহাত্মা হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তিনি জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়। এই জাতির নাম তাঁহার দেশ হইতে উদ্ভূত। মহারাষ্ট্র দেশের উত্তর সীমা সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণী ও নর্ম্মদা নদী, পশ্চিম সীমা আরব সাগর, দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণা নদী এবং ইহার পূর্ব্ব সীমা গোণ্ডবন ও তেলঙ্গন প্রদেশ। এই পর্ব্বত সঙ্কুল প্রদেশে বাস করিয়া এই জাতি শৌর্য্য-বীর্য্যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অনেক মহামনা নরনারী এই জাতিতে পূর্ব্বকাল হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেও মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর সময়েই ইহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহারাষ্ট্র জাতিকে চলিত কথায় মারাঠা বলে। মহাত্মা শিবাজী এই জাতীর মধ্যে যে নূতন স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন করেন, তাহার ফলে এই জাতির মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ বীর-পুরুষ জন্মলাভ করেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দু জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা শিবাজীর প্রাদুর্ভাব হয়। শিবাজী যেমন অতি সামান্য অবস্থা হইতে এক বিশাল হিন্দুরাজ্যের পত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ আরও অনেকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে এক একটী প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের বর্ণিত সাধ্বী অহল্যাবাঈএর শ্বশুর মহলার রাও অন্যতম। তিনি ১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে এক পশুপালকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা খণ্ডুজা পুনা নগর হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে হোল নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেন। মারাঠারা অনেকে স্বীয় নামের সঙ্গে গ্রামের নাম যোগ করিয়া থাকেন। কার শব্দের অর্থ অধিবাসী। হোল নামক গ্রামের অধিবাসী হোলকার, সেইরূপ পাটন-কার, নগরকার, নিম্বলকার প্রভৃতি। খণ্ডুজীর বংশধরেরা সেইজন্য তাঁহাদের আদি বাসস্থান হোল নামক গ্রামের নামানুসারে হোলকার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মহলার রাও পাঁচ বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা জ্ঞাতিগণের অসদ্ব্যবহারের জন্য, শ্বশুর-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা নারায়ণজীর আশ্রয়ে আগমন করেন। নারায়ণজী একজন মারাঠা সামন্তের অধীনে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈনি-কের অধিনায়ক ছিলেন। মহলার রাও প্রথমে পশুচারণেই নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। পরে মাতুলের অধীনে অশ্বা-রোহী সৈনিক হইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দৈবজ্ঞ তাঁহার মাতুলকে বলিয়া-ছিলেন যে, মহলার রাও কালে একজন বড়লোক হইবেন। এক একটী সামান্য ঘটনা হইতে, এক এক জন লোকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

এই দৈবজ্ঞের বাণী শ্রবণ হইতে তাঁহার মনেও উচ্চাকাঙ্খা প্রবল হইল। মাতুলের সৈনিক দলে প্রবেশ করিয়া, তিনি প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে বল, সাহস, শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া, উন্নতি লাভ করা কঠিন ছিল না। মাতুলও ভাগিনেয়কে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে লাগিলেন। একটী যুদ্ধে প্রসিদ্ধ নিজাম-উল-মুল্কের এক সেনাপতিকে নিহত করিয়া, বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। মাতুল স্বীয় কন্যা গৌতমা বাঈকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। এইরূপে তিনি কখনও সাহস, কখনও শৌর্য্য, কখনও রণচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া উত্তরোত্তর আপন সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহসের ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া পেশোয়া বাজীরাও তাঁহাকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার বীরত্বে ও কার্য্যকৌশলে পেশোয়ার পরম শত্রু নিজাম আলী পরাজিত ও কঙ্কন প্রদেশ পর্ত্তুগিজ দস্যুদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল। পেশোয়া এই উপযুক্ত বীরকে নর্ম্মদার উত্তরকূলস্থ দ্বাদশটী জিলা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়া, তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন (১৭২৮ খ্রীঃ)। কেবল তাহাই নহে তাঁহার কার্য্যে ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ১৭৩১ সালে আরও সত্তরটী (৭০) জিলা সেই জায়গীরের সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন। মালবদেশ মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তিনি তাহা জয় করিয়া মারাঠা রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। পেশোয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালবের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও ইন্দোর প্রদেশ জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন। তদবধি ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে দিল্লীর মোগল রাজত্ব টলটলায়মান মোগল সম্রাট অর্থদানে মহারাঠাদের সাহায্য প্রার্থী। মোগল পক্ষে রোহিলা দিগকে কি কৌশলে মহলার রাও পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। মোগল সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া চান্দোর প্রদেশ তাঁহাকে দিতে চাহিলেও স্বীয় প্রভু পেশোয়ার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। এই প্রকার বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সেনাপতি মহলার রাওকে পেশোয়ার সেনাপতি সদাশিব রাও অপমানিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাহার ফলে পাণিপথ যুদ্ধে মহারাঠা শক্তির পরাজয়। এই যুদ্ধে হোলকারের তত ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু অপর সমস্ত মহারাঠা সামন্তদের বিশেষ ক্ষতি হইয়া-

ছিল। ইহার পরিণাম এই হইল যে, সদাশিব রাওএর উদ্ধত ব্যবহারে সকলেরই মনে পেশোয়ার প্রতি অনুরাগ হ্রাস পাইল। মহলার রাও তখন সমস্ত বিছিন্ন শক্তির মধ্যে প্রধান ছিলেন।

অহল্যা বাঈ এই ইন্দোরের হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহ্লার রাওয়ের পুত্রবধূ এবং খণ্ডে রাওয়ের মহিষী ছিলেন। মালব দেশের অন্তর্গত আধুনিক আহাম্মদনগর জিলার পাথরডী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দে অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। অহল্যার পিতা আনন্দরাও সিন্ধে, অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ভালবাসিতেন। অহল্যা বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবন্ধুর নিকট কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নবম বৎসর বয়সের সময় মহ্লার রাও ও তাঁহার পুত্র খণ্ডেরাও গুজরাটের ও মালবের বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে, পাথরডী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহ্লার রাও অহল্যাকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধা করেন। অহল্যা রূপসী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার মুখের লাবণ্য ও জ্যোতি অতি মনোমুগ্ধকর ছিল। বিবাহের পর অহল্যা নিজ চরিত্রমাধুর্য্যে এবং সেবাপরায়ণতাদ্বারা অতি প্রচণ্ডস্বভাব শ্বশুর মহ্লার রাও ও তেজস্বিনী শাশুড়ী গৌতমা বাঈ উভয়েরই হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

অহল্যাবাঈ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং রাত্রি প্রহারাতীতে বিশ্রাম করিবার জন্য গমন করিতেন। গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবতী ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তিনি, অম্বাদাস পৌরাণিক নামক একজন সদাচারশীল ব্রাহ্মণের নিকট, দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী ও পতির চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া গার্হস্থ্যজীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুখের জীবনে দুঃখের ছায়া পতিত হইল। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভেরী নামক দুর্গ অবরোধ কালে খণ্ডেরাও নিহত হইলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে মালে রাও নামক এক পুত্র ও মুক্তাবাই নাম্নী এক কন্যা লইয়া তিনি বিধবা হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি চিতারোহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু শ্বশুরের অত্যন্ত অনুরোধে সে সঙ্কল্পও তাঁহাকে পরি-

ত্যাগ করিতে হইল। শ্বশুরকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন ও ইষ্টদেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সংসারের ভার কতক গ্রহণ করিলে, পতিবিয়োগ দুঃখ কতক লাঘব হইবে মনে করিয়া, মহ্লার রাও তাঁহার হস্তে অনেক কার্য্যের ভার দিলেন। আয়, ব্যয় প্রভৃতির হিসাব, আশ্রিতগণের পালন, ভৃত্যাদির নিয়োগ, এক কথায় সংসারের আভ্যন্তরীণ সমুদয় কার্য্য, অহল্যার হস্তে অর্পিত হইল। অহল্যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের উপর মহ্লার রাওয়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পুত্রবধূর হস্তে আভ্যন্তরীণ সমুদয় কার্য্যের ভার দিয়া, তিনি সন্ধি, বিগ্রহ ও রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত রহিলেন। ক্রমে ক্রমে পুত্রবধূর কর্ম্ম কুশলতা ও মিতব্যয়িতা দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। এমন কি ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে গমনকালে, তিনি অহল্যার উপরই সমস্ত রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে মহ্লার রাও পরলোক গমন করিলে, খণ্ডেরাওয়ের পুত্র মালেরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় অকর্ম্মণ্য, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কুক্রিয়াম্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি এমন ধর্ম্মিষ্ঠা জননীকেও নানাপ্রকারে বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। গৃহে পুত্রের এই প্রকার ব্যবহার, বাহিরেও শত্রুর অভাব ছিল না। মহ্লার রাও পররাজ্য জয় করিয়া অনেক শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া শত্রুতাচরণে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উভয় সঙ্কট কালে বুদ্ধিমতী অহল্যাবাঈ রাজ্যশাসন কার্য্যে যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়া ছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সেইরূপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মালে রাও অল্পকাল মধ্যেই পরলোকগত হইলেন। তাঁহার দুই পত্নী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইলেন। শ্বশুর, স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার সংসার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে মহত্তর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাজকার্য্যের ভার এখন অহল্যার উপর আসিয়া পড়িল। তিনি অতি নিপুণতার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। স্বর্গীয় মহ্লার রাওয়ের গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে একজন কূটনীতিবিশারদ স্বার্থপর ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গোপনে অহল্যাকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া অপসারিত করিতে ও একটী শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে অভিলাষী হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি মাধব রাও পেশোয়ার খুল্লতাত রঘুনাথ রাওকে, ইন্দোর আক্রমণ করিতে উত্তে-

জ্জিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুকার্য্যের বিষয় অহল্যার বিশ্বস্ত অনুচর শিবাজী গোপাল ও রাওজী মহাদেব অবগত হইয়া, হরকুবাঈ ও উদাবাঈ নাম্নী অহল্যার দুই ননন্দার দ্বারা অহল্যাকে জ্ঞাত করাইলেন। অহল্যা বিপদ সংবাদে অভিভূত হইলেন না। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত ইহা গোপন রাখিয়া, অতিশয় সংগোপনে গায়কওয়ার, জন্থুজী ভোঁসলে ও সেনাপতি দাভারে প্রভৃতিকে এই বিপদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তুকোজী রাওকে উদয়পুর হইতে শীঘ্র আসিতে লিখিলেন। তুকোজী পত্র পাঠ মাত্র অতিসত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহল্যাবাই স্বয়ং মাধব রাও পেশোয়া ও তাঁহার পত্নী রমা বাইকে সমস্ত জানাইলেন। মাধব রাও তাঁহাকে লিখিলেন যে, তাঁহার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য, তিনি যেন আততায়ীকে শাস্তি দিতে কিছুমাত্র ভীত না হন। রঘুনাথ রাও এবং গঙ্গাধর যশোবন্ত শিপ্রা নদীর তীরে সসৈন্যে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপার যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তত সহজ নহে। অগত্যা তাঁহারা তাঁহাদের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সাধুর বেশ অবলম্বন করিয়া, অহল্যার আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক একমাস কাল অবস্থান করিলেন। অহল্যার ব্যবহারে অতিমাত্র প্রীত হইয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্তকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন কিন্তু গঙ্গাধর নিজের আচরণ ও অহল্যার সাধু ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এইরূপ একটী ভীষণ ষড়যন্ত্রের তিনি মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই তিনি মহ্লার রাওয়ের নিকট আত্মীয়, তুকোজী রাও হোলকারকে, রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া অভিষেক করিলেন। তাঁহার উপর যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভার সমর্পিত হইল। আভ্যন্তরীণ সমস্ত কার্য্য তিনি নিজ হস্তে রাখিলেন। প্রজাদের অভিযোগ তিনি নিজে সমস্ত শুনিয়া ন্যায়ানুসারে বিচার করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারে সকলেই অতিশয় প্রীত হইত। রাজ্যের কোনও কর্ম্মচারী, তিনি যত বড় কর্ম্মচারীই হউন না কেন, প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া অহল্যার নিকট নিষ্কৃতি পাইতেন না। একবার এক নিঃসন্তান বণিকের পত্নী এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে পর, তাহার নাম জারির জন্য রাজকর্ম্মচারী তিন লক্ষ টাকা ঘুস চাহিলেন এবং না দিলে পোষ্যপুত্রকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। বণিক-

পত্নী মহারাণী অহল্যার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া বণিক পত্নীর কথা যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই উৎপীড়ক কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। বণিক পত্নীর পোষ্যপুত্রকে উপহারাদি দিয়া বিদায় করিলেন। এইরূপ ন্যায় বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিতা রাণী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন খুব কোমল প্রকৃতির ছিলেন অন্যদিকে তেমনি কঠোর প্রকৃতিরও ছিলেন। দুর্দ্দান্ত ভীলেরা তাঁহার রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলে, তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে কোমল ব্যবহারে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইহাতে কার্য্য না হওয়ায়, তিনি অতি কঠোর হস্তে তাঁহাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। কতকগুলি দস্যু ভীলসর্দ্দারকে নিহত করিয়া ও তাঁহাদের গ্রাম পুড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন। মহলার রাও মৃত্যুকালে ১৬ ষোল কোটী টাকা নগদ ও ৭০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। অহল্যার সময়ে রাজ্যের আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না বলিয়া, অর্থ যথেষ্ট সঞ্চিত হইতেছিল। অহল্যাবাই এই বিপুল অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও গয়ার বিষ্ণু মন্দির তাঁহারই বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের এমন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নাই যেখানে অহল্যার কোন সৎকীর্ত্তি বর্ত্তমান নাই। কোথাও রাস্তা, কোথাও জলাশয়, কোথাও যাত্রীনিবাস প্রভৃতি কোনও না কোন সদনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে। এই পুণ্যবতী মহিলার সাংসারিক জীবন বড়ই দুঃখের ছিল। তাঁহার কন্যা মুক্তাবাইয়ের একটী পুত্রকে নিকটে রাখিয়া তিনি প্রতিপালন করিতেন। এই দৌহিত্রটি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। ইহার কিছু দিন পর জামাতাও পরলোক গমন করেন। কন্যা তাঁহার সহিত সহমৃতা হইলেন। এই সকল দুঃখে তিনি অতিশয় অভিভূতা হইলেন। কন্যা ও জামাতার চিতাভস্মের উপর একটী উৎকৃষ্ট স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল মানুষের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন তাহা নহে। মৎস্যের আহারের জন্য জলে গম ও অন্যান্য খাদ্য বস্তু নিক্ষেপ করিতেন। পক্ষীদের আহারের জন্য শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র রক্ষা করিতেন। এই পুণ্যবতী মহারাণীর পুণ্যময় জীবন ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ৬০ বৎসর বয়সে অবসান হয়। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পুণ্যময় জীবনের সৌরভ রহিয়াছে।

আ

আইজদ্দিন—দিল্লীর মুঘল সম্রাট জাহান্দর শাহের (১৭১২-১৩ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফেরোকশিয়ারের পক্ষাবলম্বী সৈয়দ হুসেন খাঁর সৈন্যকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলেই জাহান্দর শাহ রাজ্যচ্যুত হইয়া নিহত হন।

আইতসিঙ্গ—একজন চীন পর্য্যটক। শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তীর্থপর্য্যটন মানসে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার জন্মকাল ৬৩৫ খ্রীঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক হিউএন্‌থ সঙ্গ এবং ফা হিয়ানের পরেই আইতসিঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং ৬৭১খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাম্রলিপ্তিতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ভারতের নানাস্থানের তীর্থপর্য্যটনে বহু কষ্ট স্বীকার ও পার্ব্বত্য দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নালন্দায় উপস্থিত হন। এই স্থানে শাস্ত্রানুশীলনে যাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে ন্যূনাধিক চারিশত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। আইতসিঙ্গের প্রায় সমস্ত জীবন অধ্যয়ন, তীর্থ-পর্য্যটন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ভাবে স্বধর্ম্মের সেবায় আকৈশোর নিরত থাকিয়া তিনি ঊনাশী বৎসর বয়সে ৭১২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। আইতসিঙ্গের গ্রন্থসমূদয়ে ভারতের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিষয়ে তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আইন-উল-মুল্‌ক (খাজা)—দিল্লীর তোগলক বংশীয় সম্রাট সুলতান মহম্মদ শাহ তোগলক ও সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্ব কালের 'ফতেমা' নামক গ্রন্থ (১২৯৬—১৩১৫ খ্রীঃ) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আই নাথ—নাথপন্থী সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর হইতে যোগিগণ এবং একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাযোগী প্রধান পুত্র। তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ। আইনাথ 'আইনাথ রুদ্রকুল' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

আউটরাম সার জেমস্, (Sir James Outram)—ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে জানুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশায়ারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বেঞ্জামিন আউটরাম। এবারডিন্ নগরের মেরিস্কেল কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে, ১৮১৯ সালে তিনি ভারতীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন এবং ১৮২০ সালে বোম্বাই নগরের দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের লেপ্টেনেণ্ট ও এডজুটেণ্ট পদ লাভ করেন। কিছুদিন তিনি খান্দেসে অবস্থান করিয়া ভিল সৈন্যদলের শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। ১৮২৫—৩৮ সাল পর্য্যন্ত গুজরাটে অবস্থান করিয়া তথাকায় বিদ্রোহী রাজাদের দমন করিয়াছিলেন। তৎপরে কিছুদিন মাহিকান্ত নামক স্থানে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। ১৮৩৮ সালের শেষ ভাগে সার জন কিনের (Sir John Keane) সঙ্গে কান্দাহার ও কাবুল অভিযানে গমন করেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যখন দোস্ত মোহাম্মদ পলায়ন করেন, তখন তিনি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। (১৮৩৯) আফগানিস্থানের দক্ষিণ ভাগের যুদ্ধেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দরাবাদের পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সমস্ত সিন্ধুদেশের পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। তথাকার আমীরদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। সেজন্য সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা সম্বন্ধে লর্ড এলেনবরার সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হয়। তিনি সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমন কি আমীরদের স্বার্থরক্ষার্থ ইংলণ্ডেও তিনি যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে বরোদা রাজ্যে রেসিডেণ্ট ছিলেন। অযোধ্যা রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীনে আসিলে তিনিই প্রথম তাহার কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৫৬--৫৭ সালে পারস্য দেশের যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হইয়া গমন করেন এবং তথায় জয়লাভ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময়েও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৫৮—৬০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সমর বিভাগের মন্ত্রণা সভার সভ্য ছিলেন। তৎপরে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি সাহসী, বীর, সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন।

আউল চাঁদ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। ১৬১৬ শকের স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটী অষ্টমবর্ষীয় অনাথ

বালককে প্রাপ্ত হয়। সে এই বালককে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করে এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখে। মহাদেবের গৃহে বার বৎসর অবস্থানের পর পূর্ণচন্দ্র দুই বৎসর এক গন্ধবণিকের গৃহে, দেড় বৎসর কোনও ভূস্বামীর গৃহে এবং পরে আরও দেড়বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে যাপন করেন। এই প্রকারে ২৭ বৎসর অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নদীয়া জেলার বেজারা গ্রামে আগমন করেন। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তৎপরে রামশরণ পাল নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার মত প্রচারে ব্রতী হন। (১) হটু ঘোষ, (২) বেচু ঘোষ, (৩) শ্যাম বৈরাগী, (৪) হরি ঘোষ, (৫) কানাই ঘোষ, (৬) রাম শরণ পাল, (৭) ভীম রায় রাজপুত, (৮) নয়ন, (৯) লক্ষ্মীকান্ত, (১০) নিত্যানন্দ দাস, (১১) খেলারাম দাস, (১২) কৃষ্ণদাস, (১৩) শঙ্কর, (১৪) নিতাই ঘোষ, (১৫) আনন্দ রাম, (১৬) মনোহর দাস, (১৭) বিষ্ণুদাস, (১৮) কিনু, (১৯) গোবিন্দ, (২০) পাচু রুই দাস, (২১) নিধিরাম ঘোষ, (২২) শিশু রাম, এই বাইশ জন আউল চাঁদের প্রথম শিষ্য। পূর্ণচন্দ্র আউলচাঁদ নাম গ্রহণ করিয়া কর্ত্তাভজা দলের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। যদিও এক্ষণে বহু ভদ্রসন্তান এই সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম শিষ্যদের নাম দৃষ্টে বোধ হয় যে ইহা প্রথমতঃ সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোক দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল। ১৬৯১ শকে (১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে) আউলচাঁদ পরলোক গমন করেন। চক্রদহের প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে পারারি নামক স্থানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই শিষ্য করিতেন। তিনি জাতি ভেদ মানিতেন না। তাঁহাদের শিষ্যদের মধ্যে রামশরণ পালের সম্প্রদায়ই প্রধান। তাঁহার পিতা-মাতা ও জাতির পরিচয় অজ্ঞাত।

আওরঙ্গজীব—ভারতের মমুঘল রাজবংশের ৬ষ্ঠ সম্রাট। তিনি সম্রাট শাজাহানের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম মহী-উদ্‌দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজীব। পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আলম্‌-গীর (ভুবন বিজয়ী) এই উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি তজ্জন্য ১ম আলম্‌-গীর নামেও কথিত হইয়া থাকেন। খ্রীঃ ১৬১৮ সনে (১০২৭ হিজরী) তিনি বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পাচ. মহল জিলাস্থিত দোহাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আওরঙ্গজীবের জন্মের কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা খুরম্ (পরে সম্রাট শ-জাহান, সম্রাট জাহাঙ্গীরের অসন্তোষ ভাজন হন। তজ্জন্য অতি অল্পবয়স

হইতেই আওরঙ্গজীবের পিতা, নিজ কার্য্যের জামীনস্বরূপ দুই পুত্র, দারা ও আওরঙ্গজীবকে নিজ পিতা জাহাঙ্গীরের নিকট রাখিতে বাধ্য হন। জাহাঙ্গীর পৌত্রদ্বয়ের লাহোরে বাস করিবার ব্যবস্থা করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় আগ্রাতে পিতার নিকট আনীত হন। আগ্রাতে শা-জাহান পুত্রগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আওরঙ্গজীব অতি বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণধী, পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। আরবী ও ফারশী এই দুই ভাষায় তিনি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ইসলামী ধর্ম্মগ্রন্থ কুরান ও হদিস প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তদ্ভিন্ন তিনি উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষারও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। আরবী অক্ষর লিখিবার কোনও কোনও প্রণালীতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিত কলায় তাঁহার আদৌ আকর্ষণ ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কোনও প্রসিদ্ধ মুঘল সম্রাটদিগের ন্যায়, বহু অর্থব্যয়ে মনোরম হর্ম্ম্য, সমাধিমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন না। রাজোচিত শৌর্য্য-বীর্য্যেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। মাত্র পনর বৎসর বয়সেই আগ্রার প্রসিদ্ধ দুর্গপ্রাঙ্গনে, হস্তিযুদ্ধের সময়ে, অসীম সাহসে এক মত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইয়া তিনি সকলের প্রশংসা লাভ করিয়া পিতার বিশেষ স্নেহভাজন হন। ষোড়শবর্ষ বয়সে শা-জাহান তাঁহাকে দশহাজারী মনসব্দারের সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেন।

পিতার জীবিতকালেই আওরঙ্গজীব একাধিক স্থানে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত থাকিয়া, রাজনীতিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন। তাহাদের মধ্যে ১৬৩৫ খ্রীঃ অব্দের বুন্দেলা সংঘর্ষ এবং ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধিত্বই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় হইতেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকে কিন্তু বিস্তৃত ও দৃঢ়ভাবে মুঘল শাসন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রভুত্ব নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। সম্রাট শা-জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাপথে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তৎফলে দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি পাঠান রাজ্যগুলি সহিত মুঘলবাহিনীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দাক্ষিণাত্যে মুঘলপ্রাধান্য স্থাপিত হইলে

শা-জাহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজীবকে দাক্ষিণাত্যের পুনঃ বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। যে সামান্য কয়টি স্থানে তখনও মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আওরঙ্গজীব পরে সেই সকল স্থানে মুঘল বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। (এই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত নামগুলি দ্রষ্টব্য— আদিল শাহ, মালিক অম্বর; কুতব্ শাহ; শাহজী ভোঁসলে ও নাজিম শাহ)। আওরঙ্গজী। নিজ ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির উপর যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। পিতা শা-জাহান, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শেকোকে অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন বলিয়া আওরঙ্গজীব অসন্তুষ্ট ছিলেন। নিজ মনোভাব পিতার নিকট জ্ঞাপন করিলে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজীবকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরে কন্যা জাহানারার অনুরোধে তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় (১৬৩৫ খ্রীঃ) গুর্জ্জর প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তথা হইতে তিনি মধ্য এশিয়া ও বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অন্তর্গত কোনও স্থানে বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন। অতি দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতীর বিরুদ্ধে মুঘলবাহিনীর ঐ অভিযান আদৌ সুবিধাজনক হয় নাই। আওরঙ্গজীব অশেষ শারীরিক কষ্ট সহ্য এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ সমরকৌশল প্রয়োগ করিয়া বিশেষ চেষ্টার পর তথায় মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কিয়ৎকাল সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে অবস্থান করেন। তৎপরে কান্দাহারের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হন। ঐ স্থানটি রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক কারণে মুঘল ও পারশীকদিগের লোভের বস্তু ছিল। কিন্তু ভারতীয় মুঘলবাহিনী একাধিকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহা অধিকার করিতে পারে নাই। কান্দাহার অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া আওরঙ্গজীব প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর সম্রাট তাঁহাকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকালব্যাপী অনাচার, অত্যাচার ও কুশাসনের ফলে দক্ষিণাপথের মুঘল শাসনাধীন প্রদেশগুলি দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। স্বভাবসুলভ কার্য্যক্ষমতার বলে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অনাবশ্যক ব্যয় সংকোচন, ন্যায্যমতে আয়-বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা-স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে মনোসংযোগ করিলেন। এই সকল কার্য্যে মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় আওরঙ্গজীব রাজস্ব সংগ্রহ ও তদানুষঙ্গিক বিষয়ের অতি সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। ঐ ব্যব-

স্থার ফলে রাজকোষে অর্থাগমও যেরূপ অধিক হইতে লাগিল, প্রজাদিগেরও নানারূপ সুবিধা লাভ হইল। সৈন্যরক্ষা, দুর্গাদি-নির্ম্মাণ অথবা তাহাদের সংস্কার সাধন প্রভৃতি বিষয়েও তিনি অতি সুবন্দোবস্ত করেন। বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে মুঘলশাসন দক্ষিণাপথে বিশেষ দৃঢ় ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পিতার সহিত নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। হয়ত সম্রাট তাঁহার কার্য্যকলাপে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না অথবা বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকের পরামর্শে তিনি পুত্রের কার্য্যাবলী সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। যে কারণেই হউক দাক্ষিণাত্যে থাকিবার সময়ে আওরঙ্গজীব নিজ কার্য্যকুশলতার দ্বারাও পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। ঐ সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের পাঠান রাজদিগের সহিত মুঘলদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। (কুতব্‌শাহ, মীর জুম্‌লা ও আদিল শাহ দ্রষ্টব্য) বিজাপুরের সহিত যে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহাতে বিজাপুরের বাস্তবিক কোনও দোষ ছিল না, বিজীগিষাই মুঘলদিগকে অকারণে বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করে। সেই যুদ্ধে আওরঙ্গজীব যখন প্রায় সমুদয় বিজাপুর রাজ্য জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখনই আগ্রাতে সম্রাট শা-জাহান পীড়িত হইয়া পড়েন। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া, আওরঙ্গজীব বিজাপুর জয়েচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুঘল ক্ষমতা তখনও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নাই। সন্ধির সর্ত্তানুসারে বিজিত রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে অর্থাদি লাভ হয় নাই। এমত অবস্থায় কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া আগ্রা গমন করিলে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ফল বিনষ্ট হইবে। অথচ আগ্রা গমন করিতে বিলম্ব করিলে সিংহাসন লাভের আশাও চিরতরে বিনষ্ট হইবে। এইরূপ দ্বিধার মধ্যে কিছুকাল থাকিয়া আওরঙ্গজীব আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিজিত প্রদেশগুলি ও অন্যান্য মুঘল অধিকৃত স্থানের শাসনাদির ভার যোগ্য পাত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। সম্রাট শা-জাহানের পীড়ার সংবাদ সমুদয় মুঘল সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং সম্রাট হয়ত বাস্তবিকই পরলোক গমন করিয়াছেন, এই অনুমান করিয়া শা-জাহানের মধ্যম পুত্র সুজা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুরাদ অপেক্ষাকৃত নিকটতর প্রদেশের (গুজরাট) শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিতই আওরঙ্গজীবের পত্র বিনিময় হয় এবং তাঁহারা এই সর্ত্তে আবদ্ধ হন যে, একযোগে অভিযান করিয়া তাঁহারা সিংহাসন অধিকার করিবেন। তৎপরে মুরাদ পঞ্জাব, আফগানিস্থান, সিন্ধু ও কাশ্মীর প্রদেশের স্বাধীন সম্রাট হইবেন এবং আওরঙ্গজীব অবশিষ্ট মুঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। এই ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে উভয় ভ্রাতা স্ব স্ব সেনাবাহিনীসহ উজ্জয়িনার সন্নিকটে মিলিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুরাদ ও আওরঙ্গজীবের সিংহাসন অধিকার করিবার প্রচেষ্টার কথা আগ্রাতে শা-জাহানের নিকট পৌছিয়াছিল। সম্রাট যশোবন্ত সিং নামক রাজপুত সেনানীকে বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উজ্জয়িনীর সন্নিকটে উভয় বাহিনীর ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। তাহাতে রাজকীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্থ হইলে ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানী অভিমুখে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মধ্যে দারা চম্বল নদীর তীরে ভ্রাতৃদ্বয়ের বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের বুদ্ধিকৌশলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। আওরঙ্গজীব মুরাদসহ অচিরেই রাজধানীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হন। সেই স্থানে পুনরায় এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং দারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ও অর্থাদিসহ দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন। মুরাদ ও আওরঙ্গজীব কয়েকদিন রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ রক্ষার কোনও উপায় নাই বুঝিতে পারিয়া এবং আওরঙ্গজীবের নিকট তাঁহার সকল প্রকার অনুনয় ব্যর্থ হইল দেখিয়া, বৃদ্ধ সম্রাট শা-জাহান অনন্যোপায় হইয়া পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। আওরঙ্গজীব দুর্গ ও প্রাসাদ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ অসহায় পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ করিলেন। সম্রাট বন্দী হইবার কয়েকদিন পরে সম্রাট নন্দিনী জাহানারা আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য চারি ভ্রাতার মধ্যে সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া সম্রাটকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজীব জাহানারার প্রস্তাবে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। আগ্রার দুর্গ ও প্রাসাদে নিজ ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি মুরাদকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন এবং কিছুকাল পরে দারা এবং সুজাও আওরঙ্গজীবের বুদ্ধিকৌশলে তাঁহার

রাজ্যলাভেচ্ছায় বলিপ্রদত্ত হইলেন। (দারা, সুজা ও মুরাদ দ্রষ্টব্য)

রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ—

বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ এবং তিন সহোদর ভ্রাতাকে ইহলোক হইতে অপসারণ করিয়া আওরঙ্গজীব ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন। শা-জাহান যতদিন বন্দীদশায় ছিলেন, ততদিন আওরঙ্গজীব প্রধানতঃ দিল্লীতে থাকিয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। পিতার পরলোক গমনের পর তিনি আগ্রায় যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। রাজত্বের প্রথম অবস্থায়ই তিনি একবার ঘোরতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। কখনও কখনও তাঁহার প্রাণ সংশয়ও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অসুস্থতার সংবাদে পাছে রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য, তিনি অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয় দিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষণ-কালের জন্যও দরবারে উপস্থিত হইতেন। রাজকীয় পত্রাদি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এমন কি মধ্যে একাধিকবার শিবিকা-বাহিত হইয়া জুম্মার নমাজ পড়িবার জন্য মসজেদেও গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার এইরূপ অসাধারণ মনের বল, স্থিরচিত্ততা এবং ধৈর্য্যই ঐ সময়ে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইতে দেয় নাই। তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ (প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর) তিনি উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষার্দ্ধ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা ও অন্যান্য পাঠান রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহেই অতিবাহিত হয়। নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাঁহার রাজত্বের প্রথমার্দ্ধে সংঘটিত হয়। (১) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, মৃত দারা, সুজা অথবা মুরাদের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক একাধিক ব্যক্তি বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। আওরঙ্গজীব ক্ষিপ্র হস্তে সেই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। (২) মধ্য ভারতের অন্তর্গত মাহেবা রাজ্যের সর্দ্দার চম্পতরাও পূর্ব্ব বর্ণিত যশোবন্ত রাওএর সহিত যুদ্ধকালে আওরঙ্গজীবের পক্ষে ছিলেন। পরে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজরাজ্যে গমন করিয়া নানা-রূপে স্বেচ্ছাচার করিতে থাকেন। ১৬-৫৯ খ্রীঃ অব্দে রাজা দেবসিং বুন্দেলার অধিনায়কত্বে এক রাজবাহিনী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। চম্পতরাও পরাস্ত হইয়া ধৃত হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। (৩) ছোটনাগপুরের প্রান্তবর্ত্তী পালামৌ নামক স্থানে দ্রাবিড় বংশীয় চেরো জাতি বাস করিত। চেরোরাজ সম্রাট শা-জাহানের রাজত্বকালে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর-প্রদান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অর্থা-

ভাবে নিয়মমত সময়ে কর দিতে অসমর্থ হওয়ায়, আওরঙ্গজীবের আদেশে বিহারের শাসনকর্ত্তা দাউদ খাঁ চেরো রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। (১৬৬১ খ্রীঃ)। (৪) কথিওআড়েও এক সামন্ত-রাজের সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, মুঘলবাহিনী শান্তি স্থাপন করিবার জন্য প্রেরিত হয় এবং বিদ্রোহীরা দমিত হয়। (১৬৬৩ খ্রীঃ)। (৫) মীরজুমলার অধিনায়কত্বে এক বিশাল বাহিনী আসামে অভিযান করে এবং কুচবিহার কামরূপ প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে। আহোম জাতি মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিলে উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। কিন্তু কতিপয় বৎসরের মধ্যেই আহোমরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুঘল প্রভুত্ব উত্তর আসামে প্রভুত হ্রাস পায়। কুচবিহারের রাজাও সুযোগ বুঝিয়া মুঘলসৈন্য রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে ১৬৬ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খাঁ পুনরায় কুচবিহারে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপন করেন। (৬) চাঁটগাঁর ফিরিঙ্গি ও মগ জলদস্যুরা বহুপূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। সম্রাট জাহানগীর ও শা-জাহানের রাজত্বকালে ইহারা সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল জলদস্যুদের অত্যাচারে লোকের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে প্রথমে মীরজুমলা ও পরে শায়েস্তা খাঁ এই মগ ও ফিরিঙ্গি উৎপাত দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। শায়েস্তা খাঁ বিশেষ দক্ষতার সহিত এবং বিস্তৃত ও গোপন বন্দোবস্তের দ্বারা মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুগণকে দমন করিয়া ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে চাঁটগাঁ অধিকার করেন। (বিস্তৃত বিবরণ শায়েস্তা খাঁ নামে দ্রঃ)। (৭ সম্রাট আকবরের সময় হইতে সীমান্ত প্রদেশান্তর্গতঃ পাঠানদিগকে মুঘল অধিকারে আনয়ন করিবার চেষ্টা হইতেছিল। আওরঙ্গজীবের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জন মুঘল সম্রাট এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও বিশেষ ফল লাভ করেন নাই। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়ারের সন্নিকটে ইয়ুসুফ-জাই পাঠানরা বিদ্রোহী হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া মুঘল প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপিত হয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে, ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে আফ্রিদি পাঠানেরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহদমন করিতে সম্রাটকে বিশেষ কষ্টস্বীকার করিতে হয়। মহব্বত খাঁ, সুজায়েত খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুঘল সেনানায়কদের চেষ্টাতেও বিশেষ ফললাভ না হওয়ায় ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের সম্রাট স্বয়ং তথায় গমন করেন। তিনি আবশ্যক মত যুদ্ধ করিয়া, এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।

বৎসরাধিক কাল তথায় অবস্থান করিয়া আওরঙ্গজীব দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে মীর খাঁ (আমির খাঁ) মুঘল অধিকৃত আফ-গানিস্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। (৮) ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে মথুরার নিকটস্থ জাঠেরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহের মূল কারণ ধর্ম্ম স্বাধী-নতায় হস্তক্ষেপ। জাঠ নেতা গোফলা মুঘল সেনাপতি হাসান আলি খাঁর হস্তে পরাজিত হইলে এই বিদ্রোহ প্রশ-মিত হয়। (৯) ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সন্নিকটে সৎনামী সম্প্রদায়ের সহিত মুঘল-সৈন্যের কতিপয় সংঘর্ষ হয়। অতি সামান্য কারণ হইতে কলহ বৃদ্ধি পাইয়া বিস্তৃত বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য পরিশেষে সৎনামী সম্প্রদায় রাজ সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয়। (১০) ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে মাডবার পতি যশোবন্তের মৃত্যু হইলে আওরঙ্গজীব তাঁহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। প্রথমে সম্রাটের চেষ্টা ফলবতী হইলেও মাড়বার পরে স্বাধীনতা লাভ করে। (অজিত সিংহ ও দুর্গাদাস দেখ।) রাজস্থানের অপর প্রসিদ্ধ রাজা মেবারও মুঘল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন ও অন্যান্য কতিপয় কারণে মেবারের সহিত মুঘলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষে আওরঙ্গজীবের অন্যতম পুত্র আকবর একজন সেনানী ছিলেন। কিন্তু তিনি পরে পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায় মেবারে মুঘল প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। উভয় পক্ষই মাঝামাঝি সর্ত্তে আবদ্ধ হইলে মেবারে শান্তি স্থাপিত হয়। (রাজ-সিংহ ও আকবর দেখ)।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজীব।

পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের ব্যবস্থা খানিকটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া আগ্রা যাত্রা করেন। পরে দীর্ঘকাল আর তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পরে নানা কারণে আবার তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের বিজা-পুর গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। গোল-কুণ্ডা-পতি কুতব্ শাহের সহিত মারাঠা -নেতা শিবাজীর অত্যধিক ঘনিষ্ঠতাই আওরঙ্গজীবকে এ বিষয়ে সচেতন করে। ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে মুঘল বাহিনী গোল-কুণ্ডায় অভিযান করে। প্রথমে সাহজাদা শা আলম কুতব্ শাহকে পরাস্ত করিয়া গোলকুণ্ডা নগরী অধিকার করিলে ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং গোলকুণ্ডার প্রসিদ্ধ দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টাতেও তিনি সম্মুখসমরে দুর্গ অধি-

কার করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে আবদুল গণি, (নামান্তর সর্দার খাঁ) নামক কুতব্ শাহের একজন বিশ্বাসঘাতক অনুচর নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় গুপ্তদ্বার দিয়া মুঘল সৈন্যকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয়। এই ভাবে সুদীর্ঘকাল পরে গোলকুণ্ডার প্রসিদ্ধ দুর্গ মুঘল করতলগত হইলে গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যযুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের অপর প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজ্য বিজাপুরও আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। গোলকুণ্ডার ন্যায় বিজাপুর অধিকার করিতেও সম্রাটকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। একাধিক মুঘল সেনাপতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে সম্রাট স্বয়ং সেনা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে বিজাপুর রাজ্যে মুঘল বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এ ব্যাপারে বিংশতি বর্ষের অধিককাল সময়ক্ষেপ হয়। এবং জয়সিংহ, দিলীর খাঁ, রাজকুমার আজম প্রভৃতি মুঘল সেনানায়কগণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শিখদিগের সহিত সংঘর্ষ।

গুরু তেগ্ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ এই দুইজন শিখ গুরুর সহিত আওরঙ্গজীবের সংঘর্ষ হয়। গুরু তেগ্‌বাহাদুরকে আওরঙ্গজীব বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। তিনি ইস্লাম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া বধ করা হয় গুরু তেগ্ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র গুরু গোবিন্দকে দমন করিবার জন্য আওরঙ্গজীবকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সম্রাটের ঐ সকল চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। ঐ সময়ে শিখদিগের মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ অতিশয় বিস্তার লাভ করে। (গুরু গোবিন্দ দেখ)

আওরঙ্গজীব ও মহারাষ্ট্র সংঘর্ষ।

সম্রাট শা জাহানের জীবিতকালে আওরঙ্গজীব যখন দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন তখনই উদীয়মান মহারাষ্ট্র শক্তির সহিত তাঁহার একবার শক্তি পরীক্ষা হয়। তৎফলে শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে পরাস্ত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ মুঘল হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। (১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দ)। তৎপরে দীর্ঘকাল আর মহারাষ্ট্রদিগের সহিত আর মুঘলদিগের প্রত্যক্ষভাবে বিবাদ উপস্থিত হয় নাই। বিজাপুর রাজ্যের সহিত মুঘলদিগের মধ্যে মধ্যে সামান্য আকবরের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে (সম্রাট শা-জাহান পীড়িত হইবার অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে) মুঘল বাহিনী আবার বিজাপুর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের নেতা ছিলেন আওরঙ্গজীব। শিবাজীর অধিনায়কত্বে

মারাঠারা পাছে বিজাপুরের সুলতানকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য আওরঙ্গজীব পূর্ব্বেই শিবাজীকে প্রলোভন পূর্ণ কয়েকটি সর্ত্ত প্রদান করেন। কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বয়ং মুঘল অধিকারভুক্ত স্থানে লুট-তরাজ আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে আওরঙ্গজীবের বুদ্ধি কৌশলে তাঁহাকে কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বিজাপুরের সহিত মুঘলদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলে, সুচতুর শিবাজী পূর্ব্ব-কৃত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আওরঙ্গজীবের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই, পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজীব আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। তজ্জন্য মারাঠা-দিগের সহিত রাজশক্তির বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত হইতে পারিল না। সিংহাসন অধিকার করিবার অল্পকাল পরেই আওরঙ্গজীব (১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে) পুনরায় শায়েস্তা খাঁকে মারাঠাদমনে প্রেরণ করেন। মুঘল সেনাপতি প্রথমে পুনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অল্প কাল পরেই শিবাজী এক গুপ্ত নৈশ আক্রমণে শায়েস্তা খাঁকে বিশেষ বিপদ-গ্রস্ত করেন। সম্রাট তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া (১৬৬৩) শায়েস্তা খাঁকে বাঙ্গালা দেশে বদলী করিয়া পাঠান। ইহার কিছুকাল পরে শিবাজী কর্ত্তৃক সুরাট নগরী লুণ্ঠিত হয়। সম্রাট সেই সংবাদ পাইয়া অনুকম্পাবশতঃ তত্রস্থ ব্যবসায়ীদিগের খাজনা এক বৎসরের জন্য মাপ করেন এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদিগের খাজনা হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু শিবাজীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, লুট প্রভৃতিতে সম্রাট বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য জয়সিং নামক প্রসিদ্ধ রাজপুত সেনানীকে বহু সৈন্য-সহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। জয়-সিংহের বুদ্ধিকৌশলে ও রণচাতুর্য্যে প্রসিদ্ধ পুরন্দর দুর্গ মুঘল অধিকৃত হয় এবং মুঘলদিগের সহিত শিবাজীর এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির ফলে এবং জয়-সিংহের প্ররোচনায় ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে শিবাজি, বহু ইতস্ততের পর, আগ্রায় গমন করেন। আওরঙ্গজীব প্রকাশ্য দরবারে শিবাজীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাওদিগের মধ্যে বসিবার আজ্ঞা দিলেন। শিবাজী ইহাতে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আওরঙ্গজীব প্রকারান্তরে মারাঠা-পতিকে তাঁহার বাসভবনে বন্দীভাবে রাখিতে লাগিলেন। চতুর শিবাজী সব বিষয় অনুধাবন করিয়া অতি-কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া সেই বৎসরেরই প্রায় শেষ ভাগে রায়-গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (বিস্তৃত

বিবরণ শিবাজী নামে দ্রষ্টব্য)। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর কাল আওরঙ্গজীবের সহিত শিবাজীর আর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। রাজপুতসেনানী যশোবন্ত সিংহ, এবং অন্যতম সম্রাটপুত্র মুয়াজ্জিমের মধ্যস্থতায় আওরঙ্গজীব শিবাজীকে "রাজা" উপাধি ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজির অধিনায়কত্বে একটি মারাঠাবাহিনী আওরঙ্গাবাদে প্রেরিত হইল এবং তৎফলে শম্ভুজি পাঁচ হাজারী মনসব্দারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের সন্দেহপ্রবণ মন ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। শিবাজার সহিত তৎপুত্র মুয়াজ্জিমের সৌহার্দ্দ তাঁহার পক্ষে আশঙ্কার হেতু হইল। তিনি শিবাজীকে পুনরায় বন্দী করিতে অথবা অন্য কোনও উপায়ে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন অতিশয় অবিবেচনা বশতঃ সম্রাট বিরার প্রদেশে শিবাজীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন। একবৎসর পূর্ব্বে শিবাজী যখন আগ্রা গমন করেন, তখন তাঁহার পাথেয়স্বরূপ লক্ষমুদ্রা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। অপরিশোধিত ঋণ আদায় করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা দ্বারা শিবাজীকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সুযোগ দেওয়া হইল মাত্র। তিনি অনতিবিলম্বে মুঘল সীমানার মধ্যে লুট তরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে সম্রাটের পুত্র মুয়াজ্জেম আওরঙ্গাবাদে সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে কাজ করিতে ছিলেন। তাঁহার সহিত মুঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। শিবাজী এই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়বার সুরাট নগরী লুণ্ঠন করেন। এই ভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে সুরাট নগরী দুইবার লুণ্ঠিত হওয়ায়, ব্যবসা ও বাণিজ্যের অতিশয় ক্ষতি হইতে লাগিল। কোনও বিশিষ্ট বণিকই আর ঐ নগরীকে, ব্যবসার নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তৎফলে রাজস্বেরও প্রভূত ক্ষতি হইতে লাগিল। ইহার পরে শিবাজী স্বয়ং অথবা অন্যান্য মারাঠা সেনাপতিরা মুঘল রাজ্যসীমার নানা স্থানের দুর্গাদি অধিকার ও লুট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবস্থা ক্রমশঃই শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সম্রাট ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দে মহবৎ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে মারাঠাদমন কার্য্যে প্রেরণ করিলেন এবং মহাবৎ খাঁর কাজ খুব সন্তোষজনক বোধ না হওয়াতে অল্পকাল পরে দিলীর খাঁ ও বাহাদুর খাঁ নামক অপর দুই জন সেনাপতিও প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা মারাঠা-

অধিকৃত কোনও কোনও দুর্গ পুনরধিকার করিলেও মুঘল প্রভুত্ব তাহাতে বিশেষ বিস্তার লাভ করিল না। এই ভাবে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দাক্ষিণাত্যে মুঘল ও মারাঠাতে বল পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কখনও মারাঠারা সাময়িক ভাবে পরাস্ত হইল, কখনও বা মুঘল বাহিনী পর্য্যদুস্ত হইল। বাহাদুর খাঁ, দিলীর খাঁ, রণমস্ত খাঁ ও আরও অনেক মুঘল সেনাপতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে শিবাজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মুঘল মারাঠা সংগ্রামে কাহারও পক্ষে জয় পরাজয় মীমাংসিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠারা মুঘল শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিতে ত্রুটি করে নাই। তদুপরি আওরঙ্গজীবের পুত্র আকবর মারাঠা ও রাজপুতদিগের সহায়তায় পিতৃসিংহাসন অধিকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। একাধারে এই সব নানারূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় সম্রাট স্বয়ং ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গাবাদে যাইয়া উপস্থিত হন। ঐ সময় হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যেই ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে তিনি স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র শম্ভুজীও মুঘলশক্তিকে শান্তি লাভ করিতে দেন নাই। দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া একাধিক সেনাপতির অধীনে বৃহৎ বাহিনী বিভিন্ন দিকে প্রেরণপূর্বক সম্রাট মারাঠাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। পরে তাহার রাজনীতিক কৌশলে তাঁহার পুত্র আকবর মারাঠাদিগের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে শম্ভুজীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদিকে শম্ভুজীও নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ স্বীয় পক্ষীয় লোকদের বিরাগভাজন হইতে ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি পর্টুগিজদিগের সহিতও শত্রুতা সাধন করিতে আরম্ভ করাতে তাহাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই সকল ঘটনা পরস্পরার সুযোগ পাইয়া সম্রাট পুনরায় মারাঠা দলনে উদ্যোগী হইলেন। এইবার কেবল সেনাপতিদিগকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। স্বয়ংও অভিযান করিয়া ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে বিজাপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শম্ভুজীর অবিবেচনাযুক্ত কাজের জন্য ক্রমশঃ তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬৮৯ খ্রীঃঅব্দে মুঘল সেনাপতি শেখ নিজাম (নামান্তর মুকারাব খাঁ) শম্ভূজীকে আক্রমণ করিয়া মারাঠাপতিকে বন্দী করিলেন। তাহার অন্ন

কয়েক দিন পরেই সানুচর বন্দী শম্ভুজী রাজসকাশে নীত হইলে আওরঙ্গজীবের আদেশে তাঁহাদের প্রতি অতিশয় অপমান সূচক ব্যবহার করা হয় এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হয়।(মার্চ্চ-১৬৮৯)। কিন্তু ইহাতেও মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল না। শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রামকে নেতা করিয়া মারাঠারা পুনরায় মুঘলদিগের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা অল্পকাল স্থায়ী হয় এবং তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুঘল সেনাপতি ইতিবাদ খাঁ রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিয়া শম্ভুজীর পুত্র শাহু ও অন্যান্য মারাঠা নেতা এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনয়ন করেন। শাহুকে রাজা উপাধি ও সাত হাজারী মনসব্‌দারের পদ প্রদান করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে প্রায় বন্দীভাবেই মুঘল তত্ত্বাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফল দর্শিল না। রাজারাম (শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), পলায়ন পূর্ব্বক জিঞ্জিতে গমন করেন এবং তথায় শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক পুনরায় মুঘল শক্তিকে যথাসাধ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য সেনানায়কগণ বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যাদিসহ মুঘল রাজ্যের একাধিক স্থানে লুটতরাজ, দুর্গাদি অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। শম্ভুজীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মারাঠা দুর্গ মুঘলদিগের অধিকারে আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই মারাঠারা আবার অধিকার করিয়া লইল। সম্রাট ঠিক এইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে শম্ভুজীকে বধ ও শাহুকে বন্দী করার ফলে মারাঠা শক্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুঘল সেনাপতিরা মারাঠাদিগের হস্তে পরাস্ত হইতে লাগিলেন এবং একই সময়ে একাধিক স্থানে সমভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিক্ষিপ্ত মারাঠাশক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করা সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। শিবাজী ও শম্ভুজীর অভাবে যে মারাঠারা আদৌ শক্তিহ্রাস হয় নাই, তাহা তিনি এইবার সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুঘল গৌরব দাক্ষিণাত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোনও উপায়ই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। মারাঠা সমস্যা পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। ঐ সময়ে দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করা একান্তই অযৌক্তিকর বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার পুত্র শাহ-আলমকে পশ্চিমোত্তর

প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বহির্ভারত হইতে শত্রুর আক্রমন বাধা দিবার ভার অর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া প্রণষ্ট মুঘল গৌরব উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাটের সকল চেষ্টাই প্রায় বিফল হইতে লাগিল। মারাঠাদিগের লুটতরাজের ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। মুঘলশক্তির দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া নানা স্থানে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। অবস্থা চতুর্দ্দিকেই অতিশয় জটিল হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে অনন্যোপায় হইয়া সম্রাট স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ঐ ভাবেই চলিয়াছিল। অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিশ্চিত মারাঠা শক্তির পশ্চাতে ধাবন করিতে করিতে মুঘল বাহিনী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাপতি দিগের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। খাদ্যাভাব ও ব্যবস্থার অভাবে অনেক স্থলে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাদি ব্যয় করিয়াও কোনও সুফল লাভ হইতেছিল না। কোনও কোনও স্থানে সাময়িকভাবে মুঘল শক্তি জয়লাভ করিলেও, অল্পকাল পরেই আবার সেইস্থান মারাঠাদিগের করতলগত হইতে লাগিল। এইভাবে জয় পরাজয় বিবর্ত্তনের ফলে যত প্রকার বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, অসুবিধা ঘটা স্বাভাবিক তাহার কোনওটিরই ক্রটী হইল না; অথচ সম্রাট নিরাশা হইবার পাত্র ছিলেন না। মারাঠাদলনরূপ মরীচিকার পশ্চাতে বৃথা দৌড়াদৌড়ি না করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব, তাঁহার নিকট উপস্থিত করাও অসম্ভব ছিল। সেই অষ্টাশীতি বর্ষ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের তখন কেবল এই সংকল্পই দৃঢ় ছিল "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" কিন্তু ভবিতব্যের বিধানে মন্ত্রের সাধন আর তাঁর জীবনে সম্ভব হইল না। ১৭০৫ খৃীঃ অব্দের শেষ ভাগে তাঁর জীবনের শেষ অভিযান ওয়াসিংগেরা অধিকার সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বোধ হয় প্রকৃতির বিধান অলঙ্ঘনীয় অনুভব করিয়া আহম্মদ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হন।

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজীব যে কয় বৎসর জীবিত থাকিয়া মারাঠাদলনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি ঘটিয়াছিল। ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে রাজারাম পলায়ন করিয়া জিঞ্জিতে উপস্থিত হন। ঐ বৎসর মুঘল সেনাপতি জুলফিকার খাঁ রায়গড় অধিকার করিয়া সানুচর শাহুকে বন্দী করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে মুঘল সেনাপতি রুস্তম খাঁ মারাঠাহস্তে বন্দী হন।

১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে অপর মুঘল সেনাপতি আলি মরদান খাঁ মারাঠা-সেনানী শান্তা ঘোরপারের হস্তে বন্দী হন। ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দ হইতে জুলফিকার খাঁ প্রভৃতি মুঘল সেনাপতিগণ জিঞ্জি অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং বিফল মনোরথ হইয়া প্রায় তিন বৎসর পরে সে প্রয়াস পরিত্যাগ করেন। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় জিঞ্জি অধিকারের চেষ্টা হয় এবং অনেক চেষ্টার পরে ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে উহা মুঘল অধিকারে আইসে। এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণাপথের পূর্ব্বভাগে তাঞ্জোর, ভেলোর, আর্কট প্রভৃতি কতিপয় স্থান মুঘল অধিকারে আইসে এবং কতিপয় মুঘল সেনানী মারাঠাদিগের হস্তে নিহত এবং বন্দী হন। রাজপুত সেনাপতি দুর্গাদাস, সম্রাটের পৌত্র (কুমার আকবরের পুত্র) বুলন্দ আখ্‌তারকে সম্রাট সমীপে উপস্থিত করেন। এবং তজ্জন্য তুষ্ট হইয়া সম্রাট দুর্গাদাস ও যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহকে জায়গীর ও রাজসম্মান প্রদান করেন। ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপীয় বণিকদিগের সহিত এক বন্দোবস্ত হয়। তাহার ফলে, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীরা আরবসাগর, পারস্য উপসাগর ও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ স্থান সমূহে জলদস্যু দমনের ভার প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরই আওরঙ্গজীব স্বয়ং সেতারার দুর্গ অধিকার করিতে অভিযান করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই উহা মুঘল অধিকৃত হয়। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরও কয়েকটি মারাঠা অধিকৃত দুর্গ মুঘল অধিকারে আইসে।

দক্ষিণাপথে যখন এইরূপ ঘটিতেছিল, তখন উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে মেবারের সহিত মুঘলশক্তির সন্ধির ফলে, তথায় শান্তি স্থাপিত হয়। তখনও মারবাড় মুঘল-অধীনে ছিল বটে, কিন্তু রাঠোর বীর দুর্গাদাস স্বদেশকে শত্রু হস্তহইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। যদিও সুদীর্ঘকাল তাঁহার আশা অপূর্ণ ছিল। দক্ষিণাপথে মারাঠাদিগের সহিত বলপরীক্ষায় মুঘলশক্তি ক্রমশঃ যখন ক্ষীণবল হইয়া আসিতে লাগিল, তখনই রাঠোরেরা তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাহা হইলেও অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চেষ্টার পর এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রকৃত পক্ষে অজিত সিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। (দুর্গাদাস দেখ)। আগ্রা ও মথুরার সন্নিকটস্থ দুর্দ্ধর্ষ জাঠ সম্প্রদায়ও, সম্রাটের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে দূরে দাক্ষিণাত্যে থাকার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নানারূপে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। রাজারাম ও রামছেড়া নামক দুই জাঠ সর্দ্দারই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। শাহজাদা বিদার বখ্‌তকে সম্রাট ঐ জাঠ বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু তিনি ভালরূপে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, জাঠেরা নানা স্থানে লুটপাট করিয়া সাম্রাজ্যের নানারূপ ক্ষতি করে। ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে রাজারাম নিহত হইলে, জাঠ উপদ্রব কথঞ্চিৎ হ্রাস পায় মাত্র, কিন্তু জাঠদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বশে আনয়ন করিতে একাধিক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। রাজারামের ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়ামন ভরতপুরের বর্ত্তমান জাঠ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী বুন্দেলখণ্ডেও সাময়িক উপদ্রব হইয়াছিল। পাহাড় সিংহ গাউর নামক একজন রাজপুত ভূস্বামী, কিছুকাল লালসিংহ খিচি নামক আর একজন চৌহানবংশীয় রাজপুতের সহিত মিলিত হইয়া, মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত স্থানে উপদ্রব করিতে থাকেন। রাজকীয় সৈন্যের হস্তে পাহাড় সিংহ নিহত হইলেও, তাঁহার অন্যতম পুত্র ভগবন্ত সিংহ এবং তাহার পর পাহাড় সিংহের অপর পুত্র দেবী সিংহ কিছুকাল পর্য্যন্ত মুঘলদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য করেন। ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে এই বিদ্রোহ শান্ত হয়। এতদ্‌ভিন্ন বিহারে গঙ্গারাম নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং রাজপুতানার অন্তর্গত রামপুরার রাও গোপালসিংহ চন্দাবৎ নামক এক জন ভূস্বামী, পারিবারিক কারণে বিদ্রোহী হন। এই সকল বিদ্রোহ অচিরেই দমিত হয়।

আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে বঙ্গে ইংরেজদিগের বাণিজ্য—

আওরঙ্গজীব সিংহাসনে আরোহণ করিবার বহুপূর্ব্বে উড়িষ্যার কোনও কোনও স্থানে ইংরেজ বণিকদের কুঠী স্থাপিত হয় এবং ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট শা-জাহানের রাজত্ব কালে হুগলীতে প্রথম ইংরাজ বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হয়। রাজকুমার শুজা তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ইংরেজদিগকে, বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজানা প্রদানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। তাহাদিগকে অপর কোনও প্রকার বাণিজ্য শুল্ক দিতে হইত না। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদিগের অসাধুতা, অর্থলোভ, ইংরেজ বণিকদিগেরও সেইরূপ দোষের জন্য ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন ইংরেজ বণিকেরা, সুরাট বন্দরে আমদানী দ্রব্যের উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার অজুহাত দেখাইয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার বন্দরে আনীত পণ্য দ্রব্যের জন্য শুল্ক দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আদেশ দেন যে, সমস্ত প্রদেশেই আমদানী দ্রব্যের জন্য হিন্দুগণ শতকরা পাঁচ টাকা ও মুসলমানগণ শত করা আড়াই টাকা শুল্ক দিবে। ইউরোপীয় বণিকগণের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করা সুবিধা জনক বোধ না হওয়াতে এবং অন্যান্য

কোনও কোনও বিষয়ে হিসাব পত্রের অসুবিধা হওয়াতে, ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি এই বিধান করেন যে, ইউরোপীয় বণিকগণ, তাহাদের আমদানী পণ্যের জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক দিবে। এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ সুরাট বন্দরে আনীত দ্রব্যের জন্যই হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ইংরেজ বণিকেরা উহা ঐ দুই প্রদেশে আনীত পণ্য দ্রব্যের উপর ধার্য্য করিতে সম্মত ছিলেন না। তদ্ভিন্ন শুজা তাঁহার শাসন কালে (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা রূপে মাত্র) যে বিশেষ আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যে পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার আমলেও বহাল থাকিবে, এইরূপ কোনও সর্ত্ত ছিল না। সুতরাং ঐ দুই বিষয় লইয়া ইংরেজ বণিকদিগের সহিত সম্রাটের বিবাদের সূত্রপাত হয়। উপরোক্ত কারণ গুলি ব্যতীত মুঘল রাজকর্ম্মচারীদিগের স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার প্রভৃতি কতিপয় বিষয়েও বণিকেরা সম্রাটের নিকট অভিযোগ করে। সম্রাট সেইগুলির যথাসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সম্রাট দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার লিখিত আদেশও অনেক সময়েই দূরবর্ত্তী প্রদেশ গুলিতে সম্যক্ ভাবে প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক রাজশক্তি ও বণিকদিগের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতে লাগিল এবং অবশেষে ১৬৮৬খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। জলপথে ইংরেজ বণিকেরা প্রথম হইতেই ক্ষমতাপন্ন ছিল। তাহারা হুগলি, হিজলি, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে মুঘল সৈন্য আক্রমণ করিয়া নানারূপে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। অনেক স্থানে সরকারী পণ্য নষ্ট করিয়া রাজস্বের ক্ষতি করিল। প্রথমে সম্রাট সমস্ত ইংরেজ বণিকদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদের বাণিজ্যের কুঠী সকল অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ইংরেজদের ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় রাজস্বের ক্ষতি হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন তাহারা মক্কায় তীর্থগামী যাত্রী জাহাজ গুলির যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। এইরূপ নানা কারণে পরিশেষে তাহাদের সহিত একটা রফা করিতে হইল (১৫৯০)। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ সম্রাটের নির্দ্দেশে পুনরায় ইংরেজদিগকে বার্ষিক ৩০০০ মুদ্রা শুল্ক দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। বাঙ্গালার ন্যায় ভারতের পশ্চিম কূলে, সুরাট ও বোম্বাই অঞ্চলেও স্থানীয় মুঘল শাসনকর্ত্তাদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বিবাদ উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষও ঘটে। ইংরেজ বণিকেরা সুরাট পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। কয়েকজন ইংরেজ নেতা মুঘল

হস্তে বন্দী হয়। পরিশেষে সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংরেজগণ দেড় লক্ষ মুদ্রা জরিমানা প্রদান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি লাভ করিলেন। সুরাট ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ইংরেজ বণিকদিগের সহিত রাজশক্তির সংঘর্ষের জন্য আরব সাগর স্থিত ইউরোপীয় জলদস্যুগণের অত্যাচারও অনেকটা দায়ী। ঐ সকল জলদস্যুগণের মধ্যে অনেক ইংরাজ ছিল। তাহাদের মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারীও অনেক ছিল। এই সকল জলদস্যুগণ ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহে গমনাগমনকারী জাহাজ সকল লুণ্ঠন করিত। ভারতবর্ষস্থিত মুঘল রাজকর্ম্মচারীগণ এই সকল জলদস্যুদিগকে ইংরেজ বণিকদিগেরই সহকর্ম্মী বিবেচনা করিতেন। এবং তজ্জন্য সুরাট ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত নিরপরাধ ইংরেজ বণিকগণও অনেক সময়ে বিনা অপরাধে রাজরোষে পতিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিত।

রাজ্যশাসন প্রণালী—

একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাটদিগের মধ্যে আওরঙ্গজীব একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। রাজোচিত গুণাবলীর এত অধিক সমাবেশ খুব অল্পের চরিত্রেই দেখা গিয়াছে। বিচক্ষণ, কর্ম্মকুশল, কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী, বিলাসিতাশূন্য, স্থিরবুদ্ধি প্রভৃতি মানবচরিত্রের মহৎগুণ সকল সম্রাট আওরঙ্গজীবে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজীব অত্যধিক স্বধর্ম্মপ্রীতিবশতঃ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের উপর বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার করিতেন বলিয়া, রাজ্য মধ্যে এক গুপ্ত অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল। তাঁহার জীবিত কালে সেই ধূমাচ্ছন্ন অগ্নি বাহির হইবার সুযোগ পায় নাই মাত্র। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে সম্রাট আওরঙ্গজীব বহুস্থলে হিন্দু প্রজাদিগের উপর বৈষম্যসূচক ব্যবহার করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্বধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণবশতঃ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল এই কারণেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি এতদূর শিথিল হইয়া উঠিতে পারে নাই যে, তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মুঘল শক্তি দুর্ব্বল হইয়া অন্যান্য উদীয়মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির নিকটও সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় মুঘল-রাজশক্তির দ্রুত পতনের

অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু আনুষঙ্গিক আরও কতিপয় কারণও বিবেচ্য। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পাঠান রাজবংশের উচ্ছেদসাধনও অবহেলা করিবার বস্তু নহে। উক্ত রাজ্যদ্বয় যদি ঐভাবে সমধর্ম্মী মুঘল-রাজশক্তির হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের মারাঠাশক্তিকে দমন করিতে মুঘল-শক্তিকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। আওরঙ্গজীবের রাজত্ব কালে মুঘল-সাম্রাজ্যের আয়তন এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, তৎকালে কোনও এক অতিদূরবর্ত্তী কেন্দ্র হইতে সকল প্রান্তবর্ত্তী স্থানে সমভাবে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আওরঙ্গজীব মারাঠা দমনে যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করেন, তাহা যদি সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণ সেই সকলের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইতেন না। মারাঠাদিগের সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী সমরে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বেও সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত ছিল না। রাজপুতানার যুদ্ধ, শা-জাহানের জীবদ্দশায় দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব কালে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার যুদ্ধ, সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা রাজশক্তিকে নষ্টবল পুনরুদ্ধারের সময় দেয় নাই। শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ও শাসনকর্ত্তাগণ দীর্ঘ-কালব্যাপিয়া দাক্ষিণাত্যের ও রাজপুতনার যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নবুদ্ধির কর্ম্মচারীগণদ্বারা গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইত। ইহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইত না এবং অচিরেই তজ্জন্য নূতনভাবে অর্থাদি ব্যয় করিবার আবশ্যকতা হইত।

সম্রাট শা-জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশেকো অনেকটা উচ্চ ও উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। আওরঙ্গজীব তজ্জন্য তাঁহাকে ইস্‌লামের শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। সিংহাসন অধিকার করিবার সময়ে তিনি অনেকবারই ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দারা সম্রাট হইলে ভারতে ইস্‌লামের ঘোর অবনতি হইবে বলিয়াই তিনি, ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া, সিংহাসন অধিকার করিতেছেন। তাঁহার উপরোক্ত ঘোষণা যে আদৌ অযৌক্তিক নহে, তাহা কয়েকটি কার্য্য হইতে সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রচলিত যে সকল কার্য্য তিনি ইস্‌লামের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন না, সেই সকল কাজ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মুঘল সম্রাটগণ রাজ্য মধ্যে প্রচলিত মুদ্রায় ইসলামী ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন (কালেমা) মুদ্রিত করাইতেন। পারস্য নরপতিদের অনুকরণে ভারতে

মুঘল সম্রাটগণও নওরোজ (পারসিক নববর্ষ) উৎসব করিতেন, আওরঙ্গজীব এই উভয় ব্যবস্থাই উঠাইয়া দেন। শেষোক্তটির পরিবর্ত্তে রমজান মাসের পরে অভিষেকোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সভাষদ্‌গণ কতকটা হিন্দু প্রথানুযায়ী হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেন। তিনি উহা বন্ধ করিয়া দেন। তৎপরিবর্ত্তে "সালাম আলে-কুম" বলিয়া সম্ভাষণের ব্যবস্থা হইল। বৎসরে দুইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটেরা দেহভারের অনুরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত তুলিত হইতেন। আওরঙ্গজীব উহা নিষেধ করেন। পূর্ব্বে মুঘল সম্রাটেরা সমস্ত রাজাদিগকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে তাঁহাদের কপালে অঙ্গুলিদ্বারা টীকা পরাইয়া দিতেন। এই প্রথা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া আওরঙ্গজীব উহা উঠাইয়া দেন। সম্রাট আকবরের সময় হইতে মুঘল সম্রাটগণ আগ্রার দুর্গপ্রাকার হইতে প্রজাদিগকে দর্শন করিতেন এবং প্রজারাও তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতেন। 'এই প্রথাও সম্রাট আওরঙ্গজীবের অনুমোদিত না হওয়ায়, তাঁহার আদেশে উঠিয়া যায়। রাজ্য মধ্যে মদ, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করেন এবং যাহাতে উক্ত প্রকার দ্রব্য সমূহ ব্যবহৃত না হয়, তজ্জন্য দৃষ্টি রাখিবার জন্য কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হয়। হিন্দুদিগের সতীদাহ প্রথাও তিনি রোধ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার সদিচ্ছা প্রণোদিত অনেক ব্যবস্থাই আশানুরূপ ফললাভ করে নাই। ইস্‌লামের প্রচার, ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত কুরীতি দমন, প্রভৃতি কার্য্যে তিনি সমধিক অবহিত ছিলেন। সেই কারণে যে সকল ধর্ম্মযাজক বা প্রচারক দারার বিশেষ অনুগৃহিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেককে সম্রাটের হস্তে নিগৃহিত হইতে হইয়াছিল। পবিত্রনগরী মক্কার প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ, পাছে তাঁহার সিংহাসন অধিকারকে অধর্ম্মপ্রসূত বলিয়া ঘোষণা করেন, তজ্জন্য রাজক্ষমতা দৃঢ় ভাবে লাভ করিয়া তিনি মক্কা ও মদিনার ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মপ্রাণ দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য বহু অর্থ, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী-হস্তে প্রেরণ করেন।

স্বয়ং অতি তীব্র স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ যাহাতে ইস্‌লাম ধর্ম্মানুমোদিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই ধর্ম্মবিশ্বাসই তাঁহাকে অনেক স্থলে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে ও তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে প্ররোচিত করে। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। এই কর, ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। ইস্‌লামে অবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রকেই এই

কর দিতে বাধ্য করা হয়। সম্রাট আকবর এই বৈষম্য মূলক কর উঠাইয়া দেন। বলাবাহুল্য এই কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি করপ্রদানে অসমর্থ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। প্রকারান্তরে এই কর স্থাপন দ্বারা ভারতে ইস্‌লামের প্রচার বৃদ্ধি পাইত বলিয়া, আওরঙ্গজীব উহা উঠাইয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের পাঠানরাজ্য গোলকুণ্ডার সুলতানেরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। আওরঙ্গজীব স্বয়ং সুন্নি সম্প্রদায়ান্তর্গত ছিলেন। গোলকুণ্ডার মুঘল আক্রমণ অনেক মুসলমানেরাও পছন্দ করিতেন না। সম্রাট পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে কাশ্মীরের শ্রীনগরে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে, তৎফলে উভয় পক্ষেই অনেক ব্যক্তি হতাহত হয়।

শায়েস্তা খাঁর পরে ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসন কালেই মেদিনীপুরের জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে অত্যাচার ও লুট করেন। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজীব ইব্রাহিম খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজ পৌত্র আজিম-উস-শানকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি আসিবার কিছুকাল পরে বিদ্রোহ দমিত হয়। (শোভা সিংহ দেখ।)

বোরা ও খোজা নামধেয় মুসলমান সম্প্রদায়গুলির অনেক আচার ব্যবহার আওরঙ্গজীবের মতে ইস্‌লামের মূলনীতির বিরোধী হওয়ায়, তাহাদিগকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইস্‌লামিয়া নামক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম নেতা কুতব্‌ সম্রাটের আদেশে নিহত হন এবং তাহার পরবর্ত্তী অনেক নেতা বন্দী হন। খোজা সম্প্রদায়ের নেতারাও অনুরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব এই ভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌লামের মূলনীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতেন।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্পর্কে কয়েকবার অল্পবিস্তর অভিযান করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে দেওগড়ের গোঁদ বংশীয় রাজা বখ্‌ত বুলন্দই দীর্ঘকাল মুঘল সৈন্যকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য করেন। এই গোঁদ বংশীয় রাজারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। পরে তাঁহাদের অনেকে মুসলমান হন।

পূর্ব্ব বর্ণিত (১২০ পৃঃ) চম্পতরাও এর পুত্র ছত্রশাল বুন্দেলাও দীর্ঘকাল মুঘল শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মালব প্রদেশের চতুর্দ্দিকস্থ মুঘল অধিকৃত স্থানে তিনি বহুকাল

ব্যাপিয়া লুট তরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার একাধিক চেষ্টা বিফল হওয়ায়, কোনও কোনও সেনাপতির পরামর্শে সম্রাট তাঁহার সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন। তৎফলে আওরঙ্গজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত ছত্রশাল আর কোনও উৎপাত করেন নাই।

আওরঙ্গজীবের অন্তিম জীবন—১৭০৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে, সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বৎসর পরে সম্রাট আওরঙ্গজীব ভগ্নস্বাস্থ্য ও আশাভঙ্গ হইয়া, আহাম্মদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন : মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জীবন শোক তাপে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি দৃঢ়হস্তে শাসনরজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনই সার্থকতা তাঁহার জীবনে অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহার শেষ সময়ে তাঁহার পুত্রগণের কেহই তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, এই প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট শেষ নিশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করেন।

আওরঙ্গজীবের রাজত্বের কয়েকটি প্রধান ঘটনা (সমুদয় বৎসর খ্রীঃ অব্দের) — (১) শিবাজী নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করেন (১৬৪৭)। (২) আওরঙ্গজীব সিংহাসন অধিকার করেন (১৬৫৮)। (৩) দারা নিহত হন (১৬৫৯)। (৪) আরাকানে শুজার মৃত্যু হয় (১৬৬১)। (৪) শাহজী ভোঁসলের মৃত্যু (১৬৬৪)। (৫) হিন্দুদিগের বাণিজ্য শুল্ক দ্বিগুণ করা হয় (১৬৬৫)। (৫) শা-জাহানের মৃত্যু (১৬৬৬। (৭) শিবাজীর আগ্রায় গমন ও পলায়ন (১৬৬৬)। (৮) শিবাজীকে "রাজা" উপাধি ধারণে অনুমতি দান (১৬৬৮)। কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির ধ্বংস ও তৎস্থলে মসজিদ নির্ম্মাণ (১৬৬৯)। (১০) মথুরার কেশব মন্দির ধ্বংস (১৬৭০)। (১১) রাজস্ব বিভাগ হইতে সমুদয় হিন্দু কর্ম্মচারী বিতাড়নের আদেশ প্রদান (১৬৭১)। (১২) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (১৬৭৪)। (১৩) শিখগুরু তেগবাহাদুরের নিধন (১৬৭৫)। (১৪) মুসলমান ভিন্ন অপর সকল প্রজার উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন (১৬৭৯)। (১৫) শিবাজীর মৃত্যু (১৬৮০)। (১৬) আওরঙ্গজীবের পুত্র আকবর নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন (১৬৮১)। (১৭) বিজাপুর রাজ্যের পতন (১৬৮৬)। (১৮) রায়গড় মুঘল অধিকৃত হয় এবং শাহু বন্দী হন (১৬৮৯)। (১৯) মুঘলকর্ত্তৃক জিঞ্জি অধিকার (১৬৯৮)। (২০) মুঘলকর্ত্তৃক সেতারা অধিকার। (২১) মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত হন (১৭০১)। (২২) দুর্গাদাস ও অজিতসিং বিদ্রোহী হন (১৭০২)। (২৩) আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক রাজগড় অধিকার (১৭০৪) আওরঙ্গজীবের মৃত্যু (১৭০৭)।

আকতর—অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদআলী শাহের কবিজনসুলভ নাম। ওয়াজেদআলী দেখ।

আকন্ন পন্থ—মদন পন্থ ও আকন্ন পন্থ ভ্রাতৃদ্বয় গোলকুণ্ডার আবু হুশেন কুতব শাহের বিশ্বস্ত শৌর্য্যশালী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাদের বীরত্বে আওরঙ্গজীবের সেনাপতি দিলার খাঁ এবং আব্দুল করিম পরাস্ত হইয়াছিলেন।

আকবর, সম্রাট—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। তিনি মুঘলবংশের তৃতীয় সম্রাট। আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন ও মাতা হামিদা বেগম। সম্রাট বাবরের অন্যতমা পত্নী দিলদার বেগমের গর্ভে হিন্দালের জন্ম হয়। এই দিলদার বেগমের অনুচরী হামিদা ছিলেন। হামিদার পিতা শেখ আলী আকবর জামী, হিন্দালের শিক্ষক ছিলেন। একদিন হুমায়ুন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দালের আবাসে হামিদাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাঁহাকে বিবাহ করেন। হুমায়ুন ১৫৩০—১৫৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করার পর, শেরশাহ নামক একজন আফগান তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরুভূমির ভিতর দিয়া পলায়ন করিলেন। নানা স্থানে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তস্থিত অমরকোটের রাজা রাণা প্রসাদসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাজা অতি সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এই দুঃখের সময়ে হামিদা বেগম ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর (৫ই রজব, হিঃ ৯৪৯) আকবরকে প্রসব করেন। সম্রাট এই শুভ সংবাদ শুনিয়া, অনুচরবর্গকে উপহার দিবার সামর্থ্যহীন মনে করিয়া, একটী মৃগনাভি পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ইহারই সুগন্ধের ন্যায় আমার পুত্রের যশ যেন পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়।" বলা বাহুল্য সম্রাটের এই একান্ত মনোবাসনা সফল হইয়াছিল। হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান সেই সময়ে কাবুলের শাসনকর্ত্তা ও মির্জা আস্কারী কামরানের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন, মির্জা আস্কারীরও সাহায্য পাইলেন না। কামরান ও মির্জা আস্কারী হুমায়ুনের শত্রু ছিলেন। সুতরাং হুমায়ুন পারস্য দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই শিশুপুত্রকে সেই দুর্য্যোগে সঙ্গে লইতে সাহসী হইলেন না। মনে করিলেন সেই শিশুর প্রতি অসদ্ব্যবহার হইবে না। মির্জা আস্কারী, পরিচারিকা পরিবৃত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত রক্ষী সমভিব্যাহারে কাবুলে ভ্রাতা কামরানের নিকট

প্রেরণ করিলেন। এইদিকে পারস্য-রাজ শাহ তমাস্প হুমায়ুনকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই সৈন্য সাহায্যে হুমায়ুন কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। (হুমায়ুন দেখ)। এই স্থানে তিনি ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। কামরান কাবুল অধিকার করিতে বার বার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। হুমায়ুন অবশেষে ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে কামরানকে অন্ধ ও বন্দী করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন এবং তথায় চারিবৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে আস্কারী মির্জা মক্কায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। হিন্দাল, কামরানের সহিত যুদ্ধে পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন।

এখন হুমায়ুন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিতে অবসর পাইলেন। এই সময়ে শের শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। হুমায়ুন এই সুযোগে ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুলাই সেকেন্দর শাহকে শিরহিন্দের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। আকবর এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। হুমায়ুন কিছুকাল পরে, ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জানুয়ারী সিঁড়ি হইতে পতনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন আকবর পাঞ্জাবের অন্তর্গত কালানৌর নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানেই ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দ) তারিখে আকবরের রাজ্যাভিষেক হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়ক্রম চতুর্দ্দশ পূর্ণ হইতে আট মাস বাকী ছিল। তৎকালে সম্রাট হুমায়ুনের সম্পর্কিতা ভগিনীর স্বামী বৈরাম খাঁ এই বালক সম্রাটের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তিনি সম্রাট হুমায়ুনের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন এবং হুমায়ুনের সমুদয় বিপদের সময় তাঁহার সহচর ছিলেন. এই সময়ে পাঞ্জাবে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য বালক আকবর, সেকেন্দর শূরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে সেকেন্দর শূর পরাস্ত হইয়া শিবালিক পর্ব্বতের পাদস্থিত মানকুট দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, আদিল শাহ শূরের সেনাপতি হিমু, আকবরের সেনাপতি তারদি বেগকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। বৈরাম খাঁ ও আকবর দিল্লী অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলেন। পরাজিত তারদি বেগকে বৈরাম খাঁ স্বীয় বস্ত্রাবাসে আহ্বান-পূর্ব্বক, সেনাপতিদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যপদেশে নিহত করেন। সম্রাট আকবর বালক হইলেও বৈরাম খাঁর এই আচরণে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই পাণিপথের যুদ্ধে আদিল শাহ

শূরের সেনাপতি হিমুকে ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৫ই নবেম্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আকবর দিল্লী অধিকার করিলেন। হিমু তীরবিদ্ধ হইয়া হস্তী পৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই হস্তী চালক নিহত হইল। ইতস্তত ধাবিত হস্তীকে আকবরের অন্যতম সেনাপতি শাহকুলি মহরম-ই-বাহারলু ধৃত করিলেন। তিনি হিমুকে তাঁহার আত্মীয় সেনাপতি বৈরাম খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন। কথিত আছে আহত শত্রু হিমুকে অসি-মুখে অর্পণ করিবার জন্য বৈরাম খাঁ সম্রাট আকবরকে অনুরোধ করিলে, সম্রাট উত্তর দিয়াছিলেন যে—"আহত, বন্দী ও মুমূর্ষু বীরের শরীরে আঘাত করা কাপুরুষোচিত কার্য্য।" বৈরাম খাঁ সম্রাটকে মৃদু তিরস্কার করিয়া স্বয়ং তাঁহার মস্তক দেহহইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। এই যুদ্ধের পরেই প্রকৃত পক্ষে আকবর ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স চৌদ্দবৎসর কয়েক দিন মাত্র। কিন্তু এই অল্প বয়সেই পিতার ও বিখ্যাত সেনাপতি বৈরাম খাঁর উপদেশে বেশ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান যে সমুদয় ভূপতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীন ছিলেন। বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান রাজদিগকে সমুদয় ভারতবর্ষের সম্রাট বলা যাইতে পারা যায় না। কারণ তাঁহারা সমুদয় ভারতবর্ষ দূরে থাকুক, তাহার চতুর্থাংশও সকলে অধিকার করিতে পারেন নাই। বিস্তৃত উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে হিন্দু প্রাধান্য ছিল। যাঁহারা নামেমাত্র পাঠানদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পাঠান-দের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া, স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আকবরের রাজ্য লাভের পূর্ব্বে কয়েকটী প্রাদেশিক মুসল-মান কর্ত্তারা স্বাধীন বলিয়া স্বীয় নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলিত করিয়া-ছিলেন। ফলতঃ আকবরকে রাজ্য লাভ করিয়াই ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে ও স্বীয় ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে হইয়াছিল।

আকবর মোহাম্মদ আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন বটে কিন্তু সেকেন্দর শূর তখনও রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করেন নাই। আকবর লাহোর ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া আসা-মাত্র, সেকেন্দর সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মানকুট হইতে বহির্গত হইয়া, আকবরের সৈন্যকে পরাস্ত করিলেন। এই সংবাদ আকবর শুনিয়া স্বয়ং সৈন্যসহ লাহোরে উপস্থিত হইলেন। জলন্ধরের

নিকট সেকেন্দর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মানকুটের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকবর ছয় মাস দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিলেন। ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দের ২৪ শে জুলাই সেকেন্দর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল রহমান দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা দেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে বৈরাম খাঁর বিবাহ হুমায়ুনের এক সম্পর্কিতা ভগিনী সলিমা বেগমের সহিত সম্পন্ন হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩০ শে অক্টোবর সম্রাট আকবর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় গমন করেন। তাঁহার সময়ে আগ্রাই রাজধানী ছিল। আকবর সম্রাট হইয়াই রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। ১৫৫৯ খ্রীঃ অব্দে আকবরের সেনাপতি আলীকুলী শৈবানী জৌনপুর ও বারাণসী অধিকার করেন।

এপর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ সম্রাট আকবরের আতালিক বা উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে সম্রাট দিন দিন অতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন। এই বিরক্তিতে ইন্ধন যোগাইবার লোকের অভাব ছিল না। দিল্লীর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা শাহাবুদ্দিন আহম্মদ খাঁ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। সম্রাট অবশেষে ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৭ শে মার্চ্চ রাজকীয় সমুদয় কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন বলিয়া, বৈরাম খাঁকে জানাইলেন। সম্রাটের এই ব্যবহারে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মক্কা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু পথে গুজরাটে একজন আফগান তাঁহাকে হত্যা করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। (বৈরাম খাঁ দেখ)।

সম্রাট আকবর রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই চারিদিকের বিদ্রোহী রাজা ও নবাবদিগকে স্ববশে আনিতে অভিলাষী হইলেন। মালব দেশ তখন বাজবাহাদুর নামক এক আফগানের অধীনে ছিল। সম্রাট মালব জয় করিবার জন্য স্বীয় ধাত্রীপুত্র আদম খাঁ ও স্বীয় শিক্ষক পীর মোহাম্মদকে প্রেরণ করেন। বাজবাহাদুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন ও পুরমহিলারা আদম খাঁর হস্তে পতিত হয়। প্রধানা মহিষী রূপবতী গরল পানে আত্মহত্যা করেন। আদম খাঁ প্রচুর ধনরত্ন পাইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সম্রাট দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন করেন। পীর মোহাম্মদ আদম খাঁর স্থানে মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরেই আবার

বাজবাহাদুর বল সঞ্চয় করিয়া পীর মোহাম্মদকে আক্রমণ করেন। পীর মোহাম্মদ পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে নর্ম্মদার জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাজবাহাদুর কিছুকালের জন্য মালবের প্রভু হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আবদুল্লা খাঁ উজবেগকে প্রেরণ করেন। রাজবাহাদুর পলায়নপূর্ব্বক রাণা উদয়সিংহের শরণাপন্ন হন। ইহার পরেও বাজবাহাদুর সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রথমে এক হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করেন।

আদম খাঁ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল না। এই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ শামসুদ্দিন খান-ই-আজাম প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আদম খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। একদা মন্ত্রী সম্রাটের কক্ষের পার্শ্বে উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে আদম খাঁ অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করেন। সম্রাট এই হত্যাকাণ্ডের শাস্তিস্বরূপ আদম খাঁকে প্রাসাদের উপর হইতে যমুনায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেন। আদম খাঁর এই শোচনীয় পরিণামে সম্রাটের ধাত্রী মাহম আঙ্কা পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

আবদুল্লা খাঁ মালবের শাসনকর্ত্তা হইয়াই সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। তিনি অতিশয় কোপন স্বভাব ছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আকবর পুনরায় মালবে আগমন করেন। আবদুল্লা খাঁ পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন।

মোহাম্মদ আদিল শাহের অন্যতম পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া, বিহার ও বারাণসী প্রদেশে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। চুণার দুর্গ তাঁহার আপন অধিকারে ছিল। আদিলের ফত্তু নামক এক ক্রীতদাস চুণারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ভয় পাইয়া সম্রাটের সেনাপতি আসফ খাঁর হস্তে দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন।

সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি আসফ খাঁ গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের উত্তর ভাগ জুড়িয়া গড়মণ্ডল প্রদেশ ছিল। নাবালক পুত্রের জননী রাণী দুর্গাবতী, তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থ স্বয়ং রণবেশে অশ্বারোহণে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মুঘল সেনা প্রমাদ গণিলেন। সেই যুদ্ধে শত্রু সৈন্য নিক্ষিপ্ত একটী তীর রাণী দুর্গাবতীর চক্ষুতে বিদ্ধ হইল। রাণী যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন এবং শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়

মনে করিয়া, উদর বিদীর্ণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল। গড়মণ্ডল অধিকার করিয়া আসফ খাঁ প্রচুর ধন প্রাপ্ত হন। তিনি এই ধন সম্রাটকে না দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন।

পাঠানেরা বরাবর এই ধারণা মনে মনে পোষণ করিত যে, মুঘলেরা ভারতবর্ষে স্থায়ী হইতে পারিবে না। হুমায়ুন যেমন অতি সহজে শের শা শূর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সম্রাট আকবরও সেইরূপ বিতাড়িত হইতে পারেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পাঠানেরা বারংবার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

উজবেক বংশীয় মালবের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা খাঁ ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিদ্রোহী হন। সম্রাট তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি পরাজিত হইয়া গুজরাটের শাসনকর্ত্তা চঙ্গিস খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। খান্দেশের শাসনকর্ত্তা মীর মুবারক শাহ দূত পাঠাইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই বৎসরেই সম্রাটের হাসন ও হুসেন নামে দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা একমাস মধ্যেই গতায়ু হন।

উজবেকেরা ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। সেকেন্দর খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ, আলী কুলী খাঁ, প্রভৃতি এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। তেলিকোটার যুদ্ধে সম্রাটের সেনাপতি সুজাত খাঁ পরাস্ত হইলেন। কিন্তু সম্রাট ইহাতে দমিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে নানা স্থানে পরাজিত করিয়া বশীভূত করিলেন। এই সময়েই আগ্রার দুর্গ নূতন করিয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের নির্ম্মাণের আদেশ, তিন হাজারী সেনাপতি কাশিম খাঁর উপর অর্পিত ছিল। ৩৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ৮ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা হাকিম কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মির্জা সুলেমান, বদকশানের অধিপতি ছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই কাবুল আক্রমণ করিতেন। ১৫৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি একবার কাবুল আক্রমণ করেন। মির্জা হাকিম উপায়ান্তর না দেখিয়া, লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার কি দুর্ম্মতি হইল, যে ভ্রাতার সাহায্যে কয়েকবার আক্রমণকারী মির্জা সুলেমানকে বদকশানে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ভ্রাতারই রাজ্য পাঞ্জাব অধিকার করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। সম্রাট আকবর সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হইলে, তিনি পলায়ন করিলেন। সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, সম্বল প্রদেশের

ইব্রাহিম মির্জা, হুসেন মির্জা প্রভৃতি কতিপয় জায়গীরদার মির্জা বিদ্রোহী হন। কিন্তু অচিরে তাঁহাদের বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

সম্রাট আকবর এত দিন আফগান বিদ্রোহীদের দমন করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এখন রাজপুতানার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইতিপূর্ব্বে অম্বর রাজ্যের (জয়পুর) রাজা বিহারী মল্লের কন্যাকে সম্রাট বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিহারী মল্ল ও তাঁহার পুত্র ভগবান দাস সম্রাটের অনুগত ছিলেন। সম্রাট তৎপরে যোধপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। যোধপুরের রাণা মালদেব পরাজিত হইয়া সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং অচিরেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র উদয় সিংহ স্বীয় ভগিনীকে সম্রাট আকবরের সহিত বিবাহ দেন। পুরস্কার স্বরূপ উদয় সিংহ আকবরের এক হাজারী সেনাপতি হইলেন। যোধপুর রাজকুমারী যোধপুরীবেগম নামে ইতিহাসে খ্যাত। তাঁহারই গর্ভে সেলিম (জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করেন। যোধপুরী বেগমের এক ভগিনী বিকানীরের রাজা রায় সিংহের পত্নী ছিলেন। সুতরাং তিনিও সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে কোথায়ও যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, কোথায়ও সৌহৃদ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রায় সমস্ত রাজ্য গুলির উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেবল মিবারপতি রাণা সংগ্রাম (সঙ্গ) সিংহের পুত্র উদয় সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। মিবারপতি সমস্ত রাজপুতানার মধ্যে সম্মানে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাকে পরাজয় করিতেই হইবে। বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া আকবর স্বয়ং মিবারের রাজধানী চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন। রাণা উদয় সিংহ পলায়ন পূর্ব্বক পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি বিদনুরের ভূপতি জয়মল্ল ও কৈলারপতি পুত্ত অসীম বিক্রমে চিতোর দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঁচ মাস অবরোধের পর জয়মল্ল আকবরের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। জয়মল্লের মৃত্যুতে চিতোর রক্ষীরা ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিলেন না। যখন দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায় রহিল না, তখন রমণীগণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। রাজপুত বীরগণ চিতোর দুর্গের দ্বার মুক্ত করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে মুঘল সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহারা অগণিত শত্রুসৈন্য নিপাত করিয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিলেন। তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। আকবর চিতোরে প্রবেশ

করিয়া ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে অসি-মুখে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রস্তরময় মূর্ত্তি আগ্রার দুর্গদ্বারে স্থাপন করিলেন। এত করিয়াও আকবর উদয় সিংহকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে উদয় সিংহের মৃত্যুর পরে রাজপুত সর্দ্দারেরা উদয়ের পুত্র প্রতাপের পতাকাতলে আসিয়া আবার মিলিত হইল। আকবর মানসিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধ হলদিঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ এক বিশ্বস্ত অনুচরের সহায়তায় রক্ষা পাইলেন। বিপুল মুঘল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুর বশী-ভূত হইলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে (১৫৭৯) অপহৃত রাজ্যের অধিকাংশ তিনি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরে সম্রাট ১৫৬৯ খ্রীঃ অব্দে রণ্থম্ভর দুর্গ অধি-কার করেন। তৎপর বৎসর বেরারের রাজা রামচন্দ্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটে অন্তর্ব্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সম্রাট এই সুযোগে তৎপ্রদেশ অধিকার করিতে অভিলাষী হইলেন এবং অতি কষ্টে এক বৎসর অনবরত যুদ্ধ চালাইয়া গুজরাট স্ববশে আনয়ন করিলেন।

গুজরাট বিজয়ের পর সম্রাট বঙ্গ-দেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাঙ্গালাদেশের পাঠান বংশীয় নবাব সুলেমান কররাণি এই সময়ে পরলোক গমন করেন (১৫৭২)। সুলেমান নামেমাত্র দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বাধীনই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য ইমাদ খাঁর পুত্র হানসু তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। হানসু দুই দিন রাজত্ব করিয়া বায়ে-জিদের অন্যতম ভ্রাতা দাউদ খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। দাউদ খাঁ সিংহাসন আরোহণ করিয়াই মুঘল অধীনতা ছিন্ন করিলেন। অধিকন্তু মুঘল রাজ্য আক্রমণ করিতে তাঁহার সেনাপতি লোদি খাঁকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অধীনে তখন ৪০ সহস্র অশ্বারোহী, দেড়লক্ষ পদা-তিক, সার্দ্ধ তিন সহস্র হস্তী ও বিংশতি সহস্র কামান ছিল। মদগর্ব্বিত দাউদ খাঁ সন্দেহ বশে স্বীয় পিতৃব্য পুত্র ও লোদি খাঁর জামাতা ইউসফ খাঁকে বধ করেন। এই সময়ে মুঘল সেনা-পতি মুনিম খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লোদি খাঁ মুনিম খাঁকে পরাজিত করিলেন। অতপর লোদি খাঁর প্রতি দাউদ খাঁর সন্দেহ জন্মে। তিনি অতি বিনম্র ভাবে সেনাপতি লোদি খাঁকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বান করিয়া আনিয়া, হত্যা করিলেন। এই বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতির নিধনের

প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। সম্রাট মুনিম খাঁর সাহায্যার্থ রাজা তোডরমল্লের অধীনে বহু সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। গঙ্গা ও শোণ নদের সংযোগ স্থলের নিকটে উভয় সৈন্যদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। দাউদ খাঁর সেনাপতি নিজাম খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। মুঘল সেনাপতি লাল খাঁ, দাউদ খাঁর বহু রণতরী হস্তগত করিলেন। লোদি খাঁর হত্যার পরে, তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল খাঁ মুনিম খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দাউদ খাঁ পাটনার দুর্গে আশ্রয় লইলেন কিন্তু এখানেও মুঘলেরা আসিয়া পাটনা অবরোধ করিলেন। দাউদ খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেনাপতি শ্রীহার রায়ের (যশোহরের প্রতাপাদিত্যের পিতা) পরামর্শে পলায়ন করিয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সেনা সুরজগড় ও মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিলে, খড়্গপুরের রাজা সংগ্রামসিংহ ও গিধোরের রাজা পূরণ মল্ল, মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপরে মুনিম খাঁ গৌড়ের রাজধানী তাণ্ডা অধিকার করেন। দাউদ খাঁর অন্যতম সেনাপতি জুনৈদ খাঁ ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথা হইতে বহির্গত হইয়া মুঘল সেনাপতি মোহাম্মদ খাঁ গথ্‌খর ও রায় বিহারী-মল্লকে পরাজিত ও নিহত করেন।

মুঘল সেনাপতি মোহাম্মদ কুলীখাঁ বরলাশ সপ্তগ্রাম বিনা যুদ্ধে অধিকার করিলেন। দাউদ খাঁ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। মুঘলমারির যুদ্ধে দাউদ খাঁর দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইল। দাউদ খাঁ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির ফলে বাঙ্গালা ও বিহার মুঘলদের হস্তগত হইল। দাউদ খাঁ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে অক্টোবর মুনিম খাঁ, তাণ্ডানগরে দেহত্যাগ করেন। দাউদ খাঁ এই সংবাদ পাইয়াই পুনর্ব্বার নষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি সসৈন্যে তাণ্ডা অভিমুখে অভিযান করিলেন। রাজমহলের নিকট খাঁ জাহান হুসেন-কুলী খাঁ ও রাজা তোডলমল্লের সহিত যুদ্ধে ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জুলাই দাউদ খাঁ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। দাউদের পুত্র জুনৈদ খাঁ এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিন দিন পরে মৃত্যু মুখে পতিত হন। দাউদ খাঁ, হুসেনকুলী খাঁর আদেশে নিহত হইলেন এবং তাঁহার ছিন্নমস্তক দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বর্ষ চতুষ্টয় দাউদ খাঁ কর্ত্তৃক রাজ্যশাসনের পরে, বঙ্গদেশ মুঘলদের শাসনাধীন হইলেও সমস্ত বঙ্গদেশ মুঘল-দের বশীভূত হইতে আরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

বঙ্গ বিজয়ের সমকালেই সিন্ধুদেশের উত্তরাংশ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার

করিয়াছিল। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে মজঃফর খাঁ বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মজঃফর খাঁ রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য জায়গীরদারদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে জলেশ্বরের সামন্ত রাজা খলিদি খাঁ ও ঘোরাঘাটের (রংপুর) বাবা খাঁ কাকশাল বিদ্রোহী হইয়া মজঃফর খাঁকে বধ করেন। তৎপরে রাজা তোড়রমল্ল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। ভ্রাতা মির্জা হাকিম সময় ও সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। ১৫৮২ খ্রী. অব্দে তিনি আবার বিদ্রোহী হইলেন। তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। কুমার মুরাদ পিতৃব্য মির্জা হাকিমকে পরাস্ত করিয়া কাবুল অধিকার করিলেন। এই সময়ে এলাহাবাদ দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সেলিম (জাহাঙ্গীর) জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দের ৩১ শে জুলাই ভ্রাতা মির্জা হাকিম কাবুলে দেহত্যাগ করেন।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আকবরের সেনাপতি বীরবল সুয়াত উপত্যকায় বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া নিহত হন। সেই বৎসরেই কাশ্মীরপতি ইউসফ খাঁ বন্দী হন, কিন্তু তাঁহার পুত্র আয়ুব খাঁ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। পরে পরাস্ত হইয়া সন্ধির বলে মুঘলদের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দের ২৫ শে এপ্রিল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন, ১১ই অক্টোবর লাহোরে সেনাপতি তোডরমল্ল এবং উক্ত নগরে ১৫ই নবেম্বর ভগবান দাস, পরলোক গমন করেন। উক্ত সালের ২রা অক্টোবর কুমার সেলিমের পুত্র পারভেজ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে বেলুচিস্থান সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিল। তৎপরে সিন্ধু দেশও বিজিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সম্রাট দাক্ষিণাত্যের বুর্হানপুর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নবাবদিগের নিকট, সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা মুঘল প্রাধান্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে, রাজকুমার দানিয়ালের অধীনে ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ খান খানান মির্জা খাঁ গমন করিয়াছিলেন। মুঘল সৈন্য আহম্মদ নগরের দুর্গ অবরোধ করিল। আহম্মদ নগরের অল্প বয়স্ক সুলতান ইব্রাহিম নিজাম শাহের পিতৃস্বসা (পিসী) চাঁদবিবির (বিজাপুরের বিধবা রাণী) অসীম বীরত্বে মুঘলবাহিনী পরাজিত হইল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে মুঘলেরা বেরার পাইল কিন্তু বুর্হান নিজাম শাহের

পৌত্র বাহাদুর নিজাম শাহকে আহম্মদাবাদ রাজ্যের স্বাধীন নবাব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মুরাদও গুজরাট হইতে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদিকে মুরাদের সহিত খান খানানের বনিবনাও না হওয়ায়, খান খানান দিল্লীতে আহুত হইলেন। আবুল ফজল ও সৈয়দ ইউসফ মুর্শেদ মুরাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। তৎপরে স্বয়ং সম্রাটও দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা মে (হিঃ ১০০৭, ১৭ই সওয়াল) মুরাদ পরলোক গমন করেন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে চাঁদবিবি নিহত হইলেন, আহম্মদ নগরেরও পতন হইল। সুলতান বাহাদুর নিজাম শাহ সপরিবারে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী হইলেন। বিজাপুরের নবাব ইব্রাহিম আদিল শাহ, আহম্মদ নগরের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে সম্রাটের অনুগত হইলেন। তাঁহার এক কন্যাকে কুমার দানিয়ালের সহিত বিবাহ দিলেন। বেরার, খান্দেশ, আহম্মদ নগর, মালব ও গুজরাট লইয়া, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ গঠিত হইল এবং কুমার দানিয়েল তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন নাই। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

সম্রাট, কুমার সেলিমকে রাজস্থানের বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ করেন। সেলিম কিন্তু রাজসিংহাসন পিতার জীবদ্দশায়ই অধিকার করিতে অভিলাষী হইয়া ১৬০১ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আগ্রা, অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ স্বীয় অধীনে আনয়নপূর্ব্বক এবং কোষাগার হস্তগত করিয়া, স্বয়ং সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেলিম আবুল ফজলের উপর খুব বিরক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে, সেলিমের প্ররোচনায় বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত উর্চ্চার সামন্ত নরপতি নরসিংহদেব কর্ত্তৃক ১৬০২ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট শুক্রবার (হিঃ ১০১১, ৪ঠা রবি আওয়ল) তারিখে নিহত হন। সম্রাট প্রিয়বন্ধু আবুল ফজলের মৃত্যুতে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। দুই দিবস পর্য্যন্ত কিছুই আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই ঘটনার পরে রাজকুমার সেলিম বিমাতা সলিমা বেগমের (বৈরাম খাঁর বিধবা পত্নী পরে সম্রাটের মহিষী) পরামর্শে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পিতার অনুগত হন। আবার পিতা পুত্রে মিলন হয় (১৬০৩ খ্রীঃ)। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে দানিয়ালের মৃত্যুতে সম্রাটের স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর বুধবারে (হিঃ ১০১৪, ১২ই জমাদল আখির) পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণে গোদাবরী

নদী হইতে উত্তরে অক্ষ নদীর তীর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে আসামের পশ্চিম অংশ হইতে আরবসাগর বিধৌত পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

সম্রাট আকবরের সন্তান সন্ততি— সম্রাট আকবরই প্রথম হিন্দু রাজকুমারীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার আট ধর্ম্মপত্নী ও বহু উপপত্নী ছিল। তন্মধ্যে (১) সুলতানা রাকিয়া বেগম—আকবরের পিতৃব্য মির্জা হিন্দালের কন্যা ছিলেন। তাঁহার কোনও সন্তান জন্মে নাই। (২) সুলতানা সলিমা বেগম—আকবরের পিতামহ বাবরের দৌহিত্রী ছিলেন। প্রথমে বৈরাম খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পরে আকবর তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার খুব কবিত্ব শক্তি ছিল। (৩) অম্বরের রাজা বিহারীমল্লের কন্যা ও ভগবান দাসের ভগিনী। (৪) আবদুল ওয়াশীর রূপবতী বিধবা পত্নী। (৫) যোধপুরের মহারাজা মালদেবের কন্যা যোধাবাই। তাঁহার গর্ভে সেলিম (জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত সাদ। (৭) মুঘলবংশীয় আবদুল্লা খাঁর কন্যা। (৮) খান্দেশ প্রদেশের মবারক শাহের কন্যা। কোন কোন ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিনি বিকানীরের রাজা কল্যাণ মল্লের এক কন্যাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্রাটের পাঁচ পুত্রের মধ্যে যমজ হাসন ও হুসেন মাত্র এক মাস জীবিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্র সেলিম রাজ্য লাভ করিয়া জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত হন। চতুর্থ মুরাদ ও পঞ্চম পুত্র দানিয়েল পিতার জীবদ্দশায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শাহজাদী খানুন বেগম, মধ্যমা শাহজাদী শুকরউন্নিসা ও কনিষ্ঠা শাহজাদী আরাম বানু বেগম।

আকবরের ধর্ম্মমত—

মীর আবদুল লতিফ নামে পারস্য দেশীয় এক মৌলবী সম্রাট আকবরের শিক্ষক ছিলেন। এই উদার ও মহাপ্রাণ মৌলবী শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ নীতির অনেক উপরে ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব শিষ্য আকবরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আকবর স্বভাবতঃ জ্ঞানার্জ্জনে অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং আবদুল লতিফের উদার মত উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, অচিরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি আজন্ম মুসলমান সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, প্রথম প্রথম সেই ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার খুবই অনুরক্তি ছিল। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তিনি নানা সম্প্রদায়ের, নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের, নানা মতের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের গুণরাজি দর্শনে অতি-

শয় প্রীত হইয়া তৎ তৎ মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য ইবাদৎ খানা (পূজাবাড়ী) নামে একটী পৃথক গৃহও নির্ম্মিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর, নানা দেশীয় বিদ্বজ্জনের আকর্ষণকেন্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি সকল স্থান হইতেই সত্য গ্রহণ করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেইজন্য যে সকল পণ্ডিত কেবল তর্কজাল বিস্তারপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হইতেন, তাঁহারা কে কতদূর সত্যানুসরণ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। এই বিতণ্ডা উপলক্ষ্য করিয়া, তিনি একদিন রাজকর্ম্মচারী, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও অন্যান্য পণ্ডিত মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে বুধমণ্ডলী, সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত ধর্ম্মমত লাভ করিয়া, তাহা প্রচার করা এবং ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মের মূল সত্য কি, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করাই আপনাদের সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতএব মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতার বশীভূত হইয়া, সত্যগোপন অথবা ঈশ্বরাদেশের বহির্ভূত কোন মত প্রচারে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নহে। এইরূপ করিলে আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে।" এই সময়ে মৌলানা আবদুল সুলতানপুরী ও শেখ নবি, রাজসভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া সম্রাটের নিকট বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিতেন। ইস্‌লাম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহাদের মত অতিশয় প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়েই পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করিতেন এবং স্ব স্ব বক্তব্য মত অতিশয় উত্তেজনা ও পরিবাদ সহকারে সমাপন করিতেন। অচিরে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্রাটের সমীপে লোপ পাইল। এমন কি ইহাদের ব্যবহারে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। এদিকে যেমন মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইতেছিল, অন্য দিকে তেমনি অন্যান্য ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই যখন বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোক রহিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞান যখন অন্য সম্প্রদায় হইতেও লাভ করা যায়, তখন কোন এক বিশেষ ধর্ম্মে অথবা ইস্‌লামের মত একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্ম্মেই সত্য আবদ্ধ থাকিবে কেন? এক সম্প্রদায় যাহা অসত্য বলিয়া মনে করে, অন্য সম্প্রদায় তাহাই কেন যথার্থ বলিয়া দৃঢ়তা সহকারে প্রচার করিবে? এই প্রকার উদার উন্নত ভাব সম্রাটের মনে উদয় হইল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের সংস্পর্শে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল। হীরাবিজয় সূরী, ভানু-

চন্দ্র উপাধ্যায়, সিদ্ধিচন্দ্র সূরী প্রভৃতি জৈনাচার্য্যদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়ে তিনি অতিশয় প্রীত ও তাঁহাদের ভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন। তাহার ফলে বহু বন্দী মুক্তি লাভ করিল, পিঞ্জরাবদ্ধ বহু পক্ষী মুক্ত হইল, বৎসরের মধ্যে কয়েক দিন পশুহত্যা নিবারিত হইল, জিজিয়া কর উঠিয়া গেল, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর উঠিয়া গেল। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতগামী জৈন তীর্থ যাত্রীদের কর রহিত হইল। জৈন প্রভাবে শেষজীবনে তিনি নিরামিষাশী হইয়াছিলেন, মৃগয়া হইতে বিরত হইয়াছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। এতকাল পর্য্যন্ত রাজকীয় মুদ্রায় যে কলেমা ব্যবহৃত হইত, তাহার পরিবর্ত্তে "আল্লাহু আকবর" এই শব্দ ব্যবহার করা যায় কিনা এই মত জিজ্ঞাসু হইলে, প্রায় সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু হাজী ইব্রাহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, 'ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—ঈশ্বর মহান্ অথবা আকবর ঈশ্বর। অতএব কোরাণের "নাজিকর আল্লাহি আকবর" (ঈশ্বরের বিষয় ধ্যান করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য) নামক একার্থ মূলক শ্লোকাংশ গ্রহণ করাই উচিত।' সম্রাট বলিলেন—'মানুষের ক্ষমতা এত অল্প যে কেহই, ঈশ্বরত্বের দাবী করিতে পারে না। সুতরাং "আল্লাহু আকবর" শব্দ মুদ্রায় অঙ্কিত করিলে দূষণীয় হইবে না। কেবল কথায় নহে কার্য্যেও তিনি তাহাই করিলেন। এই সময়ে এক বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একজন মুজতাহিদ (কোরাণের মত ব্যাখ্যাতা) শ্রেষ্ঠ, না একজন সুলতান-ই-আদিল (ন্যায়পরায়ণ সম্রাট) শ্রেষ্ঠ। কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক শেষোক্ত মত গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে মকদুম-উল-মুল্ক, শেখ আবদুল নবি, কাজী জালাল উদ্দিন মুলতানী, শেখ মবারক, গাজি খাঁ বদাক্‌শ প্রভৃতি উক্ত মত সমর্থন করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—"আমরা এক মতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মুজতাহিদগণের (কোরাণের ব্যাখ্যাতা) পদ অপেক্ষা একজন সুলতান-ই-আদিলের (ন্যায় পরায়ণ সম্রাট) পদ শ্রেষ্ঠ। ইস্‌লামের সুলতান মানবজাতির আশ্রয় স্থল, বিশ্বাসীগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া, আবুলফতে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর পাতশাহ গাজী একজন ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ধর্ম্মভীরু সম্রাট। অতএব কোরাণ ব্যাখ্যাতাগণের কোনও মতগত পার্থক্য, উপস্থিত হইলে, যদি পাতশাহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারণার বশবর্ত্তী ও অভ্রান্ত বিচারে কোনও এক পথ অবলম্বন

করেন, তবে তাহা মানবজাতির কল্যাণকর বলিয়া আমাদের গ্রহণ করা উচিত। পাতশাহ যদি কোরাণের অবিরোধী এবং জাতির কল্যাণকর কোনও আদেশ প্রচার করেন, তাহাও আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য গ্রহণীয় ও পালনীয়।" ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে এই আদেশ প্রচারিত হইল। সুতরাং আকবরের নব ধর্ম্ম মত প্রচারের পথ সুগম হইল। পর বৎসরে ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তিনি তাঁহার নবধর্ম্ম (হিঃ ৯৮৮, ১লা জমান আউল) প্রচার করিলেন। তাঁহার এই ধর্ম্মে রাজানুগ্রহ লাভের আশায় ও সম্রাটের বিরাগ ভাজনের ভয়ে অনেকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ধর্ম্মমত প্রচলিত হয় নাই। সম্রাট আকবর সমস্ত জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য পত্তনের যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না।

অর্থনৈতিক অবস্থা—

দাম বা পয়সা নামক তাম্র মুদ্রা, তঙ্কা (বর্ত্তমান টাকা) রৌপ্য মুদ্রা এবং মোহর নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ৪০ দামে এক তঙ্কা, ১৬ তঙ্কায় মোহর। দামের ভগ্নাংশ—অর্দ্ধদাম, সিকি দাম, এক অষ্টমাংশ দাম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান ২৭ সেরে এক মন হইত। সেরের ভগ্নাংশ—অর্দ্ধসের, সিকিসের, ছটাক ইত্যাদি ছিল। ধান্য খুব সুলভ ছিল বলিয়া, জীবনযাত্রা সহজে অল্প খরচে নির্ব্বাহ হইত। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভাল ছিল। এই সময়ে বস্ত্র শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বিদেশ হইতে বহুবিধ পণ্য সামগ্রী আমদানী হইত।

রাজ্যশাসন প্রণালী—

তিনি শাসন বিভাগের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য সমস্ত রাজ্যকে পনরটী সুবা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, লাহোর, কাবুল, মুলতান, আহাম্মদাবাদ (গুজরাট), মালব, খান্দেশ, বেরার, বিহার, আহম্মদনগর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, ও বঙ্গদেশ। এই সমস্ত আবার ছোট ছোট খণ্ডে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে বা বিভাগে একজন সুবাদার (শাসন কর্ত্তা), একজন দেওয়ান (রাজস্ব কর্ম্মচারী), এবং বিচারের জন্য কাজী ও মীর আদল নামে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। এতদ্ব্যতীত সুবাদারের অধীনে কোতোয়াল (পুলিশ), মীর বহর (নৌবহর, ডাকবিভাগ প্রভৃতির কর্ত্তা), বক্সী (বেতন বিভাগের কর্ত্তা), বাকিয়া নবিস (দলিল বিভাগের কর্ত্তা) প্রভৃতি কর্ম্মচারী ছিলেন। সৈন্য বিভাগে মসনবদারগণ কর্ম্ম পটুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিতেন। অতি সুশৃঙ্খলার সহিত এই বিভাগের কর্ম্ম

পরিচালিত হইত। সম্রাট অতি অবাধ্য সৈনিককে শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। পূর্ব্বে বেতনের পরিবর্ত্তে সেনাপতিরা জায়গীর লাভ করিতেন। এই কুপ্রথা রহিত করিয়া সম্রাট বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এই উপায়ে তিনি সেনাপতিদের বিদ্রোহী হইবার পথে কণ্টক রোপণ করেন। সম্রাট রাজস্ব বিভাগেরও বিশেষ উন্নতি বিধান করেন। এই বিষয়ে বিচক্ষণ হিন্দু রাজস্ব কর্ম্মচারী রাজা তোডরমল্ল তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। সমস্ত ভূমির পরিমাণ করিয়া তাহা, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভাগ করিলেন। তাহার গড়পরতা লইয়া, উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ, রাজার প্রাপ্য বলিয়া অবধারিত হইত। সেই রাজপ্রাপ্য কর মুদ্রাদ্বারা অথবা উৎপন্ন শস্যদ্বারা দিবার নিয়ম ছিল। হিন্দু রাজত্ব কালে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজপ্রাপ্য ছিল। বলা বাহুল্য কোন কারণে শস্য নষ্ট হইলে রাজকর হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। সম্রাটের এই বিধানে প্রজা সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তিনি রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্ম তাঁহার কর্ম্মচারী নিয়োগের অন্তরায় কখনও হয় নাই। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত হইলে উচ্চতর পদ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। সেই জন্য আমরা তাঁহার সেনাপতি ও সুবাদারের পদে কয়েক জন হিন্দু কর্ম্মচারী দেখিতে পাই। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে পারসিক ও ভারতীয় প্রণালীর সংমিশ্রণ ছিল। রাজার মত ও বিশ্বাস সেই সময়ের শাসন প্রণালীর নিয়ামক হইলেও, তিনি কোনও কাজ তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদেরে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। তিনি উদার, সাম্য ও সমদর্শিতার বলে যে সাম্রাজ্য সংঘটন করিয়া গেলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই পথ হইতে স্খলিত হইয়া, রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আকবর যখন রাজ্যলাভ করেন, তখন "জোর যার মুলুক তার" এই নীতিরই প্রাবল্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান রাজত্বে আমরা দেখিয়াছি, কোন রাজার মৃত্যুর পরেই, তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের ও প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইত। এই নীতি মুঘল রাজত্বেও অনুসৃত হইয়াছিল। আকবর অতি কঠোর হস্তে এই মূল নীতির মুলচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মুঘল শাসকেরা রাজ্য জয় করিয়া তাহার সুশৃঙ্খলা বিধানে তত সমর্থ ছিলেন না। এই বিষয়ে হিন্দু রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রাজ্য জয় করা অপেক্ষা

তাহার সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা অতিশয় কঠিন কাজ।

সম্রাট আকবরের চরিত্র—

তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের ন্যায় কঠোর সংযমী ছিলেন না বটে কিন্তু একবারে সংযম বর্জ্জিতও ছিলেন না। তিনি মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অতি মধুর ছিল। দীন দরিদ্র প্রজার সামান্য উপহার দ্রব্য অতি সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিতেন। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে, তিনি মুঘল বংশের এক জন শ্রেষ্ঠ রাজা এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যোগ্য লোক নির্ব্বাচনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রাজসভায় ফৈজী, আবুল ফজল, নকিব খাঁ মোল্লা মোহাম্মদ, মোল্লা সাবরি, সুলতান হাজী, হাজী ইব্রাহিম, বদায়ুনি, বীরবল, তোডর মল্ল, তানসেন প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী বিরাজ করিতেন।

সম্রাট আকবরের বিদ্যানুরাগ—

যদিও সম্রাট আকবর লেখা পড়া জানিতেন না বলিলেই হয়, তথাপি মানবের জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ অতিশয় প্রবল ছিল। অসাধারণ স্মৃতি শক্তির সাহায্যে কাণে শুনিয়া, তিনি যাহা শিখিতেন, সাধারণ লোকের পক্ষে পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। এই বিদ্যানুরাগের ফলে, তাঁহার রাজ সভায় নানা দেশীয়, নানা বিদ্যায় পারদর্শী বহু জ্ঞানী লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শুনিতে খুব ভালবাসিতেন এবং নিজেও তাহাতে যোগ দিতেন। শেখ ফৈজি একজন সেই যুগের খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তিনি সম্রাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কৃতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আবুল ফজল ও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনা অলঙ্কারবহুল হইলেও মার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিল। তাঁহার রচিত আকবর নামা, আইন-ই-আকবরী, আয়াতুল কুরশী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবদুল কাদের বদায়ুনী সম্রাটের অন্যতম সভা পণ্ডিত। তারিখ-ই-বদায়ুনী তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত বহু পণ্ডিত তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। সম্রাটের নবরত্ন সভা তাঁহার নয়জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে রাজা বীরবল, রাজা মানসিংহ, রাজা তোডর মল্ল, হাকিম হুসাম, মোল্লা দুপেয়াজা, শেখ ফৈজী, আবুল ফজল, মির্জা আবদুর রহিম,

খান খানান এবং মিয়া তান সেন ছিলেন। এই সময়ে হিন্দি সাহিত্যের ও বিশেষ উন্নতি হয়। তুলসী দাসের রামায়ণ ও শিখ গুরু অর্জ্জুনসিংহের 'গ্রন্থ-সাহেব' এই সময়েই রচিত হয়। তাঁহার রাজসভায় ছয়ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদক ছিলেন। তন্মধ্যে অন্ধ হিন্দী কবি সুরদাস, গায়ক তান-সেন, রামদাস, মালবের নরপতি বাজ বাহাদুর প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মিয়া লাল কলাবন্তের নিকট সম্রাট স্বয়ং সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট উত্তম নাকড়া বাজাইতে পারিতেন। এক সময়ে সুকবি হুশেন মরুভী একটা কবিতার জন্য সম্রাটের নিকট দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। গায়ক রাম দাসও একবার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সম্রাটের চিত্র-কলার প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ সতের জন চিত্রকরের মধ্যে তেরজন হিন্দু ছিলেন। তন্মধ্যে পাল্কীবাহক জাতীয় দাসবন্ত স্বীয় প্রতিভাবলে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এই সময়ে স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ফতেপুর সিক্রি বহু সুরম্য প্রাসাদে শোভিত হইয়াছিল।

আকবর (যুবরাজ)—সম্রাট আওরঙ্গ-জীবের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর (হিঃ ১০৬৭, ১১ই জিল হিজ্জা) তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া মহারাষ্ট্র ভূপতি শম্ভুজীর পক্ষাবলম্বন করেন। পরে তাঁহাদের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যে প্রস্থান করেন এবং তথায় ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১১৮) তাহার মৃত্যু হয়। আওরঙ্গজীব একসময়ে মুঘল পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া তাঁহাকেই উত্তরা-ধিকারী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন।

আকবর খাঁ—কাবুলের শাসনকর্ত্তা দোস্ত মোহাম্মদ খাঁর ভারতে রাজকীয় বন্দীরূপে অবস্থান কালে ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি মাষ্টার মেকনাটনকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। দোস্ত মোহাম্মদ পুনঃ কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজল খাঁর পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, গোলাম হায়দর খাঁ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন। গোলাম হায়দরও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা সের আলী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন। (১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দ)।

আকবর শা (দ্বিতীয়)—দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলমের পুত্র। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম আবুল নসর মইনুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর শা। তিনি

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ত্রিশ বর্ষের অধিক কাল রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। দিল্লীতে প্রথম বাহাদুর শাহের সমাধির কাছেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহই দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাট। তাঁহার সময়ে ইংরেজ পক্ষে মিঃ সিটন দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। (সিটন দেখ)

আকলাস খাঁ—আওরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি দিলীর খাঁর তিনি ভাগিনেয় ছিলেন। স্বীয় মাতুলের সঙ্গে থাকিয়া তিনি ক্ষুদ্র সেনাপতির কাজ করিতেন। শম্ভুজী, স্বীয় পিতা শিবাজীর নিকট হইতে পলায়ন করিলে, দিলীর খাঁ শম্ভুজীকে সাহায্য করিবার জন্য স্বীয় ভাগিনেয় আকলাস খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আকা সাদেক—তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত পাটপশার নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। ঢাকার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ কুলি খাঁর সহকারী মীর হবিব তাঁহাকে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে (১৭৩২ খ্রীঃ) ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব নরপতি ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর তৎকালীন রাজা ধর্ম্ম মাণিক্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা মীর হবিবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মীর হবিব ত্রিপুরা আক্রমণের ঃ উৎকৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ করিয়া বহু সৈন্যসহ আকা সাদেককে প্রেরণ করেন। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উভয় সৈন্যের যুদ্ধ হয় এবং ত্রিপুর সেনাপতি কমল নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস সেই যুদ্ধে নিহত হইলে, মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য পর্ব্বত প্রদেশে পলায়ন করেন। তদবধি সমতল ক্ষেত্র রোসনাবাদ নাম প্রাপ্ত হয় এবং জগৎরাম "জগৎ মাণিক্য" উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক তথাকার রাজা হন। আকা সাদেক বিজিত প্রদেশের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পরেই ত্রিপুরার মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট উপস্থিত হন। তথায় জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায়, বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হইয়া রোসনাবাদ তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন। সেই সময়ে আকা সাদেক বরদাখাতের জমিদারী প্রাপ্ত হন। আকাসাদেকের বাসগৃহের চিহ্ন এখনও থুল্লা গ্রামে বর্ত্তমান আছে এবং মেঘনা নদীর তীরস্থ "আকানগর" তাঁহারই নামে পরিচিত।

আকিদৎ খাঁ—তিনি ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর অধীনে একজন ফৌজদার ছিলেন। যখন মগ জল দস্যুরা ঢাকা আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি সেনাপতি ইস্‌লাম খাঁর সহকর্ম্মী

ছিলেন। তাঁহারা মগদিগকে পরাস্ত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

আগর ফা—তিনি ত্রিপুরাধিপতি ডাঙ্গর ফার (অন্য নাম হরি রায়) অষ্টা-দশ পুত্রের অন্যতম। ডাঙ্গর ফা সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা-কে গৌড়ে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক অবশিষ্ট সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তন্মধ্যে আগর ফা বর্ত্তমান আগরতলা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু রত্ন ফা গৌড়েশ্বরের সাহায্যে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও ভ্রাতৃগণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ।

আগা আহাম্মদ আলী—অন্যনাম আহম্মদ। ঢাকানগরের আগা সাজাত আলীর পুত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পার্শী বৈয়াকরণিক। তিনি 'রিসালা-ই-ইস্তিকাক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত অনেক পুস্তকও সম্পাদন করিয়াছেন। কলিকাতা মাদ্রাসাতে তিনি একজন পার্শীর শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আগা বাখর—আফগান জাতীয় (খ্রীঃ ১৮শ শকে) আগা বাখর ও তৎপুত্র আগা সাদেক খাঁ বরিশালের জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে লোকেরা অতিষ্ঠ ছিল। সুন্দরী কুলবধূদের সতীত্ব রক্ষা একরূপ অসম্ভব ছিল। তাঁহারা দয়াল চৌধুরী নামক এক সম্ভ্রান্ত জমীদারের সুন্দরী কন্যাকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দয়াল চৌধুরী যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও পরিবারস্থ মহিলারা জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সিরাজউদ্দৌলার পরামর্শে আগা বাখ-রের পুত্র আগা সাদেক, হুশেন উদ্দিন খাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু জনসাধা-রণ এই হত্যাকাণ্ডে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তৎ-ফলে আগা বাখর নিহত হন এবং আগা সাদেক অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন।

আগা মীর—মিরাণ হুশেন নিজাম শাহ দেখ।

আগা মোহাম্মদ রেজা—১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে আগা মোহাম্মদ রেজা নামক একজন মুঘল, কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া, কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক ইমাম মাধী নাম ধারণ করিয়া কাছাড়ের রাজা হন। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় দ্বাদশ সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া শ্রীহট্টের সীমান্ত-বর্ত্তী বদরপুরের কেল্লা আক্রমণ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন।

আগা সাদেক—আগা বাখর দেখ।

আচাকনারায়ণ—খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতা-ব্দীর মধ্যভাগে আচাকনারায়ণ নামে এক রাজা বর্ত্তমান শ্রীহট্টের অন্তর্গত

তরফ নামক স্থানে বাস করিতেন। উত্তরে বরাক নদী, পূর্ব্বে ভানুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে পরগণা বেজুরা এবং পশ্চিমে উত্তর লাখাই, এই সীমান্তর্গত স্থানে রাজপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ত্রিপুরাধিপতির সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের গৌড় নামক স্থানের শেষ হিন্দু নরপতি গৌড় গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। গৌড় বিজয়ের পর শাহজালালের সেনাপতি নসির উদ্দিন দ্বাদশজন আওলিয়াসহ তরফ অভিমুখে অভিযান করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর, আচাক নারায়ণ পলায়ন করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি মথুরা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। রাজধানী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে এক নির্জ্জন অনুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। এখনও লোকে ইহাকে "কীর্ত্তনিয়া টীলা" বলিয়া থাকে। তিনিই তরফের শেষ হিন্দু নরপতি।

আচোঙ্গ ফা—(১) অন্য নাম রাজসূর্য্য বা কুঞ্জহোম ফা। তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিপুরপতি কীর্ত্তিধরের (নামান্তর ছেংথুমফা বা সিংহতুঙ্গ) পুত্র। তাঁহার মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিয়া অসংখ্য শত্রু সৈন্য নিপাত করিয়াছিলেন। আচোঙ্গ ফার মহিষীর নাম আচোঙ্গ মা। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজা ও রাণীর একই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের সহিত ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে (১২৪০ খ্রীঃ) মহারাজা কীর্ত্তিধরের যুদ্ধ হয়, সুতরাং তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার রাজবংশের চন্দ্র হইতে গণনায় ১৪১তম এবং ত্রিপুর হইতে ৯৫তম নরপতি ছিলেন। তিনি জয়ন্তিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ। (২) স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি। তিনি চন্দ্র হইতে ৯৯তম ও ত্রিপুর হইতে ৫৪তম। তাঁহার পিতা ইন্দ্রকীর্ত্তি পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরসিংহ (চরাচর) সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীরসিংহ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ আচোঙ্গ ফা রাজা হন। তাঁহার অন্যনাম সুরেন্দ্র ও হাচুং ফা। আচোঙ্গ ফার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র বিমার রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

আজম শাহ—তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের তৃতীয় পুত্র। ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নবাব ফিদাই খাঁর মৃত্যু হইলে, আজম শাহ পিতাকর্ত্তৃক এইপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে আসামবাসীরা বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে বড়ই উপদ্রব করিতেছিল। আজম শাহ তাহাদিগকে দমনের অভিপ্রা

হইয়া, সৈন্যের সংখ্যাল্পতা ও অর্থের অপ্রাচুর্য্য দর্শনে, ইংরাজদিগকে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, একুশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন এবং অবিলম্বে আসামীদিগকে দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। নবাব সৈন্যের আগমনেই আসামীরা পলায়ন করে। গৌহাটি মুঘলদিগের অধিকৃত হয়। এই সংবাদে সম্রাট আওরঙ্গজীব অত্যধিক প্রীত হইয়া, পুত্রের নিকট সম্মানসূচক রাজপরিচ্ছদ ও দুই লক্ষ টাকা মূল্যের একটী হীরার আংটী প্রেরণ করেন। ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিত্রাদেশে খান্দেশ আক্রমণ করিয়া শেলার দুর্গ অধিকার করেন। আওরঙ্গজীবের প্রকৃতিতে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার স্থান ছিল না। ফলে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন এবং সকলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন। যখন আওরঙ্গজীব ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে সেতারা আক্রমণ করেন, তখন আজম শাহ সেতারার পশ্চিম দিক আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু মহারাষ্ট্র সেনাপতি পরশুরাম ত্রিম্বক তাঁহাকে ঘুষ দিয়া দুর্গে খাদ্যাদি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে নিজের শক্তিতে বিশ্বাসবান ও উচ্চাভিলাষী, সম্রাট আওরঙ্গজীব ইহা বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। আজম শাহ যখন আহম্মদনগরের শাসনকর্ত্তা, তখন সম্রাট আওরঙ্গজীব একবার পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি সম্রাটের দর্শনার্থ গমন করেন। কামবক্স পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন। আজম শাহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিলেন। তজ্জন্য আওরঙ্গজীব আজম শাহকে মধ্য প্রদেশের ও কামবক্সকে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে তৎ তৎ স্থানে যাইতে আদেশ দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ৩রা মার্চ্চ, আওরঙ্গজীব পরলোক গমন করেন। আজম শাহ মালব দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলমের (পরে বাহাদুর শাহ) বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আগ্রা হইতে ১৫ মাইল দূরে জাজোয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয় (১৭০৭ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে আজম শাহ এবং বিদার বখ্‌ত ও উয়ালাজা নামক তাঁহার দুই পুত্র নিহত হয়। আলী তরাব ও বিদার দিল নামক আরও দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। আজম শাহের মাতা বানু বেগম প্রসিদ্ধ শাহ নওয়াজ খাঁর কন্যা ছিলেন।

আজাদ—তিনি পাঞ্জাবে এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলানারা এই মতকে শাস্ত্র বিরোধী মত বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সম্প্র-

দায়ের লোক গোঁফ দাড়ী কামাইয়া শাস্ত্র শাসন অস্বীকার করিয়াছিল। জালাওনা অঞ্চলে এই সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগকে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

আজাবল—রঙ্গপুরের অন্তর্গত বর্দ্ধন কুঠীর রাজা। তাঁহার কন্যা কল্যাণীকে দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দিনরাজ ঘোষ (অন্যনাম হরিরাম) বিবাহ করিয়াছিলেন। দিনরাজ দেখ।

আজিজ—দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ তুগলক, তাঁহার অকৃতজ্ঞ সম্ভ্রান্তবংশীয় কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া, নীচবংশীয় লোকদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। আজিজ একজন মদ্যবিক্রেতা ছিলেন, পরে সম্রাটের অনুগ্রহে মালব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। আজিজ এই উচ্চ সম্মানিত পদ পাইয়াই এক নিমন্ত্রণে সত্তর জন সম্ভ্রান্ত লোককে আহ্বান করিয়া নিহত করেন। সম্রাট এই সংবাদে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। এইরূপ ক্রীতদাস মখিলও সম্রাটকর্ত্তৃক গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আজিজের ন্যায় কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে নিহত করেন। গুজরাটের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া মখিল ও তাঁহার সাহায্যকারী আজিজকে পরাজিত ও নিহত করেন। মোহাম্মদ তুগলক দেখ।

আজিজ উল্লা শাহ, মৌলানা—তাঁহার পিতা শাহ নিয়াম উল্লা ও পিতামহ খাজা মোহাম্মদ ইসা, সকলেই বিখ্যাত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জুনায়িদ বার্লাস সাহেবের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের সমস্ত সদ্‌গুণের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। সুলতান জুনায়িদ বার্লাস তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার বিদ্যালয়, ভজনালয় ও স্বীয় ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্রদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র হজরত শেখ মোহাম্মদ সুলতানের বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মৌলানা শাহ আজিজ উল্লা অতি মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দাতাও ছিলেন। যে অর্থ তিনি পাইতেন, তাহা অকাতরে দান করিতেন। ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ব্যতীত অন্য সময় তিনি শিক্ষা দানেই যাপন করিতেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে এতছাত্র আসিয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভুমি ক্রয় করিয়া বিদ্যালয় সংলগ্ন করিয়াছিলেন। রাজপথের সমীপে একটী হাটও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এখনও আজিজপুর নামে খ্যাত।

আজিজ কুকা—দিল্লীর সম্রাট

আকবরের উদার ধর্ম্মমতে যে সকল সম্ভ্রান্ত মুসলমান আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি মক্কায় তীর্থ করিতে যাইয়া সেখানকার মৌলবীদের ধর্ম্মান্ধতা দেখিয়া প্রচলিত আচার ব্যবহারে অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হন।

আজিজ কুকা মির্জা — সম্রাট আকবরের একজন সেনাপতি। বিদ্রোহী জায়গীরদারদের দমনার্থ সম্রাট আকবর তোডরমল্লের পরে তাঁহাকে বঙ্গবিহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। আজিজ কুকা কৌশল-পূর্ব্বক বিদ্রোহীদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া একে একে সকলকে বশীভূত করেন। তোডরমল্ল দেখ।

আজিম উদ্দৌল্লা (নবাব)—কর্ণাটের নবাব আমির-উল-ওমরার পুত্র এবং নবাব ওমদাদ-উল-ওমরার ভ্রাতা। ওমদাদ-উল-ওমরার মৃত্যুর পর, ইংরেজ সরকার কর্ণাটের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী আলিহুশেন ইংরেজ সরকারের সর্ত্তে সম্মত না হওয়ায়, মৃত নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র আয়েম উদ্দৌল্লা ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র আজিম-ঝা কর্ণাটের নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। (১৮২০ খ্রীঃ অব্দ)।

আজিম ওস্মান — দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতামহ সম্রাট আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহ দমনার্থ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তিনি পাটনাতে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহার নাম আজিমাবাদ রাখেন। তিনি কখনও কখনও বর্দ্ধমানে বাস করিতেন। সেখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ এবং হুগলীতে আজিমগঞ্জ নামে একটি বাজার স্থাপন করেন। বিদ্রোহিগণ যে সমস্ত স্থান নষ্ট করিয়াছিল তিনি তাহার সংস্কার সাধন করেন এবং বর্দ্ধমানের নিহত রাজার পুত্র জগৎ রায়কে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন। তৎপরে তিনি ঢাকায় গমন করেন। ঐ সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজীব মুরশিদকুলি খাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী বা রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা করিয়া পাঠান। আজিম ওস্মান সামরিক বিভাগের কর্ত্তারূপে ছিলেন। দেওয়ান, রাজ প্রতিনিধির প্রতি সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শনে বিমুখ না হইলেও, আজিম ওস্মান অর্থ সঞ্চয়ের বিঘ্ন মনে করিয়া, দেওয়ানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় দেওয়ান ইহা সম্রাটের গোচরীভূত করেন। সম্রাট তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার পূর্ব্বক বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় যাইয়া বাস করিবার আদেশ

প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি পাটনায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ১৭০৭ খ্রীঃ (হিঃ ১১১৯) অব্দে আওরঙ্গজীবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য আজিম শাহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি স্বীয় পুত্র ফরোকশিয়ারের হস্তে বঙ্গ ও বিহারের শাসনভার অর্পণ করিয়া, এই যুদ্ধে উপস্থিত হন। আজিম ওস্মানের বীরত্বে আজিম শাহের পরাজয় ও পতন ঘটে। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তিনি সম্রাট হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ও অহঙ্কারবশতঃ সেনাপতি এবং কর্ম্মচারীগণের বিরাগভাজন হন। তাঁহারা সিংহাসন লোভী ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষাবলম্বন করেন। আজিম শাহ যুদ্ধে নিহত হন। অতপর ভ্রাতা জাহন্দর শাহ সিংহাসন লাভ করেন। এই যুদ্ধে আজিম ওস্মানের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ করিমও বন্দী হন এবং পরে জাহন্দর শাহের আদেশে নিহত হন। আজিম ওস্মান এগার বৎসর বঙ্গ ও বিহার প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতে যথেষ্ট উদারতা ছিল। হিন্দুদিগের প্রীতিভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দুপর্ব্ব দিনে তিনিও উৎসব করিতেন এবং হোলী খেলাতে রঙ্গীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যোগ দিতেন। স্বীয় অমায়িক প্রকৃতি ও শিষ্টাচারের দ্বারা তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিঃ ওয়াল্স গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটি এই তিন খানি গ্রাম কুমার আজিম ওস্মানের নিকট হইতে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

আজিম খাঁ (১)—মীর মহম্মদ বাকীরের উপাধি। আসফ খাঁ জাফরের ভ্রাতা। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০১৫) তাঁহাকে হাজার সৈন্যের সেনাপতিপদ এবং ইদারত খাঁ উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট শা-জাহান তাঁহাকে আজিম খাঁ উপাধি প্রদান করেন। কাশিম খাঁর মৃত্যুর পরে সম্রাট শা-জাহান ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজেরা উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপলাই নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অযোগ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আসামী ও আরাকানী মগেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই জন্য তিনি বঙ্গদেশ হইতে অপসৃত হইয়া এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন (১৬৩৭ খ্রীঃ)। পরে তিনি গুজরাট, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত রাজকুমার সুজার বিবাহ হয়। সুজা যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা

হইয়া আসেন, তখন তিনিও তাঁহার সহকারীরূপে আগমন করেন। এবং ঢাকা নগরে কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৯) ৭৫ বৎসর বয়সে জৌনপুরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং স্বীয় উদ্যানে সমাহিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই উক্ত আজিম খাঁ উপাধি প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৬৮) দারাশেকো ও তাহার ভ্রাতা আওরঙ্গজীবের যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র খাঁ-জশন উপাধি প্রাপ্ত হন।

আজিম খাঁ (২)—সম্রাট হুমায়ুন ও আকবরের সময়ের একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। তিনি সাধারণতঃ আকা খাঁ নামে পরিচিত। তাঁহার অপর নাম সামসউদ্দিন মোহাম্মদ। প্রসিদ্ধ মির্জা আজিজ কোকা তাঁহারই পুত্র। তিনি গজনীর অধিবাসী ও পূর্ব্বে মির্জা কামরানের কর্ম্মচারী ছিলেন। হুমায়ুন শের খাঁর যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তিনি তাঁহার জীবনরক্ষা করেন এবং হুমায়ুন পারস্য দেশে পলায়ন করিলে, তিনি তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহার স্ত্রী জিজি বেগম, হুমায়ুনের পুত্র রাজকুমার আকবরের ধাত্রীর কার্য্য করিতেন। আকবর সম্রাট হইয়া আজিম খাঁকে সাত হাজারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। মাহম আঁকাকে পদচ্যুত করিয়া উকিল মোতালকের পদে আজিম খাঁকে নিযুক্ত করাতে, মাহম আঁকা খাঁর পুত্র আদম খাঁ ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৬৯) আজিম খাঁকে নিহত করেন। তজ্জন্য সম্রাট আকবরের আদেশে আদম খাঁকে বন্ধন করিয়া প্রাসাদ হইতে যমুনায় নিক্ষেপ করা হয় এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। আজিম খাঁকে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার মধ্যে সমাহিত করা হয়। ধাত্রী মাহম আঙ্কা পুত্রশোকে একমাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

আজিম খাঁ (৩)—মির্জা আজিজ কুকা (কোকলতাস) নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। তিনি আজিম খাঁর পুত্র। সম্রাট আকবরের ধাত্রীভাই বলিয়া তিনি কুকা নামে অভিহিত হইতেন। তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল সম্রাটের নিকট হইতে দূরে থাকাতে সম্রাটের সন্দেহ তাঁহার উপর নিপতিত হয়। তিনি দিল্লীতে আহূত হন। সম্রাটের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, তিনি সপরিবারে মক্কা গমন করেন কিন্তু তথায় জীবন যাপন করা বিপদজনক মনে করিয়া, পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে আগমনপূর্ব্বক সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট তাঁহাকে পুনর্ব্বার গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ১৬২৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩৩) জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে গুজরাটের অন্তর্গত আহম্মদাবাদে তিনি

পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার পিতার সমাধির নিকটেই সমাহিত করা হয়।

আজিম খাঁ কুকা—মুজাফর হুসেনের উপাধি। সম্রাট শা-জাহান তাঁহাকে ফেদাই খাঁ উপাধি প্রদান করেন, তজ্জন্য এই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম খাঁ জাহান বাহাদুর কোকুলতাস। উভয়েই সম্রাট আওরঙ্গজীবের ধাত্রী ভাই। সম্রাট আওরঙ্গজীব ফেদাই খাঁকে আজিম খাঁ উপাধি প্রদান করেন এবং ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৮৬) তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৮৯) তিনি বিহার প্রদেশে গমনকালে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

আজিম খাঁ, নবাব সিরাজ-উল্-ওমরা — কর্ণাটের নবাব আজিম উদ্দোল্লার পুত্র। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৩৪ বৎসর বয়সেই ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের ১২ই নবেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

আজিম সিংহ — চিতোরের রাণা অজয় সিংহের পুত্র আজিম সিংহ ও সুজন সিংহ। তাঁহারা পিতার ন্যায় বীর ছিলেন না। পিতৃআদেশ পালনার্থ অজয়সিংহ স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর অরিসিংহের পুত্র হাম্মিরকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। আজিম সিংহ ইহাতে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়া অচিরে কৈলাকরে দেহত্যাগ করেন।

আজ্জউদ্দিন মোহাম্মদ শিরাণ খিলিজী — তিনি বঙ্গবিজয়ী পাঠান নরপতি বক্তিয়ার খিলিজীর সামন্তগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বক্তিয়ার খিলিজী চীন বিজয়ে অসমর্থ হইয়া বিপুল সৈন্যক্ষয়ে অতিকষ্টে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় আজ্জউদ্দিন তাঁহাকে বধ করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মাত্র আট মাস রাজত্ব করিয়া আলীমর্দ্দান খিলিজী কর্ত্তৃক নিহত হন।

আড়ার কালাম—ভগবান গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নিজ প্রণালীতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আড়ার কালাম নামক এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার প্রয়াস পান। অচিরকাল মধ্যে আড়ার কালামের প্রণালীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, তিনি উদ্দক রামপুত্র নামক অপর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর শিষ্য হন। উদ্দক রামপুত্রের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াও অভীষ্ট লাভ করিতে না পারিয়া তিনি স্বীয় প্রণালীতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব দেখ।

আড়মল্ল—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকর্ত্তা। তিনি শার্ঙ্গধর প্রণীত শার্ঙ্গধর সংহিতার একটী উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন।

আতপিক গ্রহবৈর্য্য—একজন জৈন দার্শনিক। তিনি আর্য্য কর্কশ বর্ষিতের শিষ্য ছিলেন।

আতাউল্লা খাঁ—বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতা হাজী আহম্মদের জামাতা। তিনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি বারংবার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে চেষ্টা করেন। নবাব প্রথম দুই একবার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। আতাউল্লা খাঁ ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া অযোধ্যার নবাব সফ্‌দর খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফরক্কাবাদের পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

আতুমা (আত্মা ?)—গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত অপর এক বুদ্ধ। বুদ্ধদেব দেখ।

আত্মারাম (বিজয়ানন্দ সূরী)— (১) তিনি আধুনিক একজন বিখ্যাত জৈন সাধু। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লেহরা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম গণেশচন্দ্র, মাতা রূপদেবী। তাঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। পিতা পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীনে কিছু দিন কার্য্য করেন। পরে কার্য্যত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই সময় আত্মারাম জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন শিখ গুরু তাঁহাকে বলেন যে বালকটী রাজা অথবা সাধু হইবে। দস্যু পিতার সঙ্গে থাকিয়া, বালক দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিবে এই আশঙ্কায় শিখ গুরু গণেশের নিকট বালকটীকে প্রার্থনা করেন। গণেশচন্দ্র ইহাতে অসম্মত হন। ইহার পরে গণেশ ধৃত হইয়া দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। কারাগারে গমনকালে আত্মারামকে ব্যবসা শিক্ষার জন্য জনৈক জৈন বণিকের নিকট রাখিয়া যান। সেই সময়ে পাঞ্জাবে "ঢুঁটক পন্থা" নামক জৈন মত হইতে উদ্ভূত এক মত প্রচলিত ছিল। বণিকটী ঐ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। আত্মারাম বণিকের সঙ্গে এই মতাবলম্বী সাধুদের নিকট গমন করিতেন। সেই সময়ে দুইজন সাধুর উপদেশ শ্রবণে তাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মে এবং তৎফলে তিনি জীবনরাম সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে প্রত্যহ তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। ইহার পর তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং তীব্র জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঢুঁটক মতে ভ্রান্তি দেখিয়া তিনি শ্বেতাম্বর জৈন মত গ্রহণ করেন। বহু দেশ হইতে আগত শ্রাবকগণ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে "শ্রীমদ্বিজয়া

নন্দ স্থরী-” আখ্যা প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি সাধারণে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় (Congress of Religions) আমন্ত্রিত হইয়াও সাধু বৃত্তিতে অন্তরায় ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি প্রায় সাত আট সহস্র ঢুঁঢক মতাবলম্বীকে স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহ জৈনদের অতি আদরের বস্তু। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাণওয়ালা নগরে তাহার দেহত্যাগ হয়। এই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নানা স্থানে লাইব্রেরী ও মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী (১)—ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কালীঘাটে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কুলাচারী ও পশ্বাচারী নামে দুইটী সম্প্রদায় আছে। তিনি কুলাচারী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত করিতে পারিতেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতে লোকের মন ভক্তিরসে বিগলিত হইত। সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া তিনি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আত্রেয়—প্রাচীনকালের একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী ঋষি। বৌদ্ধযুগের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জীবক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আত্রেয় চিকিৎসা ও রোগ-নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচার করেন। ক্যাপ্টেন বাওয়ার (Capt. Bower) কর্ত্তৃক, খোটানে আবিষ্কৃত মিশ্রসংস্কৃত ভাষায় যে পত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আত্রেয়ের নাম উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন আচার্য্য চরকের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় প্রণালী আচার্য্য আত্রেয়ের প্রণালীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত।

আত্রেয় পুনর্ব্বসু—(১) মহর্ষি আত্রেয় পুনর্ব্বসু একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। কাহারও মতে তিনি ইন্দ্রের শিষ্য, আবার কাহারও মতে তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত ইঁহারা মহর্ষি আত্রেয় পুনর্ব্বসুর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম ‘চিকিৎসা সংগ্রহ’, ‘নাড়ীজ্ঞান’ প্রভৃতি। (২) পাণিনির সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০) একজন সংহিতাকার। তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত শালাতুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ‘প্রসিদ্ধ চরকসংহিতা’ তাঁহার রচিত।

আদম খাঁ, সৈয়দ—তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মুসা খাঁর পুত্র। তাঁহার পিতা ত্রিপুরা-পতি অমরমাণিক্যের আদেশ প্রতি-পালন না করায় অমরমাণিক্য তাঁহার

রাজ্য আক্রমণ করেন। মুসা খাঁ পলায়ন করেন ও আদম খাঁ বন্দী হন। পরে অমরমাণিক্য তাঁহাকে মুক্তি দেন। তাঁহার পিতৃব্য মিনা খাঁ প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক দিল্লী হইতে স্বীয় নামে সনন্দ আনয়ন করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অতি অল্পাংশই অধিকার করিবার পর অচিরকাল মধ্যেই পরলোক গমন করেন। এদিকে রাজস্ব অপ্রদত্ত থাকায় দিল্লীতে মিনা খাঁর প্রবঞ্চনার কথা প্রচারিত হয়। তৎফলে উভয় পক্ষ দিল্লীতে আহুত হন। তথায় উভয় পক্ষের মীমাংসা হইয়া আদম খাঁ তরফের নয় আনার এবং ইউনস ও ক্রাঞ্জরা নামক মিনার পুত্রদ্বয় সাত আনার মালিক হন। আদমের পুত্র আহাম্মদ।

আদি গাঞি, ওঝা—ভট্ট নারায়ণের পুত্র। রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম প্রদান করেন।

আদিত্যদাস—(১) একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে। (২) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের পিতা। তিনি স্বয়ংও একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। বরাহমিহির স্বীয় পিতার নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে অবন্তী নগরে গমন করেন। আদিত্যদাস মগধের অন্তর্গত কাম্পিল্য নগরে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন বরাহমিহির দেখ।

আদিত্য বর্দ্ধন—থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ ও প্রভাকরবর্দ্ধনের পিতা। তাঁহার মহিষীর নাম মহাসেন গুপ্তা। সম্ভবতঃ তিনি মালবের গুপ্ত বংশীয়া ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন দেখ।

আদিত্যবর্ম্মা—(১) তিনি মধ্যদেশের মুখরবংশীয় বর্ম্মরাজ। তাঁহার পিতা হরিবর্ম্মা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। (ঈশানবর্ম্মা দেখ)। আদিত্যবর্ম্মা মগধের গুপ্তবংশীয় হর্ষগুপ্তের কন্যা হর্ষগুপ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা ও পৌত্র ঈশান বর্ম্মা। (হরিবর্ম্মা দেখ)। (২) চালুক্য-বংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পুলকেশী প্রথম ও দ্বিতীয় দেখ।

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য (পণ্ডিত এম্ এ)—তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা যুক্ত-প্রদেশেই হইয়াছিল এবং তথায় তিনি সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালাদেশের আভ্যন্তরীন জীবনের সংবাদ তিনি বরাবর রাখিতেন এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি এলাহাবাদ গভর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর, কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। প্রয়াগের মাহাত্ম্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ছিল।

তিনি একজন সেকালের কংগ্রেসের লোক ছিলেন। দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁহার ছাত্র। সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদগণও কখন কখন তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেশ-ভক্তির বাহ্য আড়ম্বর তাঁহার ছিল না; তাঁহার প্রকৃত দেশ-ভক্তি ও দেশ হিতৈষণা ছিল। কর্ণেল অল্‌কটের আমলে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রাথমিক সভ্যদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। প্রথম প্রথম শ্রীযুক্তা বেসান্তের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু পরে মতবিরোধ হয়। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন এবং রাজাকে তিনি Prince of Bengalis বলিতেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধুর মুখে শুনা গিয়াছে যে, তাঁহার মতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল কুলিমজুর ও ব্যবসায়ী জীবিকার অন্বেষণে দক্ষিণ-আফ্রিকা, মরিশশ, ডেমারারা, ট্রিনিডাড প্রভৃতি স্থানে গমন করে, তাহাদের আধ্যাত্মিক সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের ব্যবস্থা করা ভারতবাসীদের যে একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহার দৃঢ় মত ছিল। তিনি বলিতেন, এই কার্য্যে ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য্যসমাজের হাত দেওয়া উচিত, কারণ প্রাচীন হিন্দু-সমাজে জাতি যাইবার ভয় থাকায়, এই কার্য্যে তাঁহাদের যোগ দিবার সম্ভাবনা কম। তিনি তাঁহার মাতার নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করেন। তাঁহার মাতা সংস্কৃতে বিদুষী ছিলেন এবং পুত্রদিগকে প্রথমে নিজেই শিক্ষা দিতেন। তিনি উইল দ্বারা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও পুত্রের কেবলমাত্র যাবজ্জীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লক্ষাধিক টাকার সমুদয় সম্পত্তি উক্ত পুস্তকালয়ের জন্য, কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার জন্য, একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য এবং সাধারণে শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে প্রয়াগে তাঁহার দারাগঞ্জস্থ বাসভবনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আদিত্য শূর—নামান্তর ধরণীশূর। তিনি শূরবংশের রাজা ছিলেন। রাঢ় প্রদেশে সিংহেশ্বর শূরবংশের রাজধানী ছিল। শূররাজ আদিত্য শূর, বাৎস্য বংশীয় অনাদিবর সিংহকে গঙ্গার পশ্চিম কূলে সিংহপুর হইতে কণ্টক নগর পর্য্যন্ত চারিশত খানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করেন। তাঁহার রাজত্ব কাল ৮৭১ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আদিত্যসূরী—একজন জৈন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। কালাদর্শ নামে তাঁহার একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ আছে।

আদিত্য সেন—(১) গুপ্তবংশীয় ভূপতি মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বভারত জয় করিয়া "মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে "জীবনধারণ পরেমেশ্বর" নামক জনৈক বঙ্গের রাজা আদিত্য সেনকে বারংবার রাজ্য বিস্তারে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন (২) তিনি মালবের গুপ্তবংশীয় অন্যতম রাজা। তাঁহার পিতা মাধবগুপ্ত মালবদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মগধে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের রাজত্ব কালে নালন্দা বিদ্যাপীঠে একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৬৭২ খ্রীঃ)।

আদিদেব—তিনি বঙ্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত সচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের স্ত্রীর নাম সাঙ্গোকা ও পুত্রের নাম ভবদেব-বালবলভী ভুজঙ্গ। এই ভবদেব-বালবলভী ভুজঙ্গ বিক্রমপুরের অধিপতি হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন।

আদিধর্ম্ম ফা—মহারাজ আদিধর্ম্ম ফা ত্রিপুরার রাজবংশীয় ছিলেন। কৈলাড়গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। (বর্ত্তমান কৈলাসহর) তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আদিশূরের ন্যায় মিথিলা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীহট্ট দেশে স্থাপন করেন। সেই সময়ে মিথিলা দেশে (৬৪১ খ্রীঃ) বলভদ্র সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন। আদিধর্ম্ম ফার অনুরোধে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রীয় শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম নামে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ তিনি শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত বর্ত্তমান ভানুগাছ পরগণার মঙ্গলপুর গ্রামে উক্ত যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, মহারাজ আদিধর্ম্ম ফা ব্রাহ্মণদিগকে যে ভূমি দান করেন, সেই ভূমিই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পঞ্চখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ আছে। কিছু দিন পরে এই ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে গমনপূর্ব্বক আরও পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণসহ শ্রীহট্টে আগমনপূর্ব্বক স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, গৌতম ও স্বর্ণকৌশিক ছিলেন। এই আদিধর্ম্ম ফার সময় হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহাই ত্রিপুরাব্দ নামে প্রচলিত। ৫৯০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইহার আরম্ভ।

আদিনাথ—অন্য নাম ঋষভদেব। তিনি একজন রাজপুত রাজার পুত্র এবং বিনিতান নগরে তাহার জন্ম হয়। তাহার মাতা মেরুদেবী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে একটা ঋষভকে (বৃষকে) তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ঋষভদেব হয়। তিনি

জৈন ধর্ম্মের প্রথম (আদি) তীর্থঙ্কর বলিয়া আদিনাথ নামেও খ্যাত। তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে ভরত সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হিমালয়ের অন্তর্গত কৈলাসনগরে দেহত্যাগ করেন। আদিনাথের পুত্র বাহুবলও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কথিত আছে আদিনাথের ব্রাহ্মী নাম্নী কন্যা বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ। (অজিতনাথ দেখ)। তৃতীয় তীর্থঙ্করের নাম সম্ভবনাথ ছিল। তিনি শ্রাবস্তী নগরের এক রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জন্মের কথা শুনিয়া রাজা দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম সম্ভবনাথ হয়। তাঁহার সহস্রসংখ্যক শিষ্য ছিল। ঘোটক তাঁহার বাহন ছিল এবং তাঁহার গাত্রবর্ণ পীত ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। চতুর্থ তীর্থঙ্কর অযোধ্যার অন্তর্গত বনিতা নগরের রাজা সম্বরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সিদ্ধার্থরাণী। তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মিলে স্বয়ং ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই পুত্রের নাম অভিনন্দননাথ রাখা হয়। তাঁহার গাত্র স্বর্ণবর্ণ ও হনুমান তাহার বাহন ছিল। তাঁহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। পঞ্চম তীর্থঙ্কর সুমতিনাথ অযোধ্যার অন্তর্গত কঙ্কনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরপতি মেঘরথ ও মাতা রাণী সুমঙ্গলা। কথিত আছে গর্ভাবস্থায়ই রাণীর (সুমতি) বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার নবজাত পুত্র সুমতিনাথ নামে কথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রবর্ণ পীত এবং রক্তবর্ণ রাজহংস তাঁহার বাহন ছিল। তিনি শমেতশিখরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। কৌশাম্বির রাজপুত রাজা ধর ও রাজমহিষী সুসিমা হইতে ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গাত্র রক্তবর্ণ ছিল, এবং রক্তবর্ণ পদ্ম তাঁহর লাঞ্ছন ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। সপ্তম তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথ কাশীর রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা ছিলেন। রোগমুক্তির পর তাঁহার পুত্র লাভ হয় বলিয়া, তিনি পুত্রের নাম সুপার্শ্বনাথ রাখেন। স্বস্তিক চিহ্ন তাঁহার লাঞ্ছন ছিল, এবং তাঁহার গাত্র পীতবর্ণ ছিল। তাঁহার পাঁচ শত অনুগত শিষ্য ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। অষ্টম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভু নাথ চন্দ্রপুরীর রাজপুত রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে চন্দ্রকেই পানকরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ পূরণার্থ

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটী পাত্রে এমন কৌশলে জল স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পানার্থ প্রদান করা হয় যে, সেই জল পানকালে তাহাতে চন্দ্র, কিরণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। সেই জন্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভু হইল। তাঁহার গাত্রবর্ণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল এবং চন্দ্র তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। তিনি শমেত-শিখরে মোক্ষলাভ করেন। নবম তীর্থ-ঙ্কর সুবিধিনাথ কাণ্ডী নগরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পর রাজপরিবারের কলহবিবাদ চিরকালের জন্য অপসারিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম সুবিধিনাথ হয়। শ্বেতম্বরীদের মতে কুম্ভীর এবং দিগম্বরীদের মতে ককট তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। তাঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত ছিল। তিনি শমেত-শিখরে মোক্ষলাভ করেন। দশম তীর্থ-ঙ্কর শীতলনাথ ভদ্রপুর নামক স্থানের রাজার পুত্র ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা একবার জরাক্রান্ত হন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার শরীরের তাপ দূর করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে তাঁহার মাতা গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের তাপ দূর হইয়া যায়। শীতল-নাথও এইগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. তিনি কাহারও গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার তাপ দূর হইয়া শরীর শীতল হইত। এই জন্য তিনি শীতলনাথ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার লাঞ্ছন শ্রীবৎস স্বস্তিক ছিল। তাঁহার গাত্রবর্ণ পীত ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। একাদশ তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশ-নাথ। তাঁহার পিতা বিষ্ণুদেব সিংহপুরীনগরের রাজা ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার একটী সুন্দর সিংহাসন ছিল। কিন্তু সেই আসন একটী উপদেবতা অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহই তাহাতে বসিতে সাহস করিতেন না। তাঁহার মাতা সেই সিংহাসনে বসিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া, একদিন উপ-বেশন করিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না। এই কারণে পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম শ্রেয়াংশনাথ রাখা হইল। গণ্ডার তাঁহার লাঞ্ছন ছিল, এবং তাঁহার গাত্র পীতবর্ণ ছিল। শমেতশিখরে তিনি মোক্ষলাভ করেন। দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য চম্পা-পুরীর বসুপুজের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ইন্দ্র ও বসু তাঁহার পিতাকে পূজা করিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার নাম বাসুপূজ্য হয়। মহিষ তাঁহার লাঞ্ছন ছিল এবং তাঁহার গাত্র রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহার ছয়শত শিষ্য ছিল। চম্পাপুরীতেই তিনি মোক্ষ লাভ করেন। ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর বিমল-নাথ কাম্পিল্য পুরের রাজার পুত্র।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীসহ কোনও দানবীঅধ্যুষিত মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই দানবী তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। সেই লোকটী বিমলনাথের মাতার বুদ্ধিকৌশলে দানবীর হস্তহইতে মুক্তি লাভ করেন। সেই জন্য পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম বিমলনাথ রাখা হয়। তাঁহার লাঞ্ছন বরাহ এবং গাত্র স্বর্ণবর্ণ ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার ছয়শত শিষ্য ছিল। চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ অযোধ্যার রাজার পুত্র ছিলেন। রাণী, অনন্তনাথের জন্মের পূর্ব্বে একটী সীমাশূন্য (অনন্ত) মুক্তার মালা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য নবজাত পুত্রের নাম অনন্তনাথ রাখিলেন। শ্বেতাম্বরীদের মতে তাঁহার লাঞ্ছন বাজপাখী কিন্তু দিগম্বরীদের মতে ভল্লুক। তাঁহার গাত্র পীতবর্ণ ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথের পিতা রত্নপুরের রাজপুতবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে, রাজা ও রাণী নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছিলেন। সেই জন্য জাতকুমার ধর্ম্মনাথ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গাত্র স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার আটশত শিষ্য ছিল। তাঁহার লাঞ্ছন বজ্র। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ হস্তিনাপুরের রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে দেশে ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে শান্তিনাথের মাতা অনেক রোগীর গাত্রে জলসিঞ্চন করিয়া, তাহাদিগকে নীরোগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি স্বীয় নবজাত পুত্রের নাম শান্তিনাথ রাখিয়াছিলেন। শান্তিনাথ ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তীরাজা ছিলেন। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার নয়শত শিষ্য ছিল। তাঁহার গাত্র পীতবর্ণ ও লাঞ্ছন মৃগ ছিল। গজপুরের রাজা শিবরাজের পত্নী শ্রীদেবী সপ্তদশ তীর্থঙ্কর কুন্তুনাথকে প্রসব করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে রাণী এক কুন্তপূর্ণ রত্ন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহার নাম কুন্তুনাথ হয়। তিনি ভারতবর্ষে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন। ছাগ তাঁহার লাঞ্ছন ছিল এবং তাঁহার গাত্রবর্ণ পীত ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। হস্তিনাপুরের রাজা সুদর্শনের মহিষী দেবী অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর অরনাথকে প্রসব করেন। তাঁহার লাঞ্ছন নন্দাবর্ত্ত নামক স্বস্তিক। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। উনবিংশ তীর্থঙ্কর একজন নারী ছিলেন। তীর্থঙ্কর হইবার উপযোগী

তাঁহার সমস্ত সাধনা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ব-জন্মে তিনি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে সামান্য প্রতারণা করিয়া নারী তীর্থঙ্কররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা প্রভাবতী গর্ভাবস্থায় নানা পুষ্পের মল্ল (মালা) পরিধান করিতে অভিলাষী হইলে সমস্ত দেবদেবীরা তাহা আহরণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই জন্য তাঁহার গর্ভজাত কন্যা মল্লিনাথ নামে অভিহিত হন। কুম্ভ তাঁহার লাঞ্ছন ছিল। তাঁহার গাত্রবর্ণ নীল ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। দিগম্বর জৈনেরা মল্লিনাথকে নারী তীর্থঙ্কর বলিয়া স্বীকার করেন না। বিংশ তীর্থঙ্কর মুনিসুব্রত রাজগৃহের রাজা সুমিত্রের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা গর্ভাবস্থায় নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মুনিসুব্রত নামে অভিহিত হন। তাঁহার লাঞ্ছন কচ্ছপ এবং গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। একবিংশ তীর্থঙ্কর নমিনাথ মথুরার রাজা বিজয়ের পুত্র ছিলেন। বিজয় যখন শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, রাজমহিষী প্রাচীরসন্নিধানে আগমন করিলে তাহাকে নমস্কার করিয়া তাহারা প্রস্থান করিবে। রাজমহিষী প্রাচীর সন্নিধানে আসিলে, তাহারা প্রণাম ’রিয়া প্রস্থান করিলেন। সেইজন্য রাণীর গর্ভজাত পুত্র নমিনাথ নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার লাঞ্ছন কৃষ্ণবর্ণ পদ্ম এবং গাত্র পীতবর্ণ ছিল। তিনি শমেতশিখরে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ (অন্যনাম অরিষ্টনেমী) সৌরীপুরের রাজা সমুদ্রবিজয়ের পুত্র ছিলেন। নেমিনাথ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে রাজমহিষী একটি কৃষ্ণবর্ণ মণিবেষ্টিত রথচক্র দেখিয়া ছিলেন। সেইজন্য তিনি নেমিনাথ নামে কথিত হন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তাঁহার সমসাময়িক ও আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার লাঞ্ছন শঙ্খ ছিল এবং তাঁহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তিনি গিরনার পর্ব্বতে (গুজরাটে) মোক্ষলাভ করেন। কথিত আছে শঙ্কর নামে এক রাজা এবং যশোমতী নামে তাঁহার মহিষী তৃষ্ণার্থ সন্ন্যাসীগণকে জল দান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে রাজা শঙ্কর নেমিনাথ নামে তীর্থঙ্কর ও তাঁহার স্ত্রী সুরাটের এক বিখ্যাত রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মে তাঁহাদের বিবাহ দিবসেই তাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। (পার্শ্বনাথ দেখ)। চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর। (মহাবীর দেখ)। (২) অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একজন প্রসিদ্ধ যোগী। ‘গোরক্ষ সংহিতার’ রচয়িতা গোরক্ষনাথ এই আদিনাথের

পৌত্র। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

আদিমল্ল—নামান্তর গোপালমল্ল, তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনুমান ৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় হইতেই মল্ল শক প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, লাউগ্রামে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (মতান্তরে রামরুদ্র) নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর নিবাসী চোহানবংশীয় ক্ষত্রিয় কুমার রঘুবরসিংহ সস্ত্রীক নানা তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। দ্বারকেশ্বর নদ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লাউগ্রামের পথে শ্রীক্ষেত্রে যাইতে ছিলেন। পথে পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, রঘুবর পঞ্চাননের আলয়ে অতিথি হন এবং ভট্টাচার্য্যের গো-শালায় তাঁহার পুত্র গোপালের জন্ম হয়। সূতিকা গৃহেই মাতার মৃত্যু হয়। পিতা রঘুবরও পত্নী-শোকে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া অন্তর্হিত হন। নবজাত ক্ষত্রিয়শিশু বাগ্‌দী জাতীয়া ধাত্রীর স্তনদুগ্ধে ভট্টাচার্য্য ভবনে প্রতিপালিত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গোপালমল্ল প্রদ্যুম্নরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। এই পদে থাকিয়া তিনি ভীমবল মহাজি নামক কোন সাঁওতাল সামন্তের সাহায্যে সৈন্যদল গঠনপূর্ব্বক উত্তরস্থ জোতবিহার রাজ্য জয় করেন। ইহার পর আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গোপালমল্লের বিক্রমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যুবক সেনাপতির পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রদ্যুম্নরাজ গোপনে তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিলে, গোপালমল্ল কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া সাঁওতাল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণ করেন। প্রদ্যুম্নরাজ সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া জলাশয়ে ঝম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধজয়ের পর গোপালমল্ল মৃত রাজার অনূঢ়া কন্যা ধ্বজমণিদেবীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে ইন্দ্রপূজা সম্পন্ন করিয়া, প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পররাজ্য জয়ের পর প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুসারেই ইন্দ্রধ্বজ পূজার পর রাজার অভিষেক কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। ইন্দ্র স্বর্গের ও দেবতাদিগের রাজা, সেইজন্য তাঁহার ধ্বজা পূজা করা বিজয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে প্রজাগণের রাজা ঐ পূজা করিয়া থাকেন। এই উৎসবে সাঁওতালদের মেলা হয়। সাঁওতালেরা ইন্দ্রধ্বজ পূজার উৎসবকে ছাতাপরব বলে। ঐ উৎসব এখনও বিষ্ণুপুরে প্রচলিত আছে। আদিমল্ল লাউগ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহা বর্ত্তমান বাঁকুরা জিলার কোতলপুর থানার সন্নিকট। প্রদ্যুম্নপুর আধুনিক পদুমপুর।

আদিল শাহ শূর — দিল্লীর সম্রাট সের শাহ শূরের ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র। মোহাম্মদ আদিল শাহ শূরের সাধারণ নাম আদ্‌লি বা আন্দেলি (অন্ধনারী)। আদিল শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণ। তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন না বলিয়া তাঁহাকে আন্দেলি বলিত। তাঁহার প্রকৃত নাম মুবারিজ খাঁ। তাঁহার পিতার নাম নিজাম খাঁ। হিঃ ৯৬০ (১৬৫০ খ্রীঃ) অব্দের শেষ ভাগে তিনি ইসলাম্ শার উত্তরাধিকারীরূপে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি হিমুর সাহায্যে কাল্পির পূর্ব্ব দিকে ছাপ্পার ঘাটে বঙ্গদেশের অধিপতি মোহাম্মদ শাহকে পরাস্ত করেন। মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সুরাজগড়ে বঙ্গের সুলতান বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক তিনি হিঃ ৯৬৪ (১৬৫৪ খ্রীঃ) সালে পরাজিত হন।

আদিশূর—বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজা। প্রজারঞ্জক ও পরাক্রান্ত রাজা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। পুত্র কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য তিনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেই তখন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত ছিল। এইজন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিয়াছিল। তজ্জন্যই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হয়। তৎসঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। আদিশূরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এক মত নহেন। এই রাজা দেশে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। আদিশূরই তাঁহার বংশের শেষ রাজা। তৎপর তাঁহার বংশ লোপ পায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড়) তাহার রাজধানী ছিল। রাজত্ব কাল ৭৩২-৭৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি দাতা ও বদান্য নরপতি ছিলেন। তিনি বহু পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ও বৈভবে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী বিদেশীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। নাগরিকদের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে নগরী শোভমানা থাকিত। আদিশূরের পিতা মাধবশূর এবং পিতামহের নাম কবিশূর। কবিশূর উত্তর রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণের অধীশ্বর ছিলেন। আদিশূরের রাজধানীতে কার্ত্তিকেয়দেবতার নয়ন মুগ্ধকর এক মন্দির ছিল। তথায় উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্যগীত, নাটকাভিনয় প্রভৃতি হইত। নগরের সমৃদ্ধি তখন পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

আনন্দ (বৌদ্ধ ভিক্ষু)—ভগবান গৌতম বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং অনুচর। বৌদ্ধ সঙ্ঘে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। আনন্দ বুদ্ধের পিতৃব্য পুত্র এবং বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য তিনি নিত্য সঙ্গী একজন পরিচারক চাহিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বিভিন্ন ভিক্ষু বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

সারিপুত্র প্রভৃতি বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ প্রার্থী হইলে, তিনি কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। ভিক্ষুগণ আনন্দকে প্রার্থী হইতে উৎসাহিত করিলে, আনন্দ ভগবান বুদ্ধের নিকট নিম্নলিখিত আটটী প্রার্থনা পূর্ণ করার অঙ্গীকারে অনুচর হইতে স্বীকৃত হন (১) ভগবান আমাকে সুন্দর বস্ত্র অর্পণ করিবেন না। (২) লোকে ভগবানকে যে খাদ্য প্রদান করিবে, তাহার অংশ আমি গ্রহণ করিব না। (৩) আমার জন্য স্বতন্ত্র কুটীর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। (৪) ভগবানকে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সেই নিমন্ত্রণে ভোজন করিব না। (৫) আমি যে স্থানে নিমন্ত্রিত হইব ভগবান সেই স্থলে গমন করিবেন। (৬) যাহারা ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইতে পারিব। (৭) আমার মন যখন চঞ্চল হইবে বা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিবে, তখন আমি ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব। (৮) ভগবান পূর্ব্বে একবার যে উপদেশ দিয়াছেন আমি জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তাহার পুনরুক্তি করিবেন। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের এই আটটী প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময় হইতে আনন্দ পঁচিশ বৎসর ছায়ার ন্যায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন। আনন্দ নিরীহ, নিঃস্বার্থ, কর্ম্মদক্ষ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। তিনি অতিশয় পণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন। তিনি রাজা শুদ্ধোধনের ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র ছিলেন। তিনি ও বুদ্ধদেব একদিনেই জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ একদিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বদা মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের সঙ্গে থাকিতেন ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ সমূহ অতি মনোযোগের সহিত শুনিতেন ও অপরকে অতি মিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। হীনযান (স্থবির বাদী) বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর রাজগৃহের সন্নিকটস্থ সপ্তপর্ণীর গুহায় যে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি (সম্মিলন) হয়, তাহাতে আনন্দ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর সঙ্কলনে বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি ভাণ্ডাগারিক উপাধি লাভ করেন। বুদ্ধ নারীজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। সে জন্য তিনি প্রথমে নারীকে তাঁহার সঙ্ঘে স্থান দেন নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পালিকা মাতা (মাতৃস্বসা) গোতমী (মহাপ্রজাবতী) প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ করিলে, বুদ্ধদেব তাহাতে অসম্মত হন। কিন্তু আনন্দের বিশেষ অনুরোধে পরে

নারীদিগকেও সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে সম্মত হন। প্রকৃত পক্ষে আনন্দের যত্নেই ভিক্ষুণীগণ বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। (২) সংস্কৃত কবি। তিনি 'মাধবানলকথা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সুন্দর গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই রচিত। গদ্যাংশ সংস্কৃত এবং পদ্যাংশ প্রাকৃত। তিনি ভট্টবিদ্যাধরের শিষ্য ছিলেন। (৩) কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের অমাত্য। হর্ষদেবের আদেশে মড়ব রাজ্যস্থিত হোলডা ডামর ও লবণ্য ডামরদিগকে তিনি বিনাশ করেন। পরে তিনি রাজদ্রোহী উচ্চলের হস্তে নিহত হন। (৪) কাশ্মীরপতি উচ্চলের মাতুল। উচ্চল যখন কাশ্মীর সিংহাসন লাভের জন্য হর্ষদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আনন্দ মড়ব রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। পরে তিনি হর্ষদেবের সেনাপতি চন্দ্ররাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

আনন্দ কৃষ্ণ বসু—কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরেজিতে তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি খুব কম ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত, গ্রীক্, ল্যাটিন, হিব্রু, উর্দ্দু, ফরাসী ও ফার্শী ভাষাতেও বুৎপন্ন ছিলেন। বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক শব্দের একখানি অভিধান রচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। পুস্তকদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তদানীন্তন বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্য আলোচনায় সাহায্য গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকটে ইংরেজি শিক্ষা করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দগিরি—(১) ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ত্রোটক আনন্দগিরি নামে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু টীকাকার আনন্দগিরি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। (২) শুদ্ধানন্দের শিষ্য। তিনি শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থ এবং উপনিষদাদির টীকা, বেদান্তসূত্রের টীকা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দির লোক ছিলেন।

আনন্দ চন্দ্র নন্দী—বাঙ্গালী সাধক। ইহার নিবাস ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রাম। সাধারণে সাধক আনন্দস্বামী নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী ইহার পিতা। আনন্দচন্দ্র সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে বহুল প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা জিলার অপর প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত রচয়িতা মনোমোহন দত্ত আনন্দচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীও একজন খ্যাত নামা সাধক ছিলেন।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—একজন কবি ও গ্রন্থকার। 'হেলেনা কাব্য', 'মিত্রকাব্য', 'প্রেমানন্দ', 'ভারত-মঙ্গল', 'মাতৃমঙ্গল', 'প্রবন্ধ-সার', 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র, মাতা কালীতারা দেবী। তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। আনন্দচন্দ্র সঙ্গীত রচনায়ও বিশেষ পটু ছিলেন। পথিক ভণিতা যুক্ত তাঁহার অনেক মনোহর সঙ্গীত আছে। তাঁহার "ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা বালা" এই সঙ্গীতটী এক সময়ে সর্ব্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবি সমাজে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে যে ধর্ম্মযুগের প্রবর্ত্তন হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া, তিনি 'ভারত-মঙ্গল' নামে এক কাব্য রচনা করেন। ১৩১০ সালের পৌষ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত "গাওরে আনন্দে সবে, জয় ব্রহ্ম জয়" সঙ্গীতটী এখনও ব্রহ্মমন্দিরে একসঙ্গে বহুকণ্ঠে ভক্তিভরে গীত হইয়া থাকে।

আনন্দচন্দ্র রায়—পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ জননায়ক এবং ঢাকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহার জীবা। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের (১২৫১ সাল) শ্রাবণ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুর জিলায় ছিল। সে স্থান এখন পদ্মাগর্ভে। আনন্দচন্দ্রের পিতা গৌরসুন্দর রায় ঢাকাতে (J. P. Wise.) জে, পি, ওয়াইজ নামক এক নীলকুঠীর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। আনন্দচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া ঢাকা পোগোজ (Pogose) স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তথা হইতে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে, পিতার পরামর্শে তিনি উকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঢাকায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়তে আনন্দচন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। এককালে তাঁহাকে কোনও মকর্দ্দমায় নিযুক্ত করিতে হইলে, তৎকালীন অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল স্যর চার্লস্ পল এর তুল্য পারিশ্রমিক দিতে হইত। দীর্ঘকালব্যাপী আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া তিনি বহু জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মকর্দ্দমা কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়া যশঃ লাভ করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও আনন্দচন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। সেই

বৎসর মাদ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির (Congress) যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ঢাকার পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে আনন্দচন্দ্র বলিয়া পাঠান যে, কংগ্রেস যদি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন, তবে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিবে। স্বনাম খ্যাত লালমোহন ঘোষ সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। উপরোক্ত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আনন্দচন্দ্র, অশেষ প্রতিপত্তিশালী, সরকার অনুগৃহিত ঢাকার নবাব বাহাদুরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই। ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট হেয়ার সাহেব আনন্দচন্দ্রকে দমন করিবার বিশেষ চেষ্টা পান। ঐ সময়ে তাঁহাকে একটা হত্যা সংশ্লিষ্ট মকর্দ্দমায় আসামী করা হয়। আনন্দচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক দক্ষতা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। হাইকোর্টে সেই মকর্দ্দমা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়, তিনি সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, তিনিই প্রথম ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর বে-সরকারী অধ্যক্ষ (Chairman) নির্ব্বাচিত হন। ঢাকার অন্যতম জনহিতকর সঙ্ঘ পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন (Peoples' Association) এর তিনি একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের জমিদারদিগের সঙ্ঘ (East Bengal Land Holders Association) ও তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টী ও তাহার কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা নগরীতে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (Bengal Provincial Conference) হয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া এক অতি মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া, তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু জনহিতকর কার্য্যের সহিত যোগ ছিন্ন করেন নাই। তিনি নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধারণের অনেক মঙ্গলসাধক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। বহু দুস্থ পরিবার নিয়ম মত তাঁহার অর্থ সাহায্য লাভ করিত এবং অনেক দরিদ্র ছাত্রের তিনি ভরণপোষণ করিতেন। সংস্কৃত শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার পত্নী আনন্দময়ী দেবী, তাঁহার তিন বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আনন্দচন্দ্র সহধর্ম্মিণীর নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আগ্রার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও "কতকাল

পরে, বল ভারত রে", "যমুনা লহরী" প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা গোবিন্দ চন্দ্র রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন দাস (S. R. Das) এর পিতা স্বনামখ্যাত দুর্গামোহন দাস, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, প্রভৃতি জননায়কগণ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের (India Council) প্রথম ভারতীয় সদস্য কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (Sir K. G. Gupta) পিতার সহিত মনোমালিন্যের পর ইংলণ্ডে গমন করিলে, আনন্দচন্দ্র বহুকাল তাঁহার ব্যয়ভার বহন করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এক বার তিনি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্মাটারে অবস্থিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস ভবন ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ট্রাষ্টীগণ তাহাতে সম্মত হন নাই। মৃত্যু ১৩৪২, কার্ত্তিক।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি— অনুমান ১২১০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ভট্টপল্লী গ্রামে কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ঔরসে ও মাতা সোণামণি দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া কাব্য ও নাটক পাঠ করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতাবান্ কবি ও পাঁচালীকার ছিলেন। 'সুবল-সংবাদ', 'অক্রূরসংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'উদ্ধবসংবাদ' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ফাল্গুন মাসে প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

আনন্দচাঁদ গোস্বামী— বীরভূম জেলার সুপুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি মহাপণ্ডিত, পবিত্রচেতা, ন্যায়-পরায়ণ ও দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং জীবনে কঠোরব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। ব্রত, উপবাস এবং দেবার্চ্চনা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তৎকালীন বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার বলিতেন। গোস্বামী প্রভুর দৈবশক্তি বিষয়ে বহুবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি নিজ ক্ষমতায় প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ পুষ্করিণী, সুবিশাল উদ্যানশোভিত অট্টালিকা প্রভৃতি আজও জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। লোকে তাঁহাকে যোগিনীসিদ্ধ বলিত এবং ইহারই দ্বারা তিনি অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া মনে করিত। অনুমান ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে তিনি অলৌকিক শক্তি বলে বর্গীদের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন।

আনন্দ চালু—মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী ও রাজনৈতিক। দাক্ষিণাত্যের যে কয়জন দেশপ্রিয় লোক স্বীয় সৎকার্য্য দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কর্তৃক তজ্জন্য বিদ্যাবিনোদ উপাধি প্রাপ্ত হন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে রাও বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। মহাজন সভা স্থাপন, পিপল্‌স্ মেগাজিন নামক পত্রিকাসম্পাদন, এবং মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য রূপে কার্য্য করিয়া তিনি দেশের মহদুপকার সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। বড়লাট সভার সদস্যরূপেও তিনি জাতির কল্যাণ সাধনে তৎপর ছিলেন। জন্ম ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ এবং মৃত্যু ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাস।

আনন্দতীর্থ—শঙ্কর মতাবলম্বী শৈব সন্ন্যাসী। তিনি পরে বৈষ্ণবমতাবলম্বী হন এবং দ্বৈতমতের মাধ্ব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামেও খ্যাত। সাংখ্যযোগের পথে সাধনা করাই এই ধর্ম্ম মতের বিশেষত্ব। ১৩৩১ খ্রীঃ অব্দে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আনন্দদাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত তিনটী মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'জগদীশ চরিত্রবিজয়' নামক একখানা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ও পিতৃবন্ধু জগদীশ পণ্ডিতের জীবনচরিত। গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। গ্রন্থের রচনা দুইশত বৎসরেরর পূর্ব্বে বলিয়া অনুমিত হয়।

আনন্দনাথ—তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। নাটোরের রাজযোগী সাধক প্রবর রামকৃষ্ণ যখন সাধনার জন্য বীরভূমের অন্তর্গত তারাপুরে গমন করেন, তখন তিনি তথায় বাস করিতেন। নাটোরের মহারাজা আনন্দ নাথের পাণ্ডিত্য, আচারনিষ্ঠা, তান্ত্রিকী সাধনার রহস্যজ্ঞতা, ও সদ্‌ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মাতৃমন্দিরের সর্ব্বাধ্যক্ষতা প্রদান করেন। আনন্দ নাথ মন্দিরের প্রধান কৌলিকের পদে বৃত হইয়া তারাপুরে তন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আনন্দনারায়ণ রায় — লর্ড কর্ণ ওয়ালিসের সময়ে তিনি উত্তর বঙ্গের লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। তাঁহারই বংশধর রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ইংরেজ সরকার হইতে রাজাবাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন।

আনন্দপাল সাহি—সাহিরাজ্যাধিপতি সাহি জয়পালের পুত্র। গজনীপতি

সুলতান মামুদ উত্তরাপথের সাহিরাজ্য আক্রমণ করিলে তাঁহার গতিরোধ করিতে গিয়া আনন্দ পালের পিতা নিহত হন এবং তিনি কর প্রদানের অঙ্গীকারে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পরাজয় জনিত অপমানে ও দুঃখে পরে প্রাণত্যাগ করেন। সুলতান মামুদের ক্রমাগত প্রবল আক্রমণে আনন্দপাল পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণের প্রতি-রোধ করিতে বিপুল চেষ্টা করেন। ৪০৫ হিজরীতে আনন্দপাল পরলোক গমন করেন। আনন্দ পালের পুত্রের নাম ত্রিলোচন পাল। সম্ভবতঃ তিনি ৯৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আনন্দ পাল—কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আউল চাঁদ ফকিরের প্রধান বাইশ জন শিষ্যের অন্যতম। আউল চাঁদ দেখ।

আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর — তিনি সম্ভবতঃ ১২০৫—১৩০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাগুরু শ্বেতগিরি, দীক্ষাগুরু অভয়ানন্দ। তিনি শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের' উপর 'ফক্কিকা বিভঞ্জন' নামক টীকা, বাদীন্দ্রের 'মহাবিদ্যা বিড়ম্বনের' টীকা, পদ্মপাদের 'পঞ্চপাদিকার' টীকা, সুরেশ্বরের, 'ব্রহ্ম-সিদ্ধির' উপর 'ভাবশুদ্ধি' নামক টীকা প্রকাশাত্ম যতির পঞ্চপাদিকা বিবরণের উপর 'সমন্বয় সূত্র বিবৃতি' নামক টীকা, মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের উপর 'টীকারত্ন' নামে এক টীকা, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক কার্ত্তিকের উপর 'ন্যায়কল্পলতিকা' নামে এক টীকা, বৈশেষিক মতে 'ন্যায়চন্দ্রিকা' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দবর্দ্ধন— খ্রীঃ নবম শতাব্দীর এক জন সংস্কৃত কবি। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কাব্যসমালোচকও ছিলেন। তাঁহার 'দেবীশতক' নামক পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থমধ্যে অপভ্রংশ প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধন্যালোক' নামে তিনি একখানা শব্দ-শাস্ত্রও প্রণয়ন করেন। অভিনবগুপ্ত 'লোচন' নামে তাহার একখানা টীকা রচনা করেন।

আনন্দবর্ম্মা—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বেত্তা। তিনি 'চিকিৎসা-সার-কৌমুদী' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দবৈদ্য—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বেত্তা। তিনি 'যোগমালা' নামে এক-খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক—১২২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'ন্যায়মকরন্দ', 'প্রমাণ-মালা', 'ন্যায়-দীপাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈত মতের সমর্থন করিয়া-ছিলেন। তিনি 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের' একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বেদান্তসিদ্ধান্ত-সূক্তিমঞ্জরীকার গঙ্গাধর সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন।

আনন্দভট্ট—ষোড়শ শতাব্দীর একজন চরিতাকার। তিনি 'বল্লাল চরিত' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দভারতী—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ।'

আনন্দময়ী—কবি লালা রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। তাঁহার পিতা লালা রামগতি তৎকালে ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম অযোধ্যা-রাম কবীন্দ্র। তিনিও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দময়ীই পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। পিত্রালয়ে থাকিতে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া তাঁহার পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক তিনি চিতারোহণ করেন। একদা মহারাজা রাজবল্লভ আনন্দময়ীর পিতার নিকট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি চাহিয়া পাঠান, তখন পিতা রামগতি সেন দীর্ঘকাল ব্যাপী একটী পুরশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় আনন্দময়ী বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করতঃ নিজাঙ্কিত যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতিসহ রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন। আর একবার রাজা রাজবল্লভের প্রধানপণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র শ্রীহরি তর্কালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানা শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন। ইহাতে অনেক ভ্রম থাকায় বিদ্যাবাগীশের নিকট আনন্দময়ী পুত্রকে শিক্ষাদানে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার খুল্লতাত জয় নারায়ণ সেন, 'হরিলীলা', 'চণ্ডিকা-মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই হরিলীলা গ্রন্থপ্রণয়নে ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী খুল্লতাত জয়নারায়ণকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে হরিলীলা গ্রন্থ রচিত হয়। কথিত আছে পিতৃব্য জয়নারায়ণ অসমর্থ হইলে, আনন্দময়ী সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করিয়া নিম্নলিখিত দুই চরণে দশাবতার বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম,
খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম।"

আনন্দমোহন বসু—প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবী ও রাজনৈতিক নেতা। ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মলোচন বসু। তাঁহার জন্মসময়ে পিতা পদ্মলোচন বসু ময়মনসিংহে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে পাঠ আরম্ভ করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমশ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এফ্‌-এ এবং বি-এ পরীক্ষায়ও তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং

গণিতে এম্ এ পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। উপাধি বিতরণের সময় ভাইস্ চেন্‌সেলার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিত্থালয়ের সর্ব্বোত্তম ছাত্রও তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে গণিতের প্রশ্নোত্তর লিখিতে পারেন না। তিনি 'প্রেমর্চাদ রায়র্চাদ' বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিত্থালয়ের রেঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই গৌরব লাভ করেন নাই। তিনি ইংলণ্ডে চারি বৎসর থাকিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আইন ব্যবসায়েও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা একমাত্র আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে, তিনি শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মহান্ প্রকৃতি যশোলাভস্পৃহায় বিমুগ্ধ না হইয়া, দেশের নানা বিভাগের সৎকার্য্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উজস্বিনী বাগ্মীতা এবং অনন্তসাধারণ প্রতিভা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের স্তরে স্তরে বিত্থমান থাকিয়া লোকোত্তর উজ্জল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার অমানুষিক শক্তি, কি শিক্ষা বিভাগে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্ম সমাজে, সর্ব্বত্র সমুজ্জল ভাবে ফুটিয় উঠিয়াছিল। তিনি শিক্ষা বিভাগে বিশ্ববিত্থালয়ের সভ্যরূপে অনেক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান 'রায়চাঁদ প্রেমর্চাদ' পরীক্ষায় যে নূতন নিয়ম প্রচলন হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার প্রস্তাব প্রধান ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভূ-বিত্থা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিত্থালয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং তাহার ফলে তদানীন্তন ডিরেক্টর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূ-বিত্থা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। গুণগ্রাহী লর্ড রিপন তাঁহাকে শিক্ষা কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচন করেন। তিনিই ঐ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন। আনন্দমোহনের প্রধান কীর্ত্তি সিটিকলেজ ও বেথুন কলেজ। অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগীতায় প্রথম সিটিস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে উহা কলেজে পরিণত হয়। তাঁহারা দুজনেই ইহার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিলেও আনন্দমোহন আজীবন উহার পশ্চাতে থাকিয়া অর্থেও সামর্থ্যে উহার পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার সমুদয় কর্ত্তৃত্ব ও সিটিকলেজের সকল ভার কতিপয় ট্রাষ্টীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন ইংলণ্ডে অবস্থান কালে বঙ্গমহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী ও দুর্গামোহন দাস মহাশয়দ্বয়ের উত্থোগে "হিন্দু মহিলা বিত্থালয়" নামে এক স্কুল

স্থাপিত হয়। বিলাত প্রত্যাগত আনন্দমোহন, দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া বালীগঞ্জে এক উদ্যান বাটীতে "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন এবং তাঁহারা উভয়েই উহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। কালক্রমে ঐ বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমোন্নতিতে কলেজে পরিণত হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে আনন্দমোহনের স্বদেশসেবা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পন করেন। সেই সভা (Indian Association) আজও জীবিত থাকিয়া দেশের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজসভায় (Parliament) ভারতীয় রাজনীতির আন্দোলনের সূত্রপাত তাঁহাদ্বারাই হইয়াছিল। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বিলাতে বক্তৃতা দিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে তিনি চমৎকৃত করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থ্য লাভ উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অসুস্থ দেহেও তিনি নানা স্থানে নানা ভাবে অবিরাম ভারতের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বিশ্রাম গ্রহণের পরিবর্ত্তে কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎফলে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তখন দেশবাসী তাঁহাকে যে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কলিকাতা টাউন হলে অভ্যর্থনার জন্য আহূত সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই মূর্চ্ছা রোগের আক্রমণেই পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। অখণ্ড বঙ্গভবনের (Federation Hall) ভিত্তি স্থাপনের দিন দেশ আর এক অতুলনীয় দৃশ্য দেখিয়াছে। রোগশয্যায় শায়িত আনন্দমোহন ভক্তগণের স্বন্ধে ভর করিয়া ক্ষীণ কম্পিত হস্তে অটল বিশ্বাসের সহিত প্রসন্নবদনে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। আনন্দমোহনের অদম্য উৎসাহ, অপরিসীম উদ্যম, গভীর ধর্ম্মভাবের তুলনা নাই। মদ্যপানে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, যে সব দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তি এই দুর্গতি দূর করিবার মানসে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন আনন্দমোহন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সমাজসংস্কারকরূপে, শিক্ষাবিভাগে ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলই তাঁহার গভীর ধর্ম্মজীবনের উৎসরূপে উৎসারিত হইয়া শোভাময় হইয়াছিল। যে সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন

করেন, সেই সময়ে, পঠদ্দশয়াই আনন্দ মোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম্মই তাঁহার এক মাত্র সাধনার বস্তু, একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মের নির্দ্দেশ না বুঝিয়া তিনি একটী পদক্ষেপও করিতেন না। বিনয়ও আনন্দমোহনের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

আনন্দমোহনের পিতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রগণের অপ্রাপ্ত বয়সেই দেহত্যাগ করেন। বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও সন্তানগণের শিক্ষার ভার মাতা উমাকিশোরীর উপর পতিত হয়। এই মহীয়সী মহিলা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, দৃঢ় চিত্তা ও ধার্ম্মিকা নারী ছিলেন। স্বকীয় বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মাচরণে তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। ধর্ম্ম মতে পুত্রেরা ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেও তিনি তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার পথে অন্তরায় হন নাই। তাঁহার সমক্ষে কেহ পুত্রগণকে বিধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিলে তেজের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার পুত্রের ঈশ্বরপূজক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁহার মাতার ধর্ম্ম অনুসরণ করে না বলিয়াই বিধর্ম্মী হইতে পারে না। তিনি পুত্রদের সর্ব্বদাই ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও দেবতায় ভক্তি রাখিয়া সকল কাজ করিতে বলিতেন। মৃত্যু ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দ।

আনন্দরঙ্গ পিলে — তিনি ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাজ সহরের উপকণ্ঠে পেরম্বোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিরুবেঙ্কট পিলে। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। বোম্বাই নগরে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উইল্‌সন্ কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। তৎপর ঐ কলেজের স্কুল বিভাগে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে ১৮৭৩—১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত হোলকাররাজ্যের দেওয়ান স্যর তাঞ্জোর মাধব রাওয়ের আহ্বানে ইন্দোরের ন্যায়াধীশের (প্রধান বিচারপতি) পদ গ্রহণ করেন। বরোদা রাজ্য তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল ছিল। তথায় নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া অবশেষে প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বরোদা রাজ্যের আদালতে গুজরাটী ভাষার পরিবর্ত্তে মারাঠী ভাষার প্রচলন করেন। তাঁহার আনুকুল্যে ও উৎসাহে অনেকে মারাঠী ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'হিম্মত বাহাদুর' নাটক, সেক্সপিয়ায়ের হ্যামলেটের অনুবাদ ও 'উগাচী জবানী'

নামক পুস্তক কর্ণেল মেঞ্জার টেলারের ইংরাজীর অনুবাদ। মারাঠী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থদ্বয় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। আত্মীয়ের অনুরোধে তিরুবেঙ্কট পিলে পণ্ডিচেরীতে যাইয়া বাস করেন। এখানেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তদানীন্তন ফরাসী গভর্ণর আনন্দরঙ্গ পিলেকে তাঁহার পিতার স্থানে দোভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে ডুপ্লে (Mr. (Duplex) ফরাসী অধিকৃত ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন আনন্দরঙ্গ পিলে তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করিয়া অধিকতর সম্মান লাভের অধিকারী হন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার লিখিত 'দৈনন্দিন লিপি নামা' ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

আনন্দ রাও সখারাম বর্বে—মহারাষ্ট্রের দাক্ষিণ কোঙ্কনের অথনী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে দরিদ্র পিতার গৃহে কষ্ট স্বীকার করিয়া শিক্ষা লাভ করেন। পিতা সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—তিনি আসাম প্রদেশের গৌহাটীতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আসামবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ডেপুটি কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। ইংরাজী, আসামী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তিনি পিতা হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের ন্যায়ই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধারে সাহিত্যসেবী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। আসামের স্কুল ও আদালতে পূর্ব্বে বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল। আনন্দরামের উদ্যোগে উভয় স্থানেই বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে আসামী ভাষা প্রচলিত হয়। তিনি বহু আসামী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া অসমীয়া সাহিত্যকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'আইন ও ব্যবস্থা' নামক বাঙ্গালা গ্রন্থ, বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্র, ইংলণ্ডীয় আইন গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন আইন ও সার্কুলার এবং আদালতের নাজিরের সারাংশ সংগ্রহ আছে। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি পরলোক গমন করেন। বঙ্গদেশের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় আসাম প্রদেশে আনন্দরাম ফুকন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছাতক নিবাসী আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী

আনন্দী কবি নামেও খ্যাত। সম্ভবতঃ তিনি ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ 'পদ্ম-পুরাণ' গ্রন্থ এখনও ছাতক, ঢুলালী প্রভৃতি স্থানে পঠিত হইয়া থাকে। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর।

আনন্দরাম বড়ুয়া—১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে আসাম প্রদেশের গৌহাটীতে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম গর্গরায় বড়ুয়া, মাতা দুর্লভেশ্বরী। ইনি জমিদার বংশসম্ভূত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গৌহাটীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। ১৮৬৯ সালে রাজকীয় বৃত্তি ও "গিলক্রাইষ্ট" বৃত্তি লইয়া বিলাত গমন করেন। তিন বৎসর কাল তথায় থাকিয়া, সিভিল সার্ভিস ও বারিষ্টারী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে পঞ্চম। সিভিলসার্ভিস্ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন। বঙ্গের সুসন্তান আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিলাতে আনন্দরামের সহপাঠী ছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ফরাসী ভাষা এরূপ উৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, ফরাসী ভাষায় কথোপকথন কালে তাঁহার সুললিত উচ্চারণে সকলে বিস্মিত হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে বিশেষ পরীক্ষা দিয়া দুই হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে আসামে পরে বঙ্গদেশের নানাস্থানে উচ্চপদের রাজ কার্য্য করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। দায়ীত্বপূর্ণ রাজকীয় উচ্চপদে থাকিয়াও তিনি সাহিত্যসেবায় নিরত থাকিতেন। বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থখানি অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই প্রতিভাশালী স্বনামধন্য পুরুষ মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। আজীবন কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন কাটাইয়াছেন। বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তাঁহার পুস্তকাগারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন এই আমার ভার্য্যা।

আনন্দরাম রায় (রাজা)—তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁঠীয়ার রাজা নীলাম্বর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার জীবিতকালেই তিনি দিল্লীর সম্রাট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রতিকান্ত কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিয়া রাজ্য লাভে

বঞ্চিত হন। আনন্দরামই সমস্ত রাজ্য লাভ করেন। বৎসাচার্য্য দেখ।

আনন্দরাম লালা—শ্রীহট্ট সহরবাসী আনন্দরাম লালা সাহুকুলসম্ভূত ছিলেন। তাঁহারই সময়ে দশশালা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয় এবং তিনিই সেই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে রত ছিলেন। ইংরেজ আমলের প্রথমে তিনি শ্রীহট্টের কার্য্য কারকের সহকারী ছিলেন। লালা এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সঙ্গীত রচনা করিতেন। দেশের বড় বড় জমিদার লালার অনুগত ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আনন্দরাম শুকুল—নাটোরের রাজা রঘুনন্দনের অন্যতন সেনাপতি। একবার ভাতুড়ীয়ার রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণের সহিত রাজা রঘুনন্দনের ঘোরতর যুদ্ধ হইরাছিল। এই যুদ্ধে আনন্দরাম বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।

আনন্দরায় মখী—তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্পয় দীক্ষিতের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। "বিদ্যাপরিণয়" ও "জীবানন্দ" নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহারই রচিত।

আনন্দলাল রায় চৌধুরী—ইনি খুলনা জিলার টাকীর জমিদার বংশীয়। ইহাঁদের পদবী বসু। সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্‌কালে তিনি জল পথে নৌকা যোগে পশ্চিম দেশে গিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়া পরে অযোধ্যাপ্রবাসী হন। বিদ্রোহীদের ভয়ে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণ চতুর্দ্দিকে যখন পলায়ন করিতে আরম্ভ করিতে থাকে তখন আনন্দকৃষ্ণ কানপুরে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার চণ্ডীচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে লক্ষ্ণৌএ আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তখন উক্ত অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই। স্থানীয় লোকদের মধ্যে রাজা ও জমিদারগণের অনুকরণে কেবল অসার আমোদ প্রমোদের প্রাবল্য লক্ষিত হইত। আনন্দকৃষ্ণ ও অপর কয়জন বাঙ্গালীর সংশ্রবে আসিয়া বিলাসী জমিদারবর্গ ও জনসাধারণের মতিগতি অতি অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অযোধ্যা প্রদেশের জমিদারবর্গ সুশিক্ষার জন্য আনন্দকৃষ্ণের নিকট বিশেষ ঋণী। রাজপুরুষগণের নিকটেও আনন্দকৃষ্ণ ঐ বিষয়ে বহুলরূপে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎ কাল ভিঙ্গরা রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন এবং পরে দেওয়ান রণবিজয় বাহাদুরের কুহুয়া তালুকের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও অধিকার ছিল। লক্ষ্ণৌএর নবাবের

চৌলক্ষি মহল নামক বৃহৎ অট্টালিকা তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন।

আনন্দ শ্রাবক—তিনি জৈন পুরাণ মতে, পেড়াল নামক ষষ্ঠ ভাবী তীর্থঙ্কর হইবেন। অমর (২৬শ ভাবী তীর্থ-ঙ্কর) দেখ।

আনন্দ সিদ্ধ—একজন বিখ্যাত আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তিনি 'আনন্দ-মালিকা যোগশাস্ত্র' নামে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দ সূরী—জৈন ধর্ম্মাচার্য্য মহেন্দ্র সূরীর শিষ্য আনন্দ সূরী ও অমরচন্দ্র সূরী বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন।

আনন্দানুভব—একজন শাস্ত্রবেত্তা। তিনি 'রস নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

আনন্দীবাই জোশী — বোম্বাই প্রদেশের কল্যাণ নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম গণপত রাও অমৃতেশ্বর জোশী। ইহাঁর পিতৃদত্ত নাম যমুনা। বাল্যাবস্থায় তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ গোপালবিনায়ক জোশীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তৎপর আনন্দীবাই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে একাকী ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ফিলাডেলফিয়া নগরে চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত এবং উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে তিনি কোল্হাপুর এলবার্ট এডওয়ার্ড হাঁসপাতালের স্ত্রী বিভাগের চিকিৎসকরূপে কার্য্য করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ২৭শে মে যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার চিতাভস্ম আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া তথায় প্রোথিত হয়।

আনন্দীরাম রায়—তিনি তাহির পুরের রাজা কংসনারায়ণের শেষ বংশ-ধর রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের একমাত্র কন্যা উমাদেবীকে বিবাহ করিয়া তাহিরপুর রাজ্য লাভ করেন। বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশ তাঁহার অনুজ বিনোদ রায়ের বংশধর।

আনর খাঁ—খুলনা জিলার প্রসিদ্ধ দরবেশ খাঁজাহান আলীর সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ তিনি খুলনা জিলায় আগমন করেন। তিনিও একজন বিখ্যাত ফকির ছিলেন। বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী বাগমারা গ্রামে আনর খাঁ নামীয় দীঘি ও মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

আনার কালী — অন্যনাম নাদিরা বেগম। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে জীবিতা ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে, কাহারও মতে তিনি একজন রাজ-কুমারী ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন তিনি একজন পরিচারিকা মাত্র ছিলেন। তিনি যে একজন পরমা সুন্দরী ছিলেন, এবং কোন রাজকুমার তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লাহোর নগরে আনার কালী নামক স্থানে এখনও তাঁহার সমাধি আছে।

আনাসহিদ, পীর—বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত নলহাটী নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে আনাসহিদ পীরের সমাধি বর্ত্তমান আছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে পীর সাহেব তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

আনিসি শামুলু—অন্যনাম মুল কুলি বেগ। যুবরাজ ইব্রাহিম মির্জার তিনি বন্ধু ও সহচর ছিলেন। যখন আবদুল খাঁ উজবেগ হিরাতনগর অধিকার করেন তখন তিনি এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, কবি আনিসিকে কেহ অপমান অথবা অসম্মান করিতে পারিবে না। প্রত্যুত তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে হইবে। তিনি ভারতে আগমন করিয়াই পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃত্তি ও বিস্তৃত জায়গীর প্রাপ্ত হন। বুর্হানপুরে ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০১৪) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আনোয়ার উদ্দিন খাঁ—তিনি কর্ণাটের নবাব সফ্দর আলীর হত্যার পরে হায়দরাবাদের নিজাম কর্ত্তৃক কর্ণাটের নবাবের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটের পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব দোস্ত-আলীর জামাতা চাঁদসাহেব, ফরাসীর সেনাপতি মারকুইস ডি বুশী কেষ্টেনোর সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কর্ণাটের নবাব হন। চাঁদসাহেব দেখ।

আনোয়ার উদ্দিন খাঁ—কর্ণাটের নবাব। তিনি প্রথমে দিল্লীর সম্রাটের অধীনে কোরা জাহানাবাদের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক আহম্মদাবাদে গাজিউদ্দিন খাঁর শরণাপন্ন হন। গাজিউদ্দিন খাঁ তাঁহাকে সুরাট নগরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। গাজিউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক তিনি কর্ণাটের নবাবের পদে অভিষিক্ত হন। এই প্রদেশ ১৭২৫ হইতে ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাহার শাসনাধীনে ছিল। নিজাম উল্-মুল্কের পৌত্র মজঃফরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি ১০৭ বৎসর বয়সে নিহত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী হন। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে নবাব নাসির জঙ্গ মোহাম্মদ আলীকেই কর্ণাটের নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আনোয়ার খাঁ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাণিয়াচঙ্গের প্রথম মুসলমান অধিপতি হবির খাঁর পৌত্র ও মজলিস আলম্ খাঁর পুত্র। এই সময়ে লাউর রাজ্যও

তাঁহাদের অধীন ছিল। পার্ব্বত্য খাসিয়া জাতিরা লাউর আক্রমণ করিয়া একবারে ধ্বংস করে। তাঁহারই সময়ে ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁ রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন। তৎকালে বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি, স্বাধীন লাউর রাজ্য ছাড়া বাণিয়াচঙ্গের অন্তর্গত অনেকগুলি পরগণার মালিক বলিয়াও তিনি সাব্যস্ত হন এবং তাহাই জোজরই তালুক নামে খ্যাত হয়। আনোয়ার খাঁ তদবধি দেওয়ান উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। আনোয়ার খাঁর, দেওয়ান আহম্মদ খাঁ, আমুদ খাঁ ও হবিব খাঁ (২য়) নামে তিন পুত্র ছিল।

আনোয়ার সাহেব—একজন মুসলমান সাধু। ঐতিহাসিক ইলাহি বক্সের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পুরাতন মালদহের একাংশের নাম 'শিরবরী'। মুসলমান সাধু নূর কুতবের পুত্র হজরত আনোয়ার সাহেব গৌড়াধিপতি গণেশের আদেশে সুবর্ণগ্রামে নিহত হইলে, তাঁহার দেহ বিচ্যুত মস্তক এই শিরবরী নামক স্থানে সমাহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহা একটি তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। কাটরার উত্তরে রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে অদ্যাপি এই সমাধি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে মালদহের পীরের আস্তানা বলিয়া থাকে।

আন্‌সারী—জাতীয়তা বাদী মুসলমান রাজনৈতিক নেতা। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম মুক্তার আহাম্মদ আন্‌সারী। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক চিকিৎসক বংশে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ-উপাধি লাভ করিয়া তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় দীর্ঘকাল থাকিয়া একাধিক স্থান হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া, অধ্যয়ন সমাপন করেন। তাঁহার পরেও কতিপয় বৎসর ইংলণ্ডের নানা হাসপাতালের চিকিৎসক রূপে কার্য্য করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সুচিকিৎসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। রাজচিকিৎসকরূপে তিনি রামপুর, ভূপাল, আলোয়ার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য হইতে বৃত্তি লাভ করিতেন। দুস্থ ব্যক্তিদিগকে অনেক স্থলেই বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন। এমন কি নিজের বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াও চিকিৎসা করিতেন। ১৯১২-১৩ খ্রীঃ অব্দে বলকান যুদ্ধের সময়ে তিনি আহতদের সেবা করিবার জন্য আরও কতিপয় চিকিৎসককে লইয়া তুরস্কে গমন করেন। চীন যুদ্ধেও সেইরূপ যাইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের অনুমতি পান নাই। পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক নেতারূপেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯১৭-

১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে শ্রীযুক্তা এনি বেসান্ত প্রমুখ প্রবর্ত্তিত ‘হোমরুল’ আন্দোলনে যোগ দেন। তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে ভারতের সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মুসলিম-লিগের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি মুসলিম-লিগের সভাপতি হন। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দ হইতে খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তৎ পরবৎসর কলিকাতায় সর্ব্বদল-সম্মেলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেস বে-আইনি প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয়। ঐ বৎসরই আগষ্ট মাসে দিল্লীতে তাঁহার ভবনে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির (Congress Working Committee) এক অধিবেশন হইতেছিল। তখন ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও আরও অনেক অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হন এবং পরদিন বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দুই বৎসর পরে পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের পর তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেস তখনও বে-আইনি প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত ছিল। তৎফলে আনসারী পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হয় এবং তিনি উহার প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে মুসৌরী হইতে দিল্লী গমনকালে পথিমধ্যে ট্রেনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আপদেব—অনন্তদেবের পুত্র আপদেব মীমাংসা শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ‘মীমাংসান্যায়প্রকাশ’ ও সদানন্দের বেদান্তসারের উপর ‘বাল বোধিনী’ নাম্নী টীকা ইহার রচিত।

আপস্তম্ব—দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রারাজ্যে কৃষ্ণানদীর নিকটে সংহিতাকার আপস্তম্ব বাস করিতেন। আমরা ধর্ম্মসূত্রকার, কল্পসূত্রকার এবং সংহিতাকার, এই তিন জন আপস্তম্বের নাম প্রাপ্ত হই। এই তিনজন একই ব্যক্তি কিনা ইহা বিবেচ্য। মহর্ষি আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার অনেক টীকাও হইয়াছে। এই সূত্র শুল্ব নামে খ্যাত। প্রাচীন হিন্দুদের

জ্যামিতিজ্ঞান এই শুল্ব সূত্রেই সংগৃহীত আছে। জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রাচীনতম হিন্দু নাম শুল্ব।

আপীশালী — বোপদেবের ও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন শাব্দিক পণ্ডিত। বোপদেব তাঁহার ধাতুপাঠে এবং পাণিনি তাঁহার সূত্রে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আপ্তাবদ্দিন—তিনি একজন কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'জামিল দিলারাম'। এই কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। এই কাব্যে হিন্দুপ্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল।

আপ্পাজী গোপাল—তিনি একজন বিখ্যাত মারাঠা নৌসেনাপতি। তিনি প্রথম আংগ্রিয়ার (Aungria) নৌবহরে চাকুরী করিতেন। এই খানেই তিনি নৌবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি গায়-কোয়ারের নৌবিভাগে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বহু বাণিজ্য পোত লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সুরাট গমনকারী একখানা রণপোত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তিনিই জয়লাভ করেন এবং বিজিত জাহাজখানি তিনি ধরিয়া আনিয়াছিলেন। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে আপ্পাজী দশখানি রণপোত লইয়া সুরাটের নিকট পুনরায় একটী পর্ত্তুগীজ বহর আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। এবং আড়াই ঘণ্টা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত-দেহের সহিত চিতারোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

আপ্পাজী গোবিন্দ, ইনামদার—মহারাষ্ট্র প্রদেশে গোপীচাঁদ নামে এক সন্ন্যাসী রাজার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহারই দুই একটী প্রবাদ অবলম্বন করিয়া, কয়েকখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'গোপীচাঁদ' নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে আপ্পাজী গোবিন্দ মহারাষ্ট্র ভাষায় উহা রচনা করেন।

আপ্পা সাহেব—তিনি সেতারার ছত্র-পতি শিবাজীর বংশধর শেষ নরপতি। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তিনি সেতারার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ অধিকার ভুক্ত হয়। (২) নাগপুরের হৃতসর্ব্বস্ব মহারাষ্ট্র-রাজ। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি লাহোরের রণজিৎ সিংহ ও অন্যান্য দেশী বিদেশী নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অকৃত কার্য্য হন। অবশেষে যোধপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোধপুররাজ

তাঁহার জামীন হইলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, তথায় থাকিতে অনুমতি দেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আফজল আলি—জনৈক কবি। ইনি চট্টগ্রামবাসী বলিয়া অনুমান হয়। কৃষ্ণলীলা বিষয়ে ইহাঁর রচিত অনেক পদ আছে।

আফজল খাঁ—(১) তাঁহার প্রকৃত নাম মোল্লা শুকুর উল্লা। তাঁহার পিতার নাম আবদুল হক। তিনি পারস্যের অন্তর্গত সিরাজনগর হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং আবদুর রহিম খাঁ খান খানান কর্ত্তৃক সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত পরিচিত হইয়া, আমির শ্রেণীতে উন্নিত হন। আসফ খাঁ জাফর বেগের ভ্রাতা ইরাদত খাঁ উজির পদ হইতে বিচ্যুত হইলে আফজল খাঁ সেই পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সাত হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্বে বরিত হন। সপ্ততিবর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। আগ্রা নগরে যমুনার বামপারে চিনিরোজা নামক স্থানে তাঁহার সমাধি এখনও বিদ্যমান আছে।

আফতাব—দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কবিজন সুলভ নাম। শাহ আলম দেখ।

আফসা-শাহ-ফসিহ — মির্জা বেদিলের ছাত্র। তিনি উর্দ্দু ভাষায় একখানা কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৯২) লক্ষ্ণৌ-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আফসোস—অন্য নাম মীর আলি। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ মোজাফর আলি খাঁ। তিনি ইমাম জাফরের বংশধর। তাঁহার পিতামহের রাজ-কার্য্যোপলক্ষে দিল্লীতে অবস্থানকালে তথায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'আরদিশ' নামক উর্দ্দুতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমে তিনি লক্ষ্ণৌনগরে আসফদৌল্লার পিতৃব্য নবাব ইসাক খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে মির্জা জয়ান বক্তের এবং সর্ব্বশেষে কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজের মুন্সী ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবজাদি—তাঁহার কবিজন সুলভ নাম মীর মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ। তিনি কর্ণাটের নবাব উমদত-উল-উমরার শিক্ষক ছিলেন। নবাব আনোয়ার খাঁ সম্বন্ধে 'আনোয়ার নামা' নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্য লিখিয়া উমদত খাঁর নিকট ৬৭০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে (১১৭৪ হিঃ) এই গ্রন্থ শেষ হয়। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি মালিক-উস-সুআরা (রাজ কবি) উপাধি পাইয়াছিলেন।

আবট্ট—মহামুনি জৈগীষব্যের গুরু

'যোগাভ্যাস, নামক গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

আবদর রহমান — তাঁহার জন্মস্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত শরাফৎগঞ্জ। তিনি ১২৯০ সালে 'গমের দরিয়া' নামে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

আবদর রহিম খাঁ, মির্জা খান খানান—ইতিহাস বিখ্যাত বৈরাম খাঁর পুত্র। তিনি সম্রাট পুত্র সুলতান সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ) শিক্ষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের আদেশে তিনি বাবর আখ্যায়িকার ফার্শী অনুবাদ করেন। তিনি হিন্দি ভাষায় মনোহর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ভক্ত কবি তুলসীদাসের সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা ছিল।

আবদী—কর্ণাটের নবাব আনোয়ার আলীর প্রশংসা-পূর্ণ বীররস-প্রধান 'আনোয়ার নামা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই গ্রন্থে ফরাসী ও ইংরেজদের সংঘর্ষের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

আবদুর রজাক—তিনি পারস্য রাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরে দূতরূপে প্রেরিত হন। তিনি বিজয়নগরের সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বিজয়-নগরের সমৃদ্ধির বহুল পরিচয় পাওয়া যায়।

আবদুর রসিক, শেখ — একজন বিখ্যাত মৌলানা ছিলেন এবং ওস্তাদ-উল-মুল্ক মুল্লা মোহাম্মদ আফজলের শিষ্য। তিনি পরম বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। একবার দিল্লীর সম্রাট শাজাহান তাঁহার দর্শন লাভের জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজদর্শনে গমন করিতে সম্মত হন নাই। দিনের অর্দ্ধ ভাগ তিনি ছাত্রদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে ও অপর অর্দ্ধ ভাগ ধার্ম্মিক লোকদের সহবাসে যাপন করিতেন এবং রাত্রিকাল ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত হইত। একদিন মোল্লা আফ্জল তাঁহাকে 'শারিফিয়া' নামক স্বীয় রচিত একখানা গ্রন্থ দেন। তিনি শত দিনের মধ্যে তাহার এক ভাষ্য রচনা করিয়া স্বীয় গুরুকে উপহার প্রদান করেন। তাঁহার নিজ রচিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে 'রাসিদিয়া', 'জদ-উস-সলেকিন', 'শার-ই-আস্রার-অলখলাব্বত', এবং 'মকসুদ-অত-তলিবিইন', প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক গুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। হিঃ ১০৮৩ সালের একদিন প্রাতঃকালের উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে হঠাৎ প্রাণ-ত্যাগ করেন।

আবদুর রহিম — তাঁহার জন্মস্থান পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত গলাচিপা হুশেনপুর। তিনি বাংলা ১২৬৮ সালে 'দিল-দিওয়ানা' নামে একখানা গ্রন্থ

বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। ১২৯৯ সালে 'শেখ-ফরিদ' নামক তাঁহার অপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আবদুল আজিজ—তিনি 'তারিখ-ই-হুশেনী' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহা বিখ্যাত সদরউদ্দিন মোহাম্মদ হুশেনী গেসুদরা রাজের জীবন চরিত। ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ আহাম্মদ শাহ বাহমনীর নামে উৎসর্গ করা হয়। (২) তাঁহার বাসস্থান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মূলফৎগঞ্জে ছিল। তিনি ১২৬৮ সালে 'গঞ্জে মারফৎ' নামে একখানা বই লিখিয়া ছিলেন। ১২৮৪ সালে তাঁহার অপর গ্রন্থ 'সয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জমাল' প্রকাশিত হয়।

আবদুল আজিজ মৌলানা—দিল্লীর বিখ্যাত মৌলবী শাহ অলিউল্লার পুত্র। তিনি কুরাণের প্রসিদ্ধ ভাষ্য 'তপসির ফাতুল আজিজ' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য অনেক গ্রন্থও আছে। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আবদুল ওয়াজেদ—ফরিদপুর জিলার পালং নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১৪ সালে তাঁহার রচিত 'ফেসানাবেদার বখ্‌ত' ও 'পরিমাহে-লাকা' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়।

আবদুলওয়াহিদ—১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম উস্মান যখন বাঙ্গালার নবাব হইয়া আগমন করেন, তখন আবদুল ওয়াহিদ তাঁহার অন্যতম অশ্বারোহী সেনাপতি ছিলেন। নবাবের সহিত রাজস্ব সচীবের তেমন সদ্ভাব ছিল না। নবাব ষড়যন্ত্র করিয়া রাজস্বসচীব মুর্শিদকুলী খাঁকে বধ করিবার জন্য আবদুল-ওয়াহিদকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ আবদুলওয়াহিদকে প্রাপ্য বেতন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মচ্যুত করেন।

আবদুল ওয়াহিদ, মীর—অযোধ্যার অন্তর্গত বিলগ্রামের অধিবাসী। ওয়াহিদ এবং জকি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি ফার্শী এবং হিন্দির একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থ গদ্য পদ্যময় 'শুকরিস্তান-ই-খেয়াল' ইহাতে তিনি সকল প্রকার মিষ্টবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭২১ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত রুহুনের জমিদারের সঙ্গে বিবাদে তিনি নিহত হন।

আবদুল ওয়াহিব— একজন কবি। তাঁহার জন্মস্থান চট্রগ্রাম জিলা।

আবদুল ওয়াহিব, মুন্সী — তিনি একজন গ্রন্থকার তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতা। ১২৯৬ সালে 'আসরার সসালত' এবং ১২৮৭ সালে 'লাইলী মজনু' নামক তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম—বাঙ্গালার সুবেদার সুজাউদ্দিন নবাব আলীবর্দ্দিকে বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া-

ছিলেন। সেই সময়ে আবদুল করিম খাঁ আলীবর্দ্দির অধীনে একজন সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলীবর্দ্দি তাঁহার সাহায্যে বিহারের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। কিন্তু পরে তিনিই গোপনে আবদুল করিমকে হত্যা করিয়াছিলেন। আবদুল করিমের ধর্ম্মদ্রোহিতাই এই শোচনীয় ঘটনার মূল কারণ। (২) তিনি বিজাপুরপতি আলী আদিল শাহের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। শিবাজীর সেনাপতি প্রতাপ রাও গুজর পনহল দুর্গ আক্রমণ করিলে, তিনি বীর বিক্রমে তাহার প্রতিরোধ করেন। অবশেষে প্রতাপ রাও তাঁহার হস্তে নিহত হন। তিনি জাতিতে আফগান ছিলেন। প্রথমে তিনি খাঁ জাহান লোদীর অধীনে কার্য্যগ্রহণ করেন। তাঁহার পতনের পর তিনি বিজাপুরপতি আলী আদিল শাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে আদিল শাহের মৃত্যুর পরে সেকেন্দর আদিল শাহ রাজা হন। এই সময়ে বিজাপুরের আবিসিনীয় সেনাপতি খাবাস খাঁ ও আবদুল করিমের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া খুব বিবাদ উপস্থিত হয়। আবদুল করিম প্রতারণাপূর্ব্বক খাবাস খাঁকে নিহত করেন। এই আবদুল করিমকে ঘুষ দিয়া শিবাজী দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। আবদুল করিম ও দিলীর খাঁ উভয়ে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা পরাজিত হন। আবদুল সেই যুদ্ধে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

আবদুল করিম মুন্সী — তিনি ফার্শীতে 'তারিখ-ই-আহাম্মদ' নামক আহাম্মদ শাহ দুরাণী ও তাঁহার বংশধরদের ইতিহাস রচনা করেন। মূলগ্রন্থ ফার্শীতে লিথোগ্রাফ হয়, পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে 'ওয়াকিত-ই-দুরাণী' নামে ইহার এক উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'মুহরবা-ই-কাবুল ও কান্দাহার' নামে তাঁহার আর একখানা বড় গ্রন্থও আছে। ইহাতে দোস্ত মোহাম্মদ খাঁর পুত্র আকবর খাঁর বীরোচিত কার্য্যের বর্ণনা আছে। শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে 'তারিখ-ই-পাঞ্জাব' 'তহফত-নলিল আহবাব' নামক আর একখানা গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন। প্রায় ৮০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আবদুল করিম, মৌলবী—একজন গ্রন্থকার। তাঁহার জন্ম স্থান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চরসিমুলিয়া। ১৩০০ সালে তাহার রচিত 'নসি হতে করিমা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১২৮৩ সালে তাঁহার 'ফজায়েলে হরমায়েন', ১২৯৩ সালে 'ফজিলাতে হজ্ব', ১৩০০ সালে 'মকিদল খালায়েক', এবং ১৩০১ সালে 'মফিদল ইস্লাম' প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম, হাজী—বাঙ্গালার

পাঠান শাসনকর্ত্তা আহাম্মদ শাহের সময়ে (১৪২৬ খ্রীঃ অব্দে) জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শা বাঙ্গালা আক্রমণ পূর্ব্বক, বহু ধন রত্ন ও বহু লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যান। আহাম্মদ শাহ, হিরাটনগরের অধিপতি তাইমুরের পুত্র শাহরুখের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হন। সম্রাট শাহরু, হাজী আবদুল করিমকে জৌনপুরপতি ইব্রাহিমের নিকট প্রেরণ করিয়া, অবিলম্বে বন্দী-দিগকে মুক্তি দিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

আবদুলকাদি — ফার্শী গ্রন্থকার। তিনি অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'জামি-উত-তোয়ারিখের' কোন কোন স্থান ফার্শীতে অনুবাদ করেন। ইহা একটা অপূর্ব্ব পুস্তক। ইহাতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমুদয় বিষয়, ভারতবর্ষের সমুদয় সাধু মহাপুরুষের জীবনী, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় এবং বৌদ্ধদেবের জীবনী বর্ণিত আছে।

আবদুলকাদের—তিনি একজন গ্রন্থ-কার। মেদিনীপুর জিলায় তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার 'বকার বালা মাতম হুশেন' নামক একখানি গ্রন্থ ১২৯৬ সালে প্রকাশিত হয়।

আবদুলকাদের, বদায়ুনী শেখ — সম্রাট আকবরের সমসাময়িক একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বদায়ুনের শেখ মোলুক শাহের পুত্র এবং নাগোরের শেখ মবারকের ছাত্র। তিনি যেমন আরবী ও ফার্শীতে তেমনি সংস্কৃতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট আকবরের আদেশে তিনি রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ও আরবী জমি-উর-রসিদি প্রভৃতি গ্রন্থ ফার্শীতে অনুবাদ করেন। এই সকল কাজের জন্য সম্রাট তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিতেন। একবার তিনি সম্রাটের নিকট হইতে কোনও কাজের জন্য দেড়শত স্বর্ণ মুদ্রা, দশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রাও নিষ্কর ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি কারুণ্য প্রদর্শন করিতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। তৎসত্ত্বেও তিনি সম্রাটের প্রতি প্রতিকূলভাব পোষণ করিতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় গোঁড়া মুসলমান সুতরাং সম্রাটের উদার ধর্ম্ম মত আদৌ তাঁহার মনোমত ছিল না। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি শেখ মবারক, ফৈজী ও আবুল ফজলের সহিত একত্র বাস করিয়াও, তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে মিলিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে (১) প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সম্বন্ধে বহর-উল-অসমার, (২) নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সলজাত-উর-রসিদ, (৩) মুঘল রাজত্ব সম্বন্ধে মন্তখব-উত-তোয়ারিখ প্রভৃতি প্রধান। তন্মধ্যে

শেষোক্ত গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়াছে। এই নামে আরও কয়েক খানা ইতিহাস আছে বলিয়া, তাঁহার রচিত গ্রন্থ তোয়ারিখ-ই-বদায়ুনী নামে খ্যাত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ গজনী বংশীয় রাজগণের, দ্বিতীয় দিল্লীর পাঠান রাজগণের, তৃতীয় বাবর ও হুমায়ুনের এবং চতুর্থ আকবরের রাজত্ব কালের বিবরণ সংবলিত। শেষ অংশে আকবরের সমসাময়িক, ধার্ম্মিক, দার্শনিক, কবি, চিকিৎসক ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ সম্রাট আকবরের নিন্দা ও কুৎসায় পরিপূর্ণ হইলেও, তাহা হইতে আকবরের মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বদায়ুনীর ও সম্রাটের মৃত্যুর অনেক পরে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম ভূমি বদায়ুনে তিনি পরলোক গমন করেন।

আবদুল কাদের বেদিল মির্জা— বিখ্যাত কবি। তিনি সাধারণতঃ বেদিল অথবা মির্জা বেদিল নামেই বিখ্যাত। তাতার জাতীয় বিরলাস বংশে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবন কালে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের পুত্র আজমশাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। একদিন যুবরাজ তাঁহাকে নিজের প্রশংসা সূচক কবিতা লিখিতে বলায়, তিনি তাঁহার কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন এবং আর কোথাও কাজ করেন নাই। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'মোহিত আজাম' 'চার - উনসুর' 'ইনসা - ই - বেদিল' ইহাকে 'রুকৃত-ই-বেদিল'ও, বলে এবং প্রায় বিশ হাজার পদ পরিপূর্ণ একখানা ফার্শী গীতি কবিতার পুস্তক প্রধান। এছাড়া পারস্যের রাজা শাহ ইস্মাইল বা সকবির পিতামহ, শেখ জুমাইতের জীবনী (নুকাত-ই-বেদিল) লিখিয়া ছিলেন। ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবদুল কাদের মৌলানা— তিনি দিল্লীর অলিওল্লা সাহেবের পুত্র। তিনি তফসিরমুজি-উল কুরান নামক কুরানের ভাষ্য রচয়িতা। তিনি উর্দ্দুতে কুরানের একখানি অনুবাদও করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে তাহা শেষ হয়।

আবদুল কুতব শাহ—আবদুল্লা কুতব শাহ দেখ।

আবদুল গনি— তাঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জিলায়। ১২৯০ সালে তিনি 'শাহ কামাল সূর্য্য ভানু বিবি' নামক গ্রন্থরচনা করেন।

আবদুল গনি খাজা নবাব বাহাদুর

এই সুপ্রসিদ্ধ দানবীর মুসলমান জমিদার [illegible] ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের ৩০[illegible] গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপু[illegible] নবী আবদুল্লা বহু

কাল পূর্ব্বে কাশ্মীর হইতে আসিয়া ঢাকায় বাস করেন। পিতা খাজা অলিমোল্লা সাহেব সামান্য ব্যবসায়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। দানশীলতার জন্য নবাব বাহাদুর বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ঢাকা নগরীতে জলের কল নির্ম্মাণের জন্য দুইলক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্-ব্যতীত তাঁহার গোপন দান যে কত ছিল তাহার হিসাব নাই। এইসব অজানিত দান ব্যতীত বৃহৎ বৃহৎ দানের পরিমাণ প্রায় আট লক্ষ টাকা। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বদান্যতার জন্য তাঁহাকে কয়েক বারে নবাব; সি, এস, আই; কে, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করিয়া, সম্মানিত করেন। তিনি বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা গরীবদিগকে দান করিতেন। অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ কালে পথের দুই ধারে সিকি, দুইআনী ছড়াইয়া যাইতেন। ঢাকার হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকাতে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়। তৎফলে মহাদাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিবার উপক্রম হই[illegible] [illegible] নবাব সাহেবের মধ্য[illegible]নও অশান্তি ঘটে নাই। উভ[illegible]র লোক শান্তভাব অবলম্বন করিলে, নবাব বাহাদুর নিজ ব্যয়ে প্রায় বিশ সহস্র লোককে এক বিরাট ভোজ দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নানারূপ প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। সেই সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছিলেন। সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড যুবরাজরূপে যখন ভারত ভ্রমণে আগমন করেন, নবাব বাহাদুরকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এবং যুবরাজ, তাঁহার ভারত ভ্রমণের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটি পদক উপহার দেন। এই উদারহৃদয় মহাপ্রাণ ধর্ম্মপরায়ণ নবাব ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

আবদুল গফার, শেখ—তাঁহার বাসস্থান হাওড়া জিলার চন্দ্রপুরে ছিল। তিনি ১২৮৮ বাংলা সালে 'নুরবখত নও বাহার' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

আবদুল জব্বর, কাজী — একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ কাজী। তাঁহার জন্মস্থান তুর্কি স্থানের অন্তর্গত সমরখন্দ প্রদেশ। তিনি সম্রাট বাবরের সঙ্গে ধর্ম্ম যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। বাবর দিল্লী অধিকার করিয়া যখন জৌনপুরের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ লোহানীকে

শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় পুত্র হুমায়ুনকে প্রেরণ করেন, তখন আবদুল জব্বর কাজী হুমায়ুনের সঙ্গে গমন করেন।

আবদুল জলিল, মীর— অযোধ্যার অন্তর্গত বিল গ্রামের সৈয়দ আহাম্মদের পুত্র। তিনি বিদ্বান্ এবং সুকবি ছিলেন। বিজাপুরে অবস্থান কালে, তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীব কর্তৃক গুজরাটে সংবাদ সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হন ও পরে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত ভাকরে বদলী হন। তাঁহার শত্রু পক্ষীয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করায়, সম্রাট ফরুকশিয়ার ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া আনেন। কিন্তু পরে সমুদায় চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে আরও সম্মানিত করেন। দিল্লীতে থাকিয়া প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্য করিতে অনুমতি পান। ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবদুল জলিল সৈয়দ শাহ — বীরভূম জিলার বারা গ্রামে চল্লিশজন পীরের সমাধি আছে, তন্মধ্যে যে ছাব্বিশ জনের নাম উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। লোহাজঙ্গ দেখ।

আবদুল নবী খাঁ — মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোডাপা নামক স্থানে তিনি নবাব ছিলেন। এই পাঠান সর্দ্দার প্রথমে স্বাধীন নরপতির ন্যায়ই চলিতেন। পরে ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে নিজামের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মহারাষ্ট্রাদের ও মহীশূরপতি হায়দর আলীর বশ্যতা স্বীকার করেন। এই প্রকারে তিন শক্তির অত্যাচারে ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ পায়। আবদুল নবী খাঁর তিন পুরুষ এইস্থানে নবাবী করেন।

আবদুল নবী খাঁ—তিনি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত কোলহরা প্রদেশের শেষ নবাব। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা গোলাম নবী খাঁ, তালপুরের বিদ্রোহী সামন্ত মীর বিজয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তিনি ভ্রাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, সমস্ত আত্মীয়কে নিহত করিয়া স্বীয় সিংহাসন নিস্কণ্টক করেন। তৎপরে তালপুরের মীর বিজয়কে স্বীয় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করেন। এই সময়ে কান্দাহারপতি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে মীর বিজয় তাঁহাদিগকে সিন্ধুদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। সেনাপতির এই প্রকার ক্ষমতায় ভীত হইয়া, আবদুল নবী খাঁ তাঁহাকে হত্যা করেন। মীর বিজয়ের পুত্র আবদুল্লা খাঁ, সেই জন্য বিদ্রোহী হইয়া আবদুল নবী খাঁকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি প্রথমে খিলাতে পলায়ন করেন। অবশেষে বহু কষ্টে কান্দাহার পতির সাহায্যে আবদুল্লা খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া

কোলহয়া অধিকার করেন। কিন্তু মৃত আবদুল্লা খাঁর আত্মীয় মীর ফতে-আলী, তাঁহাকে আবার দেশ হইতে চিরকালের জন্য তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি যোধপুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার বংশ-ধরেরা এখনও বাস করিতেছেন।

আবদুল নবী, শেখ— গঙ্গোর শেখ আবদুল কুদ্দসের পৌত্র ও শেখ আহাম্মদের পুত্র। তিনি সম্রাট আকবরের শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্য তিনি সর্দ্দার-উস-সর্দ্দারের (প্রধান বিচারপতি) সম্মানিত পদ পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন সর্দ্দারই এই প্রকার সম্মানিত পদ লাভ করেন নাই। আকবর তাঁহার এতই অনুগত হইয়াছিলেন যে, সর্দ্দার যখন বিদায় লইয়া গৃহে যাইতে উদ্যত হইতেন, তখন আকবর তাঁহার চটিজুতা ঠিক করিয়া দিতেন। কিন্তু পরে মৌলানা আবদুল-মুকদুম-উল-মুনাফ ও অন্যান্য কয়েক জন রাজকর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্রে তিনি আকবরের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান পাইতেন না। পরিশেষে মক্কায় তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৯১) মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি নিহত হন।

আবদুল বাকী— তিনি 'ময়াসির-ই-রহিমী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে আকবরের রাজদরবারের সমুদয় বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোকের, কবি ও গ্রন্থকারের জীবনী বর্ণিত আছে। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ সম্পন্ন হয় এবং ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবদুল মজিদ ভুঁয়া, মৌলবী হাজী--তিনি কটক জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭১ সালে তাঁহার রচিত 'রংবাহার', ১২৯৬ সালে তাঁহার 'দেল-রোবাটার-বমন্' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আবদুল মালী — একজন বৈষ্ণব পদাবলী লেখক। খুব সম্ভব তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রামে ছিল।

আবদুল-মুক্তাদির-শরিহি, কাজী —একজন বিখ্যাত ধাৰ্ম্মিক ও বিদ্বান্ মৌলবী। জৌনপুরের প্রসিদ্ধ মৌলবী সিহাব উদ্দিন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। জৌনপুরের সুলতান তাঁহাকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া যান। তিনি এক বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া, ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সপ্তাহে একদিন উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই সভায় সুলতান স্বয়ং ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত পৌরবর্গ এবং রাজঅন্তঃপুরের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পরদার অন্তরালে থাকিয়া, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন। বহু হিন্দু তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর পরি-

ত্যাগ সময়ে, সুলতান ইব্রাহিম শারকির অনুরোধে স্বীয় পুত্র শেখ আবদুল ওয়াহিদকে তথায় রাখিয়া যান। তাঁহার বংশধরেরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন। মৌলানা আবদুল মুক্তাদির সাহেব ১৩৮৮ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী নগরে পরলোক গমন করেন। খাজা কুতবউদ্দিনের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'কাসিদাত-উল-লামিয়া' বিখ্যাত।

আবদুল রসুল—রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবহারজীবী। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত গুনিয়াউক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জমিদার ছিলেন। তিনি লণ্ডন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ এবং ব্যারিষ্টার ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি দেশভক্ত সাহসী ও অমায়িক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা ছিল না। সেইজন্য মুসলমান সমাজের বাহিরেও তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাঁহার প্রতি সকলেরই সমান শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে, তিনি বিভাগের বিরোধী ছিলেন বলিয়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে ভুল বুঝিয়া, তখন তাঁহাকে বিধর্ম্মী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে, আপন চরিত্র প্রভাবে তিনি স্বধর্ম্মীদের শ্রদ্ধা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি ইউরোপীয় মহিলার পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি বাঙ্গালীত্ব বর্জ্জিত হন নাই। ১২২৪ সালে তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া নেজমার বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ একটি খাঁটি মানুষের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

আবদুল রহমান—সিন্ধুদেশ জয় করার পরে ইরাণের শাসনকর্ত্তা হেজাজ, কাবুল জয় করিবার জন্য আবদুল রহমান নামক একজন সেনাপতির অধীনে ৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে কাবুল প্রদেশে শাহ নামে একজন হিন্দু নরপতি ছিলেন। আবদুল রহমান প্রথমে জয় লাভ করিয়য়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই আফগানিস্থান হেজাজের হস্তচ্যুত হয়। তিনি দ্বিতীয় বার আবদুল রহমানকে তৎপ্রদেশ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হন।

আবদুল রহমান—তিনি জিঞ্জিরার সিদ্দি রসুল ইয়াকুত খাঁর পৌত্র ও আবদুল্লা খাঁর পুত্র। সিদ্দি রসুল ইয়াকুত ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে অনেকগুলি পুত্র

রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রদের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। অন্যতম পুত্র আবদুল্লা খাঁ মহারাষ্ট্রাপতি সাহুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সাহু এই গৃহবিবাদের সুযোগে সিদ্দিদের অনেক স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লা খাঁ নিহত হন। ইহার পুর্ব্বেই তাঁহার পুত্র আবদুল রহমান মহারাজা সাহুর অন্যতম সেনাপতি যশোবন্তরাও মহাদেব পটলিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন সাহুর সহিত জিঞ্জিবার সিদ্দিদের সন্ধি হইল। এই সন্ধি সূত্রে আবদুল রহমান তাঁহার পিতামহের সম্পত্তির ১২টী মহল প্রাপ্ত হইলেন।

আবদুল রহমান খাঁ—জাজপুরের নবাব; ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে (১২৭৪ হিঃ) সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, এই অপরাধে সেই বৎসরের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার ফাসি হয়। তিনি প্রসিদ্ধ নজাবত আলি খাঁর বংশধর। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে বড়লাট সার জর্জ বার্লোর সময়ে সাড়ে বার লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তিসহ নারনল দুর্গ নজাবত আলি খাঁকে প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষার জন্য, বদধান ও দাদ্রি নামক স্থান তাঁহাকে দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ইংরেজদের বন্ধু বলিয়াই জানা ছিল। কিন্তু অবশেষে তিনি শত্রু পক্ষ অবলম্বন করেন।

আবদুল রহমান চিস্তি—তিনি 'মীর-আত-ই-মামুদ' নামক সালার মামুদ, গাজির জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা। এই গাজীর সমাধি অযোধ্যার অন্তর্গত বরোচ নগরে বিদ্যমান আছে। ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজীবের রাজত্ব কালে আবদুল রহমানের মৃত্যু হয়।

আবদুল রহিম খাঁ—আকবরের প্রধান মন্ত্রী বৈরাম খাঁর পুত্র। তিনি খান খানান বা খান মির্জা নামেই পরিচিত। ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার চারি বৎসর বয়সে বৈরাম খাঁ নিহত হন। বয়প্রাপ্ত হইয়া তিনি সম্রাটের শরীররক্ষী সৈন্যের সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে গুজরাট যুদ্ধে গমন করেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে তোডরমল্লের মৃত্যুর পর তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার কন্যা জানী বেগমের সহিত যুবরাজ দানিয়ালের বিবাহ হয়। তিনি তুর্কি ভাষায় লিখিত ওয়াকিত-ই-বাবরী (বাবরের জীবন চরিত) নামক গ্রন্থ ফার্শীতে অনুবাদ করেন। আকবরের মৃত্যুর পর, তিনি ২১ বৎসর জাহাঙ্গীরের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে

মহব্বৎ খাঁর বিদ্রোহ দমনের পর, সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছুকাল পুর্ব্বে, তিনি ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিল্লীতে নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার দর্গার নিকটে এখনও তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কবিজন সুলভ নাম ছিল রহিম।

আবদুল রেজাক — তিনি প্রথমে পারস্যপতি শাহরুখকর্ত্তৃক কালীকট দরবারে দূতরূপে উপস্থিত হন। পরে তথাহইতে বিজয়নগরে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। তিনি 'মুলতিয়া-এসাদিন' নামক গ্রন্থে বিজয়নগরের ও তৎ রাজ্যের এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

আবদুল লতিফ, নবাব বাহাদুর— ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা মাদ্রাসাতে শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কয়েক বৎসর বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তার মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী পদেও তিনি কার্য্য করেন। বঙ্গীয় সরকারের নানা বিভাগে কার্য্য করিয়া তিনি সুযশ অর্জ্জন করেন। মহম্মদীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে নবাব, ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে সি, আই, ই এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও, ইংরেজ সরকার এই সুবিজ্ঞ দেশহিতৈষীর সুপরামর্শ গ্রহণ করিতে বিরত থাকিতেন না। তিনি কিছুদিন কলিকাতা পুলিশ আদালতের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন এবং বহুকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ভূপাল রাজ্যের মন্ত্রী হন এবং নানা বিষয়ে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সম্পাদন করেন। সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল। মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

আবদুল লতিফ শাহ—সিন্ধু দেশের একজন সুফী সাধক ও ভক্ত। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী 'শা-রিসালো' নামে পরিচিত। তাঁহার 'কাফী' (পদাবলী) গুলির মধ্যে তাঁহার সাধনার ও জীবনের শ্রেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পদাবলী সিন্ধুর প্রতিগৃহে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আজও গীত হয়। শাহ লতিফের জন্ম সাল নিঃসংশয়ে জানা যায় না, অনুমান ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধুর হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে

সৈয়দ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃকুলও সাধকের কুল ছিল। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসে এই কোরেশী সৈয়দ বংশ নানা ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সিন্ধুর বিখ্যাত সুফী সাধক ও পদকর্ত্তা শাহ করিম তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কন্যা ছিলেন। ভালবাসিয়াই লতিফ তাঁহার সহিত বিবাহিত হন। ইহাতে তাঁহার সাধনার কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রী ও নবজাত পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সংসার বন্ধন মুক্ত হইয়া যায় এবং তিনি নিঃসংশয়ে নিজেকে, প্রিয়তমের সন্ধানে উৎসর্গ করেন।

আবদুল শুকুর—অন্য নাম মালিক মিঞা, তাঁহার জন্মস্থান পাবনা জিলার অন্তর্গত শাহজাদপুর। ১২৯৭ সালে তাঁহার রচিত 'নুরল-বসর' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩০০ সালে 'গোলে-বকাওলি' ১৩০৪ সালে 'গোলসানে নও বাহার', রচিত হয়।

আবদুল সামাদ—সম্রাট আকবরের কর্ম্মচারী আবুল ফজলের ভাগিনেয় 'ইনসা-ই-আবুল ফজল' নামক গ্রন্থের তিনি সঙ্কলয়িতা। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আবদুল সামাদ খাঁ— তাঁহাকে নবাব সমসাম উদ্দৌল্লা বাহাদুর জঙ্গ' বলা হইত। খাঁজা আবদুল করিমের পুত্র খাঁজা উবেদুল্লা আহরার বংশধর। তাঁহাদের দেশ ছিল সমরকন্দ কিন্তু আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতার সঙ্গে সমরকন্দ গিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই বিদ্যাভ্যাস করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তিনি প্রথমে ভারতে আগমন করেন। সম্রাট প্রথমে তাঁহাকে ছয়শত সেনার সৈনাপত্যে, পরে খাঁ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ১৫০০ সৈন্যের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করেন। মুঘল সম্রাট জহন্দর শাহের সময়ে আলিজঙ্গ উপাধি ও ৭০০০ সেনার অধিনায়ক হন। সম্রাট ফরুক শিয়ার তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি শিখ গুরু বান্দাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অনেক সৈন্য সহ বন্দী করেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা ও সমসামউদ্দৌল্লা উপাধি দেন। তাঁহার পুত্র জকরিয়া খাঁ লাহোরের সুবাদার ছিলেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কালে ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতিহাসে তিনি দিলার জঙ্গ নামেও খ্যাত।

আবদুল সালাম, মোল্লা—একজন গ্রন্থকার ও ধর্ম্মগুরু। তিনি লাহোর নিবাসী মোল্লা আবদুল সলামের ছাত্র ছিলেন। 'হল-উর-রুমজ' নামক আরব্য ভাষায় লিখিত সুফিধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রণেতা। তিনি, 'তাহজিব' 'মনার'

প্রভৃতি ভাষ্যের ফার্শী ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা করিয়া, বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

আবদুল হক, শেখ—তাঁহার অন্যনাম মোহাদ্দিন। সাদত উল্লা তুর্কের পৌত্র, সায়েফউদ্দিনের পুত্র, ইহার পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের সঙ্গে দিল্লীতে আসেন। কিন্তু তৈমুর চলিয়া গেলে, তিনি দিল্লীতেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। তিনি 'তারিখ-ই-হকিক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাকে কেহ কেহ 'তারিখ-ই-আবদুল হক'ও বলে। আকবরের রাজত্ব কালে ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে, এই গ্রন্থ শেষ হয়। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে তিনি মক্কা ও মদিনা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন এবং সেই দেশে তিনি অনেক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে, প্রায় একশত খানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, এই সমুদয় গ্রন্থ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভাষ্য, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সুফি সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল। ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে ও তাঁহার সমুদয় কার্য্যকরী শক্তি সবল ছিল। ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীতে তিনি সমাহিত হন। এখনও তিনি ভারতবর্ষের মুসলমান সাধু পুরুষদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার পুত্র শেখ নুরুল হক, 'জবদত-উত-তোয়ারিখ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

আবদুলহক, সরদার-দিলার জঙ্গ-উল-মুল্‌ক — তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম সরকারের অধীনস্থ এক জমিদারের পুত্র। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি বোম্বের পুলিশে কর্ম্মগ্রহণ করেন। একটি বিখ্যাত দস্যুকে ধৃত করিয়া বিশেষ যশলাভ করেন এবং C. I. E. উপাধি লাভ করেন। তৎপরে তিনি নিজাম সরকারের কর্ম্মগ্রহণ করেন। নিজাম তাঁহাকে শিক্ষা লাভার্থ বিলাতে পাঠান। তিনি শিক্ষা লাভ করিয়া নিজাম সরকারের রেল বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাজে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া, তিনি প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই খনির এক চেটিয়া বন্দোবস্তে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক প্রতারণার অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহার যথেষ্ট ধন ক্ষয় হয়। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

আবদুল হাকিম—তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। ১২৯৫ সালে তাঁহার রচিত 'লালমতি সয়ফল মুল্লুক' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'ইয়সুফ জেলে খা' নামক একখানি গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

আবদুল হে মীর সর্দ্দার — তিনি একজন বিদ্বান্ লোক ছিলেন এবং সম্রাট হুমায়ুন ও আকবরের রাজত্বের প্রথম অংশের ঘটনাবলীর নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন।

আবতুল্লা—(১) আল ইয়াফি-ই-শাফি-ইর পুত্র। 'রোজাত-উর বয়োর্ষিন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে হজরত মহম্মদের বিস্তৃত জীবনী, বারজন ইমাম এবং আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের সমস্ত ধার্ম্মিক লোকের জীবন চরিত আছে। (২) তিনি কলিকাতা নিবাসী একজন গ্রন্থকার ১২৭৫ সালে তাঁহার 'গোলজারে-আতশ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আবতুল্লা কুতব শাহ—হায়দরাবাদের অন্তর্গত গোলকুণ্ডার কুতুব সাহী বংশের ৬ষ্ঠ সম্রাট। মোহাম্মদ কুতুব শাহের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দিল্লীর সম্রাট শা-জাহান পাদসার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, অনেক কাল রাজ্য ভোগ করেন। কিন্তু ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দে শা-জাহানকে অসন্তুষ্ট করিয়া বড়ই বিপন্ন হন। সম্রাট আবতুল্লাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি মীর মোহাম্মদ সৈয়দ ও তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ আমিনকে যেন রাজদরবারে আনিতে অনুমতি দেওয়া হয়। আবতুল্লা কুতব শাহ এই আদেশ মান্য করিলেন না। পরন্তু মোহাম্মদ আমিনকে হায়দরাবাদে আটক করিয়া তাহার ধন রত্ন কতক আত্মসাৎ করিলেন। ইহাতে সম্রাট অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। তাঁহার পুত্র আওরঙ্গজীব তখন দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র হায়দরাবাদ অবরোধ ও লুণ্ঠন করিলেন। কুতুব শা এক কোটী টাকা জরিমানা ও তাঁহার কন্যাকে যুবরাজ মোহাম্মদের নিকট বিবাহ দিয়া নিস্কৃতি পাইলেন। তাঁহার পর তিনি আর মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পান নাই বরাবর সামন্ত নবাব বলিয়া নিজকে স্বীকার করিয়া ছিলেন। ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা আবুহুশেন তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

আবতুল্লা খাঁ — তিনি দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তোগলিকপুরের যুদ্ধের সময় তাঁহার সহিত শা-জাহানের পরিচয় হয়। শা-জাহান যখন তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে ছিলেন, তখনও এই আবতুল্লা খাঁ তাঁহার সহিত ছিলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ, শা-জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শা-জাহান দরিয়া খাঁ ও আবতুল্লা খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ নিহত হন। পরে শা-জাহান দিল্লীর সম্রাট হইলে, আবতুল্লা খাঁ বিহারের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সময়ে বৌজী পুরের রাজা পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। আবতুল্লা খাঁ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে

তাঁহার দুর্গে আশ্রয় নিতে বলেন। পরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বোজীপুরের রাজাকে বধ করেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় অন্তঃপুরে গ্রহণ করেন।

আবদুল্লা খাঁ, সৈয়দ—তিনি বাঢ়ের সৈয়দ বংশসম্ভূত ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের পৌত্র (দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র) আজিম উস্মান তাঁহাকে এলাহাবাদের নায়েবতী প্রদান করেন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা হুশেনআলী খাঁও বিহারের নায়েবতী প্রাপ্ত হন। আজিম উস্মান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইলে, রাজকুমার ফরুক শিয়ার সিংহাসন অধিকার ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ মানসে প্রথমে বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব মুর্শিদ কুলী খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, বিফল মনোরথ হইয়া পরে হুশেন আলী খাঁর শরণাপন্ন হন। হুশেন প্রথমে সাহায্য দানে অস্বীকৃত হয়েন, পরে ফরুক শিয়ারের শিশু কন্যা ও মাতার অনুরোধে সাহায্য করিতে সম্মত হন। হুশেন আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ ফরুক শিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিলে, এলাহাবাদের সন্নিকটে এক তুমুল যুদ্ধে জাহান্দর শাহ পরাস্ত হন এবং ফরুক শিয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। আবদুল্লা পুরস্কার স্বরূপ উজীর পদ লাভ করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃ যুগলই রাজ্য লাভের মূলাধার ছিলেন, এই হেতু সম্রাটকে নাম মাত্র সম্মান প্রদর্শন করিয়া, নিজেরাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শত্রু বৃদ্ধিও হইল। রাজদরবারের অমাত্য ও পারিষদগণ পাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সৈয়দ যুগলের উচ্ছেদ সাধন মানসে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাটের দৃষ্টি শক্তি নাশ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। বাদশাহ কারাগারের ক্লেশ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রহরীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। সেই ঘটনাও প্রকাশ হওয়ায় সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল আহার্য্য বস্তুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন। ফরুক শিয়ারকে বন্দী করিয়া, রফি-উদ-দারাজতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এবং তাঁহাকে নামমাত্র সম্রাট করিয়া নিজেরাই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। নব নিযুক্ত সম্রাটের ইহা অসহ্য বোধ হওয়ায়, তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি উদ্দৌল্লার নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচারের প্রস্তাব করিয়া, এই প্রহসন হইতে বিদায় প্রার্থনা করেন। তখন উজীর ও ভ্রাতা হুশেন আলী, রফি উদ্দৌল্লার নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচলিত করিলেন। রফি উদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর, সৈয়দ ভ্রাতৃ-

যুগল মোহাম্মদকে রাজ পদ প্রদান করেন। মোহাম্মদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবকত্ব সহ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি তাঁহাদের প্রভুত্বের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, মালবের শাসনকর্ত্তা চিনকিলিচ খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। চিনকিলিচ খাঁ বাদশাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া, অভিযান করিলে, হুশেন আলি খাঁ বাদশাহকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু বাদশাহের ষড়যন্ত্রে তিনি গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। ভ্রাতার মৃত্যুতে আবদুল্লা খাঁ প্রতিশোধ লইবার জন্য মোহাম্মদ শাহকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ের সৈয়দ বংশের গৌরব ও ক্ষমতা লুপ্ত হইল। ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য এবং ক্ষমতামদ মত্ত হইয়া উভয়েরই অত্যধিক বিলাস ব্যসনে অনুরক্তিই, তাঁহাদের পতনের প্রধান কারণ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন।

আবদুল্লা সৈয়দ—থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সবানা গ্রামের বাহাদুর আলীর পুত্র। আবদুল কাদেরের উর্দ্দু ভাষার রূপান্তরিত কোরাণ ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশ করেন।

আবহ মল্ল—(১০৪০ খ্রীঃঅব্দে) চালুক নরপতি। সোমেশ্বর, বিক্রমাদিত্য ও জয়সিংহ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। কাশ্মীর দেশীয় কবি বিহ্লন এই বিক্রমাদিত্যের রাজ কবি ছিলেন।

আবা খাঁ—পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা কাশ্মীর দেশীয় আবা খাঁ বাঙ্গার শাসনকর্ত্তা কুতবউদ্দিন খাঁ কোকুলতাস কোকার (১৬০৬-১৬০৭ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। নুরজাহানের প্রথম স্বামী সের আফগানের সহিত সংঘর্ষে স্বীয় প্রভু কুতব-উদ্দিনের ন্যায় তিনিও সের আফগানের হস্তে নিহত হন।

আবাজী—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর মন্ত্রী বালাজী আবাজীর পুত্র। মহারাজ রাজারামের পত্নী তারাবাই শম্ভুজীকে বিনাশ করিয়া, মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিবার যে ষড়যন্ত্র করেন, তন্মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি শম্ভুজীকে বন্দী করিবার জন্য স্থানে স্থানে চিঠি লিখিয়াছিলেন।

আবাজী সোমদেব—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর একজন সেনাপতি। তিনি শিবাজীর পিতা শাহজীর অধীনে একজন কেরাণী ছিলেন। পরে শিবাজীর সেনাপতি হইয়াছিলেন। এই সুদক্ষ সেনাপতি বিজাপুরের কল্যাণ দুর্গের অধ্যক্ষ মৌলানা আহাম্মদকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, কল্যাণ দুর্গ অধিকার করেন। আবাজী শিবাজীর আদেশে

রায়গড় দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আবু আবদুল্লা, মোহাম্মদ ফজিল—তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আহাম্মদ। আগ্রার সৈয়দ হাসানের পৌত্র। 'মুকরিব-উল-উসিলিন' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে সম্রাট মোহাম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর বিবরণ আছে। ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দে (১১০৬ হিঃ) গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মজহর-উল-হক নামে আর একটি নামও ছিল।

আবু আলী খাঁ, নবাব বাহাদুর—নবাব হরকৃষ্ণ রায়ের সময়ে তিনি শ্রীহট্টের নায়েব ফৌজদার ছিলেন। হরকৃষ্ণ রায় নবাব দেখ।

আবু আহাম্মদ আবদুল খাজা—তিনিই সুফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষে দশম শতাব্দীতেই সুফি মত প্রথম প্রচারিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে খাজা মইনউদ্দিন কর্ত্তৃকই খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে উহা বিস্তার লাভ করে।

আবু ওমর মিনহাজ অল্ জর্জনী—১২৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'তবকাতই নাসিরি' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট নাসির উদ্দিন মামুদের নামে উৎসর্গ করেন।

আবুল কাসেম, মৌলবী—জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক নেতা। বর্দ্ধমান জিলার এক অভিজাত মুসলমান পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি কিছুকাল তাঁহার পিতৃব্য মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। তাঁহার পিতৃব্য তখন ভূপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি উক্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের সহকর্ম্মীরূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঐ সময়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে মতানৈক্যহেতু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সহিত যোগ রক্ষা না করিলেও, প্রবীণ রাজনৈতিক ও দেশসেবী হিসাবে তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং সভার প্রবীণতম সদস্য রূপে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মুসলিম্‌লিগ, খেলাফৎ কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার

ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি অতি মিষ্ট-ভাষী, জনপ্রিয় ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে চৌষট্টিবৎসর বয়সে বর্দ্ধমানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবু খয়ের খাঁ—১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে মুঘলেরা মহারাষ্ট্রীদেরে পরাস্ত করিয়া রাজগড় দুর্গ অধিকার করেন এবং খয়ের খাঁকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীরা ইহা পুন অধিকার করেন। খয়ের খাঁ দুর্গ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন, এমন কি তাঁহার পরিবারবর্গের অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত তাঁহারা আত্মসাৎ করে। সম্রাট আওরঙ্গজীব ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করেন।

আবুজাফর—দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ ৮২ বৎসর বয়সে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র আবুজাফর, সিনাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ পাতশা-ই-গাজী উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবু তালেব খাঁ, মির্জা—তাঁহার পিতার নাম হাজি মোহাম্মদ বেগ খাঁ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। লক্ষ্ণৌর নবাব আসফউদ্দৌল্লার প্রধান মন্ত্রী মোক্তার উদ্দৌল্লা তাঁহাকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ইটোয়া প্রভৃতি জিলার আমলদারের পদে নিযুক্ত করেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। দুই বৎসর ঐ কাজে নিযুক্ত থাকার পর নবাব সরকার হইতে বার্ষিক ষাট হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া, অবসর গ্রহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরে নবাবের অনুমতি অনুসারে কর্ণেল আলেকজাণ্ডারের (Col. Alexander) সহকারী নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে রেসিডেণ্ট মিঃ মিড্‌লটন (Mr. Middleton) তাঁহারই সাহায্যে বিদ্রোহী বলভদ্র সিংহকে পরাস্ত এবং পলায়ন কালে নিহত করেন। ইহার কিছুকাল পরে আবু তালেব কাপ্তেন ডেভিড রিচার্ডসন (Capt. David Richardson) সাহেবের সঙ্গে ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের কতিপয় দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে প্রতি-দিনের ঘটনাবলী তিনি অতি নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিতেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সেই লিখিত বিবরণ সংশোধনান্তে 'ময়াসির-উল বিলাতি ইফ্রানজি' নামে প্রকাশিত করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে চার্লস ষ্টুয়ার্ট (Charles Stewart)

তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ ইংলণ্ড হইতে প্রকাশ করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'খুলাসতি-উল আকবর' নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

আবু তুরাব সৈয়দ—তিনি বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে ভূষণার ফৌজদার ছিলেন। ভূষণার রাজা সীতারাম রায়, তাঁহাকে বধ করেন।

আবু দৌলত—একজন বিখ্যাত দরবেশ। তিনি হজরত শাহ জালাল আমিনের অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের ছনখাইড় পরগণার বিবি দৌলত গ্রামে তিনি বাস করিতেন এবং তথায় এখনও তাঁহার সমাধি আছে।

আবুবকর তুঘলক—দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শা তুঘলকের পৌত্র। ১৩৮৯ খ্রীঃ অব্দে তাহার পিতৃব্য পুত্র গিয়াস উদ্দিন নিহত হইলে, তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত মোহাম্মদ তুঘলক তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি মেওয়াড়ের দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন এবং কয়েক বৎসর মিরাটে বন্দী অবস্থায় যাপন করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন।

আবুবকর, সৈয়দ—১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব শেখ কাশিম, কর্ত্তৃক তিনি আসাম বিজয়ে প্রেরিত হয়েন। আসামের আহোম বংশীয় নরপতি প্রতাপ সিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন।

আবু রায় — বর্দ্ধমান রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ ইঁহার পিতামহ এবং বাবু রায় তাহার পিতা ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে আবু রায় বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান সহরের অন্তর্গত রেকাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে বঙ্গে আসিয়া বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী ভূভাগের রাজস্ব সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় বর্দ্ধমান পরগণা ও সন্নিকটবর্ত্তী তিন মহালের জমিদারী প্রাপ্ত হন।

আবুল আয়েব—খলিফা দ্বিতীয় ওমারের রাজত্ব কালে আবুল আয়েব নামক তাঁহার এক সেনাপতি বিপুল সৈন্য বাহিনীসহ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। আরোর নামক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আবুল আয়েব সসৈন্যে নিহত হন।

আবুল কাশিম মির্জা— সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতা মির্জা কামরাণের পুত্র। ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক তিনি গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন এবং কিছুদিন পরেই সম্রাটের আদেশে নিহত হন।

আবুল ফজল—তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত এবং পারস্য ভাষার 'তারিখ-ই-বাইহাকী' নামক একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।

আবুল ফজল, শেখ — সম্রাট আকবরের অন্যতম মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তিনি নাগোরের শেখ মবারকের পুত্র। মবারকের পিতা অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্বীয় জন্ম ভূমি আরব দেশ ত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে আগমন করেন। আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শেখ আবুল ফৈজি। ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে আবুল ফজলের জন্ম হয়। আকবরের উনবিংশ বর্ষ রাজত্ব কালে তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন। তিনি প্রসিদ্ধ 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই আকবরী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। 'মক্তোবাত-অল্লমী' নামক তাঁহার পত্রাবলী রাজকীয় দরবারের উচ্চ আদর্শে পূর্ণ। ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্থলতান মুরাদের সঙ্গে তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার সেলিম, আবুল ফজলের জন্য অনেক অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হন। তজ্জন্য তিনি আবুল ফজলের উপর জাত ক্রোধ ছিলেন পাঁচ বৎসর পরে যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় রাজকুমার সেলিমের পরামর্শে বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত আর্চ্চার রাজা বীরসিংহদেব তাঁহাকে ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে নিহত করিয়া, তাঁহার ছিন্ন মস্তক সেলিমের নিকট প্রেরণ করেন। সেলিম ঐ মস্তক জঘন্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর স্বীয় বন্ধু ও মন্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে এত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি দুই দিন দুই রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আবুল ফতে বেলগ্রামী, কাজী—তিনি শেখ কামাল নামেই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ। ১৫১১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে তিনি বেল গ্রামের কাজী ছিলেন। ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মজফর খাঁ তিরোভতির সময়ে তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবুল ফতে, শেখ—তিনি বিখ্যাত মৌলানা কাজী আবদুল মুক্তাদীর পৌত্র। জৌনপুরের এই বিখ্যাত মৌলবী শেখ আবুল ফতে অতিশয় বিদ্বান্, ধর্ম্মপিপাসু ও নির্লোভ ছিলেন। তিনি ধনীর নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করিতেন না। এমন কি দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম তাঁহার বাসগৃহের দরজার চৌকাঠ ভক্তির সহিত চুম্বন

করিয়া, তারপর এই সর্ব্বত্যাগী সাধু ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার প্রতি লোকের এমনই অচলা ভক্তি ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

আবুল ফরার—হালাগু খাঁ কর্ত্তৃক বোগদাদ নগর ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে ইনি দ্বাদশ পুত্র সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়া, ভাগ্য-লক্ষ্মীর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন এবং সমসাময়িক সম্রাট বলবনের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া, বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহারা ভারতবর্ষে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন এবং বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ইহাঁদের এক শাখা বিহারের অন্তর্গত বাঢ় নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের বংশধরেরা বাঢ়ের সৈয়দ বংশ নামে প্রখ্যাত। এই সৈয়দ বংশের গৌরব ও প্রতিপত্তি বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বংশের নামও সাধারণের অপরিচিত হইয়া পরিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে বাঢ়ের সৈয়দ বংশীয়দের নাম প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইত। গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাঁহাদের রণকুশলতা সাহসিকতা এবং কর্ম্মপটুতা উপমা স্বরূপ ব্যবহার করিত। সৈয়দগণ আপনাদিগকে ভারতের অধিবাসী বলিয়া মনে করিতেন এবং ভারতীয় মুসলমান সমাজের সুখ ও দুঃখের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিয়াছিলেন।

আবুল ফৈজী—সম্রাট আকবরের একজন প্রবীন মন্ত্রী। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর ফার্শী কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। আবুল ফজল দেখ।

আবুল ময়ালী শাহ — সম্রাট আকবরের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাবুলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাবুলে তখন আকবরের ভ্রাতা মির্জা মোহাম্মদ হাকিম শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনী মেহের-উন-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। মির্জা মোহাম্মদ তরুণ বয়স্ক বলিয়া তাঁহার মতেই অনেক সময় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সিংহাসনের দিকে ছিল। তিনি মির্জা মোহাম্মদের অভিভাবকত্বের ভান করিয়া, তাঁহাকেও অপসারিত

করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে বদকশানের ভূপতি মির্জা সুলেমান তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬৬৪ খ্রীঃ)। আবুল মযালী একজন কবিও ছিলেন।

আবুল হাসন — সম্রাট জাহাঙ্গিরের মন্ত্রী ইতিমদ্দৌল্লার পুত্র। তাঁহার অন্যতমা কন্যা আরজমন্দবানু (অন্যনাম মমতাজমহল) সম্রাট শা-জাহানের সহিত পরিনীতা হন। (২) তিনি ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর একজন নৌসেনাপতি ছিলেন। ঢাকা হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সংযোগস্থলের নিকটে নবাবের এক থানা ছিল। মগ ও পর্টুগীজ জল দস্যুদের দমন করিবার জন্য এখানে সৈন্য ও নৌবহর রক্ষিত ছিল। আবুল হুশেন এখানে দুইশত রণতরী সহ অবস্থান করিতেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই রণতরী ও নৌসেনাপতিদের সাহায্যেই চট্টগ্রাম হইতে মগদিগকে তাড়াইয়া উক্ত স্থান অধিকার করেন।

আবুল হাসন খাঁ মির্জা — ইংরেজ রাজদরবারে পারস্যের রাজদূত রূপে তিনি ১৮০৯-১৮১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। 'হয়রাত নামা' (আশ্চর্য্য বিবরণ পূর্ণ পুস্তক) নামক গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষ, তুরস্ক, রুসিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আবুল হুশেন (ডাক্তার) — হুগলি জিলার বাগনান গ্রামে ১২৬৯ সালে ইহার জন্ম হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি বিলাত গমন করেন। ইউরোপ ভ্রমণান্তে আমেরিকায় যাইয়া চিকিৎসা বিদ্যায় এমডি, উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। স্বীয় উদ্ভাবিত হোসেনী ছন্দে 'স্বর্গারোহণ', 'যমজ ভগিনী' ও 'জীবন্ত পুতুল' নামক তিন খানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, এতদ্ ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

আবুল হুশেন, মীর—তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে প্রসিদ্ধ প্রথম কালাপাহাড় (অন্য নাম মোহাম্মদ ফর্ম্মলী) ধৃত ও বন্দী হইয়া দিল্লীর সম্রাট বহুলোল লোদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আবু সৈয়দ ত্রিমিজ — একজন বিখ্যাত ফকির। তাঁহার সমাধি মুর্শিদাবাদ জিলার শেখের দিঘি নামক গ্রামে বর্ত্তমান আছে। তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হুশেন শাহের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নবাবের স্বদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া নবাব তাঁহাকে তথায় বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদর্থে

৬৬ বিঘা নিষ্কর ভূমি তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকেও নবাব আনয়ন করেন। এখনও সেই বিখ্যাত ফকিরের বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন।

আবু হুশেন, কুতব শাহ—তিনি গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশের শেষ নরপতি। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার শ্বশুর আবদুল কুতব শাহের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব গোলকুণ্ডা অধিকার করিবার জন্য নানারকম ছল অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, তিনি স্বীয় পুত্র শাহ আলম ও খাঁ জাহানের অধীনে প্রবল এক সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। আবু হুশেন সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁকে প্রতিরোধার্থ প্রেরণ করেন। মুঘল সেনাপতি খাঁ জাহান অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। পরে এই ইব্রাহিম খাই বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক মুঘল পক্ষ আশ্রয় করেন। আবু হুশেন অনন্যোপায় হইয়া অতি হীন সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া, রক্ষা পান। আওরঙ্গজীব ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শাহ আলম ও খাঁ জাহানকে অতিশয় তিরস্কার করেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজীব গুলবর্গের প্রসিদ্ধ ফকির সৈয়দ মোহাম্মদ গিশুর সমাধি দর্শন করিতে যাইতেছেন বলিয়া, প্রকাশ করেন। আবু হুশেন তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে ৫ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীব গোলকুণ্ডার সমীপবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং অতি হীন ভাবে একখানা চিঠি লিখিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি আবদুর রজ্জাকের কৃতিত্বে আওরঙ্গজীব আট মাস পর্য্যন্ত গোল-কুণ্ডা অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে আবদুর রজ্জাক বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্ব্বক মুঘল পক্ষ অবলম্বন করিলে, আবু হুশেন পরাজিত ও বন্দী হইয়া দৌলতাবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আব্বাস আলী—একজন পারমার্থিক সংগীত রচয়িতা। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম।

আব্বাস বিন আলি সারবাণী—তিনি শের শাহের রাজত্বের একটি সুন্দর ইতিহাস লিখিয়া সম্রাট আকবরের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'তোছকাই আকবর শাহী' ইহার প্রথম অংশ লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের সময়ে মজর আলী কর্ত্তৃক উর্দ্দুতে অনুবাদিত হয়। ইহাকে 'তোয়ারিক-ই-শের শাহী'ও বলে।

আব্বাস মির্জ্জা—কবি ও গ্রন্থকার।

তিনি উর্দ্দু ভাষায় খ্রীষ্টের জীবনী অবলম্বনে একখানি কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আভ্রম্বর—১৮৩৪ খ্রীঃঅব্দে কুর্গ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে, তথাকার রাজা বীর রাজেন্দ্র মাসিক ৬০০০ ছয় হাজার টাকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই আভ্রম্বর নামে রাজবংশীয় এক ব্যক্তি ইংরেজদিগকে রাজ্য হইতে দুর করিবার জন্য বিদ্রোহী হন। অতি অল্প আয়াসেই ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল।

আমজদ আলী শাহ — অযোধ্যার নবাব। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা মোহাম্মদ আলি শাহের মৃত্যুর পরে তিনি লক্ষ্ণৌএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ওয়াজাদ আলি শাহ, লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ওয়াজাদ আলি শাহেরই সময়ে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্য ভুক্ত হয়।

আমরাজ— কনৌজপতি যশোবর্ম্মার পুত্র। জৈন গ্রন্থ 'বাপ্পা ভট্ট সূরি চরিত' এবং রাজ শেখরের 'প্রবন্ধ কোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কনৌজপতি যশোবর্ম্মার পুত্র আমরাজের সহিত গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের শত্রুতা ছিল। আমরাজ তরুণ বয়সে জৈন যতি বপ্পট ভট্ট সূরি কর্তৃক জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

আমরাজ—তিনি একজন জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থকার। ব্রহ্মগুপ্ত কৃত খণ্ড খাদ্য নামক করণ-গ্রন্থের তিনি টিকাকার। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

আমশর্ম্মা— বর্ত্তমান কাথিবার প্রদেশের অন্তর্গত বদানগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। আনন্দপুরের মহাদেবের পুত্র আমশর্ম্মা খণ্ডখাদ্যের উপর এক টিকা লিখিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন।

আমহার্ষ্ট, লর্ড—১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম উইলিয়ম পিট, আর্ল অব্ আমহার্ষ্ট অ্যাণ্ড আরাকান (Earl of Amherst and Arakan) ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি চীনদেশে দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে বড়লাট মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস (Marquis of Hastings) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলে, তাঁহার স্থানে কাউন্সিলের প্রধান সভ্য জন আডাম (John Adam) কিছুদিন কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড আমহার্ষ্ট ১লা আগষ্ট (১৮২৩) তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম কাজ মুদ্রা যন্ত্র ঘটিত উত্তেজনার প্রশমন। জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম নামক এক ব্যক্তি কেলকাটা জর্ণেল

(Calcutta Journal) নামে একখানা ইংরেজী পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের এমন তীব্র সমালোচনা করিতেছিলেন যে, তৎকালীন অস্থায়ী বড়লাট জন আডাম তাঁহার পত্রিকা পরিচালনার অনুমতি পত্র বাতিল করিয়া, তাঁহাকে এদেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে তৎকালে বড়ই উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বর্ম্মারা আসামের পূর্ব্বাঞ্চল ও মণিপুর অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহারা বৃটিশ রাজ্যেও উৎপাত আরম্ভ করে। লর্ড আমাহর্ষ্ট বাধ্য হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ব্রহ্ম পুত্র নদী দিয়া একদল সৈন্য আসামে প্রবেশ করিয়া বর্ম্মাদিগকে সেই দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। আর একদল চট্টগ্রামের পথে আকিয়াবে উপস্থিত হইয়া, সেইস্থান অধিকার করিল। তৃতীয় দল ইরাবতী নদী দিয়া প্রোম নগরে উপস্থিত হইল। চতুর্থ দল মার্টাবান অধিকার করিল। এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে ১৪ কোটী টাকা ব্যয় ও ২০ হাজার সৈন্য হত হয়। অবশ্য ব্রহ্ম রাজ্যেরও প্রভূত অর্থ ও সৈন্য নাশ হইয়াছিল। অবশেষে ব্রহ্মরাজ আসাম আরাকান ও টেনাসরিম প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক কোটী টাকা ক্ষতি পূরণ দিয়া, সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১৮২৬)। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা ভরতপুর জয়। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে কর্ণেল লেক (Col. Lake) উহা আক্রমণ করিতে যাইয়া পরাস্ত হন। তদবধি লোকের ধারণা জন্মিয়াছিল। ভরতপুরের দুর্গ অজেয়। ভরতপুরের রাজা বলবন্তসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দুর্জ্জনশাল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বলবন্তসিংহকে পুন স্বীয়পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়ার (Cumbarmere) ভরতপুর দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক পূর্ব্ব পরাজয়ের দুর্ণাম অপনোদন করেন। তাঁহারই শাসনকালে ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। দিল্লী ও আগ্রাতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলসন সাহেবের প্রযত্নে কলিকাতা নগরীতে সংস্কৃত শিক্ষার, জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহারই সময়ে সিমলাশৈলে প্রথম বড়লাটের গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত হয়।

আমান—মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ে ইনি পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম স্থান চট্টগ্রাম।

আমানত উল্লা, মৌলবী হাফেজ সৈয়দ—তাঁহার বাস স্থান ২৪পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটে ছিল। তিনি ১২৪১ সালে 'কেয়ামতনামা' নামে এক বই বাংলা ভাষায় লিখেন। তাঁহার উর্দ্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থের নাম 'হেদায়েৎ ইস্‌লাম'।

আমানত খাঁ—তিনি একজন বিখ্যাত নস্তালিক লেখক। সম্রাট শা-জাহানের রাজত্বের একাদশ বর্ষে তিনি আগ্রার তাজমহলের উপরে সমস্ত লেখা লিখিয়াছিলেন।

আমানত মুন্সী—বাঙ্গালী মুসলমান কবি। 'ইন্দ্রসভা' নামক পুস্তক তাঁহার রচিত।

আমানী, মির্জা—বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা সরফরাজ খাঁ (১৭২৯-১৭৪০ খ্রীঃ) আলীবর্দ্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার হস্তী চালক অতি গোপনে সরফরাজ খাঁর মৃত দেহ মুর্শিদাবাদে আনয়ন করে। সরফ রাজের পুত্র মির্জা আমানী গোপনে মুক্তা খালীতে পিতার দেহ সমাহিত করেন। পরে আলীবর্দ্দী হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

আমিন আহাম্মদ মহম্মদ রাজি—১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে তাঁহার প্রসিদ্ধ জীবন চরিত কোষ "হপ্ত আকলিম" গ্রন্থ শেষ করেন। এই গ্রন্থে জীবন চরিত ব্যতীত সমমণ্ডলস্থিত অনেক নগর ও দেশের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে।

আমিনা—দিল্লীর বাদশাহের কন্যা অন্যনাম শেরিণা। অনন্য সাধারণ পতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ বীরভূম রাজ বদ্দিউজ্জমান খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শেরিণার সমাধি মন্দির হাতেমপুর দুর্গ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সকলের দর্শনীয় বস্তুরূপে শোভা পাইতেছে। শেরিণা এক্ষণে হিন্দু মুসলমান সকলেরই পূজিতা। পথিকেরা মন্দির পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে সকলেই সভক্তি প্রণাম করিয়া যায়। মুসলমানগণ প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সমাধি মন্দিরে আলোক প্রদর্শন করেন ও পর্ব্বদিনে সম্রাট কন্যার কল্যাণ কামনায় নমাজ পড়িয়া থকেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে আমিনার জন্ম হয় এবং ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু ঘটে। ওস্‌মান দেখ।

আমিনা বেগম—তিনি বঙ্গের শাসন কর্ত্তা আলীবর্দ্দী খাঁর তিন কন্যার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহাম্মদের তিন পুত্রের সহিত তিন কন্যার বিবাহ দেন কনিষ্ঠ জৈনদ্দিন আমিনা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁহাদেরই পুত্র প্রসিদ্ধ সিরাজউদ্দৌল্লা। জৈনদ্দিন ও সিরাজ দেখ।

আমিয়ট—পাটনার জনৈক ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ। বঙ্গের নবাব মীর জাফরের সময়ে ইনি পাটনাতে ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন।

আমীর আলী খাঁ—নবাব বাহাদুর ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে বিহার প্রদেশের বাঢ় নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যার নবাব নাসিরউদ্দিন হায়দর খাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সীর কমিশনারের কোর্টে ডিপুটি এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে পাটনার কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বাংলার লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের মেম্বার হন। তৎপরে অযোধ্যার নবাবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে বাংলার নবাব নাজিরের ঋণ পরিশোধের সহায়তা করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি তুরস্কের সুলতান হইতে সম্মান জনক C. O. C. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

আমীর আলী শা—একজন প্রসিদ্ধ ফকির। ইনি এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী সোরাও নিবাসী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাধু মাধব দাস বাবাজীর সহিত ইহার হৃদ্যতা ছিল। মাধব দাস দেখ।

আমীর আলী, সৈয়দ—১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৬ই এপ্রিল চুঁচড়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পিতা সৈয়দ সাদত আলী অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জিলা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। তাঁহারই পুত্র আমীর আলী প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ও বিচারক ছিলেন। তিনি স্বনাম-খ্যাত ভারতের অন্যতম সুসন্তান মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবহারজীবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে, আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান আইন সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত মুসলমান আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ আইন কলেজের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি কিছুকাল কলিকাতায় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়া প্রথম মুসলমান বিচারপতিরূপে খ্যাতি

লাভ করেন। তিনি একে একে বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রিভি কৌন্সীলের (Provy Council) বিচার কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ইস্লামিক আইন ও সাধারণ আইনের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সৈয়দ আমীর আলী সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া মুসলনান-দের ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক পাঠকের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ভারতীয়েরা সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত সৈয়দ আমীর আলী তাঁহাদের পক্ষে ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনিই পথ প্রদর্শক এবং বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বাং ১৩৩৫ সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করিয়াছিলেন।

আমীর খসরু—তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। প্রসিদ্ধ দরবেশ নিজাম অলদীন আওলিয়ারের তিনি শিষ্য ছিলেন। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

আমীর খাঁ—বর্ত্তমান টঙ্ক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আফগানি স্থানের অন্তর্গত বোনার প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার পিতামহ তাঁলা খাঁ দিল্লীর মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শা গাজীর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং রোহিলখণ্ডের প্রসিদ্ধ রোহিলা সর্দ্দার আলী মোহাম্মদ খাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁলা খাঁর পুত্র হায়াত খাঁ মোরদাবাদে কিছু ভূমি সম্পত্তি লাভ করেন। এই হায়াত খাঁরই পুত্র বিখ্যাত আমীর খাঁ ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে মোরদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। আমীর খাঁ প্রথমে কিছু বেতনগ্রাহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভূপাল রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ হইতে ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত যশোবন্ত রাও হোলকারের অধীনে কাজ করেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া, পেশোয়া ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। পুরস্কার স্বরূপ হুলকার তাঁহাকে টঙ্ক রাজ্য জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সিরোঞ্জ প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে

যশোবন্ত রাও হুলকার উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত হন। এই সময়ে আমীর খাঁ প্রাধান্য লাভ করিয়া রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি যোধপুর রাজ জগৎসিংহের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে অর্থ-লোভে তাঁহার শত্রু মারবাররাজ মানসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। মারবাররাজ মানসিংহ এক সময়ে খুব বিপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারই সাহায্যে মারবার রাজ্যে পুনঃ শান্তি স্থাপিত হয়। যোধপুরের জগৎসিংহ মানসিংহের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে আমীর খাঁ মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পরাজয় ও অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় তিনি জগৎসিংহের পক্ষ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক মানসিংহের আশ্রয় লয়েন। আমীর খাঁ মানসিংহের অর্থলোভে পূর্ব্ব প্রভু জগৎসিংহকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জগৎসিংহের পক্ষাবলম্বন করিবেন, এই আশা দিয়া তিনি তাঁহাকে এক মস্‌জিদে আনয়ন করেন এবং পরে কোনও সময়ে জগৎসিংহ যখন আমোদ প্রমোদে রত ছিলেন, তখন আমীর খাঁ সেই পট গৃহের রজ্জু কর্ত্তন করিয়া জগৎসিংহ ও তাঁহার পারিষদবর্গকে পশুর ন্যায় হত্যা করেন। এইরূপে তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্য ভারতবর্ষে পিণ্ডারী নামক দস্যু-দলের ভয়ানক অত্যাচার চলিতেছিল। আমীর খাঁ ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহাদের দলে যোগদান করিলেন। তাঁহাদেরও প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য ছিল। এই দস্যুদলকে লর্ড ময়রা (Lord Moira) পরে মার্ক্‌ইস অব হেষ্টিং (Marquis of Hastings) পরাজিত করেন। আমীর খাঁর সহিত ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর ইংরেজ সরকারের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির ফলে আমীর খাঁ স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সৈন্য-দলকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

আমীর চাঁদ পণ্ডিত—তিনি একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ভাবিজ্ঞান নামক জ্যোতিষ পুস্তক তাঁহার রচিত।

আমীর তৈমুরলঙ্গ—তাহার একখানা পা ছোট ছিল বলিয়া তাঁহাকে তৈমুর লঙ্গ (লঙ্গ-খোড়া) বলা হইত : প্রাচীন সগ্‌দনিয়ার অন্তর্গত কুশনগরে ১৩৩৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি একজন সামান্য কৃষক পুত্র। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তিনি পারস্যের প্রসিদ্ধ বিজয়ী চেঙ্গিশ খাঁর বংশধর। তাঁহার পিতার নাম আমির তুরা খাই, মাতার নাম তকিনা খাতুন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ কতক গুলি বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে তিনি

খোরাসানের রাজধানী বল্‌খ নগর আক্রমণ করেন এবং তথাকার অধিপতি আমীর হুশেনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। এই আমীর হুশেনের ভগিনীকেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৩৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে তিনি পারস্য, বোগ্‌দাদ এবং কান্দাহার অধিকার করেন। একদল খুব সাহসী সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতে প্রবেশ করিয়া ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলককে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। মোহাম্মদ তুঘলক গুজরাটে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে নগর-বাসীদের প্রতি কোন অত্যাচার করিবেন না। কিন্তু পরে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া লুণ্ঠন ও নর হত্যায় প্রবৃত্ত হন। পাঁচদিন ধরিয়া হত্যাকাণ্ড চলিলে, রাজপথ সমূহ শোণিতে প্লাবিত হয়। কিন্তু তৈমুর অবিকৃত চিত্তে বিজয় উৎসবে মত্ত থাকেন। অতঃপর নর শোণিতে অরুচী জন্মিল বলিয়াই যেন, তিনি নরহত্যা বন্ধ করিলেন। এই নগর লুণ্ঠন কালে প্রায় আশী-হাজার লোক নিহত হয় বলিয়া কথিত আছে। বিপুল ধনরত্নসহ তিনি ভারত হইতে প্রস্থান করিয়া, বোগ্‌দাদ অভি-মুখে যাত্রা করেন। ভারত হইতে প্রস্থান করিয়া তৈমুর দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া উত্তরে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে হিমালয়, পশ্চিমে ডন ও বল্গানদীর তীর এবং পূর্ব্বে চীন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তুরস্কের সম্রাট বায়জিদ তৈমুরের হস্তে পরাজিত হইয়া লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হন। মিশর দেশও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৪০৫ খ্রীঃ অব্দে একাত্তর বৎসর বয়সে সমরখণ্ড নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের স্থাপন কর্ত্তা বাবর তাঁহারই বংশধর ছিলেন।

আমীর বমুনিয়া—রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত মুকুটপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। একশত বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি একখানি আমপারার তফসির (ভাষ্য) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কোরাণের অধ্যায় বিশেষের অনুবাদ।

আমীর বরিদ (প্রথম)—১৫০৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১০) তিনি তাঁহার পিতা কাশিম বরিদের মৃত্যুর পরে আহাম্মদা-বাদ বিদর নগরের সিংহাসনে আরো-হণ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯২৩) সুলতান মোহাম্মদ শাহ বামনীর মৃত্যু হইলে, তিনি সুলতান তৃতীয় আলা-উদ্দিনকে সেই সিংহাসনে স্থাপন করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সুলতান

কলিম উল্লাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। সুলতান কলিম উল্লা আমিন-বরিদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক, আহাম্মদনগরে গমন করেন। কিছুকাল পরে তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিম উল্লার সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যে বাহমনীবংশের রাজত্ব শেষ হয়। আমীর বরিদই আহাম্মদাবাদ বিদরের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি এই দেশে প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৪৯) দৌলতাবাদে আমীর বরিদের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র আলী বরিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আমীর বরিদ, দ্বিতীয় — তাঁহার আত্মীয় দ্বিতীয় আলী বরিদ শাহকে ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তিনি আহাম্মদাবাদ বিদরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বরিদশাহী বংশের শেষ সুলতান।

আমেদ শাহ—তিনি উত্তর ভারতের বেরেলী নামক স্থানের সৈয়দ বংশোদ্ভব। আমেদ শাহ, সেনাপতি আমীর খাঁর অনুচর ছিলেন। এই আমীর খাঁ পিণ্ডারীদের সর্দ্দার ছিলেন। পিণ্ডারী দমনের পর আমেদ শাহের চাকুরী যায়। অতঃপর তিনি দিল্লীতে গমন করেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কা যাত্রা করিলেন। চারি বৎসর পরে ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে পাঁচশত অনুচরের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু টঙ্কের নবাব আমীর খাঁর রাজ্যে আসেন। তথায় বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, সিন্ধুদেশের অন্তর্গত খয়ের-পুরের মীর রুস্তম খাঁর আলয়ে সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। অবশেষে বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি কান্দাহার যাত্রা করেন। তথায় আরও অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া পেশোয়ার অধিকার করেন। ইতিমধ্যে তিনি এক আদেশ জারি করিলেন যে, প্রত্যেক বিবাহ-যোগ্য কন্যাকে অচিরে বিবাহ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে আফ-গানেরা তাঁহার বিরোধী হয় এবং সৈন্য সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। পরে শিখদের সঙ্গে এক যুদ্ধে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিহত হন।

আম্রদেব সূরী — তিনি নেমিচন্দ্রের আখ্যান মণিকোষ গ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। (১১৩৩ খ্রীঃ)

আয়জদ্দিন মুন্সী — তিনি একজন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। তাঁহার জন্ম-স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'গোল আন্দাম' (১২৯০)।

আয়দেব—তিনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধা-চার্য্য ছিলেন। তাঁহার রচিত চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে।

আয়ন্ন দীক্ষিত — তিনি 'ব্যাস তাৎপর্য্য নির্ণয়' গ্রন্থ লিখিয়া, ব্যাসের মত যে অদ্বৈতবাদ তাহাই প্রতিপন্ন করেন।

আয়ার, (Governor Eyre)—ইনি ইংরাজ বণিক কোম্পানীর গভর্ণর ছিলেন। ইনি শাহজাদা আজিম উস্‌মানের অনুগ্রহে প্রয়োজন মত অর্থ-দান করিয়া, কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য প্রচার কার্য্যে একটু স্থিরভাবে বাঙ্গালায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লন।

আয়াপারেল — অন্য নাম নীলমণি সিংহ। মণিপুরের মহারাজা সুরচন্দ্র সিংহ ও কুলচন্দ্র সিংহের সময়ে অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের মণিপুর যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

আয়ুপাল — শাকল নগরের একজন বৌদ্ধ স্থবির। তিনি যখন সাংখ্যেয় নামক আশ্রমে বাস করিতেছিলেন তখন, রাজা মিলিন্দ (Menander) একবার বিচারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।

আরজ মন্দ বানু, বেগম — প্রসিদ্ধ নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। রাজকুমার মির্জা খুরমের (পরে শা-জাহান) সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় (১৬১২ খ্রীঃ)। তিনি শা-জাহানের অতি প্রিয় মহিষী ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজ কুমারী দহর আরাকে প্রসব করিয়া কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বুরহানপুরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং জৈনাবাদ নামক উদ্যানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পরে তাঁহার অস্থি আগ্রাতে আনা হয় এবং তদীয় সমাধির উপরেই পৃথিবী খ্যাত তাজমহল নামক মন্দির সার্দ্ধ চারি কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আরসালান খাঁ — ইজুদ্দিন বলবন যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আরসালান খাঁ গৌড়-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন (অনুমান ১২৬০ খ্রীঃ অব্দ); সেই সময়ে জালাল উদ্দিন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। উভ-য়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে জালাল উদ্দিন নিহত হন।

আরাব আলী — তিনি বাঙ্গালার মুরশিদকুলি খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নবাব তাঁহাকে মুঙ্গের দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গেরের দুর্গ শত্রুহস্তগত হয়।

আরাম শাহ—সুলতান কুতব উদ্দিন

আইবাকের পুত্র। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে কুতবউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বীয় ভগিনীপতি ইলতিমাস কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন। ইলতিমাস সামস-উদ্দিন উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আরারু — এলাহাবাদের অন্তর্গত কোরার একজন জমিদার। তিনি খিচর জাতীয় ছিলেন। দিল্লীর মুঘল সম্রাটের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ঐ প্রদেশের চাকলাদার নবাব জান নিসার খাঁকে নিহত করেন। তিনি উজিরের আত্মীয় ছিলেন। উজিরের পুত্র আজিম উদ্দৌলা খাঁ একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি জঙ্গলে পলায়ন করাতে বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ না হইয়া, প্রতিনিধি স্বরূপ খারিজম বেগ খাঁকে তথায় রাখিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আরারু ইহাতে সাহসী হইয়া খারিজম বেগ খাঁকে নিহত করেন। উজির কুমর উদ্দিন খাঁ, অযোধ্যার সুবেদার সাদত খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সাদত খাঁ, আরারু খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, তাঁহার মস্তক দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করেন। ১৭৩৫ খ্রীঃ, (হিঃ ১১৪৮)।

আরিফ—তিনি 'লালমনের-কেচ্ছা' নামক এক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উহা আরবী ও ফার্শী শব্দ মিশ্রিত বঙ্গভাষায় রচিত।

আরিমত্ত, রাজা—তাঁহার অন্যনাম শশাঙ্ক। তিনি ব্রহ্মপুত্রবংশের সর্ব্ব প্রধান নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে।

আরীশাহ—একজন সুফী সাধক। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম বীরসাহেব এবং তিনি জন্মত হিন্দু ছিলেন। আরীশাহ জাতিতে মুসলমান হইলেও তাঁহার রচনার মধ্যে আল্লার সঙ্গে রাম, হরি, আরতি, দেহতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। হিন্দু মুসলমানের কোন সংকীর্ণতা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার গানে গুরুর চরণ রজের অঞ্জন দিবার কথা আছে। সৃষ্টি শূন্যের কাগজে তাঁহার প্রেম কলমের লেখা, যে এই রস প্রত্যক্ষ করে নাই, তাঁহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝান অসাধ্য। মানব ব্রহ্মসাগরেরই বুদ্বুদ ইত্যাদি কথা চমৎকার পদ্যে রচিত আছে।

আর্য্যক্ষেমীশ্বর — তিনি একজন নাটক রচয়িতা। তাঁহার রচিত 'চণ্ড কৌশিক' নামক নাটকে পালবংশীয় রাজা প্রথম মহীপালের বিবরণ আছে।

আর্য্যখপুত—একজন জৈনাচার্য্য। তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, জৈনমতের প্রাধান্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ৫৫ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দে ইহা সংঘটিত হয়।

আর্য্যচন্দ্র — বৈভাষিক আর্য্যচন্দ্র একজন মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মৈত্রেয় ব্যাকরণ'।

আর্য্যদেব—বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ মাধ্যমিক শাখার প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনের শিষ্য। তাঁহার নামান্তর কাণদেব ও নীলনেত্র। তিনি সিংহলের অধিবাসী ছিলেন। নাগার্জ্জুনের সহিত ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য তিনি সিংহল হইতে এদেশে আগমন করেন। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুমারজীব কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনাখ্যান চীন ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির নাম 'চতুঃশতক', চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ' ও 'হস্তবল প্রকরণ'। আর্য্যদেবের চতুঃ-শতক গ্রন্থখানির একটী টীকা চন্দ্রকীর্ত্তি কর্ত্তৃক রচিত হয়। আর্য্যদেব খুব সম্ভব ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, তিনি একবার অপর একজন ধর্ম্মা-চার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করেন। ইহাতে পরাভূত ব্যক্তির এক শিষ্য ক্রোধপরবশ হইয়া, তাঁহার জীবন সংহার করে। নাগার্জ্জুনের 'প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্র' নামক গ্রন্থের সাহায্যে আর্য্যদেব বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযান মতবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ তৃতীয় শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই রচনা করেন। তাঁহার রচনাদ্বারাই মহাযান বৌদ্ধ মত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর্য্যদেব শূন্যবাদী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। তিনি মহাকৌশল, শ্রুঘ্ন, প্রয়াগ, চোল ও বৈশালী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যধর্ম্ম ত্রাত—তিনি নরপতি বসু-মিত্রের পিতৃব্য ছিলেন। খ্রীঃ প্রথ-শতাব্দীতে তিনি 'ধম্মপদ' গ্রন্থ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ লইয়া গিয়াছিলেন।

আর্য্যবিমুক্ত সেন—তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। তিনি পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতার ভাষ্য রচনা করেন।

আর্য্যভট্ট প্রথম—ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। জ্যোতিষী আর্য্য ভট ৪৭৬ খ্রীঃ অব্দে (৩৯৮ শকে) কুসুম-পুরে (পাটলীপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা নগরে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক্-দিগের নিকট অর্দ্ধবেরিয়স এবং আর-বীয়গণের নিকট অর্জভর নামে পরি-চিত ছিলেন। তাঁহার 'কুট্টকবিধি' বিদেশীয় পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তক 'আর্য্যভট তন্ত্র' নামে খ্যাত। ইহা

চারি ভাগে বিভক্ত—(১) 'গীতিকাপাদ' ইহাতে চতুর্যুগে অর্থাৎ এক মহাযুগে নক্ষত্রগ্রহ-মন্দোচ্চপাতের ভগন সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। (২) 'গণিতপাদ' ইহাতে পাটীগণিত ; (৩) 'কালক্রিয়া-পাদ' ইহাতে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ ; (৪) 'গোলপাদ' ইহাতে গ্রহ ও গোল-গণিত বিবৃত ইইয়াছে। ইহা একখানি প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। পৃথিবী যে স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহার আবিষ্কর্ত্তা আর্য্য ভট। আর্য্যভট স্বীয় গ্রন্থে ১, ২ ,৩ ইত্যাদি সংখ্যার পরিবর্ত্তে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা ব্যবহার করিয়াছেন। আর্য্যভটের সহস্র বৎসর পরে, ইউ-রোপে কোপর্ণিকাস দিবা রাত্রি ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বহুকাল পরে একজন অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার বৃহৎ আর্য্যসিদ্ধান্ত নামে এক খানা পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তক 'আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্ত' নামে খ্যাত। সেইজন্য আর্য্যভট রচিত পুস্তক 'লঘুআর্য্য সিদ্ধান্ত' নামেও খ্যাত হয়।

আর্য্যভট, দ্বিতীয়—সম্ভবতঃ প্রথম আর্য্য ভটের পুস্তক অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় আর্য্যভট দশগীতিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। আর্য্য সিদ্ধান্তকার আর্য্যভট খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে ৮৭২ শকে, (৯৫০ খ্রীঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন।

আর্য্যরক্ষিত—তিনি জৈনাচার্য্য ব্রজ স্বামীর একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। জৈনাচার্য্য আর্য্যরক্ষিত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বারাণসী নগরে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাতার অনুরোধে জৈন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সূত্রগুলিকে সর্ব্বসাধারণের সহজে বোধগম্য চারি ভাগে বিভক্ত করেন।

আর্য্যশূর— একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি খুব সম্ভব ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী অব-লম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় 'জাতক-মালা' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গল্পগুলি ত্রিপিটকের অন্তর্গত জাতক মালার গল্পগুলির প্রায় অনুরূপ। তাঁহার রচিত অপর কোনও কোনও পুস্তক খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল।

আর্য্যশ্যাম—একজন আচার্য্য ও গ্রন্থ-কার। তিনি জৈন ধর্ম্মাচার্য্য মহাবীরের মৃত্যুর প্রায় চারিশত বৎসর পরে জন্ম-গ্রহণ করেন। জৈন ধর্ম্ম শাস্ত্র চতুর্থ 'উপাঙ্গ' তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যসঙ্ঘ সেন — একজন প্রাচীন কথা গ্রন্থকার। ৪৫০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে

তিনি একখানি কথা পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের আখ্যানগুলি সোমদেব কৃত 'কথা সরিৎ সাগরের' অন্তর্গত কাহিনীগুলির অনুরূপ। উক্ত পুস্তকখানি তাঁহার শিষ্য গুণবৃদ্ধি কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হয়।

আল উৎবী—তিনি একজন ঐতিহাসিক পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'জমিউল হিকায়ৎ'। তিনি গজনীর অধিপতি সবক্‌ তিগীন ও সুলতান মাহমুদের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জয়পালের সহিত সুলতান মাহমুদের যুদ্ধের সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

আলতমাস সম্রাট—শামস উদ্দিন ইলতিমাস দেখ।

আলমগীর প্রথম — আওরঙ্গজীব দেখ।

আলমগীর দ্বিতীয়, আজিজ উদ্দিন—তিনি দিল্লীর মুঘল সম্রাট জহন্দর শাহের পুত্র। তাঁহার মাতা অনুপাবাই রাজপুত রমণী ছিলেন। ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পুত্র আহাম্মদ শাহ সিংহাসনচ্যুত হইলে, তিনি ইমাদ্‌-উল্‌-মুলক গাজি উদ্দিন কর্ত্তৃক ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে অধিষ্টিত হন। নামে মাত্র পাঁচ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে, যিনি তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারাই সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। তাঁহার পুত্র আলী গহর বঙ্গ দেশে ছিলেন। সুতরাং কামবক্সের পুত্র, ও আওরঙ্গজীবের পৌত্র মহীউল সন্নত, দ্বিতীয় শা-জাহান উপাধি গ্রহণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই মহারাট্টারা দিল্লী আক্রমণ করিয়া আলী সফরের পুত্র, মির্জা জোয়ান বখ্‌তকে তাঁহার পিতার প্রতিনিধি রূপে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন।

আলমচন্দ্র — বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অন্যতম সেনাপতি। তিনি তাঁহার অন্যতম সহকারী ক্ষেম চন্দ্রের সহিত ভুরসুটের জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (কবি ভারত চন্দ্রের পিতা) বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ছিলেন। সেনাপতিদ্বয় ভবানীপুর গড় ও পেড়োর গড় প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ভারত চন্দ্র (কবি) দেখ।

আলমচাঁদ রায়—তিনি বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজস্ব সচীব ও মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে রাজ পরিবারের হিসাবনবীশ ছিলেন। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মৃত্যুর পর্ব্বে তাঁহার দৌহিত্র বঙ্গের নবাব সরফরাজ খাঁর সহকারী পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে আলমচাঁদের জন্য রায়রায়ান

উচ্চ উপাধি আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নবাব সুজাউদ্দিন (১৭২৫—১৭৩৯ খ্রীঃ), সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯—১৭৪০ খ্রীঃ) এবং আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে রাজস্ব সচীবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ যখন নবাব সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ ও সরফরাজ খাঁর মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকে গৃহে আনা হয়। স্বীয় অপকার্য্যের বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে হীরার আংটী চুষিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

আলাউদ্দিন প্রথম, হুশেনগঙ্গো বাহমনী — দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যের স্থাপয়িতা। আলাউদ্দিন প্রথমে গঙ্গাদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। এক দিন প্রভুর ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে কিছু গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হন এবং ঐ ধন আত্মসাৎ না করিয়া তিনি স্বীয় প্রভুকে প্রদান করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সেই ব্রাহ্মণের দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলকের নিকট অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ সম্রাটের নিকট আলাউদ্দিনের বিষয় বলেন। সম্রাট তাঁহার সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া, দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া, একজন বিচক্ষণ সেনাপতি হইয়া উঠেন। এই দিকে মোহাম্মদ তুঘলকের অত্যাচারে চারিদিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। এই সুযোগে আলাউদ্দিন দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং দক্ষিণাপথের সম্রাট হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি আলাউদ্দিন-হুশেন-গঙ্গো-বাহমনী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি কুলবর্গ নগরে ১৩৪৭ খ্রীঃ অব্দের ৩ রা আগষ্ট শুক্রবার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ শাহ (প্রথম), বাহমনীরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুলবর্গনগরের বাহমনী বংশের তালিকা এইরূপ—১। আলাউদ্দিন-হুশেন-গঙ্গো-বাহমনী ১৩৪৭—১৩৫৮ খ্রীঃ। ২। মোহাম্মদ শাহ (প্রথম) ১৩৫৮—১৩৭৫ খ্রীঃ। ৩। মোজাহিদ শাহ ১৩৭৫—৭৮ খ্রীঃ। ৪। দাউদ শা ১৩৭৮ খ্রীঃ। ৫। মাহমুদ শাহ ১৩৭৮—৯৭ খ্রীঃ। ৬। গিয়াসউদ্দিন ১৩৯৭ খ্রীঃ। ৭। সামসউদ্দিন ১৩৯৭ খ্রীঃ। ৮। ফিরোজ শাহ রোজ আফজল ১৩৯৭—১৪২২ খ্রীঃ। ৯। আহাম্মদ

শাহ ওয়ালী ১৪২২—৩৫ খ্রীঃ। ১০। আলাউদ্দিন আহাম্মদ (দ্বিতীয়) ১৪৩৫—৫৭ খ্রীঃ। ১১। হুমায়ুন ১৪৫৭—৬১ খ্রীঃ। ১২। নিজাম শাহ ১৪৬১—৬৩ খ্রীঃ। ১৩। মোহাম্মদ শাহ (দ্বিতীয়) ১৪৬৩—৮২ খ্রীঃ। ১৪। মাহমুদ (দ্বিতীয় ১৪৮২—১৫১৭ খ্রীঃ। ১৫। আহাম্মদ শাহ (দ্বিতীয়) ১৫১৭ খ্রীঃ। ১৬। আলাউদ্দিন (তৃতীয়) ১৫১৭ খ্রীঃ। ১৭। অলিউল্লা ১৫১৮ খ্রীঃ। ১৮। কলিমউল্লা ১৫১৭ খ্রীঃ। তিনিই এই বংশের শেষ রাজা। ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মন্ত্রী আমির বরিদ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন।

আলাউদ্দিন দ্বিতীয় — সুলতান আহাম্মদ শাহ বাহমনীর পুত্র। ১৪৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি আহাম্মদাবাদ বিদর নগরে সিংহাসন আরোহণ করেন। প্রায় ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলাউদ্দিন আলীশাহ বা **আলী মুবারিক** — পশ্চিম বঙ্গের একজন নবাব। তিনি ফকিরউদ্দিন মোবারক শাহকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৩৪৩ খ্রীঃ অব্দে খাজা ইলিহাস শাহের প'র সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্ররোচনায় তিনি নিহত হন।

আলাউদ্দিন ইমাদশাহ—১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা ফতেউল্লা পরলোক গমন করিলে, তিনি বেরারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজধানী বেরার হইতে গয়াল নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। সুলতান ইস্‌লাম আদিল শাহের ভগিনী খাদিজা বেগমকে তিনি বিবাহ করেন (১৫২৮ খ্রীঃ)। ১৫৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র দরিয়া ইমাদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলাউদ্দিন ইস্‌লাম খাঁ—তিনি সাধারণতঃ ইস্‌লাম খাঁ নামেই পরিচিত। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হন। তিনি রাজমহল হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ঢাকা নগরে আনয়ন করেন। সেই সময় পর্টুগিজ জলদস্যুরা বঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানে বড়ই উপদ্রব করিত। মগ জলদস্যুদেরও উপদ্রব ছিল। এই সকল অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্যই, তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইতি-মধ্যে সন্দ্বীপের মুঘল শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ পর্টুগিজদিগকে দমন করিতে যাইয়া স্বয়ং তাহাদের হস্তে নিহত হন। এই জয়লাভে পর্টুগিজেরা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। আরাকানরাজ এই সময়ে পর্টুগিজ সেনাপতি সিবাষ্টিয়ান

গঞ্জালের সহিত একযোগে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আরাকানরাজের বহু সৈন্য মুঘল হস্তে নিহত হইলে, পর্টুগিজেরা সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহার কিছুকাল পরে উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার কুতলু খাঁর পুত্র ওসমান খাঁ বিদ্রোহী হন। নবাব সুজায়েৎ খাঁ, সৈয়দ আদম, ইফতিয়ার খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর ওসমান খাঁ নিহত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা ভেলাই খাঁ ও পুত্র মুমারিজ খাঁ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬১৪ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা নগরে এই প্রজা-রঞ্জক নবাব পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দিন খাঁ, ইজ্জল মুল্ক—১২৩১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট শামস উদ্দিন আলতমাস বাঙ্গালার বিদ্রোহী নবাব হিসামউদ্দিন খিলিজিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আলাউদ্দিন খাঁ ইজ্জল মুল্ককে সিংহাসন প্রদান করেন। তিনি তিন বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করেন। তৎপরে সম্রাট তাঁহাকে পদচ্যুত করেন (১২৩৪ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দিন খিলিজি, সুলতান—তিনি সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খিলিজির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা, কিন্তু খুল্লতাত অথবা শ্বশুরকেই এলাহা-[illegible] বাদের অন্তর্গত কারামাণিকপুরে নিহত করিয়া ১২৯৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজেকে সেকেন্দর-ই-শানি (দ্বিতীয় সেকেন্দর) বলিতেন। মুসলমান সম্রাট দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা করেন। তিনি যাদব ও বল্লাল রাজপুতদিগকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিমে মহারাষ্ট্র ও পূর্ব্বে কর্ণাট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। মালব ও গুজরাটের হিন্দু রাজারা এতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু আলাউদ্দিনের চেষ্টায় এই দুই প্রদেশও পাঠান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ফলতঃ মুসলমান সম্রাটের মধ্যে তিনিই ভারতে একছত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। চিতোরের গিহ্লোট রাজপুতদিগের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হয়। রাণা ভীম সিংহ প্রভৃতি সমরে নিহত হন। রাণা ভীম সিংহের স্ত্রী পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত নারীরা অনলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। তিনি চিতোর বিধ্বস্ত করিলেও কিছুকাল পরেই রাজপুতেরা উহা পুনরায় অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়ের অনেক কবি ও বিদ্বান্ লোকের নাম আমরা শুনিতে পাই। [illegible] ও দর্শন শাস্ত্রে, মৌলানা বদরুদ্দিন

দামাস্কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, মৌলানা সিস্তাবী, জ্যোতিষে এবং শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া ও অন্যান্য অনেক কবি সেই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বড়ই ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, এক বারাণসীতেই একহাজার দেব মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি কুতব মিনারের ন্যায় আর একটি মিনার প্রস্তুত করাইতে ছিলেন কিন্তু তাহা আর সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়া ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র সুলতান সিহাবউদ্দিন ওমর, মালিক নায়েব কাফুর কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হন। মালিক নায়েব কাফুর নিহত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুবারক শাহ সিহাবউদ্দিনকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৩১৭ খ্রীঃ)

আলাউদ্দিন জানি — দিল্লীর সম্রাট সামসউদ্দিন ইলতিমাসের প্রতিনিধি-রূপে তিনি চারি বৎসর গৌড়ের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। দৌলত শাহ দেখ।

আলাউদ্দিন তোঘান খাঁ—তাতার দেশের খোটান নগরে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে তিনি দিল্লীর সুলতান ইলতি-মাসের ক্রীতদাস ছিলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাজ পরিবারে অতি বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করেন। তৎপরে (১২৩৩ খ্রীঃ) তিনি রোহিলখণ্ড প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত থাকিয়া, পরে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন (১২৩৭ খ্রীঃ)। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই ত্রিহুতরাজ্য জয় করিয়া তথাকার রাজার নিকট হইতে বহু অর্থ লাভ করেন। তৎপরে দিল্লীর সম্রাট মসায়ুদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া, অন্যান্য ওমরাহগণের ন্যায় তিনিও স্বীয় ক্ষমতার প্রসারণে প্রয়াসী হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে কোরা মানিকপুর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন ১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। উড়িষ্যারাজ পর বৎসর গৌড় নগর অবরোধ করিলে তোঘান খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। উড়িষ্যার রাজা গৌড় অধিকার না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতি তাইমুর খাঁ কেরান লক্ষ্মণাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া নিজেকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিলেন। তোঘান খাঁ বিনা যুদ্ধে উহা প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। ঘোর যুদ্ধের পর বন্ধুদের পরামর্শে তোঘান খাঁ ধনরত্নসহ দিল্লীতে

প্রস্থান করিলেন, এবং তাইমুর খাঁ কেরান বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তোঘান খাঁ সাদরে দিল্লীর সম্রাটকর্ত্তৃক পরিগৃহিত হইয়া অনতিবিলম্বে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে থাকিয়াই তিনি ১২৪৭ খ্রী: অব্দে পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দীন দৌলত শাহ—গৌড়ের অধিপতি। ১২২৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীশ্বর ইলতিমাস কর্ত্তৃক তদীয় দ্বিতীয় পুত্র গৌড় আক্রমণে নিযুক্ত হইয়া গৌড়াধিপতি ঘিয়াসউদ্দিনকে যুদ্ধে নিহত করেন ও নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে আলাউদ্দীন সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু অবিলম্বে দিল্লীর ফৌজ আসিয়া তাঁহাকে পরাভূত করে। তৎপরে আলাউদ্দীন জানি নামক এক ব্যক্তিকে রাজপ্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলাউদ্দিন মসাউদ—দিল্লীর সম্রাট। সুলতান রুকুনউদ্দিন ফিরোজের পুত্র এবং সামসউদ্দিন ইলতিমাসের পৌত্র। ১২৪২ খ্রীঃ অব্দে বেরহাম শাহের হত্যার পরে, তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারিবৎসর রাজত্বের পর ১২৪৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় তৎপরে তাঁহার ভাই সুলতান নাজির উদ্দিন মোহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলাউদ্দিন মাজুর শাহ—আগ্রার একজন মুসলমান সাধক। সাধারণতঃ তিনি শাহ আলওয়াল বা বেলওয়াল নামে খ্যাত। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ সুলেমান। ১৫৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইসলাম শাহ শূরের রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। আগ্রার নাইকি মণ্ডি নামক স্থানে তাঁহার সমাধি দর্শনার্থ প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক একত্র হয়।

আলাউদ্দিন, মৌলানা — দিল্লীর ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্ব কালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। যখন রাজকুমার ফতে খাঁ জৌনপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহার অনুরোধে মৌলানা সাহেব জৌনপুরে গমন করেন। তথায় তিনি রাজকুমার ফতে খাঁকর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হন। কথিত আছে, রাজকুমার তাঁহার দেহ ভারের অনুরূপ স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তাঁহার গমনে উক্ত নগরে চৌদ্দটী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই প্রকার সম্মান ও যশ লাভপূর্ব্বক ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭৮৮) তিনি তথায় পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দিন সুলতান—দিল্লীর সৈয়দ বংশের শেষ রাজা। ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার পিতা সুলতান মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অরোহণ করেন। তিনি বদায়ুনে গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিত

কালে মন্ত্রী হামিদ খাঁর পরামর্শে বহলোললোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪৫১—১৪৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত আলাউদ্দিন বদায়ুনে ছিলেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দিল্লীতে ছয় বৎসর এবং বদায়ুনে ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

আলাউদ্দিন হুশেন শাহ—বঙ্গ-দেশের নবাব। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আসরফ হুশেন। তিনি আরব-দেশের অধিবাসী ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন। মুরশিদাবাদ জিলার জঙ্গিপুর উপ-বিভাগে চাঁদপুর গ্রামে তিনি স্বীয় পুত্র আলাউদ্দিন হুশেন ও ইউসফউদ্দিন সহ বাস করিতে থাকেন। পুত্রদ্বয় সেখান-কার কাজীর নিকট অধ্যয়নে রত হন। কাজী সাহেব তাঁহাদের বংশ পরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্যার সহিত আলাউদ্দিন হুশেনের বিবাহ দেন। বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মুজাঃফর শাহের (১৪৯৫-৯৯) রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি মন্ত্রীপদ লাভ করেন। মুজাঃফর শাহ অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সৈয়দ হুশেনকেই রাজপদ প্রদান করেন। তিনি অতি ন্যায়-পরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি আসাম, প্রদেশ জয় করিয়া তথায় তাঁহার পুত্রকে রাখিয়া আসেন। আসামের রাজা আক্রমণের প্রথম ভাগে দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বর্ষার আগমনে তাহারা পুনঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। বহু মুসলমান সৈন্য খাদ্যাভাবে ও রোগে প্রাণত্যাগ করে। হুশেন সাহের পুত্র পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। জৌনপুরের অধিপতি শাহ হুশেন দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর লোদীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, বাঙ্গালার নবাব হুশেন শাহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হুশেন শাহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক পদ-মর্য্যাদানুরূপ বৃত্তি বিধান করিয়াছিলেন. আটাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি, পাণ্ডুয়ার প্রধান দরবেশ শাহ কুতব উদ্দিন আলমের সমাধি, বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি রক্ষার্থ বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর একবার তিনি এই সমাধি দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী রূপ ও সনাতন মহা-প্রভুর প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষারও একজন উৎসাহ দাতা ছিলেন। ৯২৭ হিঃ সালে (১৫৩১ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার আঠার জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নশরৎ শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলাউদ্দৌল্লা (মীর অথবা মির্জ্জা) — একজন কবি। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম কাফি। তিনি সম্রাট আকবরের সময় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সমকালবর্ত্তী সমুদয় কবির জীবনী সংগ্রহ করেন।

আলা-উল্-হক্ —ইনি একজন ফকির। তিনি লাহোর নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য মুসলমানের পুত্র। পিতার সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গৌড়ের বাদশাহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। পুত্র মুকদুম আখি, সিরাজ উদ্দীন নামক এক সাধু পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ফকির হয়েন। ফকির হইয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতে থাকেন। ইহাতে বাদশাহের মনে সন্দেহ হয় যে, রাজকোষ হইতে কোষাধ্যক্ষ অর্থ প্রদান করিতেছেন। সন্দেহবশে বাদশাহ ফকিরকে সুবর্ণগ্রামে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু সেখানেও ফকির অজস্র অর্থব্যয় করিতে থাকেন। তখন বাদশাহ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ফকিরকে ক্ষমা করিলে, ফকির পুনরায় পাণ্ডুয়ায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে পাণ্ডুয়া নগরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি মন্দির এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে। বাদশাহ আবুল মুজাফর মাহামুদ শাহের শাসন সময়ে তিনি পরলোক গমন করেন।

আলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ—চট্টগ্রাম-বাসী সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত বাং ১১৬০ সালে 'হপ্তপয়কার' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ১১৪১ সালে কাজী দৌলত পণ্ডিতের সহযোগে 'সতীময়না' নামেও এক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১১৯৫ সালে তাহার 'দারা সেকেন্দার নামা' প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'পদ্মাবতী' নামক গ্রন্থ সম্ভবত ১১৮৭ সালে রচিত হয়। তাঁহার রচিত 'সয়ফল মুল্লুক' কখন প্রকাশিত হয় জানা যায় না। ইনি অনুমান ১১১৫ খ্রীঃ অব্দ জেলা ফরিদপুরের, ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত জালালপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফতেয়া-বাদের অধিপতি মজলিস কুতবের সভাসদ্ ছিলেন। পিতার সঙ্গে জল পথে আরাকান যাইবার সময় পর্টুগীজ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, এবং দস্যুদের হস্তে পিতার মৃত্যু ঘটে। আলাওল সাহেব কোন মতে প্রাণ লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক শ্রীচন্দ্র সুবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রাজার প্রধান মন্ত্রী কাব্যরসপ্রিয় মুসলমান জাতীয় মাগন ঠাকুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মাগন ঠাকুর আলাওল সাহেবের কেবল আশ্রয়দাতা ও অন্নদাতা ছিলেন না, তাঁহারই অনুরোধে তিনি 'পদ্মাবতী' 'সয়ফলমুল্লুক' ও 'বদি উজ্জমাল' নামক

গ্রন্থ সমূহ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ রচনা সমাপন না হইতেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে। ব্রহ্মদেশে ইহার অবশিষ্ট অংশ রচিত হয়। ইহার পরেই আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তদীয় ভ্রাতা শাহসুজা তথায় উপস্থিত হন এবং আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সপরিবারে নিহত হয়েন। এতদুপলক্ষে আরাকান রাজ মুসলমান-দের প্রতি বিরূপ হন। এই সুযোগে মির্জা নামক এক দুরাশয়ের প্ররোচনায় রাজা, আলাওল সাহেবকে বিনা বিচারে কারাবদ্ধ করেন। পরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পঞ্চাশ দিন পরে মুক্তি প্রদান করেন। আলাওল সাহেবের জীবনের অধিকাংশ সময় চট্টগ্রামে কাটিয়াছে। তিনি হিন্দু আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বিষয়ে সাতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রচিত আটখানি গ্রন্থে তিনি সবিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। অনুমান ৮০ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত অপর কতকগুলি গ্রন্থের নাম (১) লোরচন্দ্রানী (২) তাউফা (৩) কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলী প্রভৃতি।

আলাম— বাঙ্গালী মুসলমান কবি। তাঁহার জন্ম স্থান বরিশাল জিলায়। তাঁহার রচিত দক্ষযজ্ঞ, কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সংগীত প্রভৃতি অতিশয় আগ্রহের সহিত গ্রাম অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

আলাসিংহ — পাঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালা রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে আহাম্মদ শা আবদালির সহিত শিখদের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি খুব বীরত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিপক্ষ আবদালীর নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফলকিয়া শিখ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

আলী আকবর— মজমা-উল-আওলিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থে তিনি সমুদয় মুসল-মান সাধকের জীবনী সংগ্রহ করেন। ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ শা-জাহান বাদশাহের নামে উৎসর্গ করেন।

আলী আদিল শাহ, প্রথম—বিজা-পুরের আদিল শাহীবংশের নবাব। তাঁহার অন্য নাম আবুল মুজাঃফর। ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা ইব্রাহিম আদিল শাহ (প্রথম) পরলোক গমন করিলে, তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। প্রায় ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে তহ মাম্পের পুত্র ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পরবৎসর তিনি তাঁহার একজন বিশ্বস্ত খোজা কর্ত্তৃক নিহত হন। বিজাপুর নগরে তিনি সমাহিত হন।

আলী আদিল শাহ, দ্বিতীয়—বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের নবাব। ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা মোহাম্মদ আদিল শাহের মৃত্যুর পরে তিনি বিজাপুর নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ছত্রপতি শিবাজী প্রাধান্য লাভ করিয়া, তাঁহার রাজ্যের অনেক স্থান অধিকার করেন। আফজল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু শিবাজীর প্রতারণায় প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র সেকেন্দর আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলী আসগর — কনোজের অধিবাসী। তিনি সওয়াকিব উং-তঞ্জিল নামক কোরানের এক অতি সুন্দর ভাষ্য রচনা করেন। ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

আলী ইব্রাহিম খাঁ—পাটনার এক জন অধিবাসী। তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে লিখিত উর্দ্দু কবিদের জীবন চরিত প্রসিদ্ধ। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম খলিল।

আলী গোলাম অন্তরবাদী—তিনি একজন কবি। দাক্ষিনাত্যের রাজাদের অধীনে কাজ করিতেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তিনি তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আলী জাহ—হায়দ্রাবাদের নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হন। কিন্তু অচিরেই পরাস্ত হইয়া বন্দী হন এবং মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন।

আলী নকি খাঁ—বীরভূমরাজ বদীয়-জ্জমানের পুত্র। বর্গীর অত্যাচার দমনার্থ তিনি কিছুকাল হেতমপুর দুর্গে বাস করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণনগর গড়ের দক্ষিণ প্রান্তে ও 'হাফেজ খাঁর বাঁধ' নামক বিস্তৃত দার্ঘিকার পূর্ব্বপ্রান্তে একটী আম্র বন আছে। ইহা আলি খাঁর বাগান নামে খ্যাত। আলী নকি এই বাগানস্থাপন করেন। ঐ অঞ্চলের আলী নগর পরগণাও তাঁহার নামে পরিচিত।

আলী নবেদী—তিনি একজন কবি। প্রসিদ্ধ শাহ তাহির অন্দ জানির শিষ্য। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলে দাক্ষিণাত্যের নবাব আবদুল ফতে হুসেন নিজাম শাহ প্রথম, তাঁহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। দাক্ষিণাত্যের আহাম্মদনগরে ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলীফ শাহ—একজন মুসলমান ফকির। তাঁহার আত্ম পরিচয়ে বর্ণিত আছে তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোল সতের বৎসর বয়সে অযোধ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যার অন্তর্গত বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং যুবক ব্রাহ্মণ তথাকার ধর্ম্মগুরু হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার মুরীদ বা শিষ্য হন। আলিফ শাহ তাঁহার গুরুদত্ত নাম। তিনি মহাজন বাণী সংগ্রহ করিয়া 'প্রেম পত্রিকা' নামক একখানি উপাদেয় হিন্দী পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। গয়া তাঁহার জন্ম স্থান, বুলন্দ সহরে তাঁহার সমাধি হয়। ইনি ধর্ম্মজগতের অনেক মূল্যবান্ রহস্যের কথা বলিয়া লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন।

আলীবরিদ, প্রথম—১৫৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা আমির বরিদ পর-লোক গমন করিলে তিনি আহাম্মদা-বাদ বিদরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই এই বংশের প্রথম রাজা। ২০ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে পর-লোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম বরিদ সিংহাসনে আরো-হণ করেন।

আলী বরিদ, দ্বিতীয়—১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা দ্বিতীয় কাশিম বরিদের মৃত্যু হইলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আমির বরিদ ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আমীর বরিদ এই বংশের শেষরাজা।

আলীবর্দ্দী খাঁ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম নবাব সুজা-উল্-মুল্‌ক হিসাম উদ্‌দৌলা মোহাম্মদ আলীবর্দ্দী খাঁ বাহাদুর মহব্বৎ জঙ্গ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্যের পূর্ব্ব বিভাগস্থ খোরাসান প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মীর্‌জা মোহাম্মদ, সম্রাট আওরঙ্গজীবের পুত্র আজম শাহের পাকশালার দারোগা ছিলেন। তৎপরে মীর্‌জা মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজী আহাম্মদ উক্ত পদ লাভ করেন। তৎসঙ্গে তিনি জহরত খানার অধ্যক্ষ পদও লাভ করেন। রাজবিপ্লবের সময়ে রণক্ষেত্রে আজম শাহের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে মীর্‌জা মোহাম্মদ, স্বীয় পুত্রদ্বয় হাজী আহাম্মদ ও মীর্‌জা মোহাম্মদ আলী বর্দ্দী (পরে আলীবর্দ্দী খাঁ) সহ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। সেই সময়ে বাংলার নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ উড়িষ্যার নায়েব ছিলেন। তিনি মীরজা মোহাম্মদের স্বদেশবাসী ও এক আত্মীয়কন্যার স্বামী ছিলেন। সেই সূত্রে মীরজা মোহাম্মদ পুত্রগণসহ সুজাউদ্দিন খাঁর দরবারে সাদরে স্থান লাভ করেন। অল্পকাল

মধ্যেই হাজী আহাম্মদ, নবাব সুজা-উদ্দিনের পরামর্শ দাতা ও সমস্ত কার্য্যের মূলাধার হইলেন। এই সময়ে মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। হাজী আহাম্মদের ভ্রাতা মীরজা মোহাম্মদ আলী বন্দী, আলী বর্দ্দী খাঁ উপাধি লাভ করিয়া, রাজমহল চাকলার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। হাজী আহাম্মদের তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র মোহাম্মদ রেজা বা নোয়াজিস মোহাম্মদ মুরশিদাবাদে প্রধান বেতনদাতার পদে, দ্বিতীয় পুত্র আকা মোহাম্মদ সৈয়দ রংপুরের নায়েব ফৌজদারের পদে ও তৃতীয় পুত্র জৈন উদ্দিন রাজমহলের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আলী বর্দ্দী খাঁর তিন কন্যা ছিল, কোনও পুত্র ছিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটী খানমকে মোহাম্মদ রেজা খাঁ, মধ্যমা কন্যাকে সৈয়দ আকা মোহাম্মদ এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা খানমকে জৈনউদ্দিন বিবাহ করেন। বাংলার নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ, স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে (জামাতা সুজা উদ্দিনকে অতিক্রম করিয়া) তাঁহার উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যে তাহা হয় নাই। মুরশিদ কুলীর মৃত্যুর পরে জামাতা সুজাউদ্দিনই বাংলার নবাব হইলেন। সুজাউদ্দিনের প্রিয়

পাত্র হাজী আহাম্মদের তখন কার্য্যোদ্ধারের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার অনুরোধে ও সুজাউদ্দিনের বেগম জিনৎ-উন্-নিশার প্ররোচনায়, আলী বর্দ্দী বিহারের শাসন কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুজাউদ্দিন মৃত্যুকালে সরফরাজ খাঁকে যাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া ও যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সরফরাজ তাঁহার কিছুই করিলেন না। বরং তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতে লাগিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়াই, স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় চিন্তনে নিরত হইলেন। প্রথমেই তিনি বিহারের অরাজকতা দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। এই সময়ে বুঞ্জারী নামক একদল দস্যু শস্য ক্রয়ের ছলে, দেশ লুণ্ঠন করিত। তিনি তাঁহাদিগকে আবদুল করিম নামক এক সেনাপতির সাহায্যে, সমূলে উৎপাটন করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন। বিহারের অন্তর্গত বেতিয়া, কুলওয়ারী, ছুকোয়ার, বৈজীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি একে একে সকলকেই পরাস্ত করিয়া, প্রচুর ধন লাভ করেন। কিন্তু যে আবদুল করিমের সাহায্যে তিনি এতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, শেষে তাঁহাকেই তিনি গোপনে হত্যা করেন।

ঐ সময়ে পারশ্যের সম্রাট নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদশাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। নাদির শাহের পক্ষীয় এক দূত বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাকী খাজনা দাবী করিলেন। সরফরাজ খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া বাকী খাজানা দিয়া, নাদির শাহের নামে মুদ্রা প্রচলিত করিতে ও মসজিদে খুৎবা পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে সরফরাজ খাঁর শত্রু পক্ষীয়েরা দিল্লীর সম্রাটকে সরফরাজ খাঁর বিরোধী করিয়া তুলিলেন। এদিকে আলীবর্দ্দী খাঁও নিরস্ত ছিলেন না। তিনি এই সুযোগে দিল্লীর রাজ-দরবারের অনেক লোককে অর্থদ্বারা বশীভূত করিলেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ সরফরাজ খাঁর স্থলে আলীবর্দ্দী খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া নিয়োগ পত্র প্রেরণ করিলেন। আলী বর্দ্দী এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সরফরাজ এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। মুরশিদাবাদ হইতে এগার ক্রোশ দূরে ঘেরিয়ার মাঠে ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে (১১৫৩ হিঃ) উভয় সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। গুলি বিদ্ধ হইয়া সরফরাজ খাঁ হস্তীপৃষ্ঠে চির শয়ন করিলেন। যুদ্ধান্তে লুণ্ঠনাবসর কালে হস্তীচালক মৃত নবাবকে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিল এবং নবাব পুত্র মীর্জা আমানি গোপনে মুক্তখালিতে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন। যুদ্ধের পরেই সৈন্যগণকর্ত্তৃক নগর লুণ্ঠনের ভয়ে আলীবর্দ্দী খাঁ মুরশিদাবাদে আসেন নাই। দুই দিন যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিলেন। তৃতীয় দিবসে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পেহল সেতুন নামক দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপহার গ্রহণ করিলেন। রাজপদ গ্রহণের সংবাদ তোপধ্বনী ও বাদ্যভাণ্ড দ্বারা বিঘোষিত হইল। রাজকোষ অধিকার করিয়া প্রচুর ধন রত্ন লাভ করিলেন। তন্মধ্য হইতে এক ক্রোর রৌপ্যমুদ্রা ও সত্তর লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ ও তাঁহার অমাত্যবর্গের জন্য প্রেরিত হইল। তাহার বিনিময়ে সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদের অনুমোদন পত্র প্রেরণ করিলেন এবং সপ্ত সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি-পদ, সুজা-উল্ মুলক ও হিসাম-উদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তাঁহার তিন জামাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নোয়াজিস মোহাম্মদ, সেহামতজঙ্গ, মধ্যম সৈয়দ আহাম্মদ, শৌলৎজঙ্গ ও কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিন শকৎ জঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। জৈনউদ্দিনের পুত্র মীর্জা

মামুদ, সিরাজউদ্দৌলা শাহ কুলি খাঁ বাহাদুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ এক্রাম উদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল উপাধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নোয়াজিস মোহাম্মদ ঢাকার শাসন ভার, সৈয়দ আহাম্মদ উড়িষ্যার ও জৈন উদ্দিন বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। সরফরাজ খাঁর দুই পুত্র ও বেগম বৃত্তিলাভ করিয়া ঢাকায় আগমন করিলেন।

দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ সরফরাজ খাঁর সম্পত্তির মূল্য ও বাকী খাজানার দাবী করিয়া স্বীয় কর্ম্মচারী মুরিদ খাঁকে বাঙ্গালা দেশ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। চতুর আলীবর্দ্দী অগ্রসর হইয়া রাজমহলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কতিপয় হস্তী, কিছু স্বর্ণালঙ্কার ও কয়েক লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক, সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। সরফরাজের ভগিনীপতি মুরশিদ কুলি খাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের পতন দৃষ্টে পলায়নপূর্ব্বক উড়িষ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আলী বর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া, মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহাম্মদকে উড়িষ্যায় স্থাপন করিলেন; কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অযোগ্য বিলাসী সৈয়দ আহাম্মদের অত্যাচারে উড়িষ্যাবাসীরা বিদ্রোহী হইল। মুরশিদ কুলি খাঁর অন্যতম জামাতা বকির খাঁ। এই অবসরে উড়িষ্যাবাসীর আমন্ত্রণে সসৈন্যে উড়িষ্যায় গমন পূর্ব্বক, সৈয়দ আহাম্মদকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দেশ অধিকার করিলেন। আলীবর্দ্দী এই সংবাদে অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। অবিলম্বে বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। বকির খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। জামাতা সৈয়দ আহাম্মদকে উড়িষ্যায় রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া, তৎস্থলে অন্যতম সেনাপতি মামুদ খাঁকে নিযুক্ত করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময়ে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। মুরশিদ কুলি খাঁর সেনাপতি মীর হবিব খাঁ যুদ্ধের পরে নাগপুরের অধিপতি রঘুজী ভোসলের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। রঘুজী বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ও রণকুশল আলী কারাওয়ালের (এই ব্যক্তি পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হয়) অধীনে ষাট হাজার মহারাষ্ট্রী সৈন্য দিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। এই সঙ্গে মীর হবিবও আসিয়াছিলেন। নবাব আলী বর্দ্দী খাঁ মনে করিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীরা বিহার প্রদেশের ভিতর

দিয়া বঙ্গদেশে আসিবে। সেজন্য তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহারা তাঁহার শিবিরের মাত্র বিংশতি ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় লইবার জন্য রওনা হইলেন। মহারাষ্ট্রারা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার রসদাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধও হইল কিন্তু কোনও পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হইল না। ভাস্কর পণ্ডিত এই সময়ে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা দিলে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু আলী বর্দ্দী খাঁ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মুরশিদাবাদে আসিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলেন। কারণ তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাচ হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু পলায়ন পর আলী বর্দ্দী খাঁর সৈন্যের দুর্দ্দশার এক শেষ হইল। মহারাষ্ট্রারা তাঁহার সমুদয় দ্রব্যজাত তোপ, তাঁবু অধিকার করিল। এই সময়ে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত দশ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়া, তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত এখন এক কোটী টাকা ও নবাবের সমুদয় হস্তী চাহিলেন। এইরূপ অপমান-জনক সর্ত্তে নবাব অসম্মত হইলেন। পথ চলিতে চলিতে যুদ্ধও চলিতে লাগিল। এইরূপে অনাহারে বৃষ্টিতে ভিজিয়া চতুর্থ দিনে নবাব সৈন্যসহ কাটোয়ায় পঁহুছিলেন। মহারাষ্ট্রারা পূর্ব্বেই তথায় পহুছিয়া নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। সৈন্যেরা সেই অর্দ্ধদগ্ধ শস্য আহার করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। এই সংবাদ রাজধানীতে পঁহুছা মাত্র নোয়াজিস মোহাম্মদ প্রচুর খাদ্য ও সৈন্য লইয়া আলীবর্দ্দী খাঁর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত এই পরাক্রান্ত শত্রুর দেশে বর্ষা-কাল যাপন করা নিরাপদ মনে করিলেন না। কিন্তু মীর হবিবের পরামর্শে কাটোয়ায়ই তিনি বর্ষা যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। ইতি মধ্যে মীর হবিব দুই সহস্র সৈন্য লইয়া গঙ্গা পার হইয়া, মুরশিদাবাদের উপকণ্ঠ ও জগৎশেঠের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ এই সংবাদ পাইয়াই মুরশিদাবাদে আসিলেন। মীর হবিব নবাবের আগমনে ভীত হইয়া আবার কাটোয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত বর্ষাকাল মধ্যে মীর হবিবের সাহায্যে হুগলী, বর্দ্ধমান, হিজলী, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিলেন।

আলীবর্দ্দী খাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বর্ষার

শেষ ভাগেই গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কাটোয়া নগরে ভাস্কর পণ্ডিতকে আক্রমণ করিলেন। নবাব সৈন্য মহারাট্টাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বহুলোককে নিহত করিল এবং তাঁহাদের দ্রব্যজাত হস্তগত করিল। ভাস্কর পণ্ডিত উড়িষ্যার আশ্রয় লইলেন। এখানে ভাস্কর পণ্ডিত উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মামুদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। নবাবও উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। কটকের নিকটে নবাব সৈন্যের সহিত ভাস্কর পণ্ডিতের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হইয়া, স্বদেশে গমন করিলেন। নবাব কটকের শাসন ভার রসুল খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহারাট্টা অভিযান এখানেই শেষ হইল না। রঘুজী ভোসলে তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের পরাজয়ে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল একদল সৈন্যসহ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন। ঠিক সেই সময়ে পুণার পেশোয়া বালাজী বাজী রাও, একদল সৈন্য লইয়া দিল্লীর সম্রাটের দেয় চৌথের টাকার বরাতি চিঠি লইয়া, বিহারের পথে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। নবাব বহু অর্থ প্রদান করিয়া, বালাজী বাজী রাওকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। কথা হইল বালাজীর সৈন্য ও নবাব সৈন্য এক যোগে রঘুজী ভোসলের সৈন্যকে আক্রমণ করিবে। রঘুজী অবস্থা ভাল নহে বুঝিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন এবং নবাব আপাততঃ রক্ষা পাইলেন। পরবৎসরই রঘুজী ভোসলে বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন প্রচুর অর্থ পাইলে সন্ধি করিতে আপত্তি নাই। নবাব ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত সন্ধি করিবার জন্য, সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ও রাজা জানকীরাম রায়কে পাঠাইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত প্রচুর অর্থ চাহিলেন। দূতদ্বয় তাঁহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নবাবের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে পণ্ডিত সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভাস্কর পণ্ডিত নবাব শিবিরে উনিশ জন প্রধান সেনাপতিসহ প্রবেশ করিলে, নবাব আলী বর্দ্দীর আদেশে তাঁহারা সকলেই ছিন্নশির হইলেন। অন্যতম মহারাট্টা সেনাপতি রঘু গাইকোয়ার তাঁহার অধীনে রক্ষিত সৈন্যসহ পলায়ন করিলেন। নবাব সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য এই বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতিবিধান করিতে রঘুজী ভোসলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং প্রবল এক সৈন্য বাহিনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি মধ্যে আর এক ঘটনা সংটিত হইল। মহারাষ্ট্রা যুদ্ধের অবসান হইল মনে করিয়া, নবাব তাঁহার সেনাপতি-দের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাকী বেতন প্রার্থনা করেন। নবাব বাকী বেতন ১৭ লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। মুস্তাফা খাঁ আট হাজার অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতি সৈন্যসহ বিহার অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে রাজ-মহল লুণ্ঠন করিলেন ও মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিলেন কিন্তু পাটনা অধি-কার করিতে যাইয়া নবাব জৈন উদ্দিনের হস্তে পরাজিত হইলেন। অবশেষেএই জৈনউদ্দিনের হস্তেই তিনি নিহত হন।

রঘুজী ভোসলে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ লইতে স্বীয় পুত্র জানুজী (জনকজী), সেনাপতি মোহন সিংহ ও হবিব খাঁকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কাটোয়ার সন্নিকটে নবাব সৈন্যের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়। নবাব জয়ী হইলে, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু উড়িষ্যা তাঁহাদের হস্তে রহিল। মুস্তাফা খাঁর বিদ্রোহ সময়ে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্ত আবদুল রসুল খাঁ, স্বীয় আত্মীয় মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে যোগ দিবার জন্য উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই পদে নবাব আলী বর্দ্দী খাঁ বিশ্বস্ত সেনাপতি দুর্লভ রামকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অতিশয় সন্ন্যাসী ভক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রা সৈনিকেরা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। রঘুজী ভোসলের পুত্র জানুজী (জনকজী) যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে এই জন্যই দাঁড়াইতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রারা উড়িষ্যা অধিকার করিল।

এই সময়ে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আলী বর্দ্দী খাঁ তাঁহার সেনাপতি সমসের খাঁ, সরদার খাঁ, মুরাদ শের খাঁ ও হায়াত খাঁকে সন্দেহ বশে পদচ্যুত করেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারভাঙ্গা-স্থিত জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিহারের নবাব জৈনউদ্দিন তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা নবাব জৈনউদ্দিনের সহিত সাক্ষাত করিতে দরবারে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে সমসের খাঁর ভাগিনেয় মুরাদ শের খাঁ তরবারির আঘাতে জৈন-উদ্দিনের উদর বিদীর্ণ করিলেন। নবাব তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মৃত নবাবের পরিবারবর্গ সমসের খাঁর অন্তঃপুরে স্থান লাভ করিল। হাজী

আহাম্মদকে ১৭ দিন পর্য্যন্ত অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। তাঁহার আবাস গৃহে সমসের খাঁ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া আলী বর্দ্দী খাঁ সসৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ নিহত হইলেন এবং তিনি স্বীয় কন্যাকে উদ্ধার করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা বিহারের সুবেদার হইলেন। আলী বর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহাম্মদ পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেনাপতি আতাউল্লা খাঁ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। জানুজী ভোসলে মীর হবিব সহ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন। সর্দ্দার খাঁ ও সমসের খাঁর পতন দৃষ্টে তিনি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পাটনার এই সকল গোলমালের অবসানে আলী বর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা দেশ মহারাষ্ট্রাদের কবল হইতে উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি সসৈন্যে কটকে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রারা তাঁহার আগমনে পলায়ন করিল। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা বিহারের স্বাধীন নরপতি হইবার অভিলাষে পাটনাভিমুখে রওনা হইলেন। রাজা জানকীরাম সিরাজ উদ্দৌলার প্রতিনিধিরূপে পাটনায় থাকিয়া বিহার শাসন করিতেছিলেন। তিনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বিনা হুকুমে দুর্গ ছাড়িলেন না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। সিরাজ পরাজিত হইয়া এক সামান্য গৃহে আশ্রয় লইলেন। রাজা জানকীরাম তাঁহাকে সাদরে এক উৎকৃষ্ট প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ দৌহিত্রের এই আচরণে অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া পাটনায় উপস্থিত হইলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা মাতামহের আশ্রয়ে আসিলেন। নবাবের উড়িষ্যা হইতে চলিয়া আসিবার পরেই, মহারাষ্ট্রারা আবার উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। নবাব আবার তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। অবশেষে নবাব মহারাষ্ট্রাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ চৌথের পরিবর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে নোয়াজিস মোহাম্মদ, ইহার অল্প কয়েক দিন পরেই সৈয়দ আহাম্মদ পরলোক গমন করেন। উভয় জামাতার মৃত্যু আলী বর্দ্দীর খাঁর প্রাণে খুবই বাজিল। সেই বৎসরেই তিনিও পরলোক গমন করিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের উক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। যৌবন কাল হইতেই তিনি সুরা বা অপর কোন মাদক

দ্রব্যের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেন নাই। মুসলমান ধর্ম্ম বিধানে যাহা নিষিদ্ধ, এমন সব বিষয় হইতে তিনি দূরে অবস্থান করিতেন। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ঈশ্বর উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। সঙ্গীত বাদ্য অথবা তোষামোদ কারীদের সহবাসে সময় যাপন করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং স্নান ও উপাসনার পরে বিশিষ্ট কয়েকজন সহচরের সহিত একত্র বসিয়া কাফি পান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পরে তিনি সাধারণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। তখন তাঁহার সেনাপতিগণ দেওয়ানী কর্ম্মচারী, আবেদনকারী অথবা অন্যান্য প্রার্থীগণ, অথবা দর্শনার্থী প্রজাগণ সকলেই ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইত এবং সকলেই যথাযোগ্য সমাদর পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল যাপন করিয়া তিনি নিজের খাস কামরায় গমন করিতেন। তথায় কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আসিবার অধিকার ছিল। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নোয়াজিস আহাম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ, দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা, অথবা বিশিষ্ট কোন মিত্র বা অপর আত্মীয় মাত্র উপস্থিত হইতেন। এখানে কবিতা, গল্প অথবা ইতিহাস পাঠ হইত। কখনও কখনও পাচকদের রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। তাঁহার সম্মুখেই পাচকেরা তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। অতঃপর তিনি সবান্ধবে আহারে বসিতেন। তৎপরে বিশ্রাম করিতেন এই সময়ে একজন গল্প শুনাইত। মধ্যাহ্ন একটার সময় উপাসনা শেষ করিয়া বেলা চারিটা পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করিতেন। তৎপর স্তুতি পাঠ করিয়া, এক গেলাস জল বা সরবৎ পান করিতেন। তৎপরে তিনি কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গে এক ঘণ্টা আলাপে যাপন করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই পরমার্থ সম্বন্ধে অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে জগৎশেট ও রাজস্বকর্ম্মচারীগণ নবাব সমীপে উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সংবাদ প্রদান করিতেন। নবাব যে কার্য্যের যেরূপ আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন, তাহা করিতেন। এই কার্য্যে এক ঘণ্টা যাপন করিতেন। এই সময়ে কোন কোন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইতেন। সন্ধ্যা কালে আলোক প্রদান করার পরে কয়েকজন ভাঁর বা রসিক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর বিদ্রুপ

বাক্যে নবাবকে আমোদিত করিত। তৎপরে তিনি উপাসনার জন্য গাত্রোত্থান করিতেন এবং উপাসনান্তে খাস কামরায় বেগমদিগের নিকট বসিতেন। এই সময়ে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটসম্পর্কিয়া আত্মীয়া মহিলারা আসিতেন। মহিলারা চলিয়া গেলে পুরুষেরাও তাঁহার নিকট আসিতেন। তৎপরেই তিনি শয়ন করিতে গমন করিতেন। রাত্রিতে আর ভোজন করিতেন না। সকল কার্য্যের জন্যই তাঁহার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি অতিশয় দয়ালু ও বদান্য ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ, মিত্র সকল, তাঁহার হীনবস্থার সময়ে সাহায্যকারী বন্ধুবর্গ সকলের প্রতিই তিনি অতি দয়ালু ছিলেন। দিল্লীতে যখন তিনি হীনাবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ের সাহায্যকারী বন্ধুদিগকে ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিকে বঙ্গদেশে আনয়নপূর্ব্বক যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহার ন্যায় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিত। তাঁহার অতি নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীও তাঁহার সদয় ব্যবহারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখী হইতে পারিয়াছিল। সকল কার্য্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইত। দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য, ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন তিনি অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। যদিও দুই একটী বিশ্বাস ঘাতকতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই তাহা তৎকালীন রাজনৈতিক আব হাওয়ার ফল। তিনি ইংরেজদের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার বিদ্বেষের বিষয় মনে করিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের উন্নতি দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে—'আমার মৃত্যুর পরে হয়ত ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রভু হইবে।' তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যে সফল হইয়াছিল, ইতিহাস তাঁহার সাক্ষী।

একবার নবাবের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের ধন রত্ন হস্তগত করা উচিত। নবাবের সম্মতি না পাইয়া নোয়াজিস মোহাম্মদ দ্বারা নবাবকে পুনরায় অনুরোধ করান। নবাব সভাস্থলে কিছু না বলিয়া, গোপনে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—বৎস, মুস্তাফা খাঁ একজন সৈনিক পুরুষ। সে চায় আমরা সর্ব্বদা তাহার সহায়তা গ্রহণ করি। তুমি কেমন করিয়া তাহার সহিত মিশিতে আমায় পরামর্শ দিতেছ? ইংরেজগণ আমার কি অনিষ্ট করিয়াছে, যে আমি তাঁহাদেরে নির্য্যাতন করিব? এক্ষণে স্থলের অগ্নিই নির্ব্বাণ করাই কঠিন

হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রেও যদি আগুণ লাগে, কে তাহা নিবাইবে? তাহার পরামর্শ কখনও শুনিও না। কেন না তাহার পরিণাম হয়ত সাংঘাতিক হইবে।' এই দূরদর্শী নবাবের কথাগুলি কতদূর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার ন্যায়ানুগত রাজ্য শাসনের একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ঠ মনে করি। তাঁহার সময়ে জমিদারদিগকে পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। সে জন্য জমিদারেরা তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। মহারাষ্ট্রাদের আক্রমণ সময়ে, এই জমিদারেরা তাঁহাকে দেড়কোটী টাকা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের প্রকৃত নবাব, প্রজার মা বাপ ছিলেন।

আলী বাহাদুর— বাজীরাও পেশোয়ার মস্তানী নামে এক মুসলমান রক্ষিতা ছিল। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে তাহার গর্ভে সমসের বাহাদুর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র আলী বাহাদুর ও ঘানি বাহাদুর। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে আলী বাহাদুর, পেশোয়ার মন্ত্রী নানা ফড়নবিসের নিকট হইতে বুন্দেল খণ্ড অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ঘানি বাহাদুর ও একদল সৈন্যসহ বুন্দেল খণ্ড আক্রমণ করেন। মহারাজ ছত্রসালের বংশধর নাবালক ভকত সিংহ তখন বুন্দেল খণ্ডের রাজা ছিলেন। নানা অর্জ্জুন সিংহ নাবালক রাজার অভিভাবক ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করেন এবং ভকৎ সিংহ বন্দী হইলেন। এই প্রদেশের সমস্ত অংশ আলী বাহাদুরের অধিকারে আসিল। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে আলী বাহাদুর দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমসের বাহাদুর (দ্বিতীয়) পুণানগরে ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র জুলফিকর আলী ভ্রাতার অনুপস্থিতির সুযোগে পিতৃব্য ঘানি বাহাদুর ও দেওয়ান হিম্মত বাহাদুর গোয়াইর সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সমসের বাহাদুর অচিরকাল মধ্যেই ভ্রাতাকে তাড়াইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা বান্দার নবাব নামে খ্যাত। (২) এই আলী বাহাদুরও বান্দার নবাব ছিলেন। তিনি জুলফিকর আলীর পুত্র। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তিনি পদচ্যুত হন। তিনি একজন বিদ্বান্ ও গ্রন্থকার ছিলেন।

আলী বেগ মির্জা— তাঁহার জন্ম স্থান বদকসান। সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি সম্মানিত কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কের পদ

প্রদান করেন। একবার তিনি সম্রাটের সঙ্গে আজমীরে সাধক মৈন-উদ্দিন চিস্তির সমাধি দর্শন করিতে গমন করেন। এই সমাধির নিকটেই অন্যতম সাধক শাহবাজ খাঁ কম্বুর সমাধি। আলী বেগ ইহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—'তিনি জীবিত কালে আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই বলিয়াই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর জ্ঞান সঞ্চার হইল না।

আলী বোগদাদী, শাহ—ফরিদপুর সহর হইতে প্রায় চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গেরদা নামে একটী গ্রাম আছে। এই স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে শাহ আলী বোগদাদী নামে এক সাধু পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার নামীয় ও তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী ভজনালয় (মস্‌জিদ) এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া তথায় বর্ত্তমান আছে। এই সাধু পুরুষের দৌহিত্রবংশীয়েরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহার বোগদাদী উপনাম দৃষ্টে মনে হয়, তিনি বোগদাদ নগরের অধিবাসী ছিলেন।

আলী মর্দ্দন খিলজী—তিনি প্রথমে বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলজীর সেনাপতি ছিলেন। পরে বাংলার নবাব হন। বখ্‌তিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া বাংলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই অসুস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, আলী মর্দ্দন খিলজী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সন্দেহে অন্যতম সেনাপতি মোহাম্মদ সিরান স্বীয় প্রভুর হত্যাকারী আলী মর্দ্দনকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে দেবকুটে উপস্থিত হন। আলী মর্দ্দন ভয়ে স্বীয় জায়গীর বরসুল প্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় থাকিয়া কিছুদিন যুদ্ধের পর বন্দী হন এবং বাবা ইস্‌পাহানী কোতোয়ালের জিম্মায় তিনি রক্ষিত হন। কিন্তু চতুর আলী মর্দ্দন, বাবা ইস্‌পাহানীকে ঘুস দিয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন। এদিকে মোহাম্মদ সিরান বাংলার নবাব হইলেন। দিল্লীর সম্রাট কুতবউদ্দিন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বাংলার গদি অধিকার করায়, মোহাম্মদ সিরানের প্রতি বিরূপ হইয়া, তাঁহার দমনার্থ অযোধ্যার শাসন কর্ত্তা কিমার রাউ মীকে বাংলায় প্রেরণ করেন। এদিকে আলী মর্দ্দন দিল্লীতে আসিয়া সম্রাট কুতবউদ্দিনের অতি প্রিয়-পাত্র হইলেন। কুতবউদ্দিনের গজনী অভিযানে তিনি তাঁহার সহচর হইলেন। প্রতিদ্বন্দী এলদাজকে পরাস্ত করিয়া কুতবউদ্দিন গজনী অধিকার করিয়াও স্বাধিকারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই যুদ্ধে আলী মর্দ্দন শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু পরে মুক্তি লাভ করিয়া কুতব উদ্দিনের সহিত মিলিত হইলেন। কুতব উদ্দিন তাঁহাকে

বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। ১২০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাংলায় আসি-লেন। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে কুতবউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, আলী মর্দ্দন 'সুলতান আলী মর্দ্দন আলাউদ্দিন খিলজী' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালার স্বাধীন অধিপতি হইলেন। এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি একজন চতুর ও সাহসী বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইহার পরেই তাঁহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। তিনি দিল্লী, পারস্য, খোরাসান প্রভৃতি স্থানের নরপতিদিগকেও হীনপদস্থ বলিয়া স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করিতেন। এমন কি তাঁহাদের রাজ্যান্তর্গত প্রদেশ বিশেষও স্বীয় কর্ম্ম-চারীদেরে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে লাগিলেন। একবার এক পারস্য দেশীয় বণিক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। সাম্রাজ্যগর্ব্বী আলী মর্দ্দন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পারস্যের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মন্ত্রীকে সেইরূপ নিয়োগ পত্র দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী এই অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া কিছু বলিলেন না, আদেশ পত্র লিখিবার ছলে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরে তথা হইতে আসিয়া বলিলেন—বণিক এই নিয়োগ পত্রে পরম কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মর্য্যাদানুরূপ গমনোপযোগী অশ্বারোহী সৈন্য ও অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন। তখন আলীমর্দ্দন স্বীয় সম্মান রক্ষার্থ অশ্ব-ক্রয়ার্থ প্রচুর অর্থ দিতে আদেশ করি-লেন। বলা বাহুল্য পারস্য দেশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল না। তিনি অবশেষে এমন অত্যাচারী হইয়াছিলেন যে, কতকগুলি খিলজী সর্দ্দারকে বিনা কারণে হত্যা করেন। ইহার ফলে তিনিও ১২১২ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন।

আলী মর্দ্দন খাঁ—পারস্যের অধিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক। পারস্যরাজ শাহ সফি কর্ত্তৃক তিনি প্রথমে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রভুর অধীনে জীবন নিরাপদ নহে মনে করিয়া দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের শরণাপন্ন হন। শা-জাহান অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করেন। সম্রাটের অধীনে তিনি কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। স্বীয় অমায়িক চরিত্র বলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই এপ্রিল কাশ্মীরে স্বাস্থ্য লাভার্থ গমন কালে পথিমধ্যে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ইব্রাহিম খাঁ, ইস্‌মাইল বেগ ও ইসাহাক্ বেগ নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ইস্‌মাইল বেগ ও ইসাহাক্ বেগ, দারাশেকোর সহিত আওরঙ্গজীবের ঢোলপুর নামক স্থানের যুদ্ধে ১৬৫৮ খ্রীঃ

অব্দের ২৯শে মে নিহত হন। (হিঃ ১০৬৮, ৭ই রমজান)। আলী মর্দ্দন একজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। লাহোর নগরের পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকস্থ প্রসিদ্ধ সালিমার উদ্যান তাঁহারই রচিত। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাহা নির্ম্মিত হয়। ১৬৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পাঞ্জাবের বিখ্যাত হাসলী খাল খনন করান। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কাবুলের দরওয়াজা লাহোরী নামক বাজারের "চার চাত" নামক হর্ম্মচতুষ্টয় নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এখনও তথায় তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। দিল্লীর আলী মর্দ্দন খাল ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে খনিত হয়। যমুনা নদী হইতে খাল কাটিয়া দিল্লী নগরে জল আনয়ন করিবার জন্য ইহা খনিত হইয়াছিল।

আলী মুত্তাকি, শেখ—তিনি জৌনপুরের মুনিম খাঁ খান খানানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে মক্কা ও মদিনা নগরে অবস্থান করিতেন। মুনিম খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে তথায় আগমন করিবার জন্য উপহারসহ তাঁহার নিকট একজন লোক প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁর অনুরোধে আলী মুত্তাকি জৌনপুরে আগমন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ কার্য্যে তিনি দ্বাদশ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দান নৈপুণ্যে চতুর্দ্দিক হইতে ছাত্র সকল জৌনপুরে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সমস্ত লোক তাঁহার আদর্শ শিক্ষা প্রণালীর জন্য তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর প্রথম রবিমাসের ১২ই তারিখে হজরত মোহাম্মদের জন্মদিনে জৌনপুরে বহু শিক্ষিত বিদ্বান্ লোকের এবং ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। মুনিম খাঁ স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পরিবেশনপূর্ব্বক আহার করাইতেন। এই কার্য্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইত। ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮২ সালে) তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পৌত্র শেখ মোহাম্মদ শবির তৎপদাভিষিক্ত হইয়া শিক্ষাদান করিতে থাকেন।

আলী মেচ—তিনি কুচবিহারের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গ বিজয়ের কয়েক বৎসর পরে তিব্বত ও চীন দেশ বিজয় করিবার মানসে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আলীমেচ ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বক্তিয়ারের সঙ্গে পথ প্রদর্শকরূপে গমন করিয়াছিলেন।

আলী মোবারক—গৌড়াধিপতি। তিনি দিল্লীর রাজ প্রতিনিধি কাদির খাঁর সেনাপতি ছিলেন। সুবর্ণ গ্রামের

রাজা ফকির উদ্দিন গৌড় দুর্গ আক্রমণ করিয়া কাদির খাঁকে নিহত করিলে সেনাপতি আলী মোবারক বাহুবলে ফকির উদ্দিনকে পরাজিত করেন এবং আলিশাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৮৬ খ্রীঃ অব্দে আলী মোবারক হাজি ইলিয়াস কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার রাজত্বকাল মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাস।

আলী মোবারক, সুলতান—মালদহের হজরত পাণ্ডুয়াতে সুলতান আলী মোবারক, ইতিহাস বিখ্যাত সাধু পুরুষ মকদুম শাহ জালালের জন্য, ১৩৪১ খ্রীঃ অব্দে এক অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আলী মোল্লা, মৌলবী—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলমান পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'সভা রাজেন্দ্র' ছিল। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রথম প্রচারিত হয়। উহাই খুব সম্ভব প্রথম মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা। ইহা ফার্শী ও বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হইত। তৎপরে মৌলবী আলী নামক এক ব্যক্তি 'জ্ঞানদীপক নামে' ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দি ও ফার্শী এই চারি ভাষায় একখানি পত্রিকা বাহির করেন।

আলী মোহাম্মদ—রাজসাহীর জমিদার উদয় নারায়ণের সেনাপতি। বিদ্রোহী উদয় নারায়ণকে দমন করিবার জন্য বঙ্গের নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ তাঁহার সেনাপতি লহুরী মল্ল ও তাঁহার সহকারী কৃষ্ণনগরাধিপতি রাম জীবনের পুত্র রঘুরামকে প্রেরণ করেন। রঘুরামের হস্তে আলী মোহাম্মদ নিহত হন।

আলী মোহাম্মদ—বাঙ্গালী মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ইহার বাসস্থান চট্টগ্রাম বলিয়া অনুমান হয়। কৃষ্ণলীলা বিষয়ে ইনি কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন।

আলী মোহাম্মদ খাঁ — রোহিলা শাসনের স্থাপন কর্ত্তা। এই প্রকার কথিত আছে যে, বখরত খাঁ ও দাউদ খাঁ নামে দুইজন রোহিলা সর্দ্দার, কতগুলি অনুচর লইয়া বর্ত্তমান রোহিল খণ্ডের উত্তর পশ্চিম অংশে শেরুলী নগরের রাজা মদন শাহার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মদন শাহ অনেকগুলি দস্যু প্রতিপালন করিতেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। দাউদ খাঁ নিকটবর্ত্তী কোনগ্রাম আক্রমণ করিতে যাইয়া একটি জাঠ বালক প্রাপ্ত হন। তিনি সেই বালককে আলী মোহাম্মদ নাম প্রদানপূর্ব্বক অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে, তাঁহারা মদন শাহার কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মোরাদাবাদের শাসনকর্ত্তা আজমত খাঁর অধীনে কার্য্য

গ্রহণ করেন। অতঃপর দাউদ খাঁ এক যুদ্ধে নিহত হইলে, রোহিলারা মদন শাহার রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করেন এবং আলী মোহাম্মদ খাঁ তাঁহার অধিপতি হন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে মোহাম্মদ শাহ্ সম্রাট ছিলেন। তাঁহাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া আলী মোহাম্মদ সমুদয় রোহিল খণ্ডেই আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে তিনি সম্রাটের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু কিছু কাল পরেই মুক্তি লাভ করেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলী রাজা — একজন ফকির। সংসার বিরাগী হইলেও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই। চট্টগ্রাম জেলার বংশখালী থানার অধীন ওশখাইন গ্রামে ইহাঁর বসতি ছিল। যোগ বিষয়ক এবং সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত জ্ঞান সাগর গ্রন্থ আধ্যাত্মিকতত্ত্বে পরিপূর্ণ। এতদ্ ব্যতীত 'ধ্যান মালা' 'জ্ঞান কুলুপ' ষট্‌চক্রভেদ' 'সিরাজ কুলুপ' 'কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী' এবং অনেক শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলায় কানু ফকির নামে প্রসিদ্ধ। আলী রাজার গুরু শাহ কেয়ামদ্দিন একজন তত্ত্বজ্ঞানী সাধু ছিলেন। আলী রাজা সম্ভ্রমের সহিত গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। আলী রাজার দুই পত্নী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এরসাদ উল্লা ও একাবোল্লা নামক দুই পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সরাফতউল্লা মিঞা নামে এক পুত্র জন্মে। এরসাদ উল্লা ও সরাফত উল্লা উভয়েই পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনুমান আশি বৎসর বয়সে আলী রাজা দেহ ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুকালে সরাফত উল্লার বয়স ১৭।১৮ বৎসর ছিল। আলী রাজার বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

আলী শাহনশা, বাবা কাশ্মীরী পীর —তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ময়মনসিংহের আটিয়া পরগণায় আগমন করেন। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আটিয়ায় এখনও তাঁহার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে।

আলী হাজির—তিনি একজন পারস্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান। রাজনৈতিক কারণে তিনি জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বারানসী নগরীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্মারক লিপি হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

আঁলেক্‌জাণ্ডার, দি গ্রেট — তিনি মাসিডনিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ অব্দে তাঁহার জন্ম.

হয়। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত আরিষ্টটল তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দে তাঁহার পিতা গুপ্ত ঘাতক হস্তে নিহত হইলে, মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনিই পূর্ব্ব-দেশ জয় করিতে আয়োজন করিতে ছিলেন। পুত্র তাহা সম্পন্ন করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ত্রিশ সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমে রোডস, এসিয়া মাইনার, আওনিয়া, পেলেষ্টাইন, মিশর ও পারস্য দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত প্রদেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলার (রাউল পিণ্ডির) রাজা ভয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, পথ প্রদর্শক হই-লেন। কিন্তু ঝিলাম ও চেনাব নদীর দোয়াবের রাজা পুরু প্রবল বিক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধে তাঁহার পুত্র রণক্ষেত্রেই শয়ন করিলেন এবং পুরু বন্দী হইলেন। বন্দী বীর আলেক্জাণ্ডারের নিকট নীত হইলেন। কথিত আছে আলেক্-জাণ্ডার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "তুমি আমার নিকট কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা কর"? পুরু উত্তর করিয়াছিলেন—"রাজা রাজার নিকট যে রূপ প্রত্যাশা করে।" আলেক্-জাণ্ডার তাঁহার উত্তর শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহার বন্ধন মোচনপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। বিজয় কীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রের অনতিদূরে বিতস্তার উভয় পার্শ্বে দুইটী নগর স্থাপন করিলেন। ইহার পর আলেক্জাণ্ডার দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে বর্ত্তমান অমৃতসহর নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথা হইতে বিপাশা নদী তীরে গমনপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অগ্রবর্ত্তী হইতে অস্বীকার করিল। বোধ হয় মগধের শৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী ভয় উৎপাদন করিয়াছিল। সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। বিতস্তা তীরে প্রত্যাগত হইয়া ৮০০০ আট সহস্র সৈন্য নৌকাযোগে নদীপথে প্রেরণ করেন। মুলতানে মল্লদের সহিত তাঁহার প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অতিকষ্টে স্বয়ং আহত হইয়া নগর অধিকার করেন। অনন্তর কতকগুলি রণতরি প্রস্তুত-পূর্ব্বক তিনি সিন্ধু সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কতক সৈন্য সেনাপতি নিয়ার্কাসের সঙ্গে সাগর পথে

প্রেরণ করিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ স্থলপথে পারস্যে উপনীত হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বাবিলন নগরে তিনি গতাসু হন। তিনি মাত্র দুই বৎসর পাঞ্জাবে ছিলেন। কোনও স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণে বহু জনক্ষয় ও নগর ধ্বংস হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিরা, অধিকার করিলেন। এই সূত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও গ্রীক সভ্যতার সংযোগই ইহার একমাত্র স্থায়ী সুফল।

আলেখ স্বামী—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের একজন উড়িয়া জাতীয় সাধক। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া, একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবর্ত্তীরা কুম্ভ নামক এক প্রকার গাছের ছাল পরিধান করেন বলিয়া, তাহাদিগকে কুম্ভপাতিয়া বলা হয়। উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষে এই মত খুব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারা হিন্দু হইলেও কোনও দেব দেবী মানে না। এক নিরাকার আলেখ পুরুষের উপাসক। জগন্নাথের মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে পারিলে, ইহাদের মত সকলে গ্রহণ করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহারা এক বার জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহাদের অন্য পরিচয় এখনও অজ্ঞাত।

আল্প খাঁ—তিনি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর (১২৯৫—১৩১৬ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আলাউদ্দিন গুজরাটে প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজা কারণ রায়কে পরাস্ত করেন। কারণ রায় পলায়ন করেন কিন্তু তাঁহার পত্নী কমলা দেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের নিকট প্রেরিত হইলেন। আলাউদ্দিন তাঁহার রূপে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন। কমলার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরস জাত দুই কন্যা পিতা কারণ রায়ের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পথশ্রমে পলায়ন কালেই গতায়ু হন। কমলা দেবী তাঁহার কন্যাকে পাইবার জন্য অতিশয় অধীরা হইলেন। কমলার রূপে মুগ্ধ আলাউদ্দিন তাহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন। সেনাপতি আল্প খাঁ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া দেবলা দেবী নাম্নী সেই কন্যাকে এলোরার গুহায় প্রাপ্ত হন। দেবলা দেবী দিল্লীতে নীত হন এবং অন্তঃপুরে রাজকুমার খিজির খাঁর সঙ্গে প্রতিপালিত হন। আলাউদ্দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সঙ্গে দেবলা দেবীর বিবাহ দিতে অভিলাষী ছিলেন। খিজির খাঁ ও দেবলা দেবীও পরস্পর প্রণয়াকৃষ্ট

ছিলেন। সেনাপতি আল্প খাঁর ভগিনী আলাউদ্দিনের প্রধানা মহিষী ও খিজির খাঁর জননী ছিলেন। রাজমহিষীর ইচ্ছা ছিল যে স্বীয় ভ্রাতা আল্প খাঁর কন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হয়। এদিকে মন্ত্রী মালিক কাফুরের প্রতি খিজির খাঁ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার ফলে খিজির খাঁ গোয়ালিয়র দুর্গে দেবলা দেবীসহ বন্দী হন. আল্প খাঁ ধৃত হইয়া নিহত হন।

আশক মোহাম্মদ — রংপুর জিলার শীতল গাড়ী নিবাসী মৌলবী আশক মোহাম্মদ একজন কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। বাংলা ১২৪১ সালে তিনি তাঁহার 'একদিল শাহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

আশগ—একজন জৈন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম শান্তি পুরাণ। তাঁহার আবির্ভাব কাল জানা যায় নাই।

আশা—মিবার রাজ প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহের সপ্তদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভনজী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় পুত্র অচল অন্যান্য পঞ্চদশ ভ্রাতাসহ ইন্দোর রাজ্যাভিমুখে গমন করেন। পথে অন্যতম ভ্রাতা অখিলের পত্নী একটী পুত্র প্রসব করেন তাঁহার সুলক্ষণ দেখিয়া সকলে তাঁহার নাম আশা রাখেন। তাঁহার বীরত্বে উদয়পুরের রাণা অমর সিংহের সম্মান অব্যাহত ছিল।

আশাধর (১) — একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। পীতাম্বর নামক অপর একজন গ্রন্থকার 'বিবাহ পটল' নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়া স্বয়ংই ' ইহার 'নির্ণয়ামৃত' নামক এক টীকা লিখিয়া ছিলেন। সেই টীকায় আশাদর প্রভৃতি বহুগ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আশাধরের পুত্র হরিহরও গ্রহগণিত নামক গ্রন্থের রচয়িতা। আশা ধর 'গ্রহযজ্ঞ' নামক গণিত পুস্তক ১০৫৪ শকে (১১৩২ খ্রীঃ) প্রণয়ন করেন। 'গ্রহযজ্ঞশারণী' গ্রন্থও তিনিই রচনা করেন। (২) একজন প্রসিদ্ধ জৈন কবি ও গ্রন্থকার। তিনি মালবরাজ অর্জ্জুন দেবের সমসাময়িক ছিলেন। মতান্তরে আশাধর বিন্ধ্য বর্ম্মণ হইতে জৈতুগি দেব পর্য্যন্ত পাঁচ জন মালব রাজের সমসাময়িক ছিলেন। তদ্‌রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধর্ম্মামৃত ও জিনযজ্ঞকল্প (১২২৮ খ্রীঃ)। এই দুইখানি গ্রন্থ, সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি জৈন গৃহী ও সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বর্ণনা করিয়াছেন। ১২৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঐ পুস্তকের একটি টীকাও রচনা করেন। (৩) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামক

গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আশানন্দ—রামানন্দ হইতে প্রসিদ্ধ রামায়ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। রামানন্দের বিভিন্ন জাতীয় দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। রামানন্দের মৃত্যুর পরে তিনিই গদীপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অপর নাম রঘুনাথ ছিল।

আশানন্দ মুখোপাধ্যায়, ঢেঁকি—শান্তিপুরে তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং তিনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন। তিনি অন্য অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটা ঢেঁকি উত্তোলন করিয়া একদল দস্যুকে একবার বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি ঢেঁকী এই উপনাম প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ তিনি উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আখ্যান শ্রুত হওয়া যায়। সেই সময়ে দেশে দস্যুতার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। সেজন্য বৰ্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বড় বড় জমিদারেরা কালেক্টারীতে রাজস্ব প্রেরণ করিবার জন্য তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। তিনি জমিদারদের পাইকসহ সেই রাজস্ব যথা স্থানে পৌছাইয়া দিতেন। একবার এইরূপে রাজস্ব লইয়া যাইবার সময়ে, তিনি পথিমধ্যে একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। সেই দলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দস্যুরা সংখ্যায় দুই শতাধিক ছিল। কিন্তু নির্ভীক সাহসী বীর আশানন্দ পাইকদিগকে টাকার থলি রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, মাত্র একটী যষ্ঠী হস্তে ডাকাতদলের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের দলপতিদের দুইজনকে দুই বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে অন্যান্য ডাকাতেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। তিনি ডাকাতপতিদ্বয়কে কালেক্টারের হস্তে অর্পণ করিলেন। আর একবার এইরূপ, খাজানা লইয়া যাইবার কালে পথে রাত্রি হওয়ায় কোনও গৃহস্তের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। কোন প্রকারে নিকটবর্ত্তী ডাকাতেরা এই সংবাদ পাইয়া, গভীর রাত্রিতে সেই গৃহ বেষ্টন করিল। আশানন্দ ডাকাতদের কোলাহল শ্রবণে জাগরিত হইলেন। অন্য অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ ঢেঁকিশালা হইতে ঢেঁকি গ্রহণ পূর্ব্বক, ডাকাতদিগকে আক্রমণ করিলেন। ডাকাতেরা প্রহারে জর্জরিত হইয়া পলায়ন করিল। আশানন্দ যেমনি শক্তিশালী ছিলেন তেমনি আহার্য্যও প্রচুর গ্রহণ করিতেন। আজকাল বলহীন বাঙ্গালীর আহারও তদনুরূপ হইয়াছে।

আশাপীর—একজন মুসলমান ফকির। গৌড়ের রাজ দুর্গের পরিখার বাহিরে এক মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ফিরোজ মিনার বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আশাপীর কিছু

কাল এই মিনারে বাস করিয়াছিলেন। এখনকার লোকে তাঁহার নামেই মিনারের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

আশারাম রায়—বীরভূমের অন্তর্গত নন্দী গ্রামের দক্ষিণ ভাগে 'দক্ষিণগ্রাম' অবস্থিত। এই গ্রামের রায় বংশ অতি প্রাচীন। তাঁহারা ছান্দরের বংশধর, বাৎস গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশের আশারাম রায় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি মাতা ও পিতামহীর যত্নে প্রতিপালিত হন। গ্রাম্য পাঠশালায় ইহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি প্রথমে সামান্য বেতনে কার্য্য করিয়া পরে নায়েবী করেন। অবশেষে বীরভূমে সদর সিউড়িতে মোক্তারী করিয়া প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। ইনি লক্ষ্মী জনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রত্যহ দেবতার পায়সান্ন ভোগের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে। কর অনাদায়ে বীরভূম রাজনগর রাজের জমিদারী নীলাম হওয়া কালীন, তিনি কয়েকটি লাট খরিদ করেন। তাঁহার বংশধরেরা আজিও তাহা ভোগ করিতেছেন

আশা শাহ—ধাত্রী পান্না মিবারের রাজ কুমার উদয় সিংহকে লইয়া কমলপুরের শাসনকর্ত্তা রাজপুত জাতীয় জৈন বণিক আশা শাহের আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া তাঁহাকে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। বয়প্রাপ্ত হইলে এক সভা করিয়া, সমস্ত সামন্ত নৃপতির নিকট রাণা উদয়ের পরিচয় প্রদানান্তর মিবারের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোত্তেরিয়োর অঙ্কে স্থাপন করিলেন।' বৃদ্ধ সামন্ত পূর্ব্ব হইতেই ইহা অবগত ছিলেন। সেজন্য তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রাণা উদয়ের সহিত এক পাত্রে ভোজন করিলেন। ইহাতে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল।

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী—তিনি হে॰ ম॰ পুরের রাজবংশীয়। এই ধারা ছোট তরফ বলিয়া খ্যাত। পিতার নাম রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল।

আশুতোষ চৌধুরী—কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের একজন প্রধান নেতা। তিনি পাবনা জেলার এক প্রাচীন জমিদার বংশে ১৮৬০ খ্রী অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। যশোহর ও কৃষ্ণনগরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮১ খ্রী অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ অনুমতি লাভ করিয়া, সেই বৎসরই এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং অ…

উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে পাঠ্যাবস্থায়ও নানারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কেম্ব্রিজের ছাত্র সভায় ইংরাজিতে এক কবিতা লিখিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। কিছুকাল তিনি কলেজের মুখপত্র 'ঈগল্' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এল্-এল্-বি, অঙ্কশাস্ত্রে ট্রইপস এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে প্রত্যাগমন করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুকাল সিটি কলেজের আইন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। অনন্যসাধারণ প্রতিভা বলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। ক্রমে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের একজন হইয়াছিলেন। যৌবনকালে কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি প্রখ্যাত নামা ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, অনেক সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। অক্ষয়চন্দ্রের 'গোচারণের মাঠ' শীর্ষক কবিতার এক ব্যঙ্গ অনুকৃতি রচনা করেন। তাহা পাঠ করিয়া অক্ষয়চন্দ্রও বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পরবর্ত্তী জীবনেও সাহিত্য সেবা হইতে বিরত ছিলেন না। ভারতীতে তাঁহার অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। দিনাজপুরে (১৯২২ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে তিনি যে সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সকল স্থানেই প্রশংসা লাভ করে। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে, তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও, ফরাসী সাহিত্যকে অবহেলা করিতেন না। ফরাসী ভাষায় লিখিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট পুস্তক তাঁহার গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য 'মজলিস্' নাম দিয়া একটি মিলন পরিষদ্ সংঘটন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা হয়।

রাজনীতিক বিষয়েও আশুতোষ দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। কর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে কিছুদিন Indian Association এর সম্পাদকের কার্য্য করেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইতেই তিনি উৎসাহের সহিত তাহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেন। বর্দ্ধমানে ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন

হয়, তাহাতে সভাপতিরূপে তাঁহার 'A subject race has no politics' (পরাধীন জাতির কোনও রাজনীতি নাই), এই উক্তি দেশে অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইংরেজ পরিচালিত সংবাদ পত্রসমূহ তজ্জন্য তাঁহাকে নানারূপ কটূক্তি করে। বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সমিতি (Bengal Land Holders' Association) স্থাপন তাঁহার জীবনের আর এক প্রধান কীর্ত্তি। ময়মনসিংহের স্বাধীনচেতা জমীদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। আশুতোষের কর্ম্ম নিপুণতায় অতি অল্পকাল মধ্যেই উক্ত সমিতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আশুতোষ নির্ভীক ভাবে যোগদান করেন এবং বরাবরই অতি উৎসাহের সহিত উহার সর্ব্ব প্রকার প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। রাজনীতি ভিন্ন আরও নানারূপ জনহিতকর ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের প্রথম বাঙ্গালীর কাপড়ের কল 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল্স' প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ (National Council of Education) প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি বিশেষ সাহায্য করেন এবং আমরণ অর্থ সাহায্য দানে তাহার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ভগ্ন শরীর লইয়াও যাদবপুর শিল্পশিক্ষায়তনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এককালে বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' নাম দিয়া তৎপরিচালিত শিক্ষার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ আন্দোলনের ফলে বহু প্রতিভাবান্ ছাত্র পাঠাভ্যাস ত্যাগ করে। আশুতোষ ঐ আন্দোলনে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। তিনি বরঞ্চ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতেই উৎসাহ দিতেন।

১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি বাঙ্গালার আইনসভার সভ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যও (Fellow) ছিলেন।

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পৌত্রী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে দীক্ষিত হন। তাঁহার বিবাহিত জীবন চিরকাল অতি মধুর ছিল। আশুতোষ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েরই প্রকৃতি অতি অমায়িক ছিল।

উভয়েই পরদুঃখকাতর, এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে এবং তিনি ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে পরলোক গমন করেন।

আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু)—তিনি কলিকাতার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিখ্যাত ধনী বণিক রামদুলাল দেব সরকার মহাশয়ের পুত্র। ১২১০ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষ নানারূপ সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে প্রথম অভিনীত হয়। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং সঙ্গীতজ্ঞদিগের সাহায্য দানে ও তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। আশুতোষ স্বয়ং উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত রচয়িতা ও সেতার বাদক ছিলেন। তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট নানারূপ উৎসাহ ও সাহায্য পাইতেন। পুরী, বারাণসী, তারকেশ্বর প্রভৃতি হিন্দুদের পুণ্য তীর্থস্থানসমূহে তাঁহার সৎকীর্ত্তির নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।. কাশীধামে তিনি পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ এক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায়, দুলালেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তারকেশ্বরের মন্দির ভগ্নপ্রায় হইলে তিনি স্বীয় অর্থানুকূল্যে সেই মন্দিরের স্থানেই অপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি দানশীল ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া নামক স্থানে এক উদ্যান বাটিকায়, তিনি এক অতিথিশালা স্থাপন করেন। কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিমকূলে শালকিয়া নামক স্থানে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য তিনি ঘাট বাঁধাইয়া দেন। ঐ ঘাট এখনও তাঁহার নামে (ছাতুবাবুর ঘাট) এবং ঐ অঞ্চল বাঁধাঘাট নামে পরিচিত। তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করাইয়া উপযুক্ত পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত বহু পৌরাণিক গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। ঐরূপ বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি হইতেই স্বনাম খ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

তাঁহাদের সময়ে লোক সমাজে ধনী, পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তিরা 'বাবু' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। ঐরূপ বাবু নামে খ্যাত লোকের সংখ্যা তখন খুব বেশী ছিল না। আশুতোষ দেব ও তাঁহার ভ্রাতা প্রমথনাথ দেব যথাক্রমে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতার বীডনষ্ট্রীটস্থ

'ছাতু বাবুর বাজার' এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ১২৬২ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ২৭ শে জুলাই আশুতোষ প্রথম দেশীয় জুরিদের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আশুতোষ দেব, রাধা মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কালী প্রসাদ ঘোষ, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, বীর নরসিং মল্লিক, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রসময় দত্ত এই কয়জন প্রথম নির্ব্বাচিত দেশীয় জুরি ছিলেন। আশুতোষের ন্যায় সরল স্বভাব, উদার চিত্ত সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন লোক অতি বিরল।

আশুতোষ মিত্র (ডাক্তার)—১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ তাঁহার মাতুল ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজহইতে এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ১৮ বৎসর বয়সে প্রবেশ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সহকারী শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীরূপে কাশ্মীর গমন করেন। তথায় সুচিকিৎসা গুণে তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে অদ্বিতীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মিষ্ট বচন ও বদান্যতায় সকলেই মুগ্ধ ছিল। দরিদ্র রোগীকে তিনি অর্থ না লইয়া চিকিৎসা করিতেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম ও চরিত্র বলেও তিনি সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় তিনি মহাত্মা রাজ নারায়ণ বসুর সংস্পর্শে আসিয়া, নীতি ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালী মনীষী। কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভবানীপুরের খ্যাতনামা চিকিৎসাব্যবসায়ী ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা। অতি শৈশব কাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অতি শৈশবে শিশুবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি কিছুকাল গৃহেই অধ্যয়ন করেন, তৎপরে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বান স্কুলে ভর্ত্তি হন। বিখ্যাত

ব্রাহ্ম নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তখন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া, আশুতোষ ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে পনের বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপরে যথা সময়ে এফ্-এ এবং বি-এ পরীক্ষায়ও অতিশয় কৃতিত্বের সহিত এবং উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে গণিতে এবং তৎপরবৎসর পদার্থ বিজ্ঞানে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান এই দুই বিষয়েই গবেষণামূলক পরীক্ষা দিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। সাহিত্য বিষয়েও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তিনি পরীক্ষা দিবার অনুমতি চাহিয়া ছিলেন কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। গণিতেই আশুতোষের প্রতিভা অতি তীক্ষ্ণ ছিল। যে বৎসর তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসরই তিনি এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হন। গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথা বৈদেশিক পণ্ডিত মণ্ডলীরও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি পরবর্ত্তী কালে বহু বৈদেশিক পণ্ডিত সঙ্ঘের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। গণিত ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও কৃতী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা সমাপন করিয়া, আশুতোষ শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণের চেষ্টা করেন। তিনি তৎকালীন প্রথানুযায়ী, শিক্ষা বিভাগের নিম্ন স্তরে (প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে) চাকুরী পাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহা গ্রহণ করেন নাই। পরে আইন পরীক্ষায়ও উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সফলতা লাভপূর্ব্বক, কিছুকাল দেশ প্রসিদ্ধ রাস বিহারী ঘোষের সহকারী রূপে কাজ করিয়া, স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। স্বাভাবিক প্রতিভা ও বুদ্ধি বলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। এই পদে তিনি প্রায় বিংশতি বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে একাধিকবার প্রধান বিচারপতির সম্মান জনক পদও অস্থায়ী ভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিচারক রূপে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় সকল শ্রেণীর লোকের প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে সকল ভারতীয় মনস্বী বিচারপতি রূপে হাইকোর্টের গৌরব বৃদ্ধি

করিয়া গিয়াছেন, আশুতোষের স্থান তাঁহাদের মধ্যে অনেক উচ্চে ছিল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষের জনসাধারণের সেবা করিবার স্পৃহা অতিশয় বলবতী হয়। তন্মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তার, নানারূপ শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করিতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) হন এবং তখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ (Vice Chancellor লাভ করেন। বস্তুত আর কোনও ব্যক্তি এত দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং এত অধিকবার ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন নাই। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তিনি তাহার একজন সভ্য মনোনীত হন। ঐ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য উন্নততর ভাবে পরিচালনার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অনুমোদন করেন, সেই সকলের মধ্যে আশুতোষের কৃতিত্ব বিশেষ পরিমাণেই ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বাধ্যক্ষ না থাকিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগেই তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। তিনি তাঁহার দূর দৃষ্টি বলে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চেষ্টা করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমশ্রেণীতে উন্নয়ন করা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে উহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যে গৌরবময়, অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলে মনস্বী আশুতোষের সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা বর্ত্তমান। পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিত। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইহার অধীনে এম্‌-এ ও এম্‌-এস্‌সি এবং তদনুরূপ বা তদতিরিক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। তখন হইতেই আশুতোষ তাঁহার সকল প্রকার কার্য্য কুশলতার দ্বারা ধীরে ধীরে উহাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকার উচ্চতর শিক্ষার জন্য গবেষণা করিবার সুযোগ পায়, তিনি তাহার অতি সুচারু ব্যবস্থা করেন এবং ঐ সকল মেধাবী ও কৃতী ছাত্রদিগকে বহুল সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে অধ্যাপনার ভার দিয়া, নিজ ক্ষমতা বিমূঢ় বাঙ্গালীকে নিজ কার্য্য ক্ষমতায় সচেতন করিয়া তোলেন। তাঁহারই ব্যবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া, প্রতিভাশালী বাঙ্গালী যুবকেরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষ

করিয়া আজ বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ উপেক্ষিত বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুতঃ তিনি যদি আর কোনও কাজ না করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও কেবল ঐ এক কাজের দ্বারাই তিনি বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যের পদ লাভ করিবার অল্পকাল পরেই, তিনি প্রস্তাব করেন যে এফ্-এ (বর্ত্তমান আই-এ) ও বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা, হিন্দি অথবা উড়িয়া ভাষায় একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। এবং যাহারা ফার্শী অথবা আরবী অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে উর্দ্দু ভাষায় একটি পরীক্ষা দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ইংরেজিতে এম্-এ পরীক্ষার্থীগণকেও উল্লিখিত কোনও একটি ভাষায় রচনা লিখিতে হইবে। আশুতোষের এই প্রথম চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নাই। কতিপয় বর্ষ পরে তিনি আবার ঐ বিষয়ে মনোসংযোগ করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎপ্রমুখ সাহিত্যসংসদগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষাও যাহাতে একটি পাঠ্য বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তজ্জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তৎফলে নানারূপ মতামত সংগৃহীত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। আশুতোষ ঐ কমিটীর একজন সদস্য ছিলেন। ঐ কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থীগণকে বাঙ্গালা অথবা উর্দ্দু ভাষায় রচনার পরীক্ষা দিতে হইবে। ঐ পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রগণের স্বেচ্ছাধীন হইবে এবং রচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সেই বিষয় তাহাদের সাফল্য পত্রে উল্লিখিত থাকিবে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, আরও কয়েক বৎসর পরে (১৯০৬ খ্রীঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নূতন বিধি প্রচলিত হইল, তখন তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থীগণের জন্য বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার ও পরীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ঐ ব্যবস্থাই ক্রমশঃ ব্যাপকতর ভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থান উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এম্-এ পরীক্ষাতেও ভারতীয় ভাষাতে পরীক্ষা দিবার যে প্রথা চলিত রহিয়াছে, তাহার মূলেও আশুতোষের বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয় গুলির সহিত বাঙ্গালা ভাষাও যাহাতে বিশেষ ভাবে আদরণীয়

হয়, ছাত্রগণ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করা লজ্জাজনক বোধ না করে, তজ্জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্য শিক্ষা দিবার, ঐ সকল বিষয়ে গবেষণা করিবার, যে বিস্তৃত ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকল যে আশুতোষের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উৎসাহেরই ফল মাত্র, একথা বলা একেবারেই অত্যুক্তি হইবে না। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে বাঁকীপুরে ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে হাওড়ায় এবং ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে সভাপতিরূপে তিনি যে সকল অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরের কল্পনারই অনুরূপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে তিনি অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার যে চেষ্টা করিতেন, তৎফলে দেশের শাসক সম্প্রদায়ের সহিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তিনি আজীবন একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ উদ্ভাবিত প্রণালীতে কাজ করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে একটি জাতীয়তার আদর্শ বিদ্যমান থাকিত। তজ্জন্য স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসকমণ্ডলীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গভর্ণমেণ্ট অনেকবার তাঁহাকে, তাঁহাদের মনোমত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াও বিফল হন। তজ্জন্য তাঁহারা আশুতোষের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। লর্ড লিটন একবার তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে সহযোগীতা লাভ করিতে আশা করেন। তদুত্তরে আশুতোষ লর্ড লিটনকে তিরস্কার করিয়া যে তীব্র মন্তব্য পূর্ণ উত্তর দেন তাহা সমগ্র দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিও আশুতোষের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় এম্-এ পরীক্ষাতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Ancient Indian History and Culture) বিষয়ে একটি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পালি প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার ব্যাপক শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা তাঁহারই অদম্য চেষ্টার ফল। এসকল বিষয়ে তাঁহার দূর দৃষ্টি অতি বিস্তৃত ছিল। লোক নিন্দা বা বিরুদ্ধতা কোনও দিন তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম প্রণালী হইতে বিচ্যুত করিতে

পারে নাই। হাইকোর্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে দেশের সকল প্রকার উন্নতি-মূলক কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেশবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে, পাটনা নগরে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়। তিনি ঐ সময়ে ডুমরাওনের রাজার একটি জটীল মকর্দ্দমা পরিচালনা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ বিশেষ ব্যবস্থায় রেল যোগে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া এবং মহাসমারোহে কালীঘাটের শ্মশান ঘাটে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করা হয়। হাওড়া রেল ষ্টেশন হইতে কালী ঘাট পর্য্যন্ত যে বিশাল জনস্রোত তাঁহার শবানুগমন করে, ভারতের ইতিহাসে খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই সেইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি একা যত রকম কাজ নিয়মিত-রূপে দক্ষতার সহিত করিতেন সম-সাময়িক বা বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ধর্ম্মের, রুচির, ব্যবসায়ের ও মতের নানা লোককে একত্রে কাজ করাইবার এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবারও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। কোন কোন অধ্যাপক অপেক্ষাও গণিতে তাহার মাথা বেশী খেলে বলিয়া খ্যাতি রটিয়াছিল। তিনি ধনী লোকের ছেলে ছিলেন। কিন্তু অশন বসনের বিলাসিতা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার একখানা সাধা সিধে ধুতি একটা লংক্লথের সাধারণ পাঞ্জাবীই তাঁহার সাধারণ পোষাক ছিল। দৃঢ়চিত্ততা, আত্মবিশ্বাস ও সাহস ব্যঞ্জক চেহারা ছিল। যেখানেই থাকেন শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার বরাবর ছিল। উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকতা পাইয়া শিক্ষা বিভাগে থাকিলে, গণিতের গবেষণা দ্বারা নূতন অনেক কিছু করিতে পারিতেন, কারণ পঠদ্দশায়ই তিনি কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ী হইয়া হাইকোর্টের জজের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা বরাবরই ছিল। তাঁহার লাইব্রেরী শোভার জন্য নহে, পরন্তু নানা বিষয়ক বহু সহস্র পুস্তকের সমষ্টি বলিয়া, দেখিবার জিনিষ ছিল; পুস্তক ক্রয় করা তাঁহার সখ বা বাতিক ছিল। তিনি অর্থোপার্জ্জনে রত থাকিয়াও সার্ব্বজনীন কাজে এত সময় দিয়াছিলেন ও এত কাজ করিয়া-ছিলেন যে, একজন অনন্যকর্ম্মা লোকও তাহা পারেন না। অন্যান্য সভ্য দেশের চেষ্টার ন্যায় শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি, সর্ব্ববিধ জ্ঞান অর্জ্জন, গবেষণা দ্বারা মানবের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা আমাদের দেশেও সেইরূপ প্রচেষ্টা হয়

আশু বাবুর ইহা হৃদ্গত ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য তিনি যৌবনকাল হইতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মের যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য — "আমি আমার বিবেকের অনুমোদন সহকারে বলিতে পারি যে, আমি পরিশ্রম হিসাবে যেমন অনেক সময় অন্যকে রেয়াৎ করি নাই, তেমনি আমি কখনও নিজেকেও বাঁচাইয়া চলি নাই। আমার অন্যবিধ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে আমার বিচারপতি পদের কর্ত্তব্য, সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন করিয়া যতটুকু সময় করিতে পারিতাম, তাহার প্রত্যেক ঘণ্টা প্রত্যেক মিনিট, বহু বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় ও পদ্ধতির চিন্তা হইতে আমি নিস্কৃতি পাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য আমি অধ্যয়ন ও গবেষণার সমুদয় সম্ভাবনা বলি দিয়াছি। সম্ভবতঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের স্বার্থও বলি দিয়াছি এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তির অনেক অংশ নিশ্চয়ই বলি দিয়াছি"। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই উক্তি একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত শক্ত মানুষ ছিলেন। অনেক ঝড় তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়াই গিয়াছে; কিন্তু তিনি [illegible]তে ভগ্ন বা নত হন নাই। আশুবাবু [illegible]লিয়াই তিনি পরিচিত। এই পরিচয়ে তিনি কখন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি বাঙ্গালী বাবু হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীবাবুই ছিলেন। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাঁহার মত মানুষ 'বাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কেননা তাহাতে বাবু কথাটার অর্থের লাঘব না হইয়া গৌরবই হইয়াছে। নিজের আফিস আদালতের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজে ও অবস্থায় তাঁহাকে ধুতি পরিহিত দেখা যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের বৈঠকেও তিনি ধুতি পরিয়া উপস্থিত হইতেন। একদিকে তিনি প্রভুত্বে ও নেতৃত্বে অত্যন্ত শক্ত লোক ছিলেন কিন্তু অন্যদিকে সাবেক কালের ভদ্রবাঙ্গালীর কয়েকটী গুণ তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। আজকালকার দিনে তাহা সুলভ নহে। তিনি সকল অবস্থার সকল রকমের লোকের সহজে অধিগম্য ছিলেন। বড় লোকের এমন কি খুব পরিচিত বড় লোকের বাড়ীতে গিয়াও দেখা যায়, বাড়ীর দারোয়ান বা অন্য চাকর এমন ভাবে তাকায় ও কথা বলে, যেন একটী ভিখারী বা হ্যাংলা উমেদার আসিয়াছে। আশু বাবুর বাড়ীতে কোন না কোন

প্রকারের সাহায্যপ্রার্থী ও উমেদার খুব বেশী যাইত। কিন্তু তিনি বাড়ী থাকিলে সকলে অনায়াসে অবিলম্বেই দেখা পাইত। তিনি সকলের কথা মন দিয়া শুনিতেন এবং উপায় ও সাধ্য থাকিলে সাহায্য বা উপকার করিতে বিমুখ হইতেন না। হাল্‌ফ্যাসানের "চেষ্টা করিব" বলিয়া ফাঁকি দিবার ও পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই কারণে বাংলা দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদিগের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন না কোন প্রকারের সহায়তা ও উপকার অন্য লোকের নিকট অপেক্ষা অনেক অধিক পাইয়াছেন। নিজের পরিবারের মধ্যে তিনি খুব স্নেহশীল ছিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হওয়ার পর তিনি আবার তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অতি নীচ ও অভদ্র রকমের নানা আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও তিনি অটল ছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই কন্যাটী আবার বিধবা হন এবং পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে গতায়ু হন।

আশু রায়—তিনি শ্রীহট্টের কোন প্রদেশে এক সময় রাজা ছিলেন। কুচবিহারের বিখ্যাত নরপতি নর নারায়ণের সেনাপতি শুক্লধ্বজ (ডাক নাম চিলারী) অতিশয় পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি আসামী আহম রাজা, কাচারী রাজা, জয়ন্তিয়া, মণিপুর প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আশু রায়কে তৎপদ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে তখন কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। আশু রায় কোন্ স্থানের রাজা হইয়াছিলেন, তাহা এখনও নির্ণয় হয় নাই।

আশূর বেগ—তিনি বঙ্গের শাসন কর্ত্তা শাহ সুজার নৌসেনাপতি ছিলেন। (১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রীঃ) একবার তিনি দুইশত নৌকা লইয়া নদীতে পাহারা দিতে ছিলেন, এমন সময়ে ২০ খানা ফিরিঙ্গি দস্যুর (পর্টুগীজ জল দস্যু) জাহাজ দৃষ্টি পথে পতিত হইলে, তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন।

আশ্বলায়ন—(১) তিনি শ্রৌত সূত্রাদি প্রণয়ন করেন। গৃৎসমদ শৌনকের বংশধর মহাশাল শৌনক তাঁহার গুরু ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন তিনি খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে গুরু ও শিষ্য এক যোগে ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ দুই অংশ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (২) এই আশ্বলায়ন দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সূত্র, চারি অধ্যায় বিশিষ্ট গৃহ্যসূত্র ও চতুর্থ আরণ্যক এই তিন প্রকার গ্রন্থের রচিতা। তিনি

পাণিনির সমকালবর্ত্তী ছিলেন। বোধ হয় উভয় আশ্বলায়ন একই ব্যক্তি।

আশ্মরথ্য—আচার্য্য আশ্মরথ্য একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা দর্শনের ৬।৫।১৬ সূত্রে জৈমিনি তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বাদরায়ণ হইতেও প্রাচীন। তিনি **অশ্মরথ** ঋষির পুত্র।

আশ্রম—শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদের মধ্যে পদ্মপাদ অন্যতম ছিলেন। পদ্মপাদের শিষ্য আশ্রম ও তীর্থ। দশনামী সন্ন্যাসী-দের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের উপাধি আশ্রম। শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অবস্থান করেন।

আসট — চম্পা প্রদেশের অধিপতি আসট, কাশ্মীরপতি কলসের অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলেন।

আসড়—জৈন গ্রন্থকার। তাঁহার শিষ্য অভয় দেব। আসড় দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

আসদ — মীরজা আসদউল্লাখাঁর কবিজন সুলভ নাম। তাঁহাকে সাধারণতঃ মীরজা নৌসাও বলা হইত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সমরকন্দ বাসী ছিলেন। আগ্রাতে তাঁহার জন্ম হয় এবং দিল্লীতে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। এস্থান হইতেই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের অনুগ্রহে তিনি নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। ফার্শীতে ও উর্দ্দুতে তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জীবনের শেষ অংশে (১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে) মুঘল রাজত্বের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২৮৫) তাঁহার মৃত্যু হয়। (ঘালিব দেখ)

আসদ উল্লা— ইনি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে হুগলীর ফৌজদারের কার্য্য করিতেন, তিনি নবাবের প্রিয় পাত্র ছিলেন। এমামউদ্দীন দেখ।

আসদ উল্লা — বাঙ্গালার নবাব মুরশিদকুলী খাঁর সময়ে তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদার ছিলেন। এই সর্ব্ব ন প্রিয় সাধু চরিত্র আফগান সর্দ্দার, দল বল সহ ঝাড় খণ্ডের দুরন্ত পার্ব্বত্য অধিবাসী-দের আক্রমণ হইতে পশ্চিম বঙ্গবাসী-দিগকে রক্ষা করিতেন। তিনি তাঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশ ধার্ম্মিক, সাধু, শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভরণ-পোষণার্থ ব্যয় করিতেন। সেজন্য বাঙ্গালার নবাবও তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিতেন না।

আসদ উল্লা আসদ ইয়ার খাঁ নবাব—তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ইন্সান। সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৫৮) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসদ খাঁ, নবাব — তাঁহার উপাধি আসফ উদ্দৌলা এবং জুমলত-উল-মুলক;

তিনি বিখ্যাত তুর্কি বংশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাসের অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুস্থানে পলায়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে জুলফিকর খাঁ উপাধি দিয়া নুরজাহানের কোন আত্মীয় কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। তাঁহার পুত্র আসদ খাঁ (পূর্ব্ব নাম ইব্রাহিম) নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি সহকারী রাজস্ব সচীব ও পরে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রী হন। তাঁহার পুত্র ইস্মাইল প্রধান রাজস্ব সচীবের পদে নিযুক্ত হন এবং আমিরুল উমরা জুলফিকার খাঁ উপাধী প্রাপ্ত হন. সম্রাট ফিরোক শিয়ার কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রকে নিষ্ঠুররূপে নিহত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তিনি সামান্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নির্জনে বাকী জীবন যাপন করেন ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২৯) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসদ খাঁ — মহারাষ্ট্রপতি শ রাজত্বকালে, আহাম্মদ খাঁকে দাক্ষিণাত্য জয় করিবারজন্য ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ সম্রাট আওরঙ্গজীব পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি মসলিপত্তন হইতে গঙ্গার নদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অনেক কৃতকার্য্য হন। রাজারামের রাজত্ব কালে, আসদ খাঁ আর একবার দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। কামবক্স তখন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতে ছিলেন। তাঁহার আগমনেই তাহা রহিত হয়। প্রধান মন্ত্রী আসদ খাঁ সম্রাটকে রাজারামের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ অরণ্যরোদনে পরিণত হইল। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে বাহাদুর শাহ সম্রাট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর জাহান্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট হন। অত্যল্পকাল রাজত্বের পর ফরুকশিয়ার সম্রাট হন। আসদ খাঁর পুত্র জুলফিকর খাঁ জাহান্দরের পক্ষে ছিলেন বলিয়া নিহত হন। আসদ খাঁ জহন্দর শাহকে ধরাইয়াদিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করেন।

আসদজ্জমান খাঁ — বীরভূমরাজ বদীয়জ্জমানের পুত্র। বর্গীর হাঙ্গামার কালে অত্যাচার দমনার্থ তিনি ভ্রাতা আলী নকীর সঙ্গে কিছুকাল হেতমপুর দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। দুর্গের সন্নিকটে আসদগঞ্জ নামক পল্লী তৎকালে তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, তিনি পল্লী স্থাপন মানসে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সদ্গোপ, ময়রা, মুদী, সূত্রধর, তন্তুবায়, ধীবর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী আনাইয়াছিলেন। ধর্ম্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি বিষয়কর্ম্মে বীতরাগ

হইলেন। পিতা বদীয়জ্জমান ৪র্থ পুত্র আসদজ্জমানকে ১৭৫২ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই নবাব মীরকাশিমের সহিত বীরভূম রাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অন্যান্য জমিদারের ন্যায় মীরকাশিম বীরভূম-রাজকে বর্দ্ধিতহারে কর দাখিল করার আদেশ প্রদান করিলে, বীরভূমরাজ করদানে স্বীকৃত না হওয়ায়, এই সংঘর্ষ ঘটে। স্বয়ং আসদজ্জমান এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া নবাব সৈন্যের দুর্দ্দশা ঘটান, এমন সময় মীরকাশিমের অনুরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেরিত মেজর হোয়াইট সসৈন্যে অতর্কিতভাবে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া, আসদজ্জমানকে পরাজিত করিলেন। পরাজিত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি শিওভট্টকে আহ্বান করিয়া সেনাপতি সুরাজবেগের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর সিউড়ীর নিকট করিধার প্রান্তরে উভয় পক্ষের ঘোর সংঘর্ষে সুজাবেগ পরাজিত ও তাড়িত হইলেন। রাজা আসদজ্জমান খাঁ এই সময় হেতমপুর দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাবসৈন্য কর্তৃক গুপ্তভাবে আক্রান্ত হইয়া, তিনি প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার দুই হিন্দু সেনাপতি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। অপর সেনাপতি কন্দর খাঁর বীরত্বে নবাব সৈন্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। আসদজ্জমানও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ-দর্শনে সৈন্যগণ মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কথিত আছে সাঁওতাল পরগণার ধোপা বংশীয় এক ব্যক্তি আসদজ্জমান খাঁর দেওয়ান ছিল। সে বিপক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারই চক্রান্তে এই যুদ্ধে আসদজ্জমান খাঁর পরাজয় ঘটে ও তাঁহার রাজ্য নাশ হয়। দেওয়ান কৌশলপূর্ব্বক আসদজ্জমানকে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন করাইল। বিপক্ষ-দলের গোলা হস্তীর কপোলদেশে আঘাত করায়, হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া, ভীষণ বেগে ধাবিত হইয়া, জঙ্গলে প্রবেশ করে। রাজাকে পলায়নপর দেখিয়া সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, সেনাপতি কন্দর খাঁ আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। এই সময় হইতে আসদজ্জমান স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইলেন।

আসফ উদ্দৌলা নবাব — ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (হিঃ ১১৮৮ জেলকদ) তাঁহার পিতা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার

(হিঃ ১২১২ প্রথম রবির ২৮শে) তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহারই স্থাপিত ইমামবারাতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়; তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পোষ্যপুত্র উজির আলি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু সেই সময়ের ভারতের বড়লাট তাঁহার ভ্রাতা সাদত আলিকে সিংহাসন প্রদান করেন। আসফ উদ্দৌলা দূর দেশান্তর হইতে নানা জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণকে সমাদরে স্বীয় রাজ্যে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ঐশ্বর্য্য এই সময়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নবাবের দানশীলতা, সুপ্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, 'জিসকো নদে মৌলা, উসকো দেয় আসফউদ্দৌলা' অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দয়া না করেন, আসফ উদ্দৌলা তাহাকে দয়া করেন। এই উদার নরপতির আশ্রয়ে বাঙ্গালীরা নবাব সরকারে নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

আসফ খাঁ (১) — অন্য নাম আবদুল মাজদ। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের সেনাপতি আসফ খাঁ ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৩) নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী বুন্দেলখণ্ডের প্রান্তস্থিত নগরকোট নামক স্থান অধিকার করেন। ঐ প্রদেশের রাণী দুর্গাবতী অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে অনলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। আসফ খাঁ নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধন রত্ন লাভ করেন এবং স্বয়ং তাঁহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। পরে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরে বশ্যতা স্বীকার করিলে সম্রাট আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, চিতোর জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।

আসফ খাঁ (২) — খেরাজ ঘিয়াস উদ্দিন আলি কৈবানীর উপাধি। তাঁহার পিতার নাম আকা মুল্লান্দ। তিনি সম্রাট আকবরের রাজস্বসচীব ছিলেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৮১) গুজরাটের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলে, সম্রাট তাঁহাকে আব্বাস খাঁ উপাধী প্রদান করেন। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৯) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসফ খাঁ (৩)— সাধারণতঃ মীরজা ফরবেগ নামেই তিনি খ্যাত। মীরজা বদিয়জ্জমানের পুত্র; আকামুল্লা কজাবিনীর পৌত্র। যৌবনের প্রারম্ভে ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৫) তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্য মীরজা ঘিয়াস উদ্দিনের (দ্বিতীয় আসফ খাঁ) অনুরোধে তিনি সম্রাট আকবরের রাজসভায় সাদরে গৃহীত হন। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৯) তাঁহার পিতৃব্য দ্বিতীয় আসফ খাঁর মৃত্যুর পরেও তিনি উক্ত আসফ খাঁ উপাধি ও রাজস্ব সচীবের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি একজন কবি ছিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ তোয়ারিখ আলফির শেষ অংশ তাঁহারই রচিত। তিনি ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৭) প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০২১) তাঁহার মৃত্যু হয়। জাফর নামে তাঁহার একটী পুত্র কবিত্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আসফ খাঁ (৪) — আবুল হাসনের উপাধি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য আরও অনেক উপাধি ছিল। তিনি সুবিখ্যাত মন্ত্রী ইতিমদ উল্লার পুত্র ও নুরজাহান বেগমের ভ্রাতা। ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩০) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই কন্যা আরজমন্দবানু বেগম (অন্য নাম মমতাজ মহল) সম্রাট শা-জাহানের পত্নী ছিলেন। ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দের ১০ই নভেম্বর (হিঃ ১০৫১ ১০ই সাবান) প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। লাহোর নগরের নিকটস্থ রাবী নদীর অপর পারে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। এই কন্যা ছাড়া তাঁহার শায়েস্তা খাঁ, মীরজা মশিহ, মীরজা হোশেন ও শাহ নওয়াজ খাঁ নামে আরও চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শাহ নওয়াজ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। মীরজা মশিহ কাশ্মীরে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন

আসফ খাঁ (৫) — তিনি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার আসল নাম আলমাস বেগ ছিল। সম্রাট তাঁহাকে আসফ খাঁ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক গুজরাট প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। তিনি গুজরাটের রাজা কারণ রায়কে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার স্ত্রী কমলাদেবী ও কন্যা দেবলাদেবীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করেন।

আসফ মামুদ মণ্ডল—আসফনুরি একদিলশার পুঁথির রচয়িতা। রচনা ফার্শী মিশ্রিত। কবির বাস্থান রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে ১২৪১ সালে ১৩ই আশ্বিন, বুধবার এই গ্রন্থের রচনা শেষ করেন।

আসমত উল্লা খোন্দকার—তাঁহার জন্মস্থান বগুড়া জিলা। ১৩০০ সালে তাঁহার রচিত "ফতেমার জহুরা নামা" প্রকাশিত হয়।

আসমত উল্লা মুল্লা—শাহরাণ পুরে তাঁহার নিবাস ছিল। 'হুরা খুলাসত উল হিসার' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসমান তারা—বাঙলার নবাব নশরৎ শাহের কন্যা আসমান তারাকে বিবাহ করিয়া রাজা গণেশের পুত্র যদু নারায়ণ খাঁ, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন

তাঁহার নাম জালাল উদ্দিন (ধর্ম্মধ্বজ) হইয়াছিল। আসমান তারার গর্ভে যদুর আহাম্মদ শাহ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদুর মৃত্যুর পরে তিনিই বাঙ্গালার নবাব হইয়া ছিলেন। জালাল উদ্দীন দেখ।

আসা—মধ্যভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী খান্দেশ জেলার আসীরগড়ের আহীর রাজা বলিয়া তিনি পরিচিত। এক সময়ে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ হেতু খান্দেশের বড়ই দুরবস্থা ঘটে। এই আসীরগড়ের নিকটস্থ দেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। আহীর রাজা আসা সাহায্য দানে ক্ষুধাতুরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আসীরগড় দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণে বহু লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কি করিয়া রাজার মৃত্যু ঘটে এবং রাজ্য পরহস্তগত হয়, তাহার কাহিনী হৃদয়বিদারক। ১৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু ঘটিলে পুত্র মালিক নাসির খান্দেশ প্রদেশের রাজা হন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতার সহিত আসিরগড়ের দুর্গ অধিকার করেন। নাসির, রাজা আসাকে এক পত্র লেখেন যে, 'বাগলান, অন্তর ও কেরলার প্রদেশের রাজা আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমার নিজের লালিঙ্গের দুর্গের অবস্থা ভাল নয়, এই সময়ে আমার পরিবারবর্গকে যদি নিজ দুর্গে ভিতরে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে চির বাধিত থাকিব।' শরণাগতজনকে আশ্রয়দান ও অতিথিসেবা ভারতীয়ের প্রাচীন ধর্ম্ম। পার্শ্বস্থ ছেদক প্রতি ছেদ্য তরুবর ছায়াদানে কাতর হয় না, সেইরূপ শত্রু অতিথিরও সেবা করা উচিত, হিন্দু শাস্ত্রকারের এই উপদেশ আছে। আসা শাস্ত্রানুসারে মালিক নাসিরের পরিবারবর্গকে দুর্গে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে ক্ষণকালের জন্যও সন্দেহ আসে নাই যে, মালিক নাসির দ্বারা তিনি প্রতারিত হইবেন। মালিক নাসির দুইশত পালকী দ্বারবন্ধ করিয়া পাঠাইলে, দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। পালকীর ভিতর হইতে নাসির পরিবারবর্গের পরিবর্ত্তে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুসলমান সৈন্যদল বাহির হইয়াই, অতর্কিত ভাবে দুর্গস্থিত সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হিন্দু সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। তাঁহাদের হস্তে রাজা আসারও মৃত্যু ঘটিল। মালিক নাসীর আসীরগড় দুর্গের প্রভু হইলেন এবং রাজা আসার সমস্ত রাজ্য দখল করিয়া আসীরগড় দুর্গকে নিজ রাজধানীতে পরিণত করিলেন। তাঁহার পিতার গুরু শেখ জৈনুদ্দীন আসীরগড় দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন।

আসাদবেগ — ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে বিজাপুর পতি ইব্রাহিম আদিলশাহ ও দিল্লীর সম্রাট আকবরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে ইব্রাহিম আদিল শাহের কন্যার সহিত সম্রাট আকবরের পুত্র রাজকুমার দানিয়ালের বিবাহ স্থির হয়। কন্যাকে দিল্লীতে আনয়ন করিবার জন্য আসাদবেগ দিল্লীর সম্রাটের রাজদূতরূপে বিজাপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিজাপুর নগরীর এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তৎকালীন বিজাপুরের ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

আসাদ উল্লা খাঁ—বীরভূমের রাজা। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আসান উল্লা খাজা নবাব — ইনি ঢাকার প্রসিদ্ধ দানবীর মুসলমান জমিদার আবদুল গণি নবাব বাহাদুরের পুত্র। ১৮৪৬ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট ইহার জন্ম হয়। ইনিও পিতার ন্যায় সদ্‌গুণ সম্পন্ন বদান্য নবাব ছিলেন। দানশীলতায় তিনিও বদান্য পিতারই মত সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি ঢাকা নগরীর বৈদ্যুতিক আলোর জন্য চারিলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য দানও যথেষ্ট ছিল। তিনি পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার আয় হইতে ঢাকা নগরীর দুঃস্থ লোকের সাহায্যার্থ ব্যয় হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে, সি, এস, আই, উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে এই সদাশয় নবাব সুখী ছিলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতে ও পত্নী বিয়োগে তাঁহার মনকে শোকাকুল করিয়াছিল। তাহাতে তিনি ভগ্ন হৃদয় হইয়া মানসিক ক্লেশে দিন পাত করিতেছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর এই সদাশয় নবাব দেহত্যাগ করেন।

আসান উল্লা খাঁ — ইনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। নবাবের অনুমতিক্রমে ইনি স্বরূপপুরের দুরন্ত জমিদার সুজাত খাঁ ও নিজাবৎ খাঁকে ধৃত করিয়া মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। নবাব তাঁহাদিগকে চিরকারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁহারা বিদ্রোহের সূচনা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং নবাব সরকারের চালানী ষাট হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

আসালত খাঁ—মির আবদুল হাদির উপাধি। তাঁহার পিতার নাম মীর মিরাণ ইজদি। তিনি সম্রাট শা-জাহানের সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৭) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসালত খাঁ—মীরজা মোহাম্মদের উপাধি। তিনি মশহদ নামক স্থানের মীরজা বদিয়ার পুত্র। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৫) তিনি হিন্দুস্থানে আসেন, সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে ৫ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসিক—মাহদি আলি খাঁর কবিজন সুলভ নাম। তিনি নবাব আলি মর্দ্দান খাঁর পৌত্র। তিনি ফার্শী ও উর্দ্দুতে অনেকগুলি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

আসির—আগ্রানগরের সৈয়দ গুলজার আলির কবিজন সুলভ নাম। তাঁহার পিতার নাম নাজির। উর্দ্দুতে একখানা কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন।

আসির উদ্দিন, মৌলবী—তাঁহার জন্ম স্থান ২৪পরগণার অন্তর্গত ধান্য খোলা মোহনপুর। তিনি ১২৭২ সালে 'ঝগড়ানামা' নামে একখানা বই লিখিয়াছেন।

আসুরি—তিনি কপিলের শিষ্য। কপিল আসুরিকে যে সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দেন, আসুরি তাহা স্বীয় শিষ্য পঞ্চশিখকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শত পথ ব্রাহ্মণে আমরা আসুরির উল্লেখ পাই। বেদের এই ব্রাহ্মণ ভাগ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং আসুরি ইহার পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

আসোর—মোহাম্মদ বক্সের কবিজন সুলভ নাম। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা ও আসফ উদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যায় তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

আস্কর খাঁ—তিনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি ঢাকাতেই অবস্থান করিতেন।

আস্করী মীরজা — সম্রাট বাবরের তৃতীয় পুত্র। হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করিয়া, সরকার সম্বলপুর প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি পারস্য দেশহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই বিদ্রোহী হন। সুতরাং হুমায়ুন তাঁহাকে বন্দী করেন। তিনি অবশেষে মক্কা যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু পথে আরবের মরুভূমিতে ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৬১) পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মশহদ নিবাসী ইউসুফ খাঁর সঙ্গে বিবাহিতা হন।

আস্রফ — মাজন্দরাণের মীরজা মোহাম্মদ সৈয়দের কবিজন সুলভ নাম, মোল্লা মোহাম্মদ কানার পুত্র। তিনি

হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজীবের কন্যা জেবুন্নিসা বেগমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। মুঙ্গের নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন কবি। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে।

আস্রফ খাঁ (১) — মীরজা মোহাম্মদ আস্রফের উপাধি। তিনি ইস্‌লাম খাঁ মাহশাদির পুত্র। তিনি সম্রাট শা-জাহানের সময়ে ১৫০০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন ও ইতমদ খাঁ উপাধি প্রাপ্তহন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে, তিনি তিন হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব ও আস্রফ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (হিঃ ১০৯৭, ৯ই জেলকদ) বিজাপুর জয়ের পাঁচ দিন পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

আস্রফ খাঁ (২)—তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আসগর। মশাহদ নামক স্থানের একজন সৈয়দ। তিনি সম্রাট আকবরের প্রধান সচীব ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তিনি মুনিম খাঁ খান খানানের সঙ্গে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৩) লক্ষণাবতী নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহব মল্ল—তিনি কল্যাণের চালুক্য বংশীয় অন্যতম নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বিক্রমাদিত্য গৌড়পতি তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্ব কালে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

আহশান উল্লা খাঁ (হাকিম)— তিনি দিল্লীর একজন বিখ্যাত হাকিম ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহাম্মদ—তিনি একজন বিখ্যাত মৌলবী ছিলেন। সিন্ধুদেশে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। সম্রাট আকবরের যশের কথা অবগত হইয়া, তিনি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে আকবরের সভায় আগমন করেন ও সাদরে গৃহীত হন। তিনি পূর্ব্বেই "খুলাসাৎ উল হায়াৎ" নামে একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ছিলেন। আকবর তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'তারিখি আলফির' সংকলন করিতে দেন ও তাঁহার প্রতি যথেষ্ঠ সমাদর প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে কতিপয় নীচাশয় লোকের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাঁহার পণ্ডিতের সম্মানে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে একদিন নিশীথ রাত্রে মীরজা ফুলাদ নামক এক দুরাত্মা আহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া লাহোরের পথে তাঁহার প্রাণ বধ করে। সম্রাট আকবর ইহাতে মর্ম্মাহত হয়েন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া মানবকুল-

কলঙ্ক মীরজা কুলীদকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যার আদেশ প্রদান করেন।

আহাম্মদ আব্বাসি—তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য ও দরবেশ ছিলেন।

আহাম্মদ আলী খাঁ—কর্ণালের নবাব। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি রাজ ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দশহাজার টাকার এক খিলাত ও পাঁচ হাজার টাকার খাজানা রেহাই দেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে লর্ড লেক কর্ণাল পরগণার কতক গুলি গ্রাম, মোহাম্মদী খাঁ, গয়রাত আলী খাঁ এবং ইসাহাক খাঁ নামক তিন জন সর্দ্দারকে বার্ষিক পনর হাজার টাকা জমায় জায়গীর দেন। কারণ তখন ঐ গ্রাম গুলির বার্ষিক খাজানা চল্লিশ হাজার টাকা ছিল। নবাব আহাম্মদ আলী খাঁ এই মোহাম্মদী খাঁরই বংশধর। তিনি তখন চব্বিশ খানা গ্রামের সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য গ্রামের এক তৃতীয়াংশের মালিক ছিলেন। তিনি বার্ষিক পাঁচহাজার টাকা খাজানা দিতেন। গবর্ণমেণ্ট এই পাঁচ হাজার টাকাই মাপ করিলেন।

আহাম্মদ আলী খাঁ, সৈয়দ আলী জাহের — তিনি বঙ্গদেশের নবাব নাজিম ছিলেন। ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দের ৩০ শে অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহাম্মদ আলী খাঁ নবাব—তিনি পাঞ্জাবেরঅন্তর্গত ফরোক নগরের নবাব ছিলেন। এই নগরটী ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট ফরোক শিয়ার কর্ত্তৃক স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে দলেল খাঁ নামক একজন বেলুচী সর্দ্দার এই স্থানের ফৌজদার ছিলেন। দলেল খাঁ সাধারণতঃ ফৌজদার খাঁ নামে খ্যাত ছিলেন। মধ্যে একবার জাটেরা ইহা অধিকার করে, কিন্তু ফৌজদার খাঁর পৌত্র ইহা পুনঃ অধিকার করেন। ইহার বংশীয় আহাম্মদ আলী খাঁ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ফাঁসী হয়। তাঁহার জমিদারী তফজুল হোশেন নামক একজনকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়।

আহাম্মদ আলী খাঁ— রামপুরের নবাব। (ফয়জুল্লা খাঁ দেখ)।

আহাম্মদ আলী খোন্দকার— তাঁহার জন্ম স্থান ২৪পরগণা। ১২৮৫ সালে তাঁহার রচিত "কালুগাজী ও চম্পাবতী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আহাম্মদ আলী হাসিমী শেখ— অন্য নাম খাদিম। "মেকজান উল গরীব" নামক একখানা জীবনী কোষ তিনি লিখিয়া ফৈজাবাদের নবাব সফদর জঙ্গের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৫৪

খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬৭) এই নবাবের মৃত্যু হয়।

আহাম্মদ ইদ্‌গার— বঙ্গদেশের শেষ পাঠান নবাব দাউদ শাহের আদেশে তিনি তোয়ারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফ-গিনা" নামক ভারতবর্ষের আফগান রাজ বংশের ইতিহাস, রচনা করেন।

আহাম্মদ ইয়ার খাঁ—তিনি বিরলাস নামক তুর্কী বংশীয় ছিলেন। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম 'ইয়াক্তা।' তাঁহার পিতা আল্লা ইয়ার খাঁ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোর, তাত্তা ও মুলতানের সুবাদার ছিলেন। পরে গজনীর ফৌজদার হইয়া ছিলেন। আলমগীরের রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি ও তাঁহার পিতার ন্যায় তাত্তার সুবেদার হইয়াছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দের ২১ শে সেপ্টেম্বর (হিঃ ১১৪৭ প্রথম জুমাদা ২৩ শে) তিনি পরলোক গমন করেন।

আহাম্মদ ইয়ার খাঁ—বেরিলির নবাব। তাঁহার পিতার নাম নবাব জুলফিকর উদ্দৌলা মোহাম্মদ জুলফিকর খাঁ বাহাদুর দিলোয়ার জঙ্গ। তিনি ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে (১২৩০ হিঃ) জীবিত ছিলেন।

আহাম্মদ উল্লা মৌলবী ওরফে ডঙ্কাসা--সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি একদল বিদ্রোহী সেনার অধি-নায়কত্ব করিয়াছিলেন। ইনি পথে বাহির হইলেই একজন দামামা বা ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে চলিত, এই জন্য ইনি ডঙ্কাসা নামে অভিহিত হইতেন।

আহাম্মদ এয়াজ, মালিক খাঁজা জাহান—দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শা বিন তুঘলকের অধীনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ১৩৫২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭৫২) তাত্তা নগরে মোহাম্মদ তুঘলকের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহারই কোন পুত্রকে দিল্লীর সিংহা-সনে বসাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি তাঁহার পিতৃব্য পুত্র ফিরোজ মোহাম্মদ শাহের অধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং দিল্লী প্রবেশ কালে প্রধান প্রধান লোক কর্তৃক নিহত হন।

আহাম্মদ কবির, সৈয়দ—একজন মুসলমান সাধক। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ জালাল। তাঁহার দুই পুত্রও তাঁহারই ন্যায় সাধক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম সৈয়দ জালালউদ্দিন (অন্য নাম মুকদুম জাহানিয়ান জাহান গস্ত) ও রাজু কত্তাল। মুলতান নগরের আচ্ছা নামক স্থানে সৈয়দ আহাম্মদ কবিরের সমাধি আছে।

আহাম্মদ খাঁ, জিন্দাপীর—প্রসিদ্ধ দরবেশ খাঁ জাহান আলীর সঙ্গে তিনি খুলনা জিলায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সাধরাণতঃ

জিন্দাপীর নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ পীরের সমাধি খুলনা জিলার বাগের হাটের নিকটবর্ত্তী রণবিজয়পুরে আছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। তথায় তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদ ও খনিত দীঘি এখনও তাঁহার নাম বহন করিতেছে।

আহাম্মদ খাঁ সার সৈয়দ খাঁ বাহাদুর—১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন ১২১০ বাং) তিনি দিল্লী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মধ্য এসিয়া হইতে মুঘল রাজত্বের সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা মুঘল দরবারে উচ্চ পদে আরূঢ় ছিলেন। ১৮৩৭ সালে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সব্‌জজের পদ লাভ করেন। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি সরকার পক্ষের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে গাজীপুরে অবস্থান কালে তিনি একটী অনুবাদ সভা স্থাপন করেন এবং বহু সৎ গ্রন্থ ইংরেজী হইতে উর্দ্দু ভাষায় অনুদিত হয়। তৎপরে ইহা আলীগড়ে স্থানান্তরিত হয়। তিনি একজন ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি আলীগড়ে এঙ্গলো ওরিয়েণ্টল কলেজ স্থাপন করেন। এখন ইহা মুস্‌লেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার মন্ত্রী সভার এবং বড় লাটের মন্ত্রীসভার সভ্য ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কে, সি, এস্, আই (K. C. S. I.) উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত archological History of Delhi. একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে মার্চ্চ (১৫ই চৈত্র ১২৯১ সাল) পরলোক গমন করেন।

আহাম্মদ খাঁ বঙ্গাস—ফরাক্কাবাদের নবাব মহম্মদ খাঁ বঙ্গাসের দ্বিতীয় পুত্র। আহাম্মদ খাঁর ভাই কায়েম জঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার উজির সফদরজঙ্গ রাজ্য অধিকার করেন। আহাম্মদ খাঁ আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সফদর জঙ্গের সেনাপতি রাজা নেওয়ালরায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য অধিকার করেন। এই ঘটনা ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের ২রা আগষ্ট শুক্রবার (হিঃ ১১৬৩, ১০ই রমজান) সংঘটিত হয়। প্রায় দ্বাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (হিঃ ১১৮৫) তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দিলার হিম্মত খাঁ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে মজাঃফর জঙ্গ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহাম্মদ খাঁ মেওয়াতি—তিনি সৈয়দ

বংশের রাজত্বকালে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করেন। অবশেষে লোদী বংশীয় বহলুল লোদীর নিকট তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন।

আহাম্মদ খাঁ, সৈয়দ — তরফের ৯আনীর জমিদার আদম খাঁর পুত্র আহাম্মদ খাঁ অতিশয় বিলাসী ও অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ফত্তা ও হেদায়েত উল্লা নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ফত্তা অতিশয় মন্দ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হেদায়েত উল্লাকে বঞ্চনা করিয়া সম্পত্তির অনেক অংশ গ্রহণ করেন। তদবধি হেদায়েত উল্লার বংশধরেরা 'তরফদার' এই উপনামে খ্যাত হন।

আহাম্মদ খাতু শেক—অন্য নাম ওয়াজউদ্দিন আহাম্মদ মগরিবি। ইহার পিতার নাম একতিয়ার উদ্দিন। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শা তুঘলকের সম্পর্কিত তৎকালীন একজন সম্ভ্রান্ত লোক। পিতার মৃত্যুর পরে সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিয়া অবশেষে শেখ বাবা ইসাক মগরিবির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন। তিনি গুজরাটেই অনেক সময় যাপন করিতেন। সুলতান মজাঃফর গুজরাটী তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মোহাম্মদের রাজত্বকালে ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার (হিঃ ৮৪৯, ৮ই শওয়াল) ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। আহম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী সারাকিচে তাঁহার সমাধি আছে। নাগোরের অন্তর্গত খাতুতে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি খাতু নামে পরিচিত ছিলেন।

আহাম্মদ গাজী—একজন আওলিয়া তিনি শ্রীহট্টের তরফ পরগণার ফতেপুর গ্রামের ফতেগাজী শাহের সঙ্গে বাস করিতেন। (ফতেগাজী শাহ দেখ)

আহম্মদ চাপ মালিক—দিল্লীর খিলজি বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের অধীনে তিনি নায়েব বরবক ছিলেন। আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন।

আহাম্মদ জাফর খাঁ, সৈয়দ — তিনি বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতা সৈয়দ হাজী আহাম্মদের মধ্যম পুত্র। মহারাষ্ট্রা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যায় তিনি একজন প্রধান সহায় ছিলেন। (আহাম্মদ সৈয়দ দেখ)

আহাম্মদ নিজাম শাহ — দক্ষিণাপথের আহাম্মদনগরের প্রথম রাজা। ইনি ১৪৯০ খ্রীঃ অব্দে বাহমনী রাজবংশের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া রাজা হন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম আহাম্মদ নগর রাখেন। এই নগর অল্পদিনের মধ্যেই মিশরের কৈরো এবং আরব দেশের বাগদাদ নগর

অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১৫০৮ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার রাজ্যশাসনের দক্ষতা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বংশ নিজামশাহী রাজবংশ নামে খ্যাত।

আহাম্মদ নিজাম শাহ— ইনি নিজামশাহী রাজবংশের প্রথম রাজা। বাহমনী রাজবংশ লুপ্ত হইলে দাক্ষিণাত্যে চারিটী প্রধান মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৪৯০ খ্রীঃ অব্দে বাহমনী রাজবংশের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া আহাম্মদ শাহ নিজ নামে ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে সীনা নদীর তীরে আহম্মদনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। অচিরকাল মধ্যেই ইহা মিসরের কৈরো ও আরব দেশের বাগদাদ নগর হইতে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। আহাম্মদ নিজাম শাহ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫০৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন ক্ষমতার কথা ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আহম্মদ নগরে তাঁহার সমাধি একটী দর্শনীয় স্থান।

আহাম্মদ নিজাম শাহ বাহরি— দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহী বংশের তিনি স্থাপয়িতা। তাঁহার পিতা নিজাম উলমুলক বাহরি, সুলতান মোহাম্মদ শা বামনির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার জায়গীরের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিলেন ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দের (৮৯১ হিঃ) দোবরাজপুরের দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা নিহত হইলে তিনি পিতার উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান মোহাম্মদ শা বামনী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ১৪৯০ খ্রীঃ অব্দের ২রা মে (হিঃ ৮৯৫ ৩রা রজব) তারিখে ইউসফ আদিল শাহের পরামর্শে তিনি নিজে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খোতবা এবং মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করেন। ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯০০ তিনি আহাম্মদ নগরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং দুই বৎসরে ইহার কার্য্য শেষ হয়। তিনিও নিজামশাহী বংশের প্রথম সম্রাট। ১৫০৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১৪) তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রথম বুরহান নিজামশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিজামশাহী বংশের সম্রাট ছিলেন,—

১। আহম্মদ নিজাম শাহ (প্রথম) ১৪০৯ খ্রীঃ—১৫০৮।

২। বুরহান নিজাম শাহ (প্রথম) ১৫০৮ খ্রীঃ—১৫৫৩

৩। হুশেন নিজাম শাহ—১৫৫৩ খ্রীঃ —১৫৬৫

৪। মূর্ত্তজা নিজাম শাহ—১৫৬৫ খ্রীঃ —১৫৮৮
৫। মিরণ হোশেন নিজাম শাহ— ১৫৮৮ খ্রীঃ
৬। ইস্মাইল নিজাম শাহ—১৫৮৯ খ্রীঃ
৭। বুরহান নিজাম শাহ (দ্বিতীয়)
৮। ইব্রাহিম নিজাম শাহ—১৫৯৪ খ্রীঃ
৯। আহম্মদ নিজাম শাহ (দ্বিতীয়) (শাহ তাহিরের পুত্র) ১৫৯৪
১০। বাহাদুর নিজাম শাহ—১৫৯৫
১১। মুর্ত্তজ নিজাম শাহ (দ্বিতীয়) ১৫৯৮ খ্রীঃ

১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে এই বংশ মালিক অম্বরের শাসনাধীন হয়।

আহাম্মদ নিয়াল তিগীন — ইনি লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান লস্কর লইয়া, তিনি কাশী লুট করেন। প্রাতঃকালে পৌছিয়া মধ্যাহ্নের পরেই বিপদাশঙ্কা দেখিয়া লুটতরাজ করিয়া চলিয়া যান। কাপড়ের বাজার আতর গোলাপের বাজার ও মণিমুক্তার বাজার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আশাতিরিক্ত সোনা, রূপা, আতর ও মণিমুক্তা পাওয়া গিয়াছিল।

আহাম্মদ বিন মোহাম্মদ— তিনি "অলগাফরি কাজবিনী হাবী" গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল গফ্‌ফরের বংশধর এবং তিনি কাজি ছিলেন। তিনি 'তোয়ারিখ-ই-খোক্তসির' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা আদমের সময় হইতে ১৫২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পারস্যের সহিত মাহমুর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সময়ের এসিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই গ্রন্থে স্পেনের মুসলমান রাজাদের নামও আছে। এই গ্রন্থ পারস্যের অধিপতি শাহ তমাস্পের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থান ভ্রমণান্তে মক্কা গমনের অভিলাষে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত দেবল নগরে উপস্থিত হন। এবং এই বন্দরেই ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৫) তিনি জীবন লীলা সাঙ্গ করেন।

আহাম্মদবেগ —তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম্ (পরে শা-জাহান) এক বার স্বীয় পিতার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সৈন্য তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করে। তিনি কিছুদিন দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আহাম্মদ বেগ হঠাৎ খুরম্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে খুরম্ তেড়িয়াগড়িয়ার যুদ্ধে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে নিহত করিয়া, বাঙ্গালা অধিকার করেন। পরে ঢাকা অভিমুখে গমন

করেন। আহাম্মদ বেগ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

আহাম্মদ বেগ কাবুলী—প্রথমে তিনি সম্রাট আকবরের ভ্রাতা মোহাম্মদ হাকিমের অধীনে কাবুলে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের অধীনেও ছিলেন। কিছু সময় তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তাও ছিলেন। ১৬১৪ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

আহাম্মদ বেগ খাঁ—নুরজাহানের ভ্রাতা মোহাম্মদ সরিফের অন্যতম পুত্র বঙ্গদেশে জাহাঙ্গীরের অধীনে ছিলেন। রাজকুমার খুরম্ (পরে শা-জাহান) বিদ্রোহী হইলে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলস্বরূপ খুরম্ সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি তাত্তা, শিবিস্থান ও মুলতানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যা প্রদেশ জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহাম্মদ বেগ খাঁ মির্জ্জা — তিনি বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৬২৪ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি খুর্দ্দার রাজা নরসিংহদেবকে আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের (জাহাঙ্গীরের) বিদ্রোহী পুত্র খুরম্ দাক্ষিণাত্যের কুতবশাহী রাজ্যের ভিতর দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। আহাম্মদ বেগ পলায়নপূর্ব্বক রাজ-মহলে উপস্থিত হন। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ দেখ।

আহাম্মদ মুল্লা—তাত্তা নগরের এক-জন কাজির পুত্র। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা সিন্ধুদেশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা হানিফি সম্প্রদায়ের ফারোকী ছিলেন। কিন্তু তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। খুলাসাত-ই-আয়াত নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। তিনি (১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে) দাক্ষিণাত্য হইতে সম্রাট আকবরের রাজসভায় দিল্লীতে আগমন করেন এবং আকবরের আদেশে "তোয়ারিখ-ই-আলফি" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস সংকলন কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে আরও অনেক লোক নিযুক্ত থাকিলেও তিনিই প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে, চঙ্গিশ খাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, দুই খণ্ড সম্পন্ন হয়। তিনি লাহোরনগরে মীরজা ফুলাদ বারনাস নামক এক ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিহত হন। মোল্লা আহাম্মদের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট অংশ আসফ খাঁ জাফর বেগ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। লাহোরনগরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, কবর হইতে তাঁহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করা হইয়াছিল।

আহাম্মদ শরহিন্দি, শেখ — অন্ত

নাম মৌজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-শানী। একজন বিদ্বান্ ও জ্ঞানী দরবেশ। তাঁহার পিতার নাম আবদুল ওয়াহেদ ফরুকি এবং ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দে শরহিন্দ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সাধু খাজা বাকির শিষ্য ছিলেন। তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬২৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি দ্বিতীয় আলেফ। মুসলমানদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক হাজার বৎসর পরে একজন জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিবেন।

আহাম্মদ শাহ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম মোজাহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আবু নসর আহাম্মদ শাহ বাহাদুর। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম অধমবাই। ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিবার পর সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ হন এবং কারাগারে বন্দী হন। তাঁহারই মন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলক গাজি উদ্দিন তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে একুশ বৎসর বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। দিল্লীর কদম শরিফ মসজিদের সম্মুখে মরিয়াম মকানি নামক সমাধি মন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি বন্দী হইলে জাহন্দর শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহম্মদ শাহ, প্রথম—গুজরাটের অধিপতি। তাঁহার পিতার নাম তাতার খাঁ, পিতামহের নাম মজাঃফর শা। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি গুজরাটের দ্বিতীয় রাজা। কিন্তু (১৪১০ খ্রীঃ) পাঁচ মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শবরমতী নদীর তীরে তিনি স্বীয় নামানুসারে আহাম্মদাবাদ নামক নগর স্থাপন করেন। ইহাই পরবর্ত্তী সময়ে গুজরাটের রাজাদের রাজধানী হইয়াছিল। প্রায় তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ শাহের হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

আহাম্মদ শাহ, দ্বিতীয়—গুজরাটের রাজা। তৃতীয় মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অভাবে প্রধান মন্ত্রী ইতমদ খাঁ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে মনে আশঙ্কা করিয়া, আহাম্মদাবাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আহাম্মদ খাঁর পুত্র দ্বিতীয় আহাম্মদ শাহকেই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। তদনুসারে তিনি ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাত বৎসর রাজত্ব

করিবার পর একদিন তাঁহাকে নিহত অবস্থায় রাজপ্রসাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা ১৫৬১ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়। তৎপরে তৃতীয় মজাঃফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহাম্মদ শাহ অথবা আহাম্মদ উল্লা শাহ—তিনি বিখ্যাত মৌলবী ছিলেন। শাজানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের তিনি একজন নায়ক ছিলেন। দীর্ঘকাল আগ্রাতে অবস্থান করিয়া, নানা প্রকারে লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌনগরেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে শাজানপুরের নিকটবর্ত্তী পৈন নামক স্থানে তিনি নিহত হইলে, তথাকার রাজা তাঁহার মৃতদেহ লক্ষ্ণৌএর কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

আহাম্মদ শাহ— বাঙ্গালা দেশের পাঠান নবাব। তিনি ১৪৩০ খ্রী অব্দে তাঁহার পিতা জালাল উদ্দিনের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজা গণেশের পৌত্র এবং অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অবশেষে শাদি খাঁ ও নাশের খাঁ নামক তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারীর হস্তে তিনি নিহত হন। প্রায় ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দে, তিনি নিহত হইলে, সামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহের বংশীয় প্রথম নাজির উদ্দিন আহাম্মদ সিংহাসন আরোহণ করেন।

আহাম্মদ শাহ আবদালী — সাধারণতঃ তাঁহাকে শাহ দুরানা বলা হইত। হিরাট নগরের নিকটবর্ত্তী আবদল নামক স্থানের একজন আফগান সর্দ্দারের পুত্র। বাল্যকালেই তিনি নাদির শাহ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। নাদির শাহ প্রথমে তাঁহাকে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনি সৈনিক বিভাগের উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে নাদির শাহ নিহত হইলে, তিনি উজ্‌বেগ সৈন্যদলের সাহায্যে পারশ্য সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি কান্দাহার নগরে উপনীত হইয়া, তাহা অধিকার করেন। এবং কাবুল ও সিন্ধুদেশ হইতে পারস্যের অভিমুখে প্রেরিত বিপুল ধনরাশী অধিকার করেন। এই বিপুল ধনরাশির অধিপতি হইয়া তিনি চারিদিকের জাতি সমূহের ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিলেন। অচিরকাল মধ্যেই কাবুল, পেশোয়ার ও লাহোর তাঁহার পদানত হইল। বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়া তিনি রাজধানী দিল্লী আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন।

তদনুসারে ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে তিনি লাহোর হইতে বিপুল বাহিনী সঙ্গে করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, তাঁহার একমাত্র পুত্র আহাম্মদকে উজির কমরউদ্দিন খাঁ, অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সফদর জঙ্গ এবং আরও কতিপয় অধিনায়কের সমভিব্যাহারে এই প্রচণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আহাম্মদ শাহ আবদালী শরহিন্দ নগরের এই যুদ্ধে প্রচুর ধন লাভ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার দিল্লী ও আগ্রার উপকণ্ঠে সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মথুরা নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। রোহিলা সর্দ্দার নজিব উদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং আরও কতিপয় সর্দ্দার, শাহ আবদালীকে ভারতে আগমন করিয়া দিল্লী অধিকার করিতে আহ্বান করেন। এই সময় তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা লাহোর অধিকার করাতে শাহ আবদালী বিশেষ মনক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি সেই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে প্রসিদ্ধ পাণিপথের যুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের দর্পচূর্ণ করেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে শাহ আলমকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন এবং সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতিকে তাঁহার অনুগত থাকিতে আদেশ করেন। ষড়বিংশবর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র তৈমুর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহাম্মদ শাহ আলী বামনি প্রথম — বামনিবংশের সুলতান দাউদ শাহের পুত্র। ১৪২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা সুলতান ফিরোজ শাহের পরিত্যক্ত সিংহাসনে তিনি আরোহণ করেন। ১৪৩২ খ্রীঃ অব্দে তিনি আহাম্মদাবাদ বিদর নগরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহারই নিকট প্রাচীন বিদর্ভ নগর অবস্থিত ছিল। দ্বাদশবর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া ১৪৩৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সুলতান আলাউদ্দিনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি আহাম্মদাবাদ বিজয়নগরেই সমাহিত হন।

আহাম্মদ শাহ বামনি সুলতান, দ্বিতীয়—তাঁহার পিতা সুলতান মামুদ দ্বিতীয় মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে, (১৫১৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে)

তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আমির বারিদ, নিকট বর্ত্তী অন্যান্য রাজাদিগের ভয়ে নিজে সিংহাসনে আরোহণ না করিয়া, তাঁহার পুত্র আহাম্মদ শাহকেই সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু হতভাগ্য আহাম্মদ শাহের কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। কেবল রাজপ্রাসাদটি তাঁহার থাকিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রতি দিনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সামান্য অর্থ দেওয়া হইত। অর্থাভাবে তিনি রাজ মুকুট ভগ্ন করিয়া ১৬ লক্ষ টাকায় তাহার মণি মুক্তা বিক্রয় করেন। সিংহাসন আরোহণের দুই বৎসর পরে ১৫২১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, মন্ত্রী আমির বারিদ সুলতান তৃতীয় আলাউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। দুই বৎসর পর তাঁহাকে বন্দী করিয়া মোহাম্মদ শাহের অন্য পুত্র অলি উল্লা শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিন বৎসর পরে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে নিহত করিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে বিবাহ করেন এবং তৎপদে দ্বিতীয় আহাম্মদ শাহের পুত্র কলিম উল্লাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন, এমনকি রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। অবশেষে তাঁহার প্রতি আমির বারিদ আরও কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলে, তিনি পলায়ন করিয়া বিজাপুরের ইস্মাইল আদিল শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহা হইতেই এই বংশ শেষ হয়।

আহাম্মদ শেখ — সাধারণতঃ তিনি মোল্লাজীবন নামেই পরিচিত। তিনি সম্রাট আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন। "তপসির-ই-আহাম্মদী" নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহাম্মদ সাবীর—তিনি প্রসিদ্ধ সুফী পীর ফরিদ অল্‌দিন শকর গঞ্জের বংশধর কবি শেখ সরফ উদ্দিনের শিষ্য ছিলেন। তিনিই সাবীর চিস্তি সম্প্রদায়ের স্থাপন কর্ত্তা। ১২৯১ খ্রীঃ অব্দে রুড়কীর নিকটে এই সাধক দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্ম্মধারায় হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের প্রয়াস ছিল।

আহাম্মদ, সৈয়দ—তাঁহার জন্মস্থান বেরেলি জিলায়। তিনি প্রথমে আমির খাঁর অধীনে একজন অশ্বারোহী সর্দ্দার ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য হন। তৎপরে তিনি একজন ধর্ম্ম সংস্কারক হন। মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রকার পবিত্রতা রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ ভাবে যত্নবান হন। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে বোম্বাই, মক্কা, প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কয়েক-খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ

অব্দে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং তাহাদের সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন।

আহাম্মদ, সৈয়দ— বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহার তিন কন্যাকে হাজী আহাম্মদের তিন পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। সৈয়দ আহাম্মদ দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে সৌলত জঙ্গ উপাধি দিয়া পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত প্রদেশের শাসন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নোয়াজিস্ মোহাম্মদ পরলোক গমন করেন। ইহার অল্প দিন পরেই সৈয়দ আহাম্মদও ভ্রাতার অনুগমন করেন। নোয়াজিস্ মোহাম্মদ অপুত্রক ছিলেন, সেজন্য সৈয়দ আহাম্মদের পুত্র পূর্ণিয়ার শাসন-কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আহাম্মদ, সৈয়দ—সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের ভ্রাতা। তিনি সম্রাট আকবরের অধীনে গুজরাটে কর্ম্ম করিতেন। আকবর যে সমস্ত চিতাবাঘ শিকার করিতেন, তিনি তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার পুত্র সৈয়দ জামাল উদ্দিন চিতোর নগরে নিহত হন।

আহাম্মদ, হাজী— তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলীবর্দ্দী খাঁর (১৭৪০—১৭৫৬ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁহারই তিন পুত্রের সহিত আলীবর্দ্দী খাঁর তিন কন্যার বিবাহ হয়। তৃতীয় পুত্র জৈন উদ্দিন, আলী বর্দ্দী খাঁর কণিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁহাদেরই পুত্র প্রসিদ্ধ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা। হাজী আহাম্মদ পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব সরফরাজ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন (১৭৩৯—৪০ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার শত্রু হইয়াছিলেন। হাজী আহাম্মদের বুদ্ধি কৌশলেই আলী বর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। স্বীয় ভ্রাতাকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, ভ্রাতা রাজ পদ প্রাপ্ত হইলে তিনিও উচ্চপদ লাভ করিবেন। কিন্তু তাহা না পাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং অবশিষ্ট জীবন নীরবে যাপন করিবার জন্য পাটনায় গমন করেন। আলী বর্দ্দী খাঁর বিতাড়িত ও বিদ্রোহী সেনা-পতি সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ অর্থ লাভ করিবার জন্য অতিশয় যাতনা দিয়া তাঁহাকে বধ করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ দেখ।

ই

ইউনিস, সৈয়দ—তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্ত্তা, মিনা খাঁর অন্যতম পুত্র। তিনি ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রিঞ্জিয়া সুশিক্ষিত ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহাদের সাধু ব্যবহারে তাঁহাদের পিতৃব্য পুত্র আদমের সহিত অচিরে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। ইউনিস অপুত্রক গতায়ু হন।

ইউসুফ আদিল শাহ—তিনি বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের স্থাপয়িতা। ইহার জীবন কাহিনী অতি বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি তুরস্কের সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে হইয়াছিল। ১৪৫০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মোহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের এক কুরীতি ছিল যে, একটী মাত্র পুত্র জীবিত রাখিয়া অবশিষ্ট পুত্রদেরে হত্যা করা হইত। এই প্রথানুসারে সুলতান মোহাম্মদ রাজা হইয়াই অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে নিধন সাধনের আদেশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে ইউসুফ অন্যতম ছিলেন। ইউসুফের মাতা সন্তানের প্রাণ রক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী বালককে অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া, তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে, সেই ক্রীত বালককেই স্বীয় পুত্র পরিচয়ে, সুলতান মোহাম্মদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এবং স্বীয় পুত্রকে দেশে রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া, পারস্য দেশে এক বিশ্বস্ত বণিকের সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। তথায় ইউসুফ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তিনি তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৪৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ দাভোল (রত্নগিরি) নগরে অবতরণ করিলেন। তথা হইতে বাহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদর নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজ মন্ত্রী মোহাম্মদ গাওয়ানের সহায়তায় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে দ্বিতীয় মোহাম্মদ শাহ বাহমনীর কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সুলতান মামুদ বাহমনী, ইউসুফ আদিল শাহের জীবন নাশের চেষ্টা করেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া তদীয় কর্ম্মস্থল বিজাপুরে পরিজন ও অনুচরবর্গের সহিত চলিয়া আসেন এবং অবিলম্বে ১৪৮৯

খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৯৫) স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজ নামে খুতবা পাঠ করেন। একুশ বৎসর অতি সুনামের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া পঞ্চ সপ্ততি বৎসর বয়সে, ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১৬) তিনি পরলোক বাসী হইলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিল সাহী রাজাদের নাম :—

১। ইউসুফ আদিল শাহ—১৪৮৯-১৫১০ খ্রীঃ।

২। ইস্‌মাইল আদিল শাহ (ইউসুফ আদিল শাহের পুত্র)—১৫১০-১৫৩৪ খ্রীঃ।

৩। মল্লু আদিল শাহ (ইস্‌মাইলের পুত্র)—১৫৩৪ খ্রীঃ।

৪। ইব্রাহিম আদিল শাহ ১ম (ইস্মাইলের পুত্র) ১৫৩৫—৫৭ খ্রীঃ।

৫। আলী আদিল শাহ, ১ম (ইব্রাহিমের পুত্র) ১৫৫৭—১৫৮০ খ্রীঃ।

৬। ইব্রাহিম আদিল শাহ, ২য় (আলী আদিলের পৌত্র) ১৫৮০-১৬২৬ খ্রীঃ

৭। মোহাম্মদ আদিল শাহ, ২য় (ইব্রাহিমের পুত্র) ১৬২৬-১৬৫৬ খ্রীঃ

৮। আলী আদিল শাহ, ২য় (মোহাম্মদ আদিল শাহের পুত্র) ১৬৫৬-১৬৭২

৯। সেকেন্দর আদিল শাহ (২য় আলী আদিল শাহের পুত্র)১৬৭২-১৬৮৬ খ্রীঃ।

তিনিই এই বংশের শেষ নৃপতি।

ইউসুফ আলী খাঁ (১) — তিনি রামপুরের নবাব। সিপাহী বিদ্রোহের সময়, তিনি ইংরেজ পক্ষে ছিলেন বলিয়া, ভারতবর্ষের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং (Lord Canning) তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের ২১ শে এপ্রিল (হিঃ ১২৮২, ২৪ শে জেলকদ) তিনি পরলোক গমন করেন। (২) একজন ঐতিহাসিক পণ্ডিত। তিনি 'তোয়ারিখ-ই-ইউসুফি' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইউসুফ খাঁ (১)—তিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা মীর খাঁর পুত্র। তিনি খাজা ওসমান খাঁ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন। (২) দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের সমকালবর্ত্তী, সিন্ধুদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। তিনি তাত্তানগরে একটি ইদ্‌গা ও একটি অতি সুন্দর ভজনালয় নির্ম্মাণ করান। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ধর্ম্ম প্রাণ মুসলমানেরা বৎসরে দুইবার এই স্থানে সম্মিলিত হন।

ইউসুফ খাঁ ময়না—তিনি বিজাপুরপতি সেকেন্দর আদিল শাহের (১৬৭২ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

ইউসুফ খাঁ মীরজা—দিল্লীর সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) তিনি আড়াই হাজার সৈন্যের নায়ক ছিলেন এবং পরে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। অবশেষে শেখ

আবুল ফজলের অধীনে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তথায়ই তিনি পরলোক গমন করেন।

ইউসুফ গুল—খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দিতে সৌরাষ্ট্রের সন্নিহিত বন্দর দ্বীপে, ইউসুফ গুল নামে এক নরপতি ছিলেন। এই ইউসুফ গুলের কন্যাকে বাপ্পা রাও বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বাপ্পা রাওএর অপরাজিত নামে এক পুত্র জন্মে।

ইউসুফ মোহাম্মদ খাঁ (১)—সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) ধাত্রী ভাই। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্য পানে ১৫৬৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৩) তাঁহার মৃত্যু হয়। (২) তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ) রাজত্ব কালের একখানা ইতিহাস লিখিয়া ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'তোয়ারিখ মোহাম্মদ শাহী'।

ইউসুফ শাহ — ১৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৮৭) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বারবক শাহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউসুফ শাহ রাজপদ লাভ করেন। তিনি রাজা হইয়াই ন্যায়বিচারের জন্য পরোয়ানা জারী করিলেন। তিনি নিজে অতিশয় আইনজ্ঞ ও বিদ্বান্ ছিলেন। সুতরাং অনেক জটিল বিষয় কাজীরা বিচার করিতে অসমর্থ হইলেও, তিনি সমর্থ হইতেন। ১৪৮২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৯৫) তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র ফতে শা রাজা হন।

ইউসুফ শেখ (১)—মুলতানের প্রথম স্বাধীন মুসলমান সুলতান। এই প্রদেশে ৭০০ খ্রীঃ অব্দেই মুসলমানেরা প্রথম পদার্পন করেন। কিন্তু অত্যল্প-কাল মধ্যেই তাঁহারা বিতাড়িত হন। পরে মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ কাল হইতে ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৪৭) অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মুলতানও ইউসুফ শার অধীনে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। ইহার দুই বৎসর পরেই ইউসুফের শ্বশুর রায় শেহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন এবং নিজে কুতব উদ্দিন মামুদ লাঙ্গা এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মুলতানের সুলতান হইলেন।

মুলতানের স্বাধীন নরপতি।

১। ইউসুফ, শেখ—১৪৪৩-১৪৪৫ খ্রীঃ
২। রায় শেহারা—(কুতব উদ্দিন মামুদ লাঙ্গা) ১৪৪৫-১৫০০ খ্রীঃ
৩। হোশেন লাঙ্গা ১ম—১৫০১ খ্রীঃ
৪। মামুদ লাঙ্গা—১৫০২-১৫২৪ খ্রীঃ
৫। হোশেন লাঙ্গা ২য়—১৫২৪ খ্রীঃ

(২) তিনি গুজরাটের অধিবাসী। 'তজকিরাত-উল-আতকিয়া' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

ইউসুফ হাজী — এক প্রসিদ্ধ পীর তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির অন্যতম অনুসঙ্গী ছিলেন। শাহ জালালের দরগার প্রাচীরের বহিভার্গে তাঁহার সমাধি আছে। দরগার বর্ত্তমান সরকুম বংশীয়-গণ তাঁহারই বংশধর।

ইকবাল উদ্দৌলা মোহসিন আলী খাঁ— তিনি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সামস্ উদ্দৌলা আলী খাঁর পুত্র ও সাদত আলী খাঁর পৌত্র। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বীয় নষ্ট সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হন। পরে তুরস্কের অন্তর্গত আরব দেশে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

ইকবাল খাঁ—দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র জাফর খাঁ পিতার জীবিত কালেই পরলোক গমন করেন। এই জাফর খাঁর অন্যতম পুত্র ইকবাল খাঁ। ১৪০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র মোহাম্মদকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪০৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮০২) তিনি মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

ইক্রার খাঁ—তিনি বাঙ্গালার নবাব বারবক শাহের রাজত্ব কালে, দিনাজ-পুরের অন্তর্গত দেবকূটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা হন। সেই সময়ে ১৪৫৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৬০) সপ্ত গ্রামে তিনি একটী ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন।

ইখ্তিমাস খাঁ—তিনি ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর অধীন আড়াই হাজারী সেনাপতি ছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জানুয়ারী, বুজুর্গ উমেদ খাঁ ইখতিমাস খাঁ প্রভৃতি সেনাসহ চট্টগ্রাম দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

ইখ্তিয়ার উদ্দিন—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ইখ্তিয়ার উদ্দিন তুঘরিল খাঁ মুল্ক উজবেগ। তিনি প্রথমে দিল্লীর সম্রাট ইলতিমাসের তুর্কি জাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমশ সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদে আরূঢ় হন। ইলতিমাসের মৃত্যুর পরে ১২৩৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র রুকণ উদ্দিন সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার মাতার দুর্ব্যবহারে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া সুলতান রিজিয়াকে সিংহাসন প্রদান করেন। রুকণ উদ্দিন কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পরে আর একটী বিদ্রোহে ইখ্তিয়ার উদ্দিনও বন্দী হন। পরে সুলতান মসাউদ সিংহাসন লাভ করিলে, তিনি মুক্ত হন। তাঁহারই রাজত্ব কালে, তিনি ক্রমে ক্রমে তিনবার হিন্দ, লাহোর, কণৌজ ও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১২৫৩ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সৈয়ফ উদ্দিনের মৃত্যুর পরে, তিনি সেই

পদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমেই উড়িষ্যা প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দুই যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও তৃতীয় যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। উড়িয়ারা তাঁহার হস্তী কাড়িয়া লইল। তৎপরে তিনি শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। এই জয় লাভে উল্লসিত হইয়া, পর বৎসর তিনি আসাম প্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রথম প্রথম তাঁহার ভাগ্যে জয় লাভ ঘটিলেও, বর্ষাসমাগমে তিনি বড়ই বিপন্ন হইলেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া ১২৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি জীবন লীলা সংবরণ করিলেন।

ইখ্‌তিয়ার খাঁ—তাঁহার পূর্ব্ব নাম রহমত ভুঁইয়া এবং পিতার নাম মনসুর ভুঁইয়া। বঙ্গের নবাব হোশেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫২৯ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত হিজলী নামক স্থানে এই মনসুর ভুঁইয়া বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জমাল খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র রহমত খাঁ ছিলেন জমাল খাঁ বিষয় রক্ষা করিতেন এবং রহমত খাঁ কুস্তি খেলা ও শিকার লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। জমাল বিষয় লোভে মত্ত হইয়া, ভ্রাতার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক, বিষয়ের একাধিপত্য লাভে প্রয়াসী হইলেন। জমালের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী স্বামীর এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া দেবর রহমতকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। রহমত পলায়নপূর্ব্বক গুমগড় গরগণার অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্ত্তী ধীবর পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু বিনাশ করিয়া ধীবর পল্লীকে হস্তগত করিলেন। ধীবরেরা তাঁহার বিশেষ অনুগত হইল। তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক লইয়া পাঁচ শত সৈন্যের একটী দল গঠন করিলেন। সমুদ্রগামী চাঁদ খাঁ নামক বণিকের নিকট কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অচিরে নিকবর্ত্তী স্থান জঙ্গল পরিশূন্য ও দুর্গদ্বারা সজ্জিত হইল। বাহির মুটার জমিদারকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নব বিবাহিতা পুত্র বধূকে হরণপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমাল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রহমত স্বীয় পিতৃব্য কন্যা নাজিরা খাতুনকে বিবাহ করিলেন। ভীম সেন মহাপাত্র, দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডা, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে দিল্লীর সম্রাটের উড়িষ্যার সুবেদার বাকর খাঁ আনুগত্য স্বীকার করিয়া, বালেশ্বরের জমিদারী ও ইখ্‌তিয়ার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দাউদ খাঁ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইখ্‌তিয়ার খাঁর মৃত্যুর পর তিনিই হিজলীর অধিপতি হন। তিনি বিবাহ

ব্যতীত বহু স্ত্রী নিকাহ্ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে, তাজ খাঁ মসনদ-ই-আল্লা ও সেকেন্দর খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যান্য বহু পত্নীর গর্ভে রসুল খাঁ, দরিয়া খাঁ প্রভৃতি কুড়িজন পুত্র জন্মে।

ইখ্‌লাস খাঁ, ইখ্‌লাস কেশ—লাহোর নগরের কিষণ চাঁদ ক্ষেত্রির উপাধি। তিনি দিল্লীর অচল দাস ক্ষেত্রির পুত্র। তিনি ফার্শী ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে উক্ত উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট ফরোকশেয়ারের রাজত্বকালে তিনি সপ্ত হাজারী সেনা-পতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৩৬) তিনি কবিদের জীবন চরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থে বর্ণ মালানুসারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হইতে মোহাম্মদ শাহের সময় পর্য্যন্ত (১৬০৫-১৭৪৮ খ্রীঃ) সমুদয় কবিদের নাম আছে। তিনি 'পাতশা-নামা' নামক একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থেরও রচয়িতা।

ইছাই ঘোষ—বীরভূমের অন্তর্গত শ্যামরূপার গড়ের অধীশ্বর কর্ণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া ইছাই ঘোষ এই গড় অধিকার করেন। সুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুদ্ধারূপা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী-কালে ইছাইকে নিহত করিয়া কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেন গড়ের অধীশ্বর হন। অজয় নদের দক্ষিণ তটে ইছাই ঘোষের সুপ্রসিদ্ধ দেউল বর্ত্তমান। ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। ইছাই শৈশব হইতেই ভবানীর সেবক ছিলেন। এক অবধূতের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া, তিনি উৎকট শক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক অত্যাচারী মহামদা মন্ত্রী ছিলেন। রাজকর আদায়ে অসমর্থ সোম ঘোষকে কারারুদ্ধ করিলে, দৈবাৎ রাজার শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া কারামুক্ত হন। রাজা গোপ জাতীয় সোম ঘোষের পরে এতদূর মর্য্যাদা বাড়াইলেন যে, রাজা 'বিশ্বাসে গুবাক পান খান তার হাতে'। রাজার আদেশে সোম ঘোষ পুত্র ইছাই ঘোষকে লইয়া বীরভূমের অন্তর্গত ত্রিষষ্টি গড়ে আগমন করেন। ত্রিষষ্টির অধীশ্বর কর্ণ সেন, সোম ঘোষকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। পিতার উপর মন্ত্রী মহামদার অত্যাচার, পিতার কারা ক্লেশ ভোগ প্রভৃতি কারণে শৈশব হইতেই ইছাই ঘোষের গৌড় শাসনের প্রতিবিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। চোয়ার, খয়রা, লোয়ার প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর লোক সমবায়ে গঠিত একদল সৈন্য লইয়া

বিদ্রোহ ঘোষনা করিলেন এবং কর্ণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া গড়ের অধীশ্বর হইলেন। এই কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেন কর্ত্তৃক ইছাই ঘোষ পরে নিহত হন।

ইজ্জা দেবী—মগধের নরপতি দেব গুপ্তের পুত্রের নাম বিষ্ণুগুপ্ত ছিল। বিষ্ণু গুপ্তের পত্নীর নাম ইজ্জা দেবী। ইজ্জা দেবীর গর্ভে জীবিত গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

ইডেন, এসলি সার, (Sir Ashley Eden)—তিনি বাথ এবং ওয়েলস নামক স্থানের ধর্ম্মযাজক লর্ড অক্ল্যাণ্ডের (Lord Auckland) তৃতীয় পুত্র এবং ভারতের বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই নবেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে সাওতাল বিদ্রোহে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৬২-১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে শিকিমের রাজার সহিত তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভুটানের রাজ দূত হইয়া যান। কিন্তু ভুটানের রাজা তাঁহাকে কতকগুলি অন্যায় সন্ধি সর্ত্তে সাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। তাহার ফলে পর বৎসরই ভুটান অভিযানের সূচনা হয়। তিনি ১৮৭১-৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ম্মার চিফ কমিশনার ছিলেন। ১৮৭৭—১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গদেশের কার্য্যেই তাঁহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ন্যায়দর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ৮ই জুলাই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতকাদ খাঁ (১) — ইতমদউদ্দৌলার পুত্র। সম্রাট শা-জাহানের উজির আসফ খাঁর ভ্রাতা। সম্রাট শা-জাহান তাঁহাকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। সেই কার্য্যে তিনি কিছুকাল ছিলেন। ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৬০) আগ্রা নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। (২) দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের উজির আসফ খাঁর পুত্র মীরজা বাহমান ইয়ারের উপাধি। তিনি ইতমদউদ্দৌলার পৌত্র। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৬১) সম্রাট শা-জাহান তাঁহাকে ইতকাদ খাঁ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক চারি হাজার সৈন্যের নায়কত্বে স্থাপিত করেন। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজীব তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করেন। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৭) তিনি তাঁহার ভ্রাতা ঢাকা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গমন করেন এবং তথায় ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৮২) তিনি পরলোক গমন করেন।

ইতমদউদ্দৌলা— বিখ্যাত নূরজাহান সাম্রাজ্ঞীর পিতা খাজা ঘিয়াস উদ্দিনের উপাধি। তিনি জাতিতে তুর্ক ছিলেন এবং সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, তিনি ইতমদ-উদ্দৌলা এবং তাঁহার দুই পুত্র আসফ খাঁ ও ইতকাদ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩০) সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাশ্মীর গমনকালে তিনি পথে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত দেহ আগ্রার যমুনার অপর পারে সমাহিত করা হয়। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আদেশে তাঁহার উপর একটী উৎকৃষ্ট সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা একটী দর্শনযোগ্য মন্দির।

ইতমদ খাঁ—শেখ আবদুল কবিরের উপাধি। সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ের একজন আমীর। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৭) তিনি একজন কলন্দর কর্ত্তৃক নিহত হন।

ইৎচিং — তিনি একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক। বিখ্যাত চীন দেশীয় পর্য্যটক হিউএন সঙের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পঁচিশ বৎসর পরে ৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করেন। তিনি বিশ বৎসর কাল এদেশে নালন্দা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়া তৎকালীন সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং ৭১৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

ইত্তিয়—একজন বৌদ্ধ স্থবির। তিনি মহারাজ অশোকের আদেশে তাঁহার পুত্র মহীন্দ্রের সহিত সিংহল দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

ইনমোফু—তিনি একজন শক নরপতি। খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে তিনি কিপিশ (কপিশা) দেশ অধিকার করেন।

ইনায়াৎ উল্লা খাঁ—তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের মুন্সী ছিলেন। 'আহকমই-আলমগিরী' নামে তাঁহার একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ আছে।

ইন্তিজম উদ্দৌলা খাঁ খানখানান— নবাব কমর উদ্দিন খাঁ উজিরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬১) তিনি দিল্লীর সম্রাট আহাম্মদ শাহ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বকৃসীর পদে নিযুক্ত হন। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬৫) নবাব সবদর জঙ্গের কার্য্য ত্যাগের পর, তিনি মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে নবেম্বর (হিঃ ১১৭৩, ২য় রবির ৫) তারিখে তিনি ইমাদ-উল-মুল্‌ক গাজীউদ্দিন খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার তিন দিন পরেই সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরও নিহত হন।

ইন্দিরা দেবী—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় বিখ্যাত নরপতি অনন্তবর্ম্মা চোড় গঙ্গের অন্যতমা মহিষী ও রাঘবের জননী ছিলেন। অনন্তবর্ম্মা চোড় গঙ্গ দেখ।

ইন্দুভট্ট—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তিনি 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ' গ্রন্থের এক টীকারচনা করিয়াছেন।

ইন্দুলেখা—একজন স্ত্রী কবি। 'সুভাষিতাবলী' ও 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' নামক সংস্কৃত কাব্যে তাঁহার কবিতার উল্লেখ আছে। তাঁহার সময় নিশ্চিত-রূপে এখনও নির্ণীত হয় নাই। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

ইন্দ্র—প্রাচীনকালের একজন বিখ্যাত ব্যাকরণ কর্ত্তা। তাঁহার রচিত ব্যাকরণ 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে খ্যাত। তিনি পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বুদ্ধ গ্রন্থ অবদান শতকে উল্লেখ আছে যে, সারিপুত্র ঐন্দ্র ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বেত্তা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিনী ও কুমারের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় 'আত্রেয়সংহিতা' রচনা করেন। তৎপরে সেই সংহিতা স্বীয় শিষ্য ভেল, জাতুকর্ণ প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। আত্রেয় দেখ।

ইন্দ্র—তিনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় গোবিন্দের পৌত্র ও কর্কের পুত্র ছিলেন। ইন্দ্র চালুক্য বংশীয় এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে দণ্ডীদুর্গ নামে এক পুত্র জন্মে।

ইন্দ্রকীর্ত্তি প্রথম—তাঁহার অন্য নাম অচঙ্গফনাই বা উত্তুঙ্গ ফণী। তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি সূর্য্যরায়ের পুত্র এবং ৯৩ তম নরপতি ছিলেন।

ইন্দ্রকীর্ত্তি দ্বিতীয়—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি নরেন্দ্র বর্ম্মার পুত্র। তিনি ত্রিপুর হইতে ৬৩ তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধীমান। অন্য নাম পাইমা রাজ।

ইন্দ্রগমী—তিনি একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি কলাপ ব্যাকরণের রচয়িতা সর্ব্ববর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তদ-রচিত ব্যাকরণ নেপালে নিবাসী বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইত বলিয়া কথিত হয়।

ইন্দ্রগুপ্ত—বঙ্গের অধিপতি দেবপালের রাজত্ব কালে নগরহার নগরের (বর্ত্তমান জালালাবাদ) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব মগধের অন্তর্গত যশোধর্ম্মপুরে দুইটী চৈত্য ও একটী বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রচন্দ্র—(১) জলন্ধরের (ত্রিগর্ত্তের অন্তর্গত কাঙ্গারাকুট) রাজবংশীয় অন্যতম রাজা। তিনি ১০৪০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সূর্য্য-মতী নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যাকে কাশ্মীরপতি (অনন্ত দেব—১০২৮—

১০৮১ খ্রীঃ) এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা আশা-মতীকে অনন্তরাজের সেনাপতি রুদ্রপাল বিবাহ করেন।

ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ রাজা—তিনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বংশধর ও পাইক পাড়ার জমিদার ছিলেন। তিনি রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের পুত্র। তিনি অল্প বয়সেই সাধুতা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি উদার-চেতা ও সজ্জন বলিয়া লোকপ্রিয় ছিলেন। যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এখন ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধী মত প্রচারে অগ্রণী, সেই ষ্টেটসম্যান পত্রিকার (States man) স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক স্বর্গীয় রবার্ট নাইট (Robert Knight) সাহেব একবার তাঁহার পত্রিকায় বর্দ্ধমান রাজের বিরুদ্ধে লিখিয়া মানহানীর দায়ে বিপন্ন হন। সেই সময়ে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। এক সময়ে ওরিয়েন্টেল বীমা কোম্পানীর অবস্থা অতি শোচনায় হইয়া দাঁড়ায় সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া রক্ষা করেন। এই সদাশয় রাজা দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে মুক্ত হস্ত ছিলেন। কথিত আছে তিনি বিড়ালের বিবাহ দিয়া তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মদ্য পানে আসক্তি ছিল। কোনও সময়ে বৃন্দাবনের কোনও সাধু বৈষ্ণবের প্রভাবাধীন হন। এক সময়ে সেই সাধু তাঁহার নিকট প্রার্থী ভাবে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন। তখন সাধু বৈষ্ণব তাঁহাকে মদ্যপান হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি সেইদিন হইতেই মদ্য-পানে বিরত হন। ইহা মনের কম বলের পরিচায়ক নহে। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের জুবিলী উৎসবে বড়লাট লর্ড লিটন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হন। বড়লাট তাঁহার সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এ কটী দরবার মেডেল উপহার দেন।

তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথমা পত্নী সরস্বতী নাম্নী একটী কন্যা প্রসব করিয়া লোকান্তরিত হন। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত পাঁচ থুপী গ্রাম নিবাসী শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই পুত্র সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ। রাজা ইন্দ্রচন্দ্র প্রথমা পত্নীর লোকান্তর গমনের পর রশোড়া নিবাসী ভাগল পুরের ডাক্তার লাডলী মোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে এই আদর্শ রাজা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাণী

মৃণালিনী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে পুষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও নানা প্রকার সৎকার্য্য দ্বারা বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ইন্দ্রচাঁদ জগৎ শেট – তিনি মুরশিদাবাদের জগৎ শেট হরক চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জগৎশেট কাহারও নাম নহে উপাধি মাত্র। এই শেট বংশের আদি নিবাস রাজপুতানর অন্তর্গত যোধপুর প্রদেশের নাগর গ্রামে ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বে শ্বেতাম্বরী জৈন ছিলেন পরে বৈষ্ণব হইয়াছেন। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সহিত তাঁহাদেরই সংস্রব ছিল। বাণিজ্য বিষয়ে তাঁহারা তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের মত অনুসারেই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। দেশের প্রধান প্রধান স্থানে তাঁহাদের গদি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ব্যাঙ্কের ন্যায় কাজ তাঁহাদের দ্বারাই সেই সময়ে নির্ব্বাহ হইত। জমিদার, মহাজন, রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, নবাব, পাতশা সকলেই অর্থের জন্য তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সেই জন্য দেশের রাজনীতির মূলেও তাঁহাদের প্রভাব কম ছিল না। ইন্দ্রচাঁদ ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট হইতে জগৎ শেট উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জগৎ শেট উপাধি ইন্দ্রচাঁদের পর আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র গোগিন্দচাঁদ, শেটের গদি প্রাপ্ত হন। এই অপরিমিত ব্যয়ী গোবিন্দ চাঁদ অত্যল্প কাল মধ্যেই হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া, ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে মাসিক ১২শ শত মুদ্রা ব্রিটিশ সরকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইন্দ্রজাল—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার গ্রন্থ হইতে মোমহন বাঘর স্বীয় 'মোমহন বিলাস' গ্রন্থে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎ—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —'ইন্দ্রজিৎ কেরলী'। (২) কাশ্মীরপতি তৃতীয় গোনর্দ্দের পুত্র বিভীষণ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। (১০৯৪-১১২৯ খ্রীঃ)। তৎপরে তাঁহার পুত্র রাবণ বিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

ইন্দ্রদত্ত — (১) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'রত্নমালা দধীচি'। (২) অনেকের ধারণা হিন্দুরা ইতিহাস লিখিয়া রাখেন নাই, তাহা সত্য নহে। অনেকে অনেক ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যাইতেছে না। ক্ষত্রিয় জাতীয় ইন্দ্রদত্ত বৃদ্ধপুরাণ নামে একখানি গ্রন্থে বাংলার সেন বংশীয় প্রথম কয়েকজন রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা তারা

নাথের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বুদ্ধ পুরাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

ইন্দ্রদমন—আসাম প্রদেশের রাঙ্গা-মাটি নামক স্থানে ইন্দ্রদমন রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে আহম নরপতি চক্রধ্বজ কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রদিন্ন — তিনি জৈনাচার্য্য সুস্থিত-গিরির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য কালিকাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদিন্নের শিষ্য দিন্নসুরী, দিন্নসুরীর শিষ্য সিংহ সুরী এবং সিংহসুরীর শিষ্য বজ্রস্বামী ছিলেন।

ইন্দ্র দেবী—কাশ্মীরপতি মেঘ বাহনের অন্যতমা পত্নী। তিনি নিজ নামে ইন্দ্রদেবী বিহার নামে একটী বিহার স্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

ইন্দ্রনন্দী—নেমীচন্দ্র নামক দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার ও অন্যতম আচার্য্য।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান জিলার গঙ্গাটিকুরি গ্রাম নিবাসী। তাঁহার পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ১৭৬১ শকের (১৮৪৯ খ্রীঃ) ২রা জৈষ্ঠ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাণ্ডু গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ক্যাথিড্রেল কলেজ হইতে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুর স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার কর্ম্মস্থল পূর্ণিয়ায় উকালতী করেন। তৎপরে কিছুদিন মুনসেফের কার্য্য করেন। সেই কার্য্য ভাল না লাগায় আবার পূর্ণিয়ায় উকালতি আরম্ভ করেন; কিছুদিন হাইকোর্টে উকালতি করিয়া বর্দ্ধমানে স্থায়ীভাবে উকালতী করিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য উকালতীতে তিনি যশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি সরল হাস্য পরিহাস ও ব্যঙ্গে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিপূর্ণ 'পঞ্চানন্দ' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। পরে বঙ্গ-বাসীর সত্ত্বাধিকারীর অনুরোধে বঙ্গবাসী পত্রিকায়ই পঞ্চানন্দ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার ব্যঙ্গ কাব্য 'ভারত-উদ্ধার' এক সময়ে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল এবং অনেক বাকসর্ব্বস্ব কর্ম্মবীরকে সংযত করিয়াছিল। তাঁহার 'কল্পতরু' 'ক্ষুদিরাম' নামক সামাজিক উপন্যাসেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত সাধারণী ও জন্মভূমি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার লেখার

প্রভাবে অনেক বিলাতি রোগগ্রস্ত উন্মার্গগামী লোকের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। দেশের দুঃখ দুর্দ্দশায়ও তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং তৎপ্রতিকারকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। ১৩১৮ বাংলায় ৯ই চৈত্র তিনি পরলোক গমন করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত কাগমারী পরগণায় জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া মুরশীদকুলীখাঁর কর্ম্মচারী রেজেখাঁর অত্যাচারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম এনাত উল্লা খাঁ চৌধুরী হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা অনন্তরাম রায় চৌধুরীর বংশধরেরাই বর্ত্তমান সন্তোষের পাঁচআনি ও ছয়আনির জমিদার। ইহাদের পূর্ব্ব নিবাস যশোহরে ছিল। যশোহরজিৎ চন্দ্রশেখর রায়ের বংশধর রমানাথ রায়, খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বর্ত্তমান টাঙ্গাইল উপবিভাগের অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রমানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম, হরিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলরাম। এই বলরামের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ ও অনন্তরাম। এই অনন্তরামের পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ, রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথের পোষ্য পুত্র রাজনাথ, রাজনাথের পুত্র গোলকনাথ অতি তেজস্বী জমিদার ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে নীলের চাষ ঐ অঞ্চলে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি অকালে অপুত্রক গতায়ু হইলে তাঁহার স্ত্রী জাহ্নবী চৌধুরাণী বৈকুণ্ঠনাথকে পোষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অতি দক্ষতার সহিত জমিদারী রক্ষা করেন। বৈকুণ্ঠনাথ অকালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী রাণী দিনমণি চৌধুরাণী কুমার হেমেন্দ্র নাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বনাথের পুত্র রামচন্দ্রের বংশধর সন্তোষ পাঁচ আনীর জমিদার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী। তাঁহার সহধর্ম্মিনী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী নানা সৎকর্ম্ম দ্বারা দেশে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদেরই সন্তান বিখ্যাত কবি প্রমথনাথ চৌধুরী ও মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।

ইন্দ্রপাল—আসামের নরপতি রত্নপালের পৌত্র ও পুরন্দর পালের পুত্র। তাঁহার মাতা দুর্লভাদেবী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূতা ছিলেন। রত্ন পালের জীবদ্দশায়ই পুরন্দর পাল পরলোক গমন করাতে, ইন্দ্রপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি শান্তিপ্রিয়, জ্ঞানানুশীলনরত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল অতিশয় শান্তিপূর্ণ ছিল। কাহারও কাহারও মতে তিনি বঙ্গাধিপ বিজয়সেনের সামন্ত রাজা ছিলেন।

ইন্দ্রবর্ম্মা প্রথম—কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় নরপতি। ৪৪১ খ্রীঃ অব্দের উৎকীর্ণ তাঁহার একখানি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র দানার্ণব ও পৌত্র ইন্দ্রবর্ম্মা (দ্বিতীয়)।

ইন্দ্রবল্লভ—তিনি আসামের কাচারি জাতীয় নরপতি ভীমদর্পের পুত্র। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আসামের আহম বংশীয় নৃপতি প্রতাপ সিংহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বীরদর্পনারায়ণ রাজা হন। খুনথারা দেখ

ইন্দ্রভূতি—(১) জৈন ধর্ম্মাচার্য্য মহাবীরের অন্যতম প্রধান শিষ্য। তিনি গৌতম নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বসুভূতি ও মাতার নাম পৃথ্বী। মহাবীরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে বিরানব্বই বৎসর বয়সে (খ্রীঃ পূঃ ৪১৬) তিনি পরলোক গমন করেন। ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্মস্বামী নামক অপর একজন জৈন সন্ন্যাসী উভয়ে মিলিত হইয়া মহাবীরের অনেক উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনেক অংশ ইন্দ্রভূতির রচনা অথবা তাহাতে তাঁহারই বর্ণিত বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। (২) একজন প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য। খ্রীঃ ৬৮৭ অব্দ হইতে ৭১৭ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি উড়িষ্যার (উড্ডিয়ান) রাজা ছিলেন। লামা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পদ্মসম্ভব তাঁহার পুত্র ছিলেন। ইন্দ্রভূতি অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'জ্ঞানসিদ্ধি' সমধিক প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রভূতির ভগিনী লক্ষ্মীংকরাও একজন তান্ত্রিক আচার্য্যা ছিলেন এবং তিনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে সহজিয়া মতের একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'তথাগত গুহ্যক' অথবা 'গুহ্যক সমাজ' নামক অপর একখানি গ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

ইন্দ্রমাণিক্য—স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা দেবমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার অগ্রজের নাম বিজয় মাণিক্য। লক্ষ্মী-নারায়ণ নামক জনৈক মিথিলাবাসী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দেবমাণিক্যের উপর অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজা আটজন সেনাপতিকে "চতুর্দ্দশ দেবতার" নিকট বলি প্রদান করেন। লক্ষ্মী নারায়ণ কৌশলে রাজাকেও এক শ্মশানে লইয়া যাইয়া বধ করেন এবং প্রচার করিয়া দেন যে, তিনি দেবরোষে নিহত হইয়াছেন। অতঃপর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মী নারায়ণ ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (১৫৩৫ খ্রীঃ)। কিন্তু রাজ্যের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, ইন্দ্রমাণিক্য ও তাঁহার

রাতাকে বধ করিয়া বিজয় মাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইন্দ্রমাণিক্য মাত্র চারিমাস কাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইন্দ্রমিত্র—মগধের মিত্র (শুঙ্গ) বংশীয় একজন রাজা। তাঁহার নামাঙ্কিত দুইটি মুদ্রা পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকাল নিরূপিত হয় নাই।

ইন্দ্রমুখী—একজন প্রাচীন (অনুমান খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী) বাঙ্গালী মহিলা কবি। তাঁহার রচিত পদাবলী পাওয়া গিয়াছে।

ইন্দ্ররাজ (১)—বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মাত্র ছয় মাস রাজত্ব করেন। (৬৬৭ খ্রীঃ)। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন (২য়) রাজা হন। কুব্জ-বিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ। (২) রাষ্ট্রকূট বংশীয় কর্কের পুত্র ইন্দ্ররাজ (২য়)। তিনি অনুমান ৭১০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চালুক্যবংশীয়া এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি দন্তি-দুর্গ জন্মগ্রহণ করেন। দন্তীবর্ম্মা দেখ। (৩) রাষ্ট্রকূট বংশীয় প্রথম নরপতি দন্তী-বর্ম্মার পুত্র ইন্দ্ররাজ (১ম)। তাঁহার পুত্র গোবিন্দ (১ম)। (৪) এই রাষ্ট্র-কূট বংশে ইন্দ্ররাজ নামে আরও দুইজন রাজা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ (দ্বিতীয়) শুভতুঙ্গ অকালবর্ষের পৌত্র। তাঁহার পিতা জগতুঙ্গ রাজত্ব করেন নাই। তিনি ৯১৪-৯১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অমোঘ-বর্ষ (দ্বিতীয়) রাজত্ব করেন। তৃতীয় ইন্দ্ররাজ কনৌজ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিলেন। (৫) কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের অন্যতম সেনাপতি। উচ্ছ-লের বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া তিনি নিহত হন।

ইন্দ্রসেন—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগের অন্যতম শিষ্য। তাঁহারই আলয়ে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রথমে 'প্রমাণ সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রসেন রায়—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তীপুরের একজন ব্রাহ্মণ রাজা। তিনি খাচিয়া রাজা নামেও খ্যাত ছিলেন।

ইন্দ্রাগ্নি মিত্র—মগধের কণ্ববংশীয় রাজাদের একজন সামন্ত রাজা। বুদ্ধ-গয়ায় বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের উপর মহারাজা অশোক যে যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইন্দ্রাগ্নি মিত্র তাহার চতুর্দ্দিকে একটি পাষাণ বেষ্টনী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

ইন্দ্রায়ুধ (১)—গৌড়াধিপতি চক্রা-য়ুধের পুত্র। ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। তিনি বৈদিক-দিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া, নিন্দিত হইয়া থাকেন। (২) কান্যকুব্জ

রাজ ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গুর্জ্জর প্রতীহার রাজগণের অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি। তিনি 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি জয়ানন্দের আত্মীয় ছিলেন। ইন্দ্রিয়ানন্দের রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি — উত্তর বঙ্গের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার কন্যা মানিনী দেবী পরম বিদুষী ও স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার মানিনী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ইফতিখার খাঁ—একজন মুঘল সেনাপতি। বাঙ্গালার নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার ওসমান খাঁ বিদ্রোহী হইলে, ইফতিখার খাঁ প্রভৃতি তাঁহাকে দমন করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন।

ইবন ফকর উদ্দিন আঞ্জু—পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ নগরের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশোদ্ভূত ফকর উদ্দিন কাশ্মীরির পুত্র। তাঁহার নামান্তর জামালউদ্দিন হোশেন আঞ্জু। তিনি ভারতে আগমন করিয়া প্রথম কিছুকাল দাক্ষিণাত্যে ও পরে আগ্রা নগরীতে বাস করেন। সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি তিন হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হন। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার চারি হাজার সৈন্যের নায়কত্ব এবং 'আজাদ উদ্দৌল্লা' উপাধি প্রদান করেন। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০১৪) তিনি 'ফরহাং জাহাঙ্গিরী' নামক অভিধান সঙ্কলন করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গ করেন।

ইবন বতুতা—একজন আরব দেশীয় ভ্রমণকারী। তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলকের সময়ে ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীর বিচারকের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থ ভারতের তৎকালীন ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। ১৩৩২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে রেভাঃ এস্ লি, বি-ডি, (Rev S. Lee. B. D) কর্ত্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়।

ইবন হোশেন—ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন নৌসেনাপতি। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে সন্দীপ বিজয়ে তিনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

ইবাজ খাঁ—হায়দ্রাবাদের নিজামের একজন সেনাপতি। তিনি মহারাজ শাহুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে যাইয়া পরাজিত হন এবং স্বয়ং নিজামও সেনাপতিকে সাহায্য করিতে যাইয়া, তদনুরূপ ফল লাভ করেন। শম্ভুজি

নিজামের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বাজীরাও পেশোয়ার বুদ্ধি কৌশলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে নিজাম বাজীরাও পেশোয়ার সর্ত্তানুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

ইব্রাত (১)—ইহার আসল নাম মীর জয়উদ্দিন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় পদ্মাবতের কাহিনী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন (১৭৯৫)। উক্ত গ্রন্থের শেষ অংশ গোলাম আলি ইস্রাত কর্ত্তৃক ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। (২) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি দিল্লীর একজন খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন। মির্জা আবদুল কাদের বেদিলের পরামর্শে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি কবি নাসির আলির সমসাময়িক ছিলেন।

ইব্রাহিম আদিল শাহ, প্রথম—বিজাপুরের সুলতান ইস্‌মাইল আদিল শাহের পুত্র। তাঁহার অপর নাম আবুল নসর। ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৪১) তিনি ভ্রাতা মল্লো আদিল শাহের মৃত্যুর পর, বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আলাউদ্দিন ইমাদ শাহের কন্যা রাবিয়া সুলতানাকে বিবাহ করেন। ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র আলি আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত মেহতরী মহল নামক ভজনালয় (মসজিদ) নির্ম্মিত হয়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ, দ্বিতীয়—বিজাপুরের সুলতান, তাঁহার অন্য নাম আবুল মজাঃফর। তিনি আদিল শাহের ভ্রাতা তহমাস্পের পুত্র। ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৮), মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি, আদিল শাহের মৃত্যুর পর বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় মৃত সম্রাটের পত্নী চাঁদবিবি এবং কামাল খাঁ দখানি রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কামাল খাঁ অতিশয় ক্ষমতা প্রিয় ছিলেন। তজ্জন্য তিনি অচিরেই হাজী কিশোয়ার খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন এবং হাজী সাহেব স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও চক্রান্তকারীদের হস্তে অল্পকাল মধ্যেই নিহত হন। পরে আক্‌লাস খাঁ রাজকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে দিলোয়ার খাঁ তাঁহাকে বধ করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সুলতান স্বয়ং তাঁহাকে পদচ্যুত এবং ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দৃষ্টিনাশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। প্রায় ঊনচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৩৬) তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইব্রাহিম আবুবেকর — বিহার প্রদেশের একজন বিখ্যাত সাধুপুরুষ। দিল্লীর ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭৫৩) তিনি পরলোক গমন করেন। বিহারের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ী নামক একটি ছোট পাহাড়ে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

ইব্রাহিম আলি খাঁ — রাজপুতানার অন্তর্গত টঙ্ক রাজ্যের নবাব। তিনি বিখ্যাত পিণ্ডারি সর্দ্দার আমির খাঁর পৌত্র। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের হত্যাকাণ্ডের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁহার পিতা মোহাম্মদ আলি খাঁকে সিংহাসন চ্যুত করেন। ইব্রাহিম আলি খাঁ ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃকই সিংহাসনে স্থাপিত হন।

ইব্রাহিম কুতবশাহ— দাক্ষিণাত্যের পাঠান রাজ্য গোলকুণ্ডার অধিপতি কুলি কুতব শাহের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা জামশেদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পর, রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার সাতবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু নরপতি অতি অল্পবয়স্ক বিধায়, তাঁহারাই বিজয়নগরে অবস্থিত ইব্রাহিম শাহের নিকট দুত প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম শাহ গোলকুণ্ডায় আগমন করিয়া ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৫৭) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমান রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া বিজয় নগরের রাজা রামরাজকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ১৫৭১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৯) তাঁহার সেনাপতি রেয়াফৎ খাঁ, তৎকালীন এক হিন্দু রাজার অধিকৃত রাজমাহেন্দ্রী দুর্গ অধিকার করেন। বত্রিশ বৎসর অতি গৌরবের সহিত রাজত্ব করিয়া ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৮৯) তিনি পরলোক গমন করেন।

ইব্রাহিম খাঁ (১)—গোলকুণ্ডার শেষ পাঠান নরপতি আবু হুশেনের অন্যতম সেনাপতি। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলে, তিনি অর্থ লোভে স্বীয় প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, মুঘল পক্ষ আশ্রয় করেন। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় প্রধানতঃ গোলকুণ্ডা দুর্গের পতন হয়। (২) বিখ্যাত আমির উল ওমরা আলি মর্দ্দান খাঁর পুত্র। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে লাহোর, কাশ্মীর, বিহার বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি অতিশয় নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তিনি শান্তি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের আদেশে বিতাড়িত ইংরেজ বণিকদিগকে, তিনিই

পুনরায় বাঙ্গালা দেশে আসিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৬৯৬ হইতে ১৭১২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই শোভাসিংহ বিদ্রোহী হন। সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ—সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিষী নুরজাহানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০২৫) সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে চারি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদ প্রদান করেন। অতঃপর প্রথমে কিছুকাল বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করেন। বিদ্রোহী রাজকুমার খুরমের (পরে সম্রাট শা-জাহান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি নিহত হন।

ইব্রাহিম খাঁ শূর—বায়ানার শাসনকর্ত্তা গাজি খাঁর পুত্র। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আহাম্মদ শাহ, তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী হইতে বিতাড়িত করেন। ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৫) তিনি বাঙ্গাল দেশের পাঠান নবাব সুলেমান কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

ইব্রাহিম খাঁ, সৈয়দ—দিল্লীর সম্রাট শা-জাহানের রাজত্ব কালে (১৬৫৭ খ্রীঃ) তিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা বা আমিল ছিলেন।

ইব্রাহিম নিজাম শাহ—আহাম্মদ নগরের নিজাম শাহী বংশীয় সুলতান। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৩), তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বোরহান নিজাম শাহ পরলোক গমন করিলে, তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি মাস রাজত্বের পর বিজাপুরের দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁহার উজীর মিয়াণ মুঞ্জু নিজাম শাহী বংশের আহাম্মদ নামক একটি বালককে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

ইব্রাহিম বরিদ শাহ—দাক্ষিণাত্যের আহাম্মদাবাদ বিদরের সুলতান। ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭০) তাঁহার পিতা আলি বরিদের মৃত্যু হইলে তিনি আহাম্মদাবাদ বিদরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৬৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৭) তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় কাশিম বরিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইব্রাহিম-বিন-নায়াল—তিনি তুঘরল বেগের মাতুল। তিনি শেলজুকী বংশীয় প্রথম তুঘরল শাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। পরে তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করেন। ৯৫২ খ্রীঃ

অব্দে (হিঃ ৩৫১) তুঘরল শাহের মামা তুঘরল বেগ তাঁহাকে নিহত করেন।

ইব্রাহিম বিন হারিরি—'তোয়ারিখ ইব্রাহিমী' নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। উক্ত গ্রন্থে অতি প্রাচীন কাল হইতে সম্রাট বাবরের দিল্লীর সিংহাসন লাভ করা পর্য্যন্ত সময়ের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস।

ইব্রাহিম মালেক-উল-উলমা — শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের মুসলমান শাসনকর্ত্তা মুসাফিরের চতুর্থ পুত্র। তিনি বিদ্যাবত্তার জন্য 'মালেক-উল-উলমা' উপাধি প্রাপ্ত হন। বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ ইসা খাঁর পিতা কালীদাস গজদানী (সুলেমান) তাঁহারই নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইব্রাহিম হোশেন লোদী—দিল্লীর লোদী বংশীয় সুলতান সেকেন্দর লোদীর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১৫) তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজশক্তি অতি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাঁহার ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রয়াসী হন। ইব্রাহিম তাঁহাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু ভ্রাতার পক্ষীয় আমীরগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করায়, দেশ মধ্যে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। প্রথমেই পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বীয় নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলিত করেন। ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলাউদ্দিন বা আলম খাঁ, তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়া কাবুলে পলায়ন করেন। এই সময়ে কাবুলের শাসনকর্ত্তা মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন। আলম খাঁ ভারতের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবের অধিপতি দৌলত খাঁও, ভারতবর্ষে অভিযান করিবার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ করিলেন। বাবর ভারতবর্ষ অধিকার করিবার এই সুবর্ণসুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আলম খাঁকে সাহায্যদান ব্যপদেশে সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। আলম খাঁকে দিবালপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে দৌলত খাঁ বাবরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেজন্য আলম খাঁকে তিনি পাঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আলম খাঁ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। বাবর ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দে আলম খাঁকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। দৌলত খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বাবর ধীরে ধীরে পাণিপথ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দের

২০শে এপ্রিল ইব্রাহিম লোদির সহিত যুদ্ধ হয়। ইব্রাহিম যুদ্ধ করিতে করিতে সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। ভারতের রাজলক্ষ্মী মুঘলের অঙ্ক শায়িনী হইলেন।

ইব্রাহিম শাহ, পীর—একজন মুসলমান সাধক। কচ্ছ নগরে তাঁহার সমাধি আছে।

ইব্রাহিম শাহ, সুলতান—জৌনপুরের পাঠান বংশীয় সুলতান। ১৪০১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮০৪) তাঁহার ভ্রাতা মোবারক শাহের মৃত্যুর পর তিনি জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জৌনপুর বিদ্যাচর্চ্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৪৪) তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ শাহ শারকী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম শাহ একবার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া কয়েকটি জিলা লুণ্ঠন করেন। বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আহাম্মদ শাহ (১৪০৯-১৪২৬ খ্রীঃ) প্রতীকার প্রার্থনায় পারশ্য রাজের সহায়তা প্রার্থনা করেন। আহাম্মদ শাহের অনুরোধে পারশ্যপতি ইব্রাহিম শাহকে তিরস্কার করেন। তৎফলে ইব্রাহিম শাহ আর বাঙ্গালা দেশে অভিযান করেন নাই।

ইব্রাহিম শেখ—পিতার নাম শেখ মুসা। শেখ সলিম চিস্তি তাঁহারই ভ্রাতা ছিলেন। সম্রাট আকবরের অধীনে তিনি সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। ভ্রাতা মোহাম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পর আকবর যখন কাবুলে গমন করেন, সেই সময়ে ইব্রাহিম শেখ তাঁহার অনুগামী ছিলেন। পথে, ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৯২) থানেশ্বরে, অতিরিক্ত পান দোষে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম শুকুকর শাহ—বাঙ্গালা দেশের বর্দ্ধমান জিলার একজন সাধক ফকীর। তিনি প্রথম জীবনে জলবাহকের কাজ করিতেন। তৎপরে সুফী সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষদের নিকট ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া, তিনি ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হন। পরে কাব্য ও ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এখনও বহু লোকে তাঁহার সমাধি দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে।

ইব্রাহিম, সুলতান—গজনীর সুলতান প্রথম মসাউদের পুত্র। ১০৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৮৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ভারতের প্রান্তবর্ত্তী কোনও কোনও স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম হোশেন, খাজা — সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের একজন

নস্তালিক লেখক। ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ১০০১) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম হোশেন, মীরজা—পিতার নাম মোহাম্মদ হোশেন মীরজা। ইব্রাহিম হোশেন মীরজারা পাঁচ ভাই ছিলেন এবং তাঁহারা সকলে সমবেত ভাবে মীরজারা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান মীরজার কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাদের পাঁচ ভাইকেই সম্ভল দুর্গে বন্দী করেন। ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৫) আকবর যখন মালব দেশ জয় করিতে গমন করেন, তখন 'মির্জারা' বন্দী নিবাস হইতে পলায়ন করিয়া ভরুচ বন্দরের, চঙ্গিস খাঁ নামক একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাহার কিছুকাল পরেই পঞ্চ ভ্রাতা নিকটবর্ত্তী স্থানে নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করায়, সম্রাটের সেনা পতি মুকসুম খাঁ। ১৫৭৩ খ্রীঃ (হিঃ ৯৮১) ইব্রাহিম হোশেনকে বন্দী করিয়া নিহত করেন।

ইমতিয়াজ—রাজা দয়ামলের কবিজন সুলভ নাম। তাঁহার পিতা সম্রাট আওরঙ্গজীবের মন্ত্রী আসাদ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। ইমতিয়াজ খাঁ, গাজি উদ্দিন খাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

ইমতিয়াজ খাঁ, সৈয়দ—তাঁহার কবি জন সুলভ নাম খালিস। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কিছুকাল গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২২) খোদা-ইয়ার খাঁ কর্ত্তৃক তিনি সিন্ধুদেশে নিহত হন। বঙ্গদেশের কাশিম আলী খাঁ তাঁহার পৌত্র।

ইমাদ উদ্দিন—একজন ভারতীয় কবি। ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৫) তাঁহার রচিত কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইমাদ-উল্-মুলক — দাক্ষিণাত্যের বিরার প্রদেশের ইমাদশাহী বংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার অন্য নাম ফতেউল্লা ইমাদ শাহ। তিনি দাক্ষিণাত্যের কেনারী জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর হি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি বিজয়-নগর আক্রমণকারী খাঁ জাহান কর্ত্তৃক বন্দী হন এবং পরে তাঁহারই শরীর রক্ষী সৈন্য দলে প্রবেশ লাভ করেন। সুলতান মোহাম্মদ শাহ বাহমনির রাজত্ব কালে, তিনি ইমাদ-উল্-মুলক উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি বেরার প্রদেশের সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বীয় প্রভু খাজা মোহাম্মদকে বধ করিয়া তাঁহারই পদে (বেরারের শাসন কর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত হন। সুলতান মোহা বাহমনির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৯০)

ইলিচপুর নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১৯) তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। বেরারের ইমাদ শাহী সুলতানদের বংশ তালিকা—

১। ফতেউল্লা ইমাদ শাহ—এই বংশের স্থাপয়িতা, ১৪৮৫—১৫১৩ খ্রীঃ।

২। আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ, ফতে উল্লার পুত্র। ১৫১৩—১৫৩২ খ্রীঃ।

৩। দরিয়া ইমাদ শাহ, আলাউদ্দিন ইমাদ শাহের পুত্র। ১৫৩২—১৫৬৭ খ্রীঃ

৪। বুরহান ইমাদ শাহ, দরিয়া ইমাদ শাহের পুত্র। ১৫৬৭—১৫৬৮ খ্রীঃ।

১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে বালক বুরহান শাহের মন্ত্রী তোফল খাঁ স্বীয় প্রভু বুরহান ইমাদ শাহকে বন্দী করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজাম শাহ এই ঘটনার কিছুকাল পরে, বেরার আক্রমণ করিয়া তোফল খাঁ, তাঁহার পুত্র এবং বুরহান ইমাদ শাহকে একটি দুর্গে আবদ্ধ করিয়া, রাজ্য অধিকার করেন। ইহার অনতি কাল পরেই সকলে নিহত হন এবং ইমাদ শাহী বংশ ও তোফল খাঁর বংশ নির্ম্মূল হয়।

ইমাম শাহ—ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর গুজরাট প্রদেশের পীরণাপন্থ বা কাকা পন্থ নামীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংস্থাপক। এই মতাবলম্বীরা হিন্দু ভাবে থাকেন। তাঁহাদের নাম ও আচার ব্যবহার হিন্দুরই মত, অথচ তাঁহারা মুসলমান গুরুর শিষ্য। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাঁহারা মৃতদেহ সমাহিত করেন।

ইম্মাড়ি নরসিংহ— বিজয়নগরের সালুব বংশীয় শেষ নরপতি। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া, তুলুব বংশীয় দ্বিতীয় বীরনরসিংহ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ১৫০৬ খ্রীঃ বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসন লাভ করেন।

ইয়াকুত খাঁ — জিঞ্জিরার অধিপতি সিদ্দি সম্বলের অন্যতম নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ দক্ষ নৌসেনাপতি আর কেহ ছিলেন না। মহারাষ্ট্রপতি শম্ভুজি জিঞ্জিরা অধিকার করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইয়াকুত খাঁ, শেখ — প্রদেশের কোল নামক স্থানের প্রাচীন রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। পুরুষানুক্রমে তিনি গুহগড় নামক স্থানের প্রধান সর্দ্দার ছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ নৌসেনাপতিও ছিলেন।

ইয়াকুব লেইছ—বোগদাদের খলিফার একজন সেনাপতি। তিনি ৮৭০ খ্রীঃ অব্দে কাবুলের শাহী বংশীয় হিন্দু নরপতি কল্লারকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ইয়াজউদ্দিন— দিল্লীর সম্রাট জাহান্দর

শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র। এলাহাবাদের নিকটস্থ কালোয়ার যুদ্ধে তিনি ফরখশেয়ার কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

ইয়ার মোহাম্মদ খাঁ মীর — সিন্ধু-দেশের অন্তর্গত হায়দারাবাদের ভূপতি। মির মুরাদ আলির পুত্র। স্যার চার্লস্ নেপিয়ার (Sir Charles Napier) কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ বিজিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মোহাম্মদ খাঁ প্রথমে বন্দী হন। পরে তিনি ইংরেজ সরকারের বৃত্তি ভোগী হইয়া, হায়দারাবাদেই সাধারণ লোকের ন্যায় বাস করিতে থাকেন।

ইরতিজা আলি খাঁ বাহাদুর — 'ফরাইজ ইরতিজিয়া' নামক একখানি দায়ভাগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনা করেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগের মধ্যে উক্ত পুস্তকের মতই প্রচলিত।

ইরফান—পিতার নাম মোহাম্মদ জান ইরফান। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ রেজা। কবিজন সুলভ নাম ইরফান। সম্রাট শা-জাহানের সময়ের একজন আমির-উল-উমরা। তিনি 'কারনামা' নামে আলিমর্দ্দান খাঁর প্রশংসাসূচক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইরাদত খাঁ—(১) প্রকৃত নাম মীর ইসাহাক খাঁ, ইরাদত খাঁ উপাধি মাত্র। তাঁহার পিতা আজিম খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইরাদত খাঁ সম্রাট শাজাহানের অধীনে নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে তিনি অযোধ্যার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। মাত্র দুইমাস কার্য্য করিয়াই পরলোক গমন করেন। (১৬৫৮ খ্রীঃ, হিঃ ১০৬৮)। (২) একজন মুঘল বংশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার প্রকৃত নাম মীরজা মোবারিক উল্লা। তাঁহার আর একটি কবিজনসুলভ নাম উজা। তাঁহার পিতা ইসাহাক খাঁ এবং পিতামহ আজিম খাঁ উভয়েই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইসাহাক খাঁ কিছুকাল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে রাজস্ব সচীব ছিলেন, পরে জৌনপুরের ফৌজদার হন। ইরাদত খাঁ ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে রাজকুমার বিদর-বখ্‌ত এর অশ্বাধ্যক্ষ হন। অশ্বজীবন সম্বন্ধে তিনি একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা করেন। প্রথম বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তিনি দোয়াবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি নির্জ্জনেই বাস করিতেন। ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২৮) তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজীবের বংশধর-দের ইতিহাসই প্রসিদ্ধ। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মীর হিদায়েত উল্লা, হুসদার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং চারি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদ লাভ করেন। হুসদার খাঁ ১৭৪৪ খ্রীঃ (হিঃ ১১৫৭) আওরঙ্গাবাদে

পরলোক গমন করেন। ইরাদত খাঁ। প্রণীত গ্রন্থ ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে জোনাথন স্কট (Jonathan Scott) সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়।

ইরুগপ — 'নানার্থরত্নমালা' নামক ব্যাকরণের রচয়িতা। তিনি বিজয় নগরের মহারাজ হরিহরের সেনাপতি ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে উক্ত ব্যাকরণখানি তাঁহার ব্যবহারের জন্য লিখিত হয়।

ইরেজ খাঁ — নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার শ্বশুর। তিনি নবাবের পরামর্শদাতাও ছিলেন। কিন্তু নবাবের বিপদকালে নবাবকে কোনওরূপ সাহায্য করেন নাই। পলাশী যুদ্ধের অন্তে পলায়নপর নবাব অতি কাতরভাবে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। তিনি পরে মিরজাফরের সহিত যোগদান করেন।

ইরেয়াঙ্গা হয়শাল— তিনি কল্যাণের চালুক্য নরপতির একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ১০৭৬ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সময়ে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে সোমেশ্বরের ভ্রাতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পৌত্র বিত্তিদেব চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

ইলাহ ইয়ার খাঁ — তাঁহার পিতার নাম শেখ আবদুর শোভান। ইয়ার খাঁ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নবাব মোবারিজ উল মুল্ক সরবলন্দ খাঁ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট ফরকশেয়ার তাঁহাকে রোস্তম জমান খাঁ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বে স্থাপন করেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, রাজা অজিত সিংহ মারওয়ারীর পুত্র রাজা অভয় সিংহকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তৎফলে সরবলন্দ খাঁর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে নবাব পক্ষে ইলাহ ইয়ার যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (১৭৩০ খ্রীঃ, হিঃ ১১৪৩)।

ইলাজল গুবরা—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা। তাঁহার আবির্ভাব কাল এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই।

ইলাহাদাদ, মৌলানা—জৌনপুরের কাজী শিহাব উদ্দিনের ছাত্র এবং কাজি হামিদ শাহের অনুবর্ত্তী একজন পরম বিদ্বান, দাতা ও পরোপকারী ব্যক্তি। জৌনপুরের সুলতান হোশেন শারকি একবার তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। তিনি অচিরকালমধ্যে সমস্ত টাকা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন অধ্যাপনা, উপদেশ প্রদান, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি কার্য্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি 'হিদায়া' গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা, 'রজ্ঞাদি' গ্রন্থের ভাষ্য, 'মোদারিক' গ্রন্থের

ভাষ্য, এবং 'হাসিয়া-ই-হাসিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইলাহাদাদ শরহিন্দি — তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ফৈজী। তিনি শরহিন্দের অধিবাসী ছিলেন। 'মদর-উল-আকাজিল' নামক একখানি অভিধান তিনি সঙ্কলন করেন।

ইলাহি ইয়ার খাঁ মীর তুজ্জক — সম্রাট আলমগীরের সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি দেড় হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৩) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইলাহিবক্স—একজন ঐতিহাসিক। 'খুরসিদ জাঁহা' নামক ফার্শী ভাষায় একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মালদহ জিলার অধিবাসী ছিলেন।

ইলাহি শেখ—শেরশাহ শূরের পুত্র সলিম শাহের রাজত্বকালে বয়ানা নামক স্থানের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি একটি নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে ১৫৪৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৫৪) নিহত হন।

ইলিয়াস কুদ্দুশ শাহ — প্রসিদ্ধ জ্ঞানী মুলক-উল-উলামা ইব্রাহিম খাঁ শাহের পুত্র। তিনি নিজেও পরম জ্ঞানী এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সাধুচরিত্র ও বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি 'কুতব-উল-আউলিয়া' রূপেই প্রসিদ্ধ হন। শ্রীহট্ট জিলায় খোয়াই নদীর তীরে এক নির্জ্জন কুটীরে তিনি বাস করিতেন। মৃত্যুর পর মুড়ারবন্দ নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ঐ স্থান কুতুবের দরগা অথবা মুড়ার বন্দের দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ খোন্দকার সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুজলা খোন্দকার ময়মনসিংহের অন্তর্গত সিকান্দর নগরে বাস করিতেন। তৃতীয় পুত্র মিয়া খোন্দকার ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চান্দুরা নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই সকল স্থানে তাঁহার বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ খোন্দকারের জুন্নুন, মোহাম্মদ ও মুসা নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মোহাম্মদের আট পুত্রের মধ্যে গদা হাসন ও গিয়াস সমধিক প্রসিদ্ধ। গদা হাসন প্রপিতামহেরই মত সাধক ছিলেন।

ইলিয়াস খাজা—তিনি ১৩৪৩ হইতে ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ইলিয়াস খাজা সামসউদ্দিন ভাঙ্গরা। তিনি অতিশয় ভাঙ্গ বা সিদ্ধি খাইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভাঙ্গরা উপাধি দিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব আলী মবারিকের ধাত্রীপুত্র ছিলেন। তিনি আলী মবারিককে

নিহত করিয়া, বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেও, তাঁহার ন্যায়ানুগত শাসনগুণে ও অন্যান্য সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকেরা তাঁহার পূর্ব্ব অপকার্য্যের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিল, প্রথম দশ বৎসর তিনি বেশ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেন। পরে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বারাণসী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া, রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১ খ্রীঃ) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ পরাজিত হইয়া বার্ষিক কর প্রদানে সম্মত হইয়া, সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি উপহার দ্রব্যাদি সহ দিল্লীতে এক দূত প্রেরণ করেন। দিল্লীর সম্রাট অতি সমাদরের সহিত সেই দূতকে গ্রহণ করেন। ১৩৫৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় এক দূত প্রেরিত হয়। সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে এক সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। তাহাতে দিল্লীর সম্রাট ইলিয়াস শাহকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া, স্বীকার করেন এবং উভয় রাজ্যের সীমাও নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র সেকেন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইল্লারাজ—কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের একজন সামন্ত রাজা। হর্ষদেব রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, তিনি নরপতি উচ্চলের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সৈন্য প্রেরণ করিয়া পলায়মান হর্ষদেবকে নিহত করেন। উচ্চল রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকামী ইল্লারাজকে এক যুদ্ধে বধ করেন।

ইসফন্দিয়ার বেগ—বাঙ্গালার নবাব মীর জুমলার অন্যতম সেনাপতি। মীরজুমলা কুচবিহার জয় করিয়া ইসফন্দিয়ারের হাতে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন এবং স্বয়ং আসাম প্রদেশ জয় করিতে অভিযান করেন। তখন পরাজিত কুচবিহারপতি পুনরায় ইসফন্দিয়ার খাঁকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কুচবিহার হইতে তাড়াইয়া দেন।

ইসরাত—একজন উর্দ্দু কবি। মীরজিয়াউদ্দিন নামক অপর একজন উর্দ্দু কবি, সিংহলরাজ কন্যা এবং রাজপুত নৃপতি রতন সিংহের স্ত্রী পদ্মাবতীর সম্বন্ধে "পদ্মাবৎ" নামে একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেন। পরে কবি ইসরাত (সম্পূর্ণ নাম গোলাম আলী ইসরাত) ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২১১) ইহা সম্পন্ন করেন।

ইসলাম খাঁ—(১) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা। সম্রাট শা-জাহানের রাজত্বকালে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অযোগ্য শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ পদচ্যুত হইলে, তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ

লাভ করেন এবং ১৬৩৭ হইতে ১৬৩৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে আরাকানের মৃত রাজার ভ্রাতা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানরাজের সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি বাঁশ থাগড়ার ভুর (ভেলা) তৈয়ারী করিয়া তাহাদের গতিরোধ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম আরাকানরাজের অধিকার ভুক্ত ছিল, তিনি উহা মুঘল রাজ্যভুক্ত করেন। তৎকালীন আসামের রাজা একবার মুঘল অধিকারভুক্ত বাঙ্গালা দেশের কোনও কোনও স্থানে লুঠপাট আরম্ভ করেন। ইসলাম খাঁ তাহা-দিগকে বিতাড়িত করেন। সম্রাট শাজাহানের আদেশে তিনি শাহ শুজার প্রতিনিধি সৈফখাঁর হস্তে বাঙ্গালার শাসন ভার প্রদান করিয়া দিল্লী গমন করেন। এবং তথায় উজিরের পদ লাভ করেন। অনেকদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদ লাভ করেন। ১৬৪৮ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। (২) মীর জিয়াউদ্দিন হোসেন বক্সীর উপাধি। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ওলা। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কও ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৪) আগ্রাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। (৩) মুঘল সম্রাট ফেরুক শিয়ারের রাজত্বকালে তিনি লাহোরের সুবেদার ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সফি খাঁ। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ তাঁহাকে সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন।

ইসলাম খাঁ তরিণ—তিনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন সহকারী মগদস্যুগণকে বিতাড়িত করিয়া চাঁটগাঁ অধিকার করেন।

ইসলাম খাঁ মেসেদি নবাব—তাঁহার জন্মস্থান মসাদ। তাঁহার পূর্ব্বনাম মীর আবদুল সলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিপতি ও বঙ্গদেশের সুবেদার ছিলেন। সম্রাট শা-জাহানের রাজত্বকালে তিনি ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং পরে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হন। তিনি মোতাম উদ্দৌল্লা উপাধিও প্রাপ্ত হন। পরে পুনরায় বাঙ্গালার সুবেদার হন। তিনি ১৬৩৭ হইতে ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা আজম খাঁর সময়ে আসামের অন্যতম রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে মুঘল রাজ্যভুক্ত স্থানে লুণ্ঠনাদি করিতেন। ইসলাম খাঁ তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। বাঙ্গলাদেশে

থাকিবার সময়ে তিনি জোমদাত-উল-মুলক উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হন এবং ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৭) আওরঙ্গাবাদে পরলোক গমন করেন।

ইসলাম খাঁ রুমি, তুর্ক—পিতার নাম আলী পাশা। তাঁহার প্রকৃত নাম হোশেন পাশা। তিনি বসরা নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই কাজ হইতে চ্যুত হইয়া তিনি ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৮০) তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং ইসলাম খাঁ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কের পদ প্রদান করেন। বিজয়পুরের যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ইসলাম খাঁ, শেখ—তাঁহার অপর নাম নবাব ইয়াদজাদ উদ্দৌলা। তিনি প্রসিদ্ধ শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র এবং আবুল ফজলের ভগিনীপতি ছিলেন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০১৭) সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নবাব ইক্রাম খাঁর পরিবর্ত্তে কাশিম খাঁ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। আগ্রার সন্নিকটে ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

ইসলাম বেগ—একজন পারস্য দেশীয় যোদ্ধা ও বীরপুরুষ। ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে গোলাম কাদির নামক এক রোহিলা সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া, ইসলাম বেগ দিল্লী আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। পরে তাঁহারা আগ্রা নগরী অবরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সিন্ধিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল পরে তাঁহারা পুনরায় আগ্রা আক্রমণ করেন। সেবারও তাঁহারা পরাস্ত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে ইসলাম বেগ গোলাম কাদের হইতে পৃথক হন। কিছুকাল পরে সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষ রণেখাঁর সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বীরের পক্ষে মহারাঠাসেনা বিভাগে আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা সম্ভব হইল না। তিনি তাঁহার খুল্লতাতের মৃত্যুর পর মহারাঠা সেনাদলে কাজ করিয়াছিলেন। তাহার দশমাসকাল পরেই তিনি মহারাঠাদের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন মুঘল অশ্বারোহী সৈন্যগণকে পুনরায় একত্রিত করিয়া, তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করিলেন এবং নানাস্থানে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিলেন। মহারাঠারা তাঁহার নিকট রাজকর

দাবী করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মহারাঠারা বিজয়ী হইলে ইসলামবেগ আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিয়া কনৌজ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী গোলাম কাদেরের বিধবা ভগিনী ঐ দুর্গের অধিস্বামিনী ছিলেন। তখন তাঁহার সহিতও মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি কোনও রকমে স্বীয় দুর্গ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ইসলামবেগ তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু অল্পকাল পরেই মহারাঠাদের সহিত যুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হন। আত্মসমর্পণ করিলে প্রাণরক্ষা হইবে এইরূপ আশা পাইয়া, তিনি মহারাঠাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর মহারাঠারা তাঁহাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দেও জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ অজ্ঞাত।

ইসহাক, মৌলানা—একজন বিখ্যাত বিদ্বান্। মুলতানের অন্তর্গত উচ্ছা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মাতুল সৈয়দ সদরউদ্দিন রাজ কত্তালের শিষ্য ছিলেন। ১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮৬০) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইসা খাঁ মসনদ-ই-আলা—বাঙ্গালার বার ভূঞার অন্যতম। তাঁহার পিতার নাম সুলেমান খাঁ। কথিত হয় যে সুলেমান খাঁ পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল কালিদাস গজদানী। তিনি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন। তিনি বাঙ্গালার নবাব হোশেন শাহার বংশীয়া ফাতেমা খানমকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইসা খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় ক্ষমতায় ইসা খাঁ সুবর্ণ গ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সুবর্ণ-গ্রামের শাসন ভারপ্রাপ্ত হন। অধিকার লাভ করিয়া তিনি রাজধানী সুবর্ণ গ্রামের অন্তর্গত খিজিরপুরে পরিবর্ত্তন করেন। সম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিয়া ইসা খাঁ সরকার সোনার গাঁ (সুবর্ণ গ্রাম) ও সরকার বাজুহার পরগণার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। উত্তরে ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্বীয় শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি সুবর্ণ গ্রামের এলাকাস্থ কলাগাছিয়া, ত্রিবেগ ও হাজিগঞ্জে তিনটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং পুরাতন এগার সিন্দুর ও একডালা দুর্গের সংস্কার করেন। ক্ষমতাশালী হইয়া ইসা খাঁ স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিলে ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে

সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত শাহ বাজ খাঁর আক্রমণে পরাজিত হইয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দ্বীপ পুঞ্জে আত্মরক্ষার্থ আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ বাজ খাঁ রাজধানী খিজিরপুর ধ্বংস করিয়া ইসা খাঁর অনুসরণ করেন কিন্তু শিবির স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান কালে অতর্কিত আক্রমণে ইসা খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইসা খাঁ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। শাহ বাজ খাঁর শিবির স্থান এখন শাহাবাজপুর নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহ অধিকার করিয়া তথাকার জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে অন্য রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপের পুরাতন রাজধানী রাঙ্গা, মাটিয়া অধিকার করিয়া তথায় এক দুর্গ এবং ময়মনসিংহের উত্তর প্রান্তে দশ কাহনিয়াতে (সেরপুরে) অন্য একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট আকবর, শাহ বাজ খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরে মহারাজ মানসিংহকে ইসা খাঁর দমনার্থ প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপন মানসে ইসা খাঁ রাজা মানসিংহের সহিত সম্রাট আকবরের নিকট আগমন করেন। ইসা খাঁর বীরত্বের পরিচয় পাইয়া, সম্রাট তাঁহাকে দেওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দ্বাবিংশ পরগণার শাসন ভার অর্পণ করেন। ইসা খাঁ বিখ্যাত ভুঁইঞা চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনা-মণিকে অপহরণ করিয়াছিলেন। সোনা-মণি ইসা খাঁর অন্তঃপুরে 'বিবি আলী নেয়ামত' নামে পরিচিতা ছিলেন। সোনামণি জনসমাজে সোণাবিবি নামে খ্যাত। নারায়ণ গঞ্জের নিকটবর্ত্তী সোনাকান্দা নামক স্থান সোনাবিবির নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে ইসা খাঁর পতন আরম্ভ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে (১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দে) ইসা খাঁ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শাসন কালে টাকায় চারি মণ চাউল পাওয়া যাইত ; প্রতি কানী জমির খাজনা ছিল মাত্র সাড়ে তিন আনা। ইসা খাঁর মৃত্যুর পরে মগ, ত্রিপুরারাজ ও শ্রীপুর রাজ সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন। সোনাবিবি মগধের সহিত যুদ্ধে পরা-জিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

ইসি তোর্কান মীরজা— সিন্ধুদেশের রাজা শাহ বেগ আর্গানের প্রধান সেনা-পতি। স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পরে তিনি তাত্তা নগর অধিকার করেন এবং তথা-কার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৫) তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরজা মোহাম্মদ বাকী তোরখান সিংহাসনে

আরোহণ করেন। তিনি নানা প্রকারে সম্রাট আকবরের মনোস্তুষ্টি করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৯৩) তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পৌত্র মীরজা জানি বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইসিদাসি—একজন শিক্ষিতা বৌদ্ধ মহিলা। উপ্পল বন্না, শোভিতা, সবলা, বিশাখা, সন্ধদাসী এবং নন্দার ন্যায় বিদ্যাবত্তার জন্য ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিনয় গ্রন্থ ইনিও বিশেষরূপে আয়ত্ত করেন।

ইস্মু বাই—মহারাজা শম্ভুজীর অন্যতমা স্ত্রী। তিনি প্রসিদ্ধ সার্কে বংশের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম পীলাজী সার্কে ছিল। কুমারী অবস্থায় তাহার নাম জিউবাই ছিল। মহারাষ্ট্র রীতি অনুসারে বিবাহের সময়ে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইস্মু বাই রাখা হয়। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে শম্ভুজীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয়। ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে অক্টোবর তিনি পুত্র শিবাজীর সহিত বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। এই শিবাজীই সাহু নামে খ্যাত হইয়া পরে রাজা হইয়াছিলেন।

ইস্মু সিংহ—তিব্বতের দলই লামা একবার নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঠিকনা পাহাড়ের হারিয়া মেচের রূপবতী হীরা ও জীরা নাম্নী দুই পত্নীকে তিনি সেবাদাসী রূপে লইয়া যান, হীরার গর্ভে বিশুসিংহ (বিশ্বনাথ সিংহ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধরেরা কোচবিহারের ও জলপাই-গুড়ির রায়কতদের আদি পুরুষ। জীরার গর্ভে ইস্মুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাহাঁর বংশধরেরা বিজনী ও সিডলী রাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ।

ইস্কি (১)—একজন কবি। সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব কালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ১৭২৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৪২) তাঁহার মৃত্যু হয়। (২) শেখ মোহাম্মদ ওয়াজির কবিজন সুলভ নাম। পাটনার গোলাম হোশেন মোজরীমের পুত্র। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে কিছুদিন তহশিলদার ছিলেন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২২৪) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ইস্মাইল আদিল শাহ, সুলতান—১৫১০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯১৫) তাঁহার পিতা ইউসুফ্ আদিল শাহের মৃত্যুর পরে তিনি বিজাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দের ২৭ শে আগষ্ট বুধবার (হিঃ ৯৪১, ১৬ই শফর) তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মল্লু আদিল শাহ বিজাপুর রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের নয়

জন রাজার অন্যতম হইলেও তাঁহার রাজত্বকাল ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দের ছয় মাস মাত্র।

ইস্‌মাইল গাজী—একজন ধার্ম্মিক ও গাজী (ধর্ম্মযোদ্ধা)। রঙ্গপুরের দক্ষিণ পীড়গঞ্জের এলাকায় তাঁহার সমাধি আছে। ঘোড়াঘাট অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় হইয়াছিল। কথিত আছে ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কামতাপুরের সেন রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে হোশেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণের সময়ে গাজী সাহেব তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। কোনও কারণে হোশেন শাহের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, তিনি নিহত হন। দক্ষিণগড় মান্দারণে তাঁহার সমাধি আছে।

ইস্‌মাইল নিজাম শাহ — তাঁহার পিতা বুরহান শাহ, তাঁহার ভাই মুর্ত্তজা নিজাম শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সম্রাট আকবরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পলায়ন কালে তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম ও ইস্‌মাইল হোশেন শত্রু হস্তে বন্দী হন। মিরাণ হোশেন শাহের মৃত্যুর পরে জামাল খাঁ ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৯৭) ইস্‌মাইলকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা সম্রাট আকবরের সাহায্যে পুত্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে উপস্থিত হন। বুরহান শাহ প্রথমে পরাজিত হন, পরে জয় লাভ করিয়া পুত্র ইস্‌মাইলকে বন্দী করিয়া ১৫৯১ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রিল (হিঃ ৯৯৯ ১৩ই রজব) বুরহান নিজাম শাহ (দ্বিতীয়) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আহম্মদ নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইস্রাইল, খাঁ মৌলবী, বি, এল—তাঁহার জন্ম স্থান ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল উপবিভাগের অন্তর্গত ধুবরিয়া গ্রাম। তাঁহার পিতা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে বর্ম্মাদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে অবস্থান করিতেন। সেজন্য তিনি বি, এল পরীক্ষা পাশ করিয়া রেঙ্গুন চিফকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অচির কাল মধ্যেই তিনি তথাকার এডভোকেট শ্রেণীর মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক সাধু প্রকৃতি অন্যায়কারীর পক্ষ সমর্থন করিত না। শেষে বিচারকদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি যে পক্ষে থাকিতেন, সেই পক্ষই প্রকৃত ন্যায়ানুসরণকারী। অনেক দুস্কৃতকারী বহু অর্থ প্রদানে তাঁহাকে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়া, বিফল কাম হইয়াছে। তিনি রেঙ্গুনের হিন্দু মুসলমান সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বলা বাহুল্য তিনি বর্ম্মাবাসী ভারতীয় মুসলমানের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রেঙ্গুন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, তাঁহার শোক সভায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তাঁহার মৃত্যুতে রেঙ্গুন হাইকোর্ট একজন সাধু ব্যবহার-জীবির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল।" দেশের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। রেঙ্গুনের বাঙ্গালীদের প্রধান দুইটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—বেঙ্গল একাডেমী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের—তিনি প্রধান পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়টী দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তাঁহারই ভবনে পরিচালিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি বাড়ী ভারা বাবতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে ১৬ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার জন্য, ইউরোপীয়, দেশীয়, বিদেশীয় বহুলোক তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিলেন।

ইস্রাইল, সৈয়দ শাহ — শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খোদাবক্সের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন। তিনি বিদ্যাবত্তার জন্য দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক "মুলুক-উল-উলামা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু তিনি ধন এবং ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা জ্ঞান ও ধর্ম্মকেই অধিকতর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া, তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় তিনিও আজীবন দরিদ্রই ছিলেন। তিনি ৯৪১ হিজিরি সালে (১৫২৩ খ্রীঃ অব্দে) "মদালেল ফওয়ায়েদ" নামে ফার্শীতে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পুত্র বিখ্যাত ইলিয়াস কুদ্দুস, কুতব উল আওলিয়া। এই বংশে বহু সাধকের জন্ম হইয়াছে।

ইহতি শাম খাঁ—ফতেপুর শিক্রির শেখ করিদের উপাধী। তাঁহার পিতার নাম কুতবউদ্দিন শেখ খুবান। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজীবের অধীনে কাজ করিয়াছেন। আলমগীর তাঁহাকে তিন হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বে উন্নীত করেন। ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৭৫) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহসান—দিল্লীর আবদুর রহমান খাঁর কবিজন-সুলভ নাম। তিনি উর্দ্দুতে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২৬০) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈশ পাটীল দাবাড়ে—তিনি পুণা ও বোম্বের মধ্যবর্ত্তী তালেগাঁও দাবাড়ে নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। তিনি ছত্রপতি শিবাজীর ও তাঁহার পুত্র মহারাজ রাজারামের অনুসঙ্গী ছিলেন। তাঁহার খণ্ডেরাও দাবাড়ে ও শিবাজী দাবাড়ে নামে দুই বিখ্যাত পুত্র ছিল। তাঁহারা শিবাজী ও তাঁহার বংশধরদিগের বিশেষ অনুগত ছিলেন।

ঈশাজী কঙ্ক—একটী ক্ষুদ্র তালুকদারের পুত্র। দাদাজী কুণ্ডদেবের সহায়তায় তিনি ছত্রপতি শিবাজীর বাল্যসঙ্গী হন। তুরণদুর্গ অধিকার কালে তিনি শিবাজী ছত্রপতির সঙ্গে ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খাঁর নির্য্যাতনের সময়ে তিনি শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন। শিবাজী যখন আগ্রায় আওরঙ্গজীবের দরবারে গমন করেন তখনও তিনি তাহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আজীবন স্বীয় প্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন।

ঈশান—(১) ইনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। (২) তিনি বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের অন্যতম ভ্রাতা। তিনিও একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি।"

ঈশানচন্দ্র—ভূঃখার দেশীয় চঙ্কুন কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। চঙ্কুণের শ্যালক ঈশানচন্দ্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নাগরাজ তক্ষকের অনুগ্রহে প্রচুর ধনলাভ করেন। তিনি একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া, অর্থের সদ্ব্যবহার করেন।

ঈশানচন্দ্র—ইনি বঙ্গভাষায় কবিতাকারে "বর্ণসুন্দর" নামক বর্ণমালা গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশানচন্দ্র দেব—ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গান ফেক্টারীতে কর্ম্ম করিতেন। প্রায় ১১৫ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ফতেগড় নামক স্থানে বদলী হন। ফতেগড় তখন ঐ প্রদেশের একটী প্রধান স্থান ছিল। সেখানে ইংরাজের সৈন্য থাকিত, টাকশাল, রসদ বিভাগ, গান ফেক্টারী ইত্যাদিতে ইহা একটী বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ঈশানচন্দ্রের কর্ম্মদক্ষতায় উপরিতন বড় বড় সাহেবগণ তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও, সাহেবদের সাথে

তাঁহার বন্ধুতা স্থাপিত হইয়াছিল। আধুনিককালে চাকরে মনিবে এরূপ সদ্ভাব প্রায় দেখা যায় না। বিলাত হইতেও তাঁহারা ঈশানবাবুর নিকট পত্র লিখিয়া খোঁজখবর লইতেন। ফতেগড়ে দেব পরিবারের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গঙ্গার ধারে ইঁহাদের বৃহৎ অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান আছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহাদের বাড়ী লুট হয়। তাঁহারা সপরিবারে কোন হিন্দুস্থানী বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইয়া, আত্মরক্ষা করেন। স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি রবার্টসন্ সাহেবকে বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। তদানীন্তন নবাব তজম্মুল হোশেন এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। ঈশানবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবৎসদেব নবাবকে কয়েকটী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া, সকলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১)—১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (২) কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। তিনি নিজেও সুকবি ছিলেন। ১২৬২ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। 'যোগেশ' নামক কাব্য এবং 'সুধাময়ী' নামক উপন্যাস তাঁহার কাব্য প্রতিভার উৎকৃষ্ট ফল। তিনি হুগলীতে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বাঁশবেড়িয়া হইতে পূর্ণিমা নামক মাসিক পত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উহার একজন নিয়মিত লেখক ও সহায়ক ছিলেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈশানচন্দ্র বসু—মেদিনীপুর জিলার অধিবাসী। বিদ্যালয়ে তিনি মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মেদিনীপুর বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনই মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আলয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়োগ করেন। তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাজা রামমোহনের লুপ্ত প্রায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাঁহাকে অর্থানুকূল্য করেন। পরে যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের সহায়তা পাইয়া, রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ভাবের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য

তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতাবলীও প্রকাশ করেন। বালক বালিকাদিগের মধ্যে নীতি শিক্ষা প্রচারের জন্যও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তজ্জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নীতি গ্রন্থ রচনা করেন। স্ত্রী শিক্ষায়ও তাঁহার উৎসাহ ছিল। কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী, নবজীবন, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের এক খানি ক্ষুদ্র জীবন চরিত রচনা করেন। ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত প্রভাতী নামক পত্রিকা এবং কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদনে সফলতা অর্জ্জন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কিছুকাল অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন এবং হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন এবং নানারূপ দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পড়িয়াও কখন কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থী হন নাই। নানারূপ বিপদ আপদের মধ্যেও স্থির চিত্তে ও শান্তভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে উনসত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রাজসাহী জিলার পুঠিয়ার একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণিক। তিনি কাব্য চন্দ্রিকার একখানি টীকা, প্রণয়ন করেন।

ঈশানচন্দ্র বিশারদ—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ভৈষজ্য বিজ্ঞান'।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — তিনি জয়পুর রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র রায়—পাবনা জিলার উল্লাপাড়া থানার দৌলতপুর নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অতি সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহাদের জমীদারীর নিকটস্থ অপর এক জমিদারের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল ও ধনশালী ছিলেন বলিয়া, রায়বংশ তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। পরিশেষে জমিদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে বৃদ্ধিজমা ও বাজেজমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাই রাজসাহীর বিখ্যাত প্রজা বিদ্রোহ। ঈশানচন্দ্র এই প্রজা বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়া, স্বীয় বুদ্ধি বলে তাঁহাদের নেতা হইলেন। বিদ্রোহিরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিল। এই সময়ে রুদ্রগাঁথি নিবাসী প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়া, বিদ্রোহী রাজা ঈশানচন্দ্রের মন্ত্রী

হইলেন। এই সময়ে, বাজু সরকার, ছালুসরকার, রমজান খাঁ, প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান সরদার তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া দল পুষ্টি করিল। বিদ্রোহীরা প্রকাশ্য দিবালোকে দল বদ্ধ হইয়া জমিদার ও ধনী গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট তখন এক দল পুলিশসৈন্য পাঠাইয়া দলপতিদিগকে ধৃতকরিয়া বিচারর্থ প্রেরণ করেন। বিচারে ঈশানচন্দ্র রায় নিস্কৃতি পাইলেন ও তাহার সঙ্গীরা একমাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল।

ঈশান দেব (১)—শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীন কালের চন্দ্র বংশীয় একজন রাজা। নব গীর্ব্বাণ দেখ। সম্ভবতঃ তিনি ১৭শ সংবতে জীবিত ছিলেন। (২) কাশ্মীরপতি সন্ধিমতির গুরু। রাজা সন্ধিমতি তাঁহারই অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধিমতি দেখ।

ঈশান দেবী—তিনি কাশ্মীর পতি জলৌকের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তিনি দ্বার প্রভৃতি প্রদেশে প্রভাব সম্পন্ন মাতৃ মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ঈশান নাগর—১৪৯২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত সুনাম গঞ্জ উপবিভাগের লাউর পরগণার নব গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে ইহার জন্ম হয়। বৈষ্ণব শিরোমণি অদ্বৈত মহাপ্রভু এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশানের পিতার মৃত্যু হইলে, মাতা বালকটীকে ঘোর দরিদ্রের মধ্যে প্রতিপালন করিতে থাকেন। অদ্বৈত প্রভু তখন শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। জননী ঈশানকে লইয়া শান্তিপুরে আগমন করেন ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আচার্য্য অদ্বৈত, ঈশানকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, স্বীয় তনয়ের সঙ্গে শিক্ষা দিতে থাকেন। ঈশান বয়প্রাপ্ত হইয়া গুরুর সন্নিধানেই নিয়ত বাস করিতেন। গুরুদেব শিষ্যকে সাতিশয় প্রীতি করিতেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালীন, শিষ্য ঈশান তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গুরুর আদেশ অনুসারে গুরুর তিরোধানের পর ঈশান জন্মভূমি শ্রীহট্টে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। গুরুপত্নী সীতাদেবীর আজ্ঞানুসারে ৭৬ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের চরিত অবলম্বনে 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। গুরু পত্নীর আদেশে ঈশান ৭০ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। পদ্মানদীর তীরস্থিত তেওথাগ্রামে বিবাহ হয়। পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। ১৭৪৪ খ্রীঃ

অব্দে লাউড়রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাঁহার বংশধরেরা উল্লিখিত তেওথার নিকটবর্ত্তী ঝাকপাল গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় এখনও তাঁহার বংশধরেরা আছেন।

ঈশান বর্ম্মা — কনৌজের মৌখারী বংশীয় নরপতি ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম উপগুপ্তা। তাঁহার সময়ে মৌখারিবংশের বিশেষ উন্নতি হয়। তিনিই প্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। মৌখারি বংশীয়েরা হুন দিগকে ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য বার বার তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত শর্ব্ববর্ম্মা। এই বংশের প্রথম রাজার নাম হরিবর্ম্মা তিনিই মৌখারী রাজবংশের স্থাপয়িতা। হরিবর্ম্মার পুত্র আদিত্য বর্ম্মা, তৎপুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা, ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র ঈশান বর্ম্মা, ঈশানবর্ম্মার পুত্র শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যাবর্ম্মা। ঈশানবর্ম্মার পূর্ব্ব পুরুষগণ মহারাজা উপাধি ধারণ করিতেন না। ঈশান বর্ম্মাই মৌখরী রাজবংশের সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন বলিয়া বিবেচিত হয়। একখানা শীলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত গুপ্ত রাজবংশের সখ্যতা ছিল না। কিন্তু তাঁহার পিতামহ আদিত্য বর্ম্মার সহিত গুপ্তরাজ বংশের সৌহার্দ্দ্য ছিল পণ্ডিতেরা বলেন, দ্বিতীয় গুপ্তরাজ বংশের হর্ষগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুপ্তার সহিত, আদিত্য বর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। ঈশানবর্ম্মা যদিও গুপ্ত রাজবংশের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, তথাপি প্রবল পরাক্রান্ত হুণদের আক্রমণ কালে উভয়ে একযোগে হুণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে গুপ্তবংশের কুমারগুপ্ত কর্ত্তৃক ঈশান বর্ম্মা পরাজিত হইয়াছিলেন। ঈশান বর্ম্মা নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের বারাবাঁকী জেলার হার্হা নামক স্থানে প্রাপ্ত ঈশান বর্ম্মার রাজত্ব কালের একখণ্ড শিলালিপিতে তাঁহার রাজত্বকাল ৫৩২ খ্রীঃ অব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। অনুমান ৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈশানবর্ম্মার পূর্ব্ব পুরুষদের নামে কোন মুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ নাই, বোধ হয় তাঁহারা সেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈশান বর্ম্মা গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তখন গৌড়ের রাজা কে ছিলেন জানা যায় নাই। ঈশানবর্ম্মার শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা নামক দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর শর্ব্ববর্ম্মা রাজা হন। শর্ব্ববর্ম্মা নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরের দেবতা বরুণবাসীর পূজার জন্য বরুণিকা গ্রাম দান করেন। বরুণিকা গ্রামে গুপ্ত রাজবংশের দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের

খোদিত যে শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে। দেবতা কপালেশ্বরের পূজার জন্যও তিনি পাঞ্জাবের নির্ম্মন্দ গ্রামে ভূমি দান করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল অনির্ণীত। ভ্রাতা সূর্য্যবর্ম্মা কতকাল জীবিত ছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কটকের সোমবংশীয় রাজা মহাশিব গুপ্তের একখানি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, মহাশিব গুপ্তের পিতা হর্ষ গুপ্তের সহিত সূর্য্য বর্ম্মার কন্যা বাসটা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। সূর্য্যবর্ম্মার সময়ে মৌখরি বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইহার শাখাবংশে অবন্তি বর্ম্মা নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। শর্ব্ববর্ম্মার রাজত্ব কালেই তিনি মগধের একাংশে আধিপত্য করিতেন মনে হয়। হর্ষচরিতে কোন মালব নরপতি কর্ত্তৃক অবন্তি বর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার পরাজয় ও মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ক্ষত্রবর্ম্মা নামক একজন মৌখরি নরপতির কথা হর্ষ চরিতে উল্লেখ আছে। তিনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন তাহার ঠিক জানা যায় নাই। বর্ণিত আছে যে, তিনি চারণের গান শুনিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার শত্রু প্রেরিত চারণেরা 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষত্রবর্ম্মাকে নিহত করিয়াছিলেন। নেপালের লিচ্ছবি বংশের রাজা অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, মৌখরি রাজ শূরসেন অংশুবর্ম্মার ভগিনী ভোগদেবীকে বিবাহ করেন। শূরসেনের পুত্রের নাম ভোগ বর্ম্মা ও কন্যার নাম ভাগ্য দেবী। আর একটী মৌখরি বংশের শাখার প্রতিষ্ঠাতা যজ্ঞবর্ম্মা, পুত্রের নাম শার্দ্দুল বর্ম্মা, তৎপুত্র অনন্ত বর্ম্মা। গুপ্ত রাজবংশীয় নরপতিগণ মৌখরিগণকে সাময়িক ভাবে বশ্যতা স্বীকার করাইলেও মৌখরিগণ কখন কখন প্রবল হইয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া তাঁহাদের একাধিপত্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

ঈশানেশ্বর সর্ব্বাধিকারী।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌-চেন্‌সেলার স্বর্গগত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ এবং সর্ব্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িতা। মহাত্মা সুরেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মন্ত্রী ছিলেন। ভারতশাসন ব্যাপারে তাঁহার প্রভাব বড় সামান্য ছিল না।

ঈশ্বর—সঙ্গীত রচয়িতা। ইনি সাধন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামবাসী বলিয়া অনুমিত হয়।

ঈশ্বর—ইনি রাম স্তোত্র ও কৃতি স্তুতি নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ঈশ্বর কৃষ্ণ—মধ্য যুগের একজন ব্রাহ্মণ দার্শনিক। তিনি সাংখ্য মতাবলম্বী;

ছিলেন এবং সাংখ্যকারিকা নামে এক-খানি প্রামাণ্য টীকা রচনা করেন। তিনি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা এখনও ঠিক নিরূপিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক, আবার মতান্তরে দ্বিতীয় শতাব্দীর। বার্ষগণের শিষ্য বিন্ধ্যবাস ও ঈশ্বরকৃষ্ণ একই ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। খ্রীঃ ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ অব্দের মধ্যে পরমার্থ নামক এক জন বৌদ্ধ পণ্ডিত সাংখ্য কারিকা চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যসপ্ততি নামে অপর একখানা গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরিচিতও ছিলেন। এইরূপও উক্ত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীভাব বর্ত্তমান ছিল। একবার ঈশ্বর কৃষ্ণ ও দিঙ্‌নাগ বিচারে প্রবৃত্ত হন। ঐরূপ দার্শনিক বিচারের নিয়মানুসারে যাঁহারা পরাস্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে বিজেতার মত বা ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইত। ঈশ্বর কৃষ্ণ কিন্তু দিঙ্‌নাগের সহিত তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কাঁচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৩২ শকের ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার (১৮১০ খ্রী ৯ই মার্চ্চ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার সন্নিহিত শিয়াল ভাঙ্গার নীল কুঠীতে চাকুরী করিতেন। তিনি বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পিতা আবার বিবাহ করেন। এই সময় তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। এখানে থাকিয়া তিনি পাঠে মনোযোগী হন। ইংরেজী শিক্ষায় ততদূর অগ্রসর না হইলেও, তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে গুপ্তি পাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল না। কলিকাতার অন্তর্গত পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল। তাঁহারই অর্থ সাহায্যে ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (১৮৩০ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী) সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা বাহির করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পত্রিকা উঠিয়া যায়। কাণাই ঠাকুরের সাহায্যে ১২৩২ সালে ইহা পুন প্রকাশিত হয়। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর দৈনিক রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্র।

১৩৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) রসরাজ নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় পত্রিকায় অশ্লীল কবিতা সকল প্রকাশিত হইত। সুখের বিষয় উভয় পত্রিকা অল্পায়ু হইয়াছিল। ১২৫৪ সালে তিনি 'সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতে বঙ্কিম চন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র বৃন্দের কবিতা প্রকাশিত হইত। ১২৬০ সালের বৈশাখ হইতে তিনি 'প্রভাকর' নামে একখানি বৃহৎ আকারের মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রিকায় 'প্রবোধ প্রভাকর' 'হিত প্রভাকর' 'বুধেন্দু বিকাশ' নামক তাঁহার তিন খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দশ বৎসর কাল বঙ্গ দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে রামপ্রসাদ সেন, রামবসু, রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বসু, নৃসিংহ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গকবির জীবন চরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে ১২৬২ সালে ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। প্রাচীন কবির জীবনী ও কাব্য প্রকাশে তিনিই প্রথম ব্রতী হন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ তিনি পরলোক গমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন (১৮২০ খ্রীঃ ২৮ শে সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার হুগলী (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাসের সাত পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহের নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, পরিবারবর্গকে লইয়া কলিকাতায় বাস করা সম্ভব হইত না; দরিদ্র হইলেও পুত্রের সুশিক্ষার জন্য ঠাকুরদাসের বিশেষ চেষ্টা ছিল। বাল্যকালের প্রথম কয় বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামেরই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া মাত্র নয় বৎসর বয়সেই পিতার সহিত কলিকাতায় গমন করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আসিবার সময়ে পথিপার্শ্বস্থিত প্রস্তর খণ্ডে খোদিত দূরত্বজ্ঞাপক ইংরেজি সংখ্যা চিহ্নগুলি আয়ত্ব করিয়া ফেলেন।

কলিকাতায় আসিবার পর ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। (১৮২৯ খ্রীঃ ১লা জুন)। ঐ বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় এগার বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ পূর্ব্বক ছাত্র জীবন সমাপন করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই কলেজের সাধারণ পরীক্ষা ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষয়েও নিজ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃতে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন তৎপরে একবার সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া এবং আবার সংস্কৃতেই দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া, দুইবার একশত টাকা করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু আইন সম্বন্ধে এক পরীক্ষা দিয়া প্রশংসা পত্র পান। কলেজে থাকিবার সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নাই। পরে নিজ চেষ্টায় অতি উৎকৃষ্টরূপে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ছাত্র জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে অতি কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। তিনি কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার আরও দুইটি অনুজ অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। পাচক বা দাসদাসী বেতন দিয়া রাখিবার ক্ষমতা ঠাকুরদাসের ছিল না। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রকেই স্বহস্তে রন্ধন ও অন্যান্য কাজ সমাপন করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। অনেক সময়ে রন্ধন করিবার সময়েই ফাঁকে ফাঁকে পড়িয়া লইতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কোনও দিন অধ্যয়নে বীতস্পৃহ হন নাই, অথবা গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রথমে ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে নবাগত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে হইত। তজ্জন্য ভালরূপ ইংরেজি শিক্ষা করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক উৎকৃষ্টরূপে ইংরেজি শিক্ষা করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) নিযুক্ত হন। তখন সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বাধিকারীর (Principal) পদ সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের (রসময় দত্ত) সহিত কার্য্য প্রণালী লইয়া মতভেদ হওয়াতে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ

করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৫০ খ্রীঃ) তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে মাসিক নব্বই টাকা বেতনে সাহিত্য শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) ও তাঁহার সহকারীর পদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বাধিকারীর (Principal) পদ সৃষ্ট হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে প্রথমে ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন, ঐ পদে তাঁহার বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, মাসিক তিনশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে, উক্ত কার্য্যের অতিরিক্ত মাসিক সর্ব্বমোট পাঁচশত টাকা বেতনে, বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ পরিদর্শকের পদও লাভ করেন। ঐ পদে অবস্থিত থাকিবার সময়ে তিনি বঙ্গের ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু মিঃ ইয়ং নামক একজন অল্প বয়স্ক সিভিলিয়ান তখন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা (Director) ছিলেন। ঐ সকল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ব্যপদেশে দেশের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মতান্তর উপস্থিত হয়। ইয়ং সাহেব তাঁহার কার্য্যে নানারূপে বাধা দিতে আরম্ভ করেন। তৎফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত, হইয়া অম্লানবদনে মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের চাকুরী পরিত্যাগ করেন। (১৮৫৮ খ্রীঃ)

তদনন্তর ঈশ্বরচন্দ্র পুস্তক রচনা মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। পূর্ব্বেও তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই, তিনি 'বাসুদেব চরিত' নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), জীবন চরিত বিষয়ক একখানি পুস্তক (১৮৫০) প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কলেজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই তিনি ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী নামে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণালয় এবং বিক্রয়ের জন্য তৎসংলগ্ন পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। মাত্র চারি দিনের পরিশ্রমে ঐ পুস্তক রচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে নিম্ন লিখিত পুস্তকাবলী রচনা অথবা সংকলন করেন—ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ারের 'কমেডি অব্ এরার্স (Comedy of Errors) নামক গ্রন্থাবলম্বনে 'ভ্রান্তি বিলাস', 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'কথামালা' 'বোধোদয়' 'চরিতাবলী' 'আখ্যান মঞ্জরী' প্রভৃতি বিদ্যালয় পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক, 'উপক্রমণিকা',

'ব্যাকরণ কৌমুদী' (চারি ভাগ), 'ঋজু পাঠ' প্রভৃতি সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পুস্তক, সটীক 'মেঘদূত', 'উত্তর-রাম চরিত', 'শকুন্তলা' (বাঙ্গালা), এবং 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এই সকল পুস্তকই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছে।

বিধবাবিবাহ প্রচলন ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। পরবর্ত্তী জীবনে বালবিধবাদের জন্য তাঁহার মনে যে দারুণ কষ্ট ও তজ্জনিত সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহার উন্মেষ প্রথম জীবনেই লাভ হয়। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় অতি বৃদ্ধ বয়সে এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার পাণিপীড়ন করেন। বাচস্পতি মহাশয় বিবাহের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন বলাবাহুল্য সে প্রতিবাদে কোনও ফল হয় নাই। বিবাহের অল্পকাল পরেই বাচস্পতি মহাশয় পরলোক গমন করেন। আর একবার তাঁহারই গ্রামে একটি বালবিধবার চরিত্রস্খলন হয় এবং সে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করে। বিধবার আত্মীয় স্বজনেরা লোকলজ্জা ভয়ে সেই সদ্য প্রসূত শিশুকে বধ করেন। এই ঘটনাও ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ভবিষ্যৎ জীবনে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি অশ্রু-মোচন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে সংকল্প করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন একদিকে যেমন সনাতনরীতি পক্ষপাতী ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, আবার সেইরূপ বহু বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁহার চেষ্টার সহানুভূতি দেখাইতে ও নানারূপে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহপূর্ব্বক উহা দেশ-মধ্যে প্রচলন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতক-গুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনার জন্য তাঁহার সেই চেষ্টা তাদৃশ সফল হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে দেশের লোকের মনোভাব বিধবা বিবাহের অনুকূলে আনয়ন করিবার জন্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তৎফলে প্রথমে এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পতিত হয়। প্রবন্ধে তিনি যে সকল শাস্ত্রীয় মত প্রকাশ করিতেন, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার জন্য, তাঁহাকে অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে

বসিয়া সংস্কৃত পুঁথি সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিতেন। অবশেষে একদিন পরাশর সংহিতান্তর্গত "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে"॥ এই অমূল্য শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি ঐ শ্লোকটিই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহের বৈধতার স্বপক্ষে যুক্তি-সঙ্গত পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নামক কর্ম্মকার জাতীয় এক ব্যক্তি নিজ বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া, পণ্ডিত মণ্ডলীর ব্যবস্থা প্রার্থী হন। তাহাতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যা-বাগীশ প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ বিধবাবিবাহ-পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন। ঐ সময়েই শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের বাটীতে আহূত এক বিচার সভায় পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া জয়ী হন। এই ভাবে নানাস্থানে পৃথক পৃথক ভাবে বিধবাবিবাহের বৈধতার অনুকূলে মত প্রকাশ হইলেও, উদ্যোগী হইয়া বিশেষ কেহই বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন নাই। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র দেশ-মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে নানাস্থানে সভা হইতে লাগিল। পুস্তিকাদি প্রচার দ্বারা অনেকে তাঁহার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভাপ্রসূত সুসঙ্গত শাস্ত্র ব্যাখ্যার ক্ষুর ধারে প্রতিদ্বন্দীদের যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঐ সকল কূট তর্কের মীমাংসা করিয়া ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তিনি বৃহদাকারে দ্বিতীয়বার বিধবা বিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া অশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিয়া, তিনি দেশের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা প্রমাণ হইয়া দেশের নানা স্থানে বিবাহ হইতে থাকিলে, আর এক গুরুতর প্রশ্ন সমর্থকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হয়। তাহা এই যে,—বিধবা বিবাহ সম্ভূত সন্তানেরা তাহাদের পিতৃ সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবে কিনা। এই বিষয়ে আশু মীমাংসার জন্য বহু পদস্থ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইল। সেই আবেদন-পত্রে হিন্দু দায়ভাগের সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়। সেই আবেদনে তৎকালীন কলিকাতার বহুপদস্থ

লোক স্বাক্ষর করেন। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতপচাঁদ বাহাদুর স্বতন্ত্র একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কলিকাতার বাহিরে নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকও ঐরূপ আবেদন প্রেরণ করেন। বহু সহস্র লোক এইরূপ সমবেতভাবে উপরোক্ত আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করায় বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিধবা বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া বিখ্যাত গায়ক দাশুরায় এক পাঁচালীর পালা রচনা করিলেন। নানাস্থানে সঙ্গীত রচিত হইতে লাগিল। বিধবা বিবাহ নাটক রচিত হইয়া অভিনীত হইল। শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে বিধবা বিবাহের গানের পদ বুনিতে লাগিল। এইভাবে দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধেও একটি প্রবল সঙ্ঘ ছিল। শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ঐ দলের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। সেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার ছিল। যাহা হউক নানারূপ বিপক্ষতাসত্ত্বেও ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল।

রাজানুগ্রহে বিধবাবিবাহের, বৈধতা প্রতিপাদক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন না। অতঃপর তিনি পরমোৎসাহে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আইন প্রণীত হইবার পর চারিমাসের মধ্যেই মহাসমারোহে কলিকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বালবিধবা কন্যা কালীমতীকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করেন। কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়ায় কন্যার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যা সম্প্রদান করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই পাণিহাটি গ্রামনিবাসী কৃষ্ণকালি ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষ, কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে দেশের নানাস্থানে দুই একটি করিয়া বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইতে লাগিল। ঐ সকল বিবাহের অনেকগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়াছিল।

প্রথমতঃ বহু ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে একে একে অনেকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র অচিরেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। যে সকল মহানুভব ব্যক্তির নিকট সাহায্য পাইবেন আশা করিয়া তিনি কার্য্যে লিপ্ত হন, তাঁহাদের অনেককেই ঐ ভাবে পশ্চাদ্পদ হইতে দেখিয়া, তিনি বিশেষ মনোবেদনা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যথার্থ পুরুষসিংহের ন্যায় কখনও তজ্জন্য নিজ কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার ঐরূপ অর্থকষ্টের সময়ে মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ সুহৃদেরা তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। বন্ধু-বান্ধবগণের সহায়তালাভে বঞ্চিত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদূর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পুনরায় রাজকর্ম্মগ্রহণ করিবার বাসনা মনে উদয় হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি তদানীন্তন বাঙ্গালার ছোটলাট বীডন সাহেবের (Sir Cecil Beadon), সহিত পত্রালাপ করেন। কিন্তু পরে, ঐ কাজের জন্য তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ তাঁবেদারী করিতে হইবে, আশঙ্কা করিয়া তিনি ঐ চেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টায় ব্রতী হওয়া অবধি একাধিক ব্যক্তি তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করে। এমন কি কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধ করিবার চেষ্টাও করে। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রাণরক্ষার জন্য রক্ষীপরিবৃত হইয়া গমনাগমন করিতেন।

তিনি যখন পরম উৎসাহে বিধবা বিবাহ প্রচলনে লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা এই বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিত যে তিনি কেবল অপরের বিধবা বিবাহেই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য যখন তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করিবেন বলিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য ঐ বিবাহ সংঘটিত হওয়ায় শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার নিন্দা করিতে আর সাহসী হয় নাই।

বিধবা বিবাহ দিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলিয়া, তিনি বহু বিবাহের উপরও অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। বিধবা বিবাহে তাঁহার আগ্রহের বিষয় জানিয়া অনেক দুষ্টবুদ্ধি লোক এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট সাহায্য পাইবার লোভে, পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া বিধবা বিবাহ করিত অথবা প্রথমে বিধবা বিবাহ করিয়া পুনরায় অপর একটি কুমারীর পাণি-পীড়ন করিত। এইরূপ কয়েকটি ঘটনা তাঁহার গোচরে আসিলে, তিনি

অতিশয় মর্ম্মপীড়া লাভ করেন এবং তাহার পর হইতে যাহারা বিধবা বিবাহ করিতে আসিত, তাহাদের দ্বারা একটি একরারনামা লিখাইয়া লইতেন। এতদুপলক্ষে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের তিন আইনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিধবা বিবাহকারীদের স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্বিবাহ যাহাতে নিরোধ করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

বহুবিবাহ নিরোধের জন্য তাঁহার সে চেষ্টাও বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টার ন্যায় বিপুল ও বহুবিস্তৃত ছিল এই কার্য্যের জন্য তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, নানা স্থান হইতে বহু বিবাহকারী কুলীনদিগের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এক সুবিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পুস্তকে তিনি "অতি বিস্তৃতভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত এবং কৌলিন্যপ্রথা নিবন্ধন যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সেই সকল অনাচারকে সদাচারে পরিণত করিতে সমাজকে কতদূর খর্ব্ব ও হীনবল হইতে হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন।" তাঁহার বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা প্রথমতঃ বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টার ফলে, স্থগিত থাকে। গভর্ণমেন্টও প্রথমে একবারে দুইটি সমাজ সংস্কার মূলক কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন না বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বহু বিবাহ নিবারণকল্পে মনোসংযোগ করেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও দেশের পদস্থ ও মান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সহায়তা করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ব্যাপকভাবে বহু-বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। বহু বৎসর ধরিয়া সেই আন্দোলন চলে। এই বিষয়েও বহু বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরসহ (সর্ব্বমোট প্রায় ২৫০০০ ব্যক্তির সহিযুক্ত) এক আবেদন রাজসকাশে প্রেরিত হয়। তৎপরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ আবার দ্বিতীয় আবেদন পত্র বঙ্গের ছোটলাট স্যর সিসিল বিডন সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ঐ পত্র লাট সকাশে পাঠ করেন এবং ছোটলাটও সহানুভূতি সূচক উত্তর প্রদান করেন। কেবল রাজসকাশে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্য উপায়ে বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুলীনগণ অগ্রসর হইয়া এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হন কিনা, তিনি তাহারই সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ঢাকা জিলার তারপাশা নিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দেবীবরের মেলবন্ধন ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বদ্বারী বিবাহ

সম্মত হইয়াছিলেন। এ দেশে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ না করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া বহু বিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিবেন যে "মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘুচেনা কেন" ?

বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহু বিবাহ নিরোধের চেষ্টা, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় দুইটী প্রধান কাজ। তদ্ভিন্ন তিনি নানা ভাবেও দেশের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা তাহার মধ্যে প্রধান। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় যে বঙ্গদেশীয় মাদক সেবন নিবারণ সভা (Bengal Temperance Society), স্থাপিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন তাহার একজন উৎসাহী সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে 'সম্মতি আইন' সম্পর্কে দেশে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়াও বালিকা স্ত্রীদিগকে যাহাতে উপযুক্তরূপে নিরাপদ করা যাইতে পারে, সেইভাবে আইন বিধিবদ্ধ হউক। এবং দ্বিতীয় সংস্কার-কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোনও স্বামীর, বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিতে পাওয়া দণ্ডনীয় হউক।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর-চন্দ্র নানারূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নিজ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে বড়লাট লর্ড হার্ডিং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবমত একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার অর্পণ করেন। ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রার্থী শিক্ষকগণের যোগ্যতার বিচার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন, তখন তথায় অধ্যাপনা ও অন্যান্য কার্য্যে কোনওরূপ শৃঙ্খলা অথবা সুবন্দোবস্ত ছিল না। অধ্যাপক-গণ স্বেচ্ছামত অধ্যাপনা করিতেন। ছাত্রগণেরও অধ্যয়নের জন্য আগমনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। তিনি সকল বিষয়েই সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও নিয়মানুবর্ত্তীতার প্রচলন করেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়েও নানারূপ নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। সেই সকল প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ১৮৫০

খ্রীঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাহার কিছুকাল পরেই রসময় দত্ত উক্ত কলেজে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলে, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অবস্থা এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে প্রস্তাব করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহারই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ঐ কলেজের সেক্রেটারী ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ উঠাইয়া দিয়া প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হয়। তদনুসারে ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রেরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পাইত। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথমে সকল জাতির ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সকল বাধাই দূর হইয়া যায়। তাঁহারই অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজের পাঠার্থীদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ভবিষ্যতে যখন রাজকোষে অর্থের অভাব হইবে, তখন ব্যয়সংকোচ ব্যপদেশে রাজপুরুষগণ হয়ত সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়াও দিতে পারেন, এই আশঙ্কায়ই তিনি বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা সংস্কৃত কলেজের এই আয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইত। ইহাতে অযথা অধিক কালক্ষেপ হইত এবং ব্যাকরণের নীরস সূত্রাদি আয়ত্ব করিতে অসমর্থ হইয়া ছাত্রগণ সংস্কৃত সাহিত্যেরপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িত। এই বিষয় সম্যক অনুধাবন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ব্যাকরণের অধ্যয়ন সহজ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' নামে নূতন প্রণালীতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে প্রায় সেই প্রণালীতেই 'ব্যাকরণ কৌমুদী' চারি ভাগ প্রণীত হয়। উপক্রমণিকাখানি প্রধানতঃ তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষার সুবিধার জন্য রচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে শিক্ষায়তন সমূহে যে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা ঈশ্বরচন্দ্রই প্রবর্ত্তিত করান।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি

সাধনোপযোগী প্রস্তাবাবলী সংকলন করেন। সেই প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই গৃহীত হইয়া তদনুরূপ সংস্কারাদি সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী যেরূপ বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেইরূপ সেই সকল বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য 'নর্ম্মাল স্কুল'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বপ্রথম 'নর্ম্মাল স্কুল' কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই উপরে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের পূর্ব্বে ইংরেজি শিক্ষা স্বেচ্ছাধীন ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা বাধ্যতামূলক করেন। হিন্দুকলেজের পদক প্রাপ্ত ও বৃত্তিধারী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, প্রথম ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণও উক্ত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

বঙ্গের ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের আমলে পুরাতন শিক্ষা-সমিতি (Education Council) উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে 'ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকৃশন' (Director of Public Instruction) নামে শিক্ষাবিভাগের এক কর্ম্মকর্ত্তার পদ সৃষ্ট হয়। উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং (William Gordon Young) নামে একজন যুবক সিবিলিয়ান উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এই ইয়ং সাহেবের সহিত নানা বিষয়ে মতান্তর হইতে হইতে পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাধ্য হইয়া অম্লান বদনে পাঁচশত টাকা বেতনের চাকুরীটি পরিত্যাগ করেন। (১৮৫৮ খ্রীঃ আগষ্ট)। কর্ম্মত্যাগের পর তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেম্‌স কলভিন (Sir James Colvin) সাহেবের অনুরোধে আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী করিবার মানসে তিনি কিছুকাল তাঁহার বন্ধু দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় এবং ঐ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন।

শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর — ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা, ভারতবাসী সাধারণ লোকমণ্ডলীর শিক্ষাবিধানের জন্য, কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং সেই অর্থব্যয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, সে বিষয়েও কতকটা আভাষ দিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে মেকলে ও লড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির অনুসরণে, তদানীন্তন মন্ত্রীসভা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইয়া, কয়েকটি জিলায় বহুসংখ্যক

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নানাস্থানে আদর্শ বিদ্যালয়সমূহ (Model Schools) স্থাপন করিতে থাকেন। এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন, তাহাদের পরিচালন ও তদানুসঙ্গিক বিষয়ে যে অর্থব্যয় হইত, প্রধানতঃ তাহা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ইয়ং সাহেবের সহিত, তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালে যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন যে ছয়জন দেশীয় ব্যক্তি উহার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। ঐ বৎসর যে পরীক্ষক সমিতি (Board of Examiners) গঠিত হয়, তাহাতে বিদ্যা-সাগর মহাশয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ও উড়িয়া এই চারি ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনার ভার প্রাপ্ত এবং পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন। কিছুকাল পরে পরীক্ষক সমিতি পুনর্গঠন করিবার সময়ে তিনি আর কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। কেবল ১৮৬৫ খ্রীঃ একবার এম্-এ পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবার পর একবার সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এবং বহুবিধ যুক্তি ও তর্ক সহযোগে প্রতিপক্ষগণকে একেবারে নিরস্ত করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রম সমভাবেই উল্লেখযোগ্য। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরম সহায়ক বেথুনসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হয়। বেথুন সাহেবের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহী কার্য্যকারক হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল এবং বেথুন সাহেবের শোচনীয় অকালমৃত্যুর পরও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন। ঐ বিদ্যালয়ের নামই পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বেথুন স্কুল (পরে কলেজ) হয়। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংএর পত্নী ঐ বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। ঐ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া এই চারিটী জিলায় পঞ্চাশটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন। ঐ সকল

বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি, এই সকল বিষয় লইয়াও ইয়ং সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে পরহিতব্রতী ইংরেজমহিলা মিস্ কার্পেণ্টার (Miss Mary Carpenter) যখন ভারত ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুতা স্থাপিত হয়। তাঁহারা উভয়ে অনেক স্থলে গমন করিয়া, বালিকাবিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতেন। ঐভাবে একবার উত্তরপাড়া গমন কালে, পথিমধ্যে গাড়ী উল্টাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাতের ফলেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীর অভাব সকলেই অনুভব করিতে থাকেন। তজ্জন্য মিস্ কার্পেণ্টার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বেথুন স্কুলে কতকগুলি মহিলাকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হউক। কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, এক সুচিন্তিত পত্রে, ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেন। দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক বিতর্কের পর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের জন্য 'নর্ম্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদান স্থির হয়। কিন্তু সেইরূপ বিদ্যালয়ও প্রকৃতপক্ষে আরও দুই বৎসরেরও অধিককাল পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান চেষ্টায় স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ব্যক্তিগত কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করিলেও, স্ত্রী শিক্ষার সুপ্রচার সাধন কল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত হৃদয়ের পূর্ণযোগ ছিল।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই পরিচালকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় দুইটি স্কুল স্থাপিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরাতন বিদ্যালয়টির সহিত প্রথমে যোগরক্ষা করেন নাই। পরে পরিচালকগণ সকলেই বিদ্যালয় পরিচালনায় অসমর্থ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উহার ভার অর্পণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'হিন্দু মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন'

হইল। প্রথমতঃ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঐ বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত এক যোগে কাজ করিতেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তিতে, উহার সমুদয় ভার তাঁহার উপর পড়ে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ঐ বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং তাঁহার সুব্যবস্থার গুণে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ভিন্ন দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও জাতি গঠন মূলক কার্য্যের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র আমরণ যুক্ত ছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতেন। মেট্রপলিটন কলেজের আয় হইতে তিনি কোনও দিন নিজে লাভবান হইবার চেষ্টা করেন নাই। কলেজের সমস্ত টাকা তিনি কলেজের উন্নতির জন্যই ব্যয় করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত সেণ্ট্রেল টেক্‌স্‌ট বুক কমিটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত কমিটি যে সকল পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিবেন, তিনি গ্রন্থকাররূপে সে সকলের ফলভোগী হইবেন। সে স্থলে ঐ কমিটিতে বিচারকরূপে তাঁহার আসন গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না, এই বিবেচনায় তিনি উক্ত কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন নাই।

বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে স্বচ্ছ সাবলীল গতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম প্রদান করেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহার পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা অনুস্বার বিসর্গ বর্জ্জিত সংস্কৃত মাত্র। তিনি বহু চিন্তা ও শ্রম স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সহজ বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন ; তিনি একাধারে ভাষার মধুরতা ও কোমলতার সৃষ্টি এবং বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। (তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান পুস্তকের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে)। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা রচনায় ইংরেজির মত বিবিধ প্রকার বিরাম চিহ্ন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রধান মহত্ব লোকসেবা ও পরদুঃখকাতরতা। এই দুই মহদ্‌গুণের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে সকল দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য করিয়াছিলেন, সে সকলের সামান্য বিবরণ দেওয়াও এস্থলে সম্ভব নহে। বস্তুতঃ তেজস্বিতা, নির্লোভ, পরদুঃখকাতরতা, নিঃস্বার্থপরতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি মানব চরিত্রের মহৎগুণাবলীর একত্র সমাবেশ তাঁহার ভিন্ন অল্প লোকের জীবনেই লক্ষিত হইয়া থাকে। পরিচিত অপরিচিত ভেদে কোনও সাহায্য প্রার্থীই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া

নিরাশ হয় নাই। মহাকবি মধুসূদন ইংলণ্ডে অর্থাভাবে যখন প্রায় অনশনে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন দেশীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেই সাহায্যপ্রার্থী হন। বলা বাহুল্য কবির আশা অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার মহৎ গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া অনেক লোক কূটবুদ্ধিবশতঃ তাঁহার ক্ষতিও করিয়াছিল; কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও তাহাতে দুঃখিত হন নাই। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি যখন সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কর্ম্মাটারে বাস করিতে যাইতেন, তখন সাঁওতাল নরনারীদের ব্যবহারে জন্য নানাবিধ বস্তু লইয়া যাইতেন। তাহাদের পীড়ার সময়ে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার সহৃদয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কত লোক যে, তাঁহাকে আর্থিক বিষয়ে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোনও দিন, নিজ স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেন নাই। ১২৭২ সালের অব্দের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ১২৭৩ সালের প্রথম ভাগে দেশে এক মন্বন্তর উপস্থিত হয়। সেই সময়ে তিনি বীরসিংহ গ্রামে অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখেন। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশ্রাম লাভ ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিতেন। পরে প্রাণান্তকর ম্যালেরিয়া রোগ যখন বর্দ্ধমানেও সংক্রামিত হইয়া, তথাকার সুখ ও স্বাস্থ্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, তখনও তিনি নিজে তৎস্থানীয় লোকদের সুচিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া অনেকের জীবন,রক্ষা করেন।

পরবর্ত্তীজীবনে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার উপকারিতা সম্যক্ অবধারণ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রণালীর চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী হন। পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি ঔষধ প্রেরণ করিতেন। নিজেও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারে সাধারণতঃ একজন লোকের উপার্জ্জনের উপরেই সকলেই নির্ভর করিয়া থাকে। সেই একজন লোকের মৃত্যু হইলে সকলেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি ভাণ্ডার (Hindu Family Annuity Fund) স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে

প্রতিষ্ঠাতাদের কাহারও কাহারও সহিত মতান্তর হওয়াতে তিনি উহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন গো-বীজ হইতে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করিতে মনস্থ করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু সমাজপতি নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সাহায্যে ইংরেজি টীকা প্রচলনে সহায়তা করেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় জার্ম্মেণীর অন্তর্গত লিপ্‌জিক নগরে সমবেত মনস্বীমণ্ডলীর প্রদত্ত সম্মান-চিহ্নে সম্মানিত হন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম্মমত সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনও এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমত জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে সহজে কাহাকেও স্পষ্টরূপে নিজ অভিপ্রায় জানিতে দিতেন না। ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে একবার বলিয়াছিলেন "গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।"

ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার দৌহিত্র (জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্র) ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া নানারূপ পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে ঠাকুরদাস কাশীবাস করিতেন। পারিবারিক জীবনে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ নিকট আত্মীয়দের অবিবেচনার জন্য বিশেষ মনোকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুজ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় একবার সংস্কৃত যন্ত্র ও তৎসংলগ্ন পুস্তকাগারের অংশের প্রার্থী হইয়া আদালতে মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। পরে উহা আপোসে মীমাংসা হইয়া যায়। তাঁহার পারিবারিক জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর বিষয় এই যে, একটি বিধবাবিবাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া, চিরকালের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। বহু বৎসর পরে, অনেক কাতর অনুরোধে শেষে আবার বীরসিংহে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া আর তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। বীরসিংহে গমন করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া, তিনি মাতাপিতাকে পত্রদ্বারা সে বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনুজগণকেও যথাযোগ্য পত্র লিখিয়া উপদেশাদি প্রদান করেন, এবং সকলকেই যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পুত্র নারায়ণচন্দ্র কোনও কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অশেষ বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা প্রথমে কাশীতে দেহরক্ষা করেন। পরে পিতা ঠাকুরদাসও তথায় পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র

কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষ ভাগে তিনি নিজে গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন, তাহার পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। বহু সুচিকিৎসকের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও কোনও ফল লাভ হয় নাই। ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ মধ্য রাত্রিতে এই মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সর্ব্বাঙ্গীন মহত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্রের মহানুভাবতা পরিস্ফুট হইবে।

লোকের অধীন হইয়া চলা, কাহারও তাবেদারী করা, কাহারও কৃপাদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। তিনি চিরদিন দৃঢ়ভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। সংস্কৃত কলেজের কার্য্য প্রণালী লইয়া তৎকালীন কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) রসময় দত্তের সহিত তাঁহার মতান্তর হয়। তৎফলে তিনি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা, কর্ম্মত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। বন্ধু বান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষীদের নানারূপ অনুরোধেও তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। "আলু পটল বেচিব, মুদির দোকান করিব, তথাপি যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না।" ইহাই ছিল সেই পুরুষসিংহের উক্তি এবং কাজও তদনুরূপ ছিল।

পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে উচ্চরাজ কার্য্য প্রার্থী ইংরেজগণ এদেশে আসিয়া, এদেশীয় ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। অসমর্থ ও অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। এই সকল কর্ম্মপ্রার্থী ইংরেজ যুবকদিগের পরীক্ষার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপর অর্পিত ছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া কর্ম্মপ্রার্থী যুবকগণকে এদেশে আগমন করিয়া, যদি অনুত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনঃক্ষোভের সীমা থাকিত না। সেই জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধানাধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরীক্ষার আটাঁআঁটি ভাবটা একটু কম করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে যুবক ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, 'উটি আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকুরী ছাড়িয়া দিব। তবুও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিব না।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও সময়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির কর্ম্ম প্রাপ্তির সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, ঈশ্বরচন্দ্রকেই ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা

হয়। ঐ পদের বেতন নব্বই টাকা ছিল। তিনি তখন পঞ্চাশ টাকা বেতনে অপর এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু নির্ব্বাচিত হইলেও তিনি ঐ পদে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিতে বলেন। এবং যাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের কর্ম্ম প্রাপ্তির কোনও ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং বাচস্পতি মহাশয়ের বাসস্থান কালনায় গমন করিয়া, তাঁহার সম্মতি লইয়া দুইদিনের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক—তিনি জ্ঞানোল্লাস নামক নীতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে ইহা রচিত হয়। কলিকাতার বড় বাজার অঞ্চলে তাঁহার বাস স্থান ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — তিনি ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে প্রথমে আলীগড়ের ডাকমুন্সী ও পরে ট্রেজারীর হেড ক্লার্ক হন। তাঁহার পিতা তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়, সিপাহীবিদ্রোহের সময় আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপূর্ব্বক বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং তথায়ই তিনি পরলোক গমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এক বার দেশে চলিয়া আসেন, পরে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে ফিরিয়া গিয়া, কিছুকাল নানা স্থানে চাকুরী করেন। পরে আলীগড়েই তাঁহার পিতার অর্জ্জিত জমিদারী পরিচালন ও ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হন। তিনি সময়ে সময়ে সাহিত্যানুরাগী লোকদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন আলীগড়ের সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবার।

ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজা—তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ও শিবচন্দ্রের পুত্র। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। তিনি অতিশয় বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে গিরিশচন্দ্র রাজা হন। ঈশ্বরচন্দ্র সারদা মঙ্গল নামক সংগীতসংগ্রহ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গীত গাহিয়া তখনকার লোকেরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার রাজসভাও বিদ্বান্‌গণদ্বারা শোভিত ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার—তিনি প্রভাস খণ্ড নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সার্ব্বভৌম—"দুর্গার্চ্চনা-বারিধি" নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীর নগরের বিখ্যাত জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা—তিনি পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের অন্যতম পোষ্যপুত্র। তিনি ১২৩৮ সালে জন্মগ্রহণ

করেন। হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন। বাল্যাবধিই তিনি বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। কাব্য ও নাটকে তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি-কল্পে তিনি বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার যোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়া উদ্যান ক্রয় করেন। কলিকাতার অভিজাত সমাজে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা বলিয়া, রাজপুরুষগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। পাইকপাড়ার রাজবংশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ। অভিনয়াদি দর্শন করিয়া লোকে যাহাতে আনন্দ লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে স্বীয় বেলগেছিয়ার উদ্যানের মধ্যে অভিনয়ের উপযোগী সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিমিয়া ও ফটো-গ্রাফিতে (আলোক চিত্রাঙ্কণ বিদ্যাতে) তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া, তিনি এতৎসংক্রান্ত যন্ত্রসকল পাইকপাড়ার বাটীতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অশ্ববিদ্যায় তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। বহু ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, এই বিদ্যায় তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। ঘোঁড়া দেখিয়াই তিনি দোষগুণ বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার নিজ উদ্যানে ঘোটক শিক্ষার একটি কারখানা ছিল। অনেক অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ লোক তাঁহার অশ্ব বিদ্যালয় দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এই নানা গুণশালী রাজা ১২৬৭ সালের ১৭ই চৈত্র (১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ) পরলোক গমন করেন। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

ঈশ্বর দত্ত—"কু স্থরী' বংশ পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ঈশ্বরদত্ত নামক "আভীর" জাতীয় রাজা সমুদ্রপথে সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া এই রাজ্য জয় করেন। নাসিক গুহায় ইহার বর্ণনা আছে। ইনি পশ্চিম সমুদ্রতীর জয় করিয়া, ত্রিকুটে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বের রাজার রাজত্ব ১৭০ শকাব্দা বা ২৪৮ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়। ঈশ্বরদত্তও তাঁহার নামে "ত্রিকটক অব্দ" প্রচার করেন।

ঈশ্বর দাস — জ্যোতিষ রায়ের পুত্র ঈশ্বর দাস 'মুহূর্ত্তরত্ন বা রত্নাকর' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (২) ইনি একজন সন্ধি বিগ্রহিক ছিলেন।

ব্রাহ্মণরাজ সংক্ষোভের তাম্রশাসনে ভুজঙ্গম দাসের পুত্র ঈশ্বরদাসকে শাসন-লেখক বা সন্ধি বিগ্রহিক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

ঈশ্বরদাস রাঠোর — দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে, মিবারপতি রাণা উদয়সিংহ ভয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু মিবারের সামন্ত নরপতিগণ মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। তন্মধ্যে ঈশ্বরদাস রাঠোর অসংখ্য তাতার ও পাঠান সৈন্য দলন করিয়া সমরশায়ী হইলেন। উদয় সিংহ দেখ।

ঈশ্বরদেব শর্ম্মা — তিনি একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সামবেদ-কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়ী হেমাশ্বরথ গোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্ম্মা বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণ সেনের মহাদানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর নাগ — ইনি বঙ্গাধিপ ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসন খানি লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পিতার নাম দত্তনাগ।

ঈশ্বর নাথ— নাথপন্থী যোগীদের মধ্যে যাঁহাদের মতবাদ বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ঈশ্বর নাথ একজন বড় সংযমী পুরুষ ছিলেন এবং সকলকেই সংযমী হইতে শিক্ষা দিতেন এবং পরম তত্ত্ব সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন।

ঈশ্বরপুরী—একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপে আগমন করিলে, বিশ্বম্ভরের (পরে চৈতন্য মহাপ্রভু) সহিত মৈত্রি জন্মে। পরে বিশ্বম্ভর গয়াতে তাঁহারই নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বর ফা—নামান্তর নীলধ্বজ। মহা-রাজ যোগেশ্বরের পুত্র নীলধ্বজ চন্দ্র হইতে ৭৩ তম ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ২৮শ ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন। তিনি ৮৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র বসুরাজ (রঙ্গখাই) ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুররাজবংশে তিনিই প্রথম ফা উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিপুর দেখ।

ঈশ্বর বর্ম্মা (১)—তিনি কনৌজের মৌখারী বংশীয় অন্যতম নরপতি। তাঁহার পিতার নাম আদিত্য বর্ম্মা ও মাতার নাম হর্ষগুপ্তা। তাঁহারই সময়ে মৌখারী বংশ অতিশয় প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহার মহিষী উপগুপ্তা হইতে ঈশানবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। মালবের গুপ্তদের সহিত কনৌজের মৌখারী বংশীয়দের চির শত্রুতা ছিল। ঈশ্বরবর্ম্মা মালবের জীবিতগুপ্তকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। হরিবর্ম্মা দেখ।

ঈশ্বর বর্ম্মা (২)—ইনি মগধের মোথারী বংশীয় তৃতীয় রাজা। তাঁহাদের মহারাজ উপাধি ছিল। তৎপুত্র ঈশান বর্ম্মা একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। ঈশান বর্ম্মা দেখ।

ঈশ্বর বৈদিক—ইনি একজন কুলগ্রন্থ রচয়িতা। ইনি সেন বংশীয় রাজাদের কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'সদ্বৈদিক কুল পঞ্জিকা' গ্রন্থও তাঁহার রচিত। ইহাতে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের কুল পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

ঈশ্বর সেন—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকর্ত্তা।

ঈশ্বর সেন—ইনি একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষু দিঙ্-নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়' নামক দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ হইত।

ঈশ্বরা দেবী—ইনি শৈব বর্ম্মরাজ ভাস্করের কন্যা এবং জালন্ধর রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ছিলেন। ডেরাডুন জেলায় ঘড়া নামক একটী সুপ্রাচীন গ্রামে "ললকথা মঙ্গল" নামক অতি প্রাচীন এক মন্দির আছে। ঈশ্বরা দেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত এক শিলালিপি আছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল।

ঈষ্ট, সার এডওয়ার্ড হাইড, (Sir Edward Hyde East)—১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর জামাইকা দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। কিছুকাল তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য ছিলেন। ১৮১৩ ২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপনকর্ত্তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

ঈষ্টারাম—কাশ্মীরের প্রখ্যাত কবি ও ঐতিহাসিক বিল্হনের ভ্রাতা। বিল্হন দেখ।

উইমগি—মহারাজা মনিপুরপতি শূর-চন্দ্র সিংহ ও মহারাজা কুলচন্দ্র সিংহের অন্যতম সেনাপতি। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের মনিপুর বিদ্রোহের সময় তিনি নিহত হন।

উইলকিন্‌স, সার চার্লস — (Sir Charles Wilkins) ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণী হইয়া এদেশে আগমন করেন। বোধ হয় ইংরেজদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। তৎকালীন গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে ভগবদ্‌-গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহারই প্রযত্নে বাংলা ও ফার্শী অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং একটী মুদ্রা যন্ত্রও স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রীঃ সার উইলিয়ম জোন্‌স এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করেন। ইউলকিন্‌স সাহেব এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রচারের তিনিই প্রবর্ত্তক। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রতি-গমন করেন। তিনি হিতোপদেশ ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরঙ্গ পত্তন হইতে আনিত সংস্কৃত হস্ত লিখিত গ্রন্থের রক্ষার ভার তিনি প্রাপ্ত হন। তিনি ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থ-রক্ষক ছিলেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দ্বিতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে রিচার্ডসনের ফার্শী ও আরবী অভিধানের তিনি সম্পাদন করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ তিনি লিখেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, সি, এল (D. C. L. Doctor of Civil Law) উপাধি প্রদান করেন। রয়েল সোসাইটী অব লিটেরেচার তাঁহাকে একটী পদক উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ইউ-রোপের অন্যান্য দেশের জ্ঞানীরাও তাঁহাকে নানাবিধ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই মে তিনি পরলোক গমন করেন।

উইলসন, হোরেস হেম্যান— (Horace Hayman Wilson) ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহার লণ্ডন সহরে জন্ম হয়। ১৮০৮ খ্রীঃ

অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ডাক্তার হইয়া তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া, টাঁকসালে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর ব্যতীত তিনি ১৮১১—৩৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদক ছিলেন। অবসর সময়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সেই ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি কালিদাসের মেঘদূত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। হিন্দুদের থিয়েটার (Theatre of the Hindus) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয়, বর্ম্মা যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। ১৮৩৬ সালে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হন। তিনি বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তিনি উত্তর রাম চরিত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় এই নাটক প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল (১৮৩১ খ্রীঃ)। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

উইলিয়ম নরিস— ইংলণ্ডেশ্বরের (King William III) পক্ষে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তিনি নজর ও উপঢৌকন সহকারে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট কোম্পানীর অনুকূলে আদেশ পত্র দান করিবার প্রাক্কালে সংবাদ পান যে, ইংরেজ জলদস্যুকর্ত্তৃক তিন খানি দেশীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই ঘটনার জন্য বাদশাহ ইংরাজ দূতকে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে ক্ষতি পূরণ করার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। তিনি অস্বীকৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উখিয়া—আরবের মুসলমানেরা মুলতান অধিকার করিয়াও তৎপ্রদেশ শাসন করিবার জন্য বহু হিন্দু শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পুন হুন চলনের (পূর্ণ চন্দ্র ?) পুত্র উখিয়া ডেরাশিবি নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

উগ্রদণ্ড—তিনি একজন কাঞ্চীর পল্লব বংশীয় নরপতি। তিনি চালুক্য বংশীয় নরপতি রণরসিককে পরাস্ত করিয়াছিলেন। উগ্রদণ্ডের পুত্রের নাম রাজসিংহ।

উগ্রপ্রভু—ইনি পুঞ্জের পুত্র, পদারতের পৌত্র। কথিত আছে উগ্রপ্রভু হিঙ্গলাজ চণ্ডাল নামক কোন দেবতার মন্দিরে যাত্রা করিয়া কঠোর ব্রতানুষ্ঠান

ও তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবতা তৎপ্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি তরবারি অর্পণ করেন। বর্ণিত আছে, দেবাদেশে সেই তরবারি মন্দির সম্মুখস্থ একটী কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিল। সেই দেবদত্ত তরবারির সাহায্যে উগ্রপ্রভু সাগরতট-বর্ত্তী সমস্ত দক্ষিণদেশগুলি জয় করিয়াছিলেন। চাঁদেল কামধ্বজগণ তাঁহারই বংশে উদ্ভূত হয়েন।

উগ্রভূতি— একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণিক। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। 'শিষ্য-হিতান্যাস' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচনা।

উগ্রসিংহ—ইনি চম্বারাজ ছত্রসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। ছত্রসিংহের পুত্র ইন্দ্রিয়াসক্ত উদয়সিংহকে হত্যা করিয়া, অমাত্যেরা ১৭২০খ্রীঃ অব্দে উগ্রসিংহকে রাজা করে এবং তাহারাই পুনরায় উগ্রসিংহকে হত্যা করিয়া, ছত্রসিংহের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র দলেনসিংহকে রাজা করেন। উদয়সিংহ দেখ।

উগ্রসেন—তিনি পালক নামক স্থানের রাজা (বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের নেলোর জিলা) ছিলেন। অন্যান্য ভূপতিদের সহিত মিলিত হইয়া, পল্লব ভূপতিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মগধ রাজ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃকও পরাজিত হইয়াছিলেন।

উগ্রসেন—ইনি সিংহল দ্বীপের রাজা ছিলেন। বাঙ্গালার রাজকন্যা চন্দ্রা-বলীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।

উচ্চল—তিনি কাশ্মীর-পতি হর্ষদেবের জ্ঞাতি মল্লের পুত্র। হর্ষদেব যখন দরদ রাজ্যে অভিযান করিয়া অকৃত-কার্য্য হন, উচ্চল ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সুস্সল অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেই হর্ষদেবের সৈন্যসমূহ একেবারে বিনিষ্ট হয় নাই। এই যুদ্ধের পর হইতেই উচ্চলের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহার মনেও রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। হর্ষদেবের রাজত্বের শেষ সময়ে অমাত্য সকল ও প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি অনুরাগ বিহীন হইয়াছিল। মনে মনে তাঁহার বিনাশই কামনা করিতেছিল। এই সময়ে উচ্চল বিদ্রোহী হইয়া হর্ষদেবকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। উচ্চল রাজা হওয়াতে সুস্সল অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। উচ্চল তাঁহাকে লোহর প্রদেশে প্রেরণ করিয়া কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। উবসরাজ অভয়ের কন্যা বিভবমতীর গর্ভে হর্ষদেবের তনয় ভোজের ভিক্ষাচর নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। উচ্চলের সিংহাসন আরোহণের সময় তাঁহার বয়স মাত্র দুই বৎসর ছিল। রাজা উচ্চল তাঁহাকে রাজ্ঞী জয়ামতীর হস্তে

লালন পালনের জন্য অর্পণ করেন। ডামর সেনাপতি ভীমদেব ও মন্ত্রী জনকচন্দ্র, এই উভয়কে তিনি ভীষণ শত্রু বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। ইতিমধ্যে এই উভয় দলে বিবাদ আরম্ভ হইল এবং ইহার ফলে জনকচন্দ্র নিহত হইলেন। পরে তিনি আরও কৌশল অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী সকলকেই শাসন করিলেন। তিনি দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগকে অতিশয় শাসন করিতেন। এইরূপে সুনিয়মে ও সুশাসনে তিনি প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি সূক্ষ্ম বিচারে অন্যায় কর্ম্ম করিয়া কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। তিনি ছদ্মবেশে বাহির হইয়া প্রজাদের অবস্থা অবগত হইতেন। তিনি নানা গুণে ভূষিত থাকিলেও তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার কঠোর শাসনে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিতেন না। একবার তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যের প্রতি লোভবশতঃ উচ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। রাজ মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিন্তু সকলেই পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তুল দেশাধিপতির কন্যা বিজ্জলাকে বিবাহ করিবার কিছু দিন পরেই আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে রড্ড, ছড্ড, প্রভৃতি এবং ভোগসেনই প্রধান ছিলেন। একদা রাজা রাত্রির আহারের পর মহিষী বিজ্জলার গৃহে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হত্যা করা হয়। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রড্ড শঙ্খরাজ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উজিজ উদ্দিন—ফকির উজিজ উদ্দিন পাঞ্জাবপতি রণজিৎ সিংহের একজন বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রণজিৎ সিংহের সহচর ছিলেন। রণজিৎ সিংহও তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বলিয়া সম্মান করিতেন।

উজির আলি খাঁ—লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ উদ্দৌল্লার পোষ্য পুত্র। ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে নবাব আসফ উদ্দৌল্লার মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসন লাভ করেন কিন্তু পর বৎসরেই সার জন শোর (Sir John Shore) ভূতপূর্ব্ব নবাবের ভ্রাতা সাদত আলি খাঁকে সিংহাসন প্রদান করেন। উজির আলি বারাণসীতে প্রেরিত হন। তিনি তথায় পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিষ্টার বেরিকে (Barry) হত্যা করেন এবং জয়পুর রাজ্যে পলায়ন করেন। জয়পুর-রাজ তাঁহার জীবন রক্ষা করা হইবে, এই সর্ত্তে তাঁহাকে ইংরাজ হস্তে অর্পণ

করেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা দুর্গে বন্দী থাকেন, পরে ভেলোর দুর্গে প্রেরিত হন। তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। এক সময়ে যাঁহার বিবাহে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে মাত্র সত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

উজির খাঁ (১)—অন্য নাম মোহাম্মদ তাহির। সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। পরে তিনি মালবদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (২) তাঁহার প্রকৃত নাম হাকিম আলিম উদ্দিন। সম্রাট শা-জাহান তাঁহাকে উজির খাঁ উপাধি ও পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদ প্রদান করিয়া পাঞ্জাবের সুবেদারের পদে নিযুক্ত করেন।

উজির খাঁ হেরিবী—সম্রাট আকবর, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শাহবাজের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া, তৎপদে উজির খাঁ হেরিবীকে নিযুক্ত করেন। উজির খাঁ ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে টাণ্ডা নগরে পরলোক গমন করিলে, অম্বররাজ মানসিংহ বঙ্গ-বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন।

উজির সরকার—১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামক দুই ব্যক্তি প্রজাদের দলপতি হইয়া জমিদার-দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং কোনও কোন স্থানে জমিদারদের কাছারী বাড়ী পুড়াইয়া দেয়। এই অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের শাস্তি দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ উপ-যুক্ত উকিলের পরামর্শে সদরে মোকদ্দমা চালাইতে আসিল। এই অবসরে বিদ্রোহী প্রজারা জানকু ও দোবরাজ নামক ভীষণ প্রকৃতি দুইজন অধিনায়-কের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চালাইতে আরম্ভ করিল। তৎফলে গুমানু ও উজির নিস্কৃতি পাইল।

উজো — ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথে মিবারের সংগ্রামসিংহের সহিত দিল্লীর সম্রাট বাবরের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মিবারের সামন্ত নরপতি ঝালাপতি উজো অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিপাত করিয়া সমরে শয়ন করেন।

উজ্জ্বল দত্ত — তিনি উণাদি সূত্রবৃত্তি-কার। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

উড্ডীশ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। মোমহন বাষর স্বীয় 'মোমহন বিলাস' গ্রন্থে তাঁহার অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উৎকট নাথ—নাথ পন্থীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

উৎকর্ষ—কাশ্মীরপতি সংগ্রাম রাজের ভ্রাতা বিগ্রহরাজের প্রপৌত্র ও ক্ষিতি-রাজের দ্বিতীয় পুত্র কলসের পত্নী রামলেখারগর্ভজাত সন্তান। পিতামহ

ক্ষিতিরাজ, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনরাজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পৌত্র উৎকর্ষকে রাজপদে নীলপুরীতে স্থাপন করিয়া অনন্তরাজের হস্তে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। অনন্তরাজের আদেশে তন্বঙ্গরাজ উৎকর্ষের অভিভাবক হন। নরপতি কলসের জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষদেব পিতার বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সন্দেহের বশে কলস তাঁহাকে বন্দী করেন। এবং লোহর প্রদেশ হইতে উৎকর্ষকে আনয়নপূর্ব্বক সিংহাসন প্রদান করেন। ইহার কিছুকাল পরেই রাজা কলস গতায়ু হন। উৎকর্ষ অতিশয় কৃপণ ছিলেন বলিয়া রাজ্যের অধিকাংশ লোক তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন। হর্ষের অনুজ বিজয়মল্ল রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেই রাজ্যের অনেক লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে এবং হর্ষদেব মুক্তি লাভ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উত্তমপূর্ণ—খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে তিনি দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথের বিষ্ণুর অর্চ্চক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি রামানুজের প্রধান শিষ্য কুরেশের জীবন চরিত রচনা করেন। কুরেশ দেখ।

উত্তর—একজন বৌদ্ধ স্থবির। তিনি সোণ নামক অন্য একজন স্থবিরের সহিত অশোকের আদেশে সুবর্ণভূমিতে (বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশে) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

উত্তর সেন—ইনি একজন বৌদ্ধ দার্শনিক। ইনি যোগাচার দর্শনের আলোচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাব কাল অনুমান করা হয়।

উত্তরা (১)—বৌদ্ধ যুগের একজন শিক্ষিতা মহিলা। ইনি ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুরাধপুরে গমন করিয়া তিনি বিনয় পিটক, সুত্ত পিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধর্ম্মের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। (২) ইনি একজন বৌদ্ধ উপাসিকা বা গৃহস্থা বৌদ্ধ। ত্রিপিটক গ্রন্থে বহু উপাসক উপাসিকার নাম পাওয়া যায়। এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ উপাসক উপাসিকার গুণ কীর্ত্তনের সময় নন্দমাতা উত্তরাকে ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন। (৩) জৈনাচার্য্য শিবভূতির ভগিনী। তিনিও ভ্রাতার ন্যায় নগ্ন সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতা শিবভূতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন।

উত্তান কূর্ম্মনাথ—নাথ পন্থীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

উত্তিয় (১)—ইনি একজন অর্হৎ বা উচ্চতম স্তরের বৌদ্ধ সাধক।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত "কথা বথু" নামক গ্রন্থে তিন জন গৃহী অর্হতের নাম উল্লেখ আছে। ইনি তাঁহাদের অন্যতম। তিন জনের নাম, 'যশ', 'উত্তিয়' এবং 'সেতু'। (২) তিনি একজন বৌদ্ধ স্থবির। মহারাজ অশোকের আদেশে তাঁহার পুত্র মহামহিন্দ্রের সঙ্গে তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

উত্থিত বিবেক নাথ—নাথ পন্থীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

উৎপল— কাশ্মীরাধিপতি ললিতা-পীড়ের শিশুপুত্র বৃহস্পতি ওরফে চিপ্পট জয়াপীড় রাজা হইলে পদ্ম, উৎপল, কল্যাণ, মম্ম ও ধম্ম এই পঞ্চ মাতুল-রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ইঁহারা সকলেই রাজমাতা জয়াদেবীর আদেশে রাজকার্য্য পরিচালনা করি-তেন। বালক বৃহস্পতি বার বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া মাতুলগণের চক্রান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতুলেরা স্ব স্ব ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য এক এক-জনকে নামে মাত্র রাজা করিয়া অক্ষুণ্ণ-ভাবে ৩৬ বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও নূতন নগর স্থাপিত হইয়াছিল। উৎপল পূর্ব্বেই গরীয়ান্ উপাধিতে ভূষিত হইয়া সন্ধি-বিগ্রহাদি পাঁচটী প্রধান ধর্ম্মস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বপ্পিয়ের পৌত্র অজিতাপীড়কে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে প্রভু হইলেন। মম্ম ও উৎপলকের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পরে উৎপল তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি উৎপলপুর নামে এক নগর ও উৎপলস্বামী নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কবি শঙ্কুকের ভুবনাভ্যুদয় নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উৎপলবর্ণা— জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। তিনি শ্রাবস্তী নগরের এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। সেইজন্য বহু রাজা মহারাজা ও ধনী তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁহার পিতা এক জনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া অপরের বিরাগ ভাজন হইবার ভয়ে, তাঁহাকে ভিক্ষুণী করিয়া দেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মাতুলপুত্র নন্দ অত্যাচার করিয়া তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিল। তিনি অতি পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। শ্রাবস্তী নগরের নিকটে একটী অরণ্যে নির্জ্জন গুহায় তিনি ধ্যান মগ্না থাকি-তেন। উৎপলবর্ণা ও ক্ষেমা অগ্র-শ্রাবিকা বলিয়া অভিহিতা হইতেন। 'থেরি গাথা' নামক পালি গ্রন্থে উৎপল-বর্ণার রচিত একটি মনোহর গাথা আছে।

উৎপল ভট্ট—একজন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি ৮৮৮ শকে (৯৬৬ খ্রীঃ) বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতার টীকা রচনা করেন। তাঁহার জন্মস্থান কাশ্মীর ছিল। তাঁহার মাতা পিতা কে ছিলেন, তাহা কিছুমাত্র জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে তাৎকালিক দিন গণনা সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তৎকালে দিন গণনা, উদয়িক, মাধ্যাহ্নিক, আস্তময়িক এবং আর্দ্ধরাত্রিক এই শাখা চতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিল। কেহ সূর্য্যের উদয়, কেহ অস্ত, কেহ দিবার মধ্যাহ্ন কাল এবং কেহ বা রাত্রির মধ্যভাগ হইতে দিন গণনা করিতেন। দিনারম্ভ গণনা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। দৈনিক সামান্য কাজ কর্ম্মে আমরা সূর্য্যোদয় হইতে দিবারম্ভ গণনা করি কিন্তু জ্যোতিষে উজ্জয়িনীর মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণ্য হইয়া থাকে। তিনি বরাহের বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ সংহিতার টীকা, বরাহের পুত্র পৃথুযশার রচিত ষট্পঞ্চাশিকার টীকা ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্যের উপর টীকা রচনা করিয়াছেন। উৎপলের বৃহৎ সংহিতা বিবৃতি এক মূল্যবান্ গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত প্রশ্নজ্ঞান নামে উৎপলের প্রশ্ন বিষয়ক এক গ্রন্থ আছে। তিনি "মূল পুলিশ সিদ্ধান্ত" নামক বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন।

উৎপলাক্ষ—তিনি কাশ্মীরপতি রাজা সিদ্ধের পুত্র। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৮৯২—৮৬২ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার পুত্র হিরণ্যাক্ষ রাজা হন।

উৎপলাচার্য্য — একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শিব দৃষ্টিকার সোমানন্দ ইঁহার গুরু। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী। তিনি কল্লটেন্দু প্রণীত স্পন্দকারিকার উপর 'স্পন্দ প্রদীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন। তিনি 'প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা'রও প্রণেতা। তাঁহার রচিত আরও অন্যান্য গ্রন্থ আছে।

উৎপলাপীড়—কাশ্মীরের অধিপতি। রাজ বংশলতায় তিনি ষোড়শ নৃপতি এবং তাঁহার রাজত্বকাল ৮৫৩ খ্রীঃ অঃ বলিয়া বর্ণিত আছে। তিনি কাশ্মীরপতি অজিতাপীড়ের পুত্র। অজিতাপীড় মন্ত্রী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, উৎপলকের পুত্র সুখবর্ম্মা উৎপলাপীড়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে সুখ বর্ম্মা রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা আরত্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলও তিনি শীঘ্রই প্রাপ্ত হইলেন। সুখবর্ম্মা তাঁহার কোনও আত্মীয় কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র অবন্তী বর্ম্মা মন্ত্রী শূরের সহায়তায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহা হইতেই কর্কোটবংশের শেষ হয় এবং কল্পপাল বংশের আরম্ভ হয়।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মহা-মহোপাধ্যায়—১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্র-বিচার করেন এবং রাজার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

উদমণ্ড সিংহ (রাজা)—ইনি ইতি-হাস বিখ্যাত রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতু-স্পুত্র এবং মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মহা-রাজা রণজিৎ সিংহের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ইনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী সৈন্য ছিল। ইংরেজ কোম্পানী যখন রেওয়ারাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন রাজা উদমণ্ড সিংহ স্বীয় সেনাদ্বারা সাহায্য করেন। ১৮১০ হইতে ১৮২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুর্শিদা-বাদের নবাব নাজিম আলিজার আমলে তিনি দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বড় বাজারের রাজা উদমণ্ড ষ্ট্রীট তাঁহারই নামে পরিচিত হইয়াছে।

উদয় কর—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'সার কলিকা'।

উদয় কর দেবশর্ম্মা—তিনি একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গাধিপ বিজয় সেনের মহিষী বিলাসবতীর "কনক তুলা পুরুষ দানে" কান্তিজোঙ্গ নিবাসী আশ্বলায়ন শাখা বড়ঙ্গাধ্যায়ী উদয় কর দেবশর্ম্মা হোমানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

উদয় গুপ্ত—কাশ্মীর রাজের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী। কাশ্মীরাধিপতি ক্ষেম গুপ্ত ও তদীয় পত্নী দিদ্দার রাজত্বকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। পরে বিদ্রোহী হইলে মহারাণী দিদ্দা তাঁহাকে সপারিষদ বিনষ্ট করেন।

উদয়চরণ আঢ্য—তিনি ১৮৩৭ খ্রীঃ খ্রীঃ অব্দে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রি-কার সম্পাদক ছিলেন। ইংরাজী বাংলা অভিধান, শব্দাম্বুধি, নূতন অভি-ধান গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্র সম্পাদন, ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সিনিয়র স্কলার ছিলেন। প্রথমে কলিকাতা ট্রেজারীতে একশত টাকা বেতনে কাজ করেন, পরে লবণ বিভাগে কিছুদিন কাজ করিয়া আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে আড়াইশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। যে দিন গবর্ণমেণ্ট হইতে ডেপুটী পদ প্রাপ্ত হন, সেই দিনই কলিকাতায় বিসূচিকা রোগে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এক মাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তিনিও জীবিত নাই। উদয়চন্দ্র বিদ্যানুরাগী, অধ্যয়ন-শীল, মিষ্টভাষী ও মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন।

উদয় দিবাকর জ্যোতিষ ভট্ট—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত। জ্যোতিষ ভট্ট কৃত লঘুভাস্করীয়ের টীকা

মাদ্রাজের অন্তর্গত ত্রিভন্দ্রম্ নগরে এবং বরোদার মহারাজার পাণ্ডুলিপি শালায় পাওয়া যায়।

উদয় দেব—তিনি আসামের ভগদত্ত-বংশীয় একজন রাজা। তাঁহার পৌত্র হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে নেপাল-রাজ শিবদেবের পুত্র জয়দেব বিবাহ করিয়াছিলেন (৭৫৯ খ্রীঃ)।

উদয়ন (১)—তিনি গুর্জ্জরপতি সিদ্ধ-রাজ জয়সিংহ দেবের (১০৯৪-১১৪৩ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বণিকও ছিলেন। তিনি কর্ণাবতী নগরীতে উদয়ন বিহার নামে এক প্রসিদ্ধ জৈনবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

উদয়ন (২)—ইনি কৌশাম্বীরাজ শতা-নিকের পুত্র। তিনি শাক্য সিংহের সমকালিক নরপতি ছিলেন।

উদয়ন (৩)—জনৈক ব্রাহ্মণ দার্শনিক। ‘দ্রব্য কিরণাবলী’ ও ‘গুণাকরণাবলী’ নামে বৈশেষিকের দুইখানি টীকা করিয়াছেন। ‘আত্মানাত্ম বিবেক’ গ্রন্থ, তাঁহারই রচিত। তাঁহার মত প্রভাবে বৌদ্ধমত ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উদয়ন (৪)— শবর জাতীয় নরপতি। তিনি পল্লব বংশীয় নরপতি নন্দী বর্ম্মা পল্লব মল্লকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

(৫)—তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৎস নামক জনপদের রাজা ও গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। বৎস জনপদের রাজধানী কৌশাম্বী যমুনার তীরে বর্ত্তমান প্রয়াগ হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে ছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বৎসরাজ উদয়নকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থসমূহ হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী লোকের আলোচনার বিষয় ছিল। উদয়নের পিতার নাম শতা-নীক ও পিতামহের নাম সহস্রানীক। অবন্তীরাজ প্রদ্যোত ও বৎসরাজ উদয়-নের বিবাদ উপলক্ষে নানাবিধ কাহিনী ‘কথা সরিৎসাগর’ ও পালি গ্রন্থের টীকা প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। উদয়ন পরবর্ত্তী জীবনে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক ইউয়ানচং কৌশাম্বী নগরীতে উদয়নকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি প্রসিদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য চীন দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে উদয়ন নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তির আদর্শে গঠিত একটি মূর্ত্তিও ছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থেও উদয়নকর্ত্তৃক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক-

গণ এসকল বর্ণনা বিশ্বাস যোগ্য মনে করেন না। উদয়নের পুত্র বোধি (মতান্তরে অহীনর) অথবা নরবাহন।

উদয়নাচার্য্য— মিথিলার অধিবাসী উদয়নাচার্য্য গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শনের একটী উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ— ন্যায়তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি। কথিত আছে কল্যাণ রক্ষিত প্রণীত 'ঈশ্বরভঙ্গকারিকা' নামক ন্যায়-গ্রন্থের মত নিরাকরণ জন্য, তিনি কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি 'বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নামে বৈশেষিক দর্শনের একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়নই প্রাচীন ন্যায়ের শেষ আচার্য্য। তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ন্যায়দর্শন ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি ৯৪৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত করিয়ন বলাহা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এখনও তথায় তাঁহার বাস্ত বাড়ীর ভিটা বর্ত্ত-মান আছে। তাঁহার রচিত 'লক্ষণা-বলী' নামক গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে। —তর্কাম্বরাঙ্ক প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ। বর্ষেষু উদয়শ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥ ইহা হইতে জানা যায় ৯০৬ শকে (৯৮৪ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার লক্ষণাবলী রচিত হয়। নৈয়ায়িক হইলেও তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সৌগত চার্ব্বাকাদির মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি, আত্ম বিবেকাদি গ্রন্থ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী—১২০০ শত শতাব্দীতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কল্লুকভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য, বৌদ্ধাচার্য্য জিন্ধানির সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া, লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। উদয়না-চার্য্য এই ব্যাপারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। তাহারই ফলস্বরূপ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ব্রহ্মতত্বের প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার বিদুষী কন্যা লীলাবতী স্বামী বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুতে শোকাবেগে একখানি করুণ রসাত্মক কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের বংশধরের গৃহে ঐ গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত থল্লিগ্রামে উদয়নাচার্য্যের বংশ বিদ্যমান আছে। উদয়নাচার্য্য কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। 'কুসুমাঞ্জলি' উদয়নাচার্য্যের

একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তৎকৃত 'কিরণাবলী' নামক গ্রন্থ কণাদ-সূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের একখানি উত্তম টীকা। বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মহলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় সমাদরে গৃহীত হয়। বৌদ্ধমত খণ্ডনকারী 'আত্ম-বিবেক' নামক ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধীয় গ্রন্থও তাঁহার লিখিত। বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যের 'তাৎপর্য্যপরি-শুদ্ধি' নামক উত্তম টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। রাজসাহীর অন্তর্গত তাহিরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ তাঁহারই বংশধর।

উদয়নাথ—নাথপন্থীদের গোরক্ষপন্থী নামক সম্প্রদায়ে নবনাথের উল্লেখ আছে। ইনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের মতে নবনাথের নাম ১। একনাথ, ২। আদিনাথ, ৩। মৎস্যেন্দ্র নাথ, ৪। উদয়নাথ, ৫। দণ্ডনাথ, ৬। সত্যনাথ, ৭। সন্তোষনাথ, ৮। কূর্ম্ম-নাথ এবং ৯। জালন্ধরনাথ।

উদয়নাথ ত্রিবেদী—ইনি দোয়ারের অধীনস্থ আচেমীর রাজা গুরুদত্ত সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি "রামচন্দ্রোদয়" নামক হিন্দি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে "কবীন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন।

উদয়নারায়ণ মিত্র — ইনি বঙ্গজ কায়স্থ রাজা। পূর্ব্ববঙ্গের উলাইল গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। দৌহিত্র সূত্রে তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। উদয়নারায়ণ রাজা রামচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র সূত্রে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। মাধব পাশায় তাঁহার রাজধানী ছিল। ইনি বঙ্গীয় কায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন।

উদয়নারায়ণ রায়, রাজা—লালা উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে রাজা উদয়নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। (মুর্শিদাবাদ) বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত আছে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে উদয় নারায়ণ একজন উপযুক্ত জমিদাররূপে খ্যাত ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ রাজসাহীর পূর্ব্ব আয়তন বৃদ্ধি করিয়া রাজা উদয়নারায়ণের প্রতি রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। নাজিমী পদ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারী বন্দোবস্তে কঠোরতা অবলম্বন করিলে, উদয়নারায়ণের সহিত ক্রমশঃ তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে নবাবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘ-টিত হয়। রাজা উদয়নারায়ণ পরাজিত হইয়া, সপরিবারে পলায়ন করেন।

কিন্তু শেষে বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন ও তথায়ই বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। উদয়নারায়ণ রাজসাহীর জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইলে, নাটোরের রঘুনন্দনের ভ্রাতা রাম-জীবনকে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হয়। উদয়নারায়ণ একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক, পরহিতরত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি অনেক সৎকীর্ত্তি তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

উদয়নারায়ণ রায়, রাজা—তিনি রাজসাহী তাহেরপুরের রাজা ছিলেন। বঙ্গের স্বাধীন নরপতি ভাতুড়ীয়ার রাজা গণেশ তাঁহার ভগিনীপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জীবন রায় গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের (পরে জালাল উদ্দিন) দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারা মনুসংহিতার টীকাকার প্রসিদ্ধ কল্লুকভট্টের বংশধর।

উদয় নারায়ণ সিংহ—দিল্লীর সম্রাট বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা রক্ষার জন্য বুদ্ধিমন্ত হাজরা নামক একজন সেনাপতির উপর ভার অর্পণ করেন। তিনিই সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তদনুরূপ পশ্চিম দ্বার রক্ষার জন্য বিজয়লস্কর নামক একজন সেনাপতিকে নিযুক্ত করিয়া ২২টী পরগণার জায়গীর ও সিংহ উপাধী প্রদান করেন। তিনিই তাহিরপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই পুত্র রাজা উদয়নারায়ণ সিংহ বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নিরাবিল পটীর প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। এই উদয়নারায়ণের পৌত্রই প্রসিদ্ধ রাজা কংস নারায়ণ।

উদয়প্রভ সূরী—জৈন গ্রন্থকার তদ্রচিত গ্রন্থের নাম — 'সুকৃত-কীর্ত্তি-কল্লোলিনী'।

উদয়বীর গণিন্—জৈন গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'পদ্মসুন্দর' নামে একখানি, জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন।

উদয়মাণিক্য — স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি গোপীপ্রসাদেরই নামান্তর। বিজয় মাণিক্যের পুত্র অনন্ত মাণিক্য অতি অকর্ম্মণ্য ও মন্দকর্ম্মান্বিত ছিলেন বলিয়া, বিজয়মাণিক্য তাঁর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা জয়াদেবীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দেন এবং গোপীপ্রসাদকে তাঁহার অনুগত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পরেই, 'গোপী-প্রসাদ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং উদয় মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে

মুঘলেরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করে, সেই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। রাজধানী রাঙ্গামাটীর, নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি "উদয়পুর" নামকরণ করেন এবং তথায় দীঘিকা খনন, বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দেবালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। তিনি ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র লোকতর, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উদয়রাম বিশ্বাস, রায়—প্রসিদ্ধ সীতারামের পিতা। তিনি "ভীমাদাদা" নামেই খ্যাত ছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি ও স্থূলকায় ছিলেন। তিনি ফৌজদার তাজখাঁর দেওয়ানী করিয়া জমিদারী লাভ করেন।

উদয় সিং (১)—তিনি মিবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র। সংগ্রাম সিংহের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হইলে, কিছুদিন সর্দ্দারেরা দাসীপুত্র বনবীরকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। বনবীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বীয় পদ নিষ্কণ্টক করিবার, জন্য উদয় সিংহকে বধ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু প্রভুভক্ত ধাত্রী পান্নার ত্যাগ স্বীকারে, তাহা সফল হয় নাই। পান্না নিজের গর্ভজাত পুত্রকে উদয় সিংহের শয্যায় শয়ান রাখিয়া রাজপুত্রকে বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে দুর্গ বাহিরে প্রেরণ করেন। বনবীর রাজ পুত্র ভ্রমে পান্নার পুত্রকেই হত্যা করেন। তৎপরে এক রাজপুত সেনানীর সাহায্যে, পান্না উদয় সিংহকে লইয়া কমলমীর দুর্গের শাসনকর্ত্তা আশা শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় উদয় সিংহ আশা শাহের 'ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উদয় সিংহ রাজপুত সর্দ্দারগণকর্ত্তৃক গৃহীত হন। সর্দ্দার অখিল রাওএর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, রাজপুত সেনানীগণ উদয় সিংহের কপালে রাজা৲লক পরাইয়া দিয়া, তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তৎপরে অন্যান্য সামন্ত নরপতিগণ আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে, ১৫৪১ খ্রীঃ অব্দে উদয় সিংহ চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বনবীর প্রাণভয়ে দাক্ষিণাত্যে, পলায়ন করেন।

উদয়সিংহ অতি অযোগ্য নরপতি ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে, তিনি রাজ্য রক্ষার কোনও চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধে তিনি মুঘল হস্তে বন্দী হন। কিন্তু রাণার একজন উপপত্নীর বীরত্বে মুঘল বাহিনীর পরাজয় ঘটে ও রাণা মুক্তি লাভ করেন। কিছুকাল পরে আকবর পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। এবারে উদয় সিংহ যুদ্ধ না করিয়া, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক

পলায়ন করেন। কিন্তু বহু রাজপুত সর্দ্দার ও সামন্তরাজগণ মিলিত হইয়া, মুঘল বাহিনীর গতিরোধ করেন। তন্মধ্যে বিদনৌর অধিপতি জয়মল্ল এবং কৈলাবরের অধিপতি পুত্ত, রণক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। সম্রাট, আকবর তাঁহাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, দিল্লীর দুর্গের প্রবেশদ্বারে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন।

উদয়সিংহ চিতোর নগরী পরিত্যাগ করিয়া, আরাবলীর অভ্যন্তরস্থ গিরবো নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বে তথায় উদয়সাগর নামক একটি সরোবর খনন করাইয়া, উদয়পুর নামে এক নগরী স্থাপন করাইয়াছিলেন। উহাই পরে মিবারের রাজধানী হইয়াছিল। চিতোর ধ্বংসের চারি বৎসর পরে, উদয়সিংহ পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যোগমলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্দ্দারেরা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রতাপসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

কথিত আছে যে চিতোরের দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সকল ক্ষত্রিয় নিহত হন, তাঁহাদের যজ্ঞোপবীতের ওজন ৭৪।। মণ (পাকা চারি সেরে একমণ) হইয়াছিল তদবধি গোপনীয় পত্রাদির মোড়কে ৭৪।। এইরূপ লিখা হইয়া আসিতেছে ইহার অর্থ প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অপর কেহ উক্ত পত্র খুলিলে, তাহারা ঐ চিতোর যুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়গণের বধ জনিত পাপের ফলভাগী হইবে।

উদয়সিংহ (২)— কাশ্মীরপতি কলশরাজের অন্যতম সেনাপতি। লোহর প্রদেশের সামন্ত নৃপতি ভুবনরাজ বিদ্রোহী হইলে, নরপতি কলশ, সেনাপতি উদয়সিংহ ও কন্দর্পকে তাঁহার দমনার্থ প্রেরণ করেন। তাঁহারা ভুবনরাজকে রাজ্যহইতে বিতাড়িত করেন। উদয়সিংহ পরবর্ত্তী কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের সময়েও সেনাপতি ছিলেন। অন্যতম মন্ত্রী কলশদেবের সহিত বিবাদে, তিনি কলশদেবকর্ত্তৃক নিহত হন।

উদয়সিংহ, মঠরাজা— রাজা মালবদেবের পুত্র। তিনি যোধপুর রাজ্যের অধিস্বামী ছিলেন। মুঘল রাজের সঙ্গে উদয়সিংহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহের আদেশে কুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) উদয়সিংহের কন্যা বালমতীর পাণিগ্রহণ করেন। বালমতীর গর্ভে শা-জাহানের জন্ম হয়। সম্রাট আকবর উদয়সিংহকে জায়গীর স্বরূপ যোধপুর (মাড়ওয়ার) রাজ্য প্রদান করেন। উদয় সিংহ ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

উদয়াদিত্য— কাশ্মীররাজ প্রতাপাদিত্যের তিন পুত্র ছিল—বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য। পিতার মৃত্যু হইলে পর প্রথম পুত্র বজ্রাদিত্য

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। উদয়াদিত্য এক ব্রাহ্মণের কৃত্যারূপ অভিচার ক্রিয়া-দ্বারা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া, নিজে রাজা হন। উদয়াদিত্য অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনিও কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া, এক ব্রাহ্মণের অভিচার ক্রিয়ায় নিহত হন।

উদয়াদিত্য—তিনি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

উদয়াদিত্য সিংহ—আসাম প্রদেশের আহম নরপতি চক্রধ্বজ সিংহ ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা মাজু গোহাই বা সুনিয়াং ফা, উদয়াদিত্য সিংহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে রাজপুত রাজা রামসিংহের অধীনে মুসলমান সৈন্যেরা জলে, স্থলে বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিল। রাজা উদয়াদিত্য সিংহ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসানে, যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার ভ্রাতা রামধ্বজের হস্তে নিহত হন। তিনি ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কারক শঙ্করদেবের বংশধর চক্রপানির শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতা রামধ্বজ রাজা হইয়াছিলেন।

উদয়েশ্বর—ইনি মগধ রাজ অজাতশত্রুর পুত্র। অজাতশত্রু পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগরের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও পুত্র উদয়েশ্বরের শাসনকালেই পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। খ্রীঃ পূর্ব্ব ৫১৯ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া অনুমিত হয়।

উদাজী চবন—তিনি প্রসিদ্ধ বীর বিথোজী চবন হিম্মত বাহাদুরের পুত্র। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে কর্ণাটের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র উদাজীচবন পিতৃপদ ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ মন্ত্রীর অতি অনুগত ছিলেন। উদাজীও পিতৃবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাণী তারাবাই এর পক্ষাশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি বত্তিস শিরলে নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থানপূর্ব্বক সাহুর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। উদাজী বরাবর শম্ভুজীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে সাহুর সহিত শম্ভুজীর সন্ধি হইয়া গেলেও, উদাজী সাহুর রাজ্যে উৎপাত করিতে বিরত হন নাই। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে উদাজী সাহুকর্ত্তৃক বন্দী হন এবং বহু অর্থ প্রদানে মুক্তি

লাভ করেন। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি আবার বন্দী হন কিন্তু এইবারও সাহু তাঁহাকে মুক্তি দেন। উদাজী মুক্ত হইয়াই নিজামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মহারাষ্ট্র রাজ্যে লুট করিতে লাগিলেন। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে বালাজী বাজীরাও তাঁহাকে অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া, সিংহলী রাজ্যে একটী জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে মিরাজের নিকটবর্ত্তী স্থানে দস্যুবৃত্তি করিতে যাইয়া নিহত হন।

উদাজী পদবল—তিনি মহারাজ শম্ভুজীর সময়ে সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী খাণ্ডেরী দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজা সাহু কর্ত্তৃক শম্ভুজীর পরাজয়ের পর, তিনি প্রবলগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজ্য কানুজী আঙ্গ্রে অধিকার করেন।

উদাজী পবার—তিনি পরমার বংশীয় রাজপুত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মালব দেশে ১০৫৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় শম্ভুজীর উদাজী পবার, আনন্দ রাও পবার ও জগদেব পবার নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে উদাজী পবার ধারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মালবদে ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে অধিকার করিয়া মাণ্ডুনগরে অবস্থান করেন।

উদাসীন স্বামী অমরদাস — তিনি বেদান্ত পরিভাষার টীকা শিখামণির উপর 'মণিপ্রভা' নামক টীকা রচনা করেন।

উদিত বরাহ—তিনি উড়িষ্যার বরাহবংশীয় নরপতি। তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত। তাঁহার পুত্র তেজ বরাহ ও পৌত্র উদয় বরাহ। তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়া, তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। উদয়বরাহের পরবর্ত্তী বিবরণ অজ্ঞাত।

উদুম্বর মহাদেব — তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'জাতকতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

উদো—মিবারের রাণা কুম্ভের পুত্র। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে ১৪৬৯ খ্রীঃ অব্দে হত্যা করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি সকল রাজপুত সর্দ্দারের ঘৃণার পাত্র হন। তজ্জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদীকে, কন্যাদান করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু কোনও সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই, বজ্রপাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শিহেষমল ও সূর্য্যমল নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। দিল্লীশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বেই রায়মল্ল সিংহাসন অধিকার করিয়া-

ছিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত সামন্ত নৃপতি রায়মল্লের সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীশ্বর ঘোরতররূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। শিহেষমল ও সূর্য্যমল রাণার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

উদ্দণ্ড খাঁ — তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের (১৪৯৭—১৫৪২ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতম মুসলমান সেনাপতি ছিলেন। বিজয়নগরপতি কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া, প্রতাপরুদ্রকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র বীরভদ্র, সেনাপতি মল্লু খাঁ, উদ্দণ্ড খাঁ প্রভৃতি বন্দী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় দেখ।

উদ্দাকা—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি নয়পালের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে রাণী উদ্দাকার ব্যয়ে 'পঞ্চরক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নয়পাল বিংশতি বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া, ১০৪৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

উদ্দ্যোতকর মিশ্র, ভারদ্বাজ—থানেশ্বরের নিকট যমুনার পশ্চিমকূলে শ্রুঘ্ন গ্রামে (বর্ত্তমান শুঘন) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন হর্ষবর্দ্ধনের পিতা রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধ ন্যায়ের বচন উদ্ধৃত করিয়া, অতি দক্ষতার সহিত তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

উদ্দ্যোতন—একজন মধ্যযুগের কবি। তিনি প্রাকৃত ভাষায় 'কুবলয় মালা' নামে কাব্য রচনা করেন (৭৭৯ খ্রীঃ)। তাঁহার গ্রন্থে অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার উপাধ্যায়ের নাম হরিভদ্র।

উদ্ধবচন্দ্র চূড়ামণি- ইহাঁর জন্মস্থান হুগলি জেলার বাগনান (মতান্তরে ধনিয়াখালি)। তিনি বিখ্যাত কথক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি হাটখোলায় স্বর্গীয় কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দ্বারা কলিকাতায় আনীত হন এবং তাঁহার শ্বশুর ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (লোকে বিদ্যাসাগর বলিত) মহাশয়ের সুবিখ্যাত টোলে শিক্ষালাভ করেন। পরে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে বহু যত্নে কথকতা শিক্ষা করেন এবং গুরুগৃহে পরীক্ষায় পারদর্শিতার ফল স্বরূপ চূড়ামণি উপাধিতে ভূষিত হন। পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কথকতার সুযশ দেশব্যাপী হইয়াছিল। তিনিও পরে অনেককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। চন্দন-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল।

উদ্ধবদাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা তাঁহার রচিত ১১০টী পদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত টেঞা বৈদ্যপুর। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। তিনি টেঞা গ্রাম নিবাসী দ্বিজ হরিদাসের বংশোদ্ভব রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক ছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—তিনি ত্রিবেণীর তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে বৈশ্য সুবর্ণবণিক বংশে ১৪৭১ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত। মাতার নাম ভদ্রাবতী। পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। পৈত্রিক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তিনি বাঙ্গলার নবাব হোশেন শা হইতে বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করেন এবং স্বীয় নামানুসারে ইহার নাম উদ্ধারণপুর রাখেন। কাটোয়ার সন্নিকটস্থ এই উদ্ধারণপুর গ্রাম এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তে তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং নীলাচলে গমন করিয়া, মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ ভবেশ দত্ত মহাশয় ৯৭৫ শকে (১০৫৩ খ্রীঃ) অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্য হেতু বঙ্গদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বাস করেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণদত্ত একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন ও পুরুষোত্তম শর্ম্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি জয়দেব বিরচিত গীত-গোবিন্দকাব্যের "গঙ্গ" নামে এক অদ্ভুত টীকা রচনা করিয়া ছিলেন। এই বৈশ্য দত্তবংশ বিদ্যা ও ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত যেস্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে এখনও একটী প্রকাণ্ড মাধবী লতার বৃক্ষ আছে। এই লতা-বিশিষ্ট বৃক্ষ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নাই, তবু ইহা শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক একটী বটবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ মাধবী লতার স্থান বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ পাটের অন্যতম পাট। তাঁহার বংশধর বালীগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সেই কালের ভাস্কর নির্ম্মিত দারুমূর্ত্তি আছে। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৬ বৎসর নীলাচলে ও ৬ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পরলোক গমন করেন।

উদ্ভট ভট্ট—কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী রাজা জয়াপীড়ের রাজসভার তিনি প্রধান

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা (দীন্নার) বেতন স্বরূপ রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন।

উন্মত্ত সিংহ — তিনি উড়িষ্যার কর-বংশীয় নরপতি ছিলেন। তৎপুত্র গয়াড়, তৎপুত্র লোলভার (লোনভার), তৎপুত্র কুসুমভার ও ললিতভার। ললিতভারের তনয় প্রথম শান্তিকর ও দ্বিতীয় শোভাকর। ললিতভারের মহিষী ত্রিভুবন মহাদেবী দক্ষিণ দেশের অধিপতি রাজমল্লের কন্যা ছিলেন। ললিতভারের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিকর রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে ললিতভারের বিধবা মহিষী ত্রিভুবন মহাদেবী, সন্ন্যাসিনী পুরায়ী দেবী ও সামন্ত নৃপতিবর্গের অনুরোধে সিংহাসনের অধিকারিণী হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ললিতভারের অন্যতম পুত্র দ্বিতীয় শোভাকর রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী গৌরীদেবী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে তাঁহার কন্যা দণ্ডী মহাদেবী ৯৫৮—৯৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে এই কর বংশীয়দের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ভঞ্জ বংশীয়েরা তৎপরে তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন বলিয়া অনুমান হয়।

উন্মত্ত সিংহ
|
গয়াড়
|
লোনভার

কুসুমভার — ললিতভার
= ত্রিভুবন মহাদেবী

শান্তিকর — শোভাকর
= গৌরীদেবী

(কন্যা) দণ্ডী মহাদেবী
(৯৫৮—৯৬৫ খ্রীঃ অব্দ)

উন্মাদচিত্তা—বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহলদ্বীপ অধিকার করিয়া, তথাকার রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, স্বীয় ভ্রাতার পুত্র পাণ্ডুবাসকে, তথায় লইয়া যান। পাণ্ডুবাস শাক্যবংশীয় রাজা দীর্ঘায়ুর ভগিনী ভদ্দকচ্চানাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসের হরিকুণ্ড সিংহ নামে এক পুত্র ও উন্মাদচিত্তা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘায়ু স্বীয় ভগিনীকে দেখিতে গিয়া সিংহলেই রহিয়া গেলেন। দীর্ঘায়ুর পুত্র দীঘগামনি উন্মাদচিত্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

উপগুপ্ত—একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তিনি মথুরার

সন্নিকট উরুমুণ্ডা পর্ব্বতের নটবাটিক অরণ্যে বাস করিতেন। তিনি অশোকের সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে কশ্যপ, আনন্দ, সনবাস ক্রমে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। মহাত্মা সনবাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্য উপগুপ্ত চতুর্থ গুরু হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পরপারে বিদেহ নগরের সমুসার নির্ম্মিত বিহারে, তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গান্ধার পর্ব্বতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় বহু লোক তাঁহার প্রচারের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তথা হইতে তিনি মথুরায় আগমন করিয়া নট ও ভট্ট নামক বণিকদ্বয় নির্ম্মিত বিহারে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানেও তাঁহার উপদেশে বহু সহস্র লোক বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করেন। মথুরা হইতে তিনি সিন্ধুদেশে গমন করেন। তথাকার মহেন্দ্র ও চমস নামক নরপতিদ্বয়ের নির্ম্মিত হংসারাম বিহারে কিছুকাল অবস্থান করেন। তৎপরে তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপতিষ্য (১)—ভগবান গৌতম বুদ্ধেরই একজন অতি প্রধান শিষ্য সারিপুত্রের নামান্তর। সারিপুত্র দেখ। (২) উপতিষ্য নামে বিভিন্ন সময়ে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। 'অনাগত বংশ' নামক পালি গ্রন্থের রচয়িতার নাম উপতিষ্য। আবার কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দাতে উপতিষ্য নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু "বিমুক্তি মার্গ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ উহাই পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রসিদ্ধ "বিশুদ্ধি মার্গ" গ্রন্থ রচনা করেন।

উপধান নাথ—নাথ পন্থাদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

উপবর্ষ — এক প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ পূর্ব্ব ৮ম ৯ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের তিনি গুরু ছিলেন। তিনি বেদাদি রক্ষার জন্য উভয় মীমাংসার বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহার গ্রন্থাদি এখনও পাওয়া যায় নাই। তিনি বেদান্ত দর্শনের বার্ত্তিককার। তিনি পাণিনিরও গুরু ছিলেন।

উপালি—তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট শিষ্য হইয়াছিলেন। বিনয়পিটকে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি "বিনয়ধর" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তপর্ণী গুহায় যে বৌদ্ধ সঙ্গীতি হয়, তাহাতে তাঁহারই সাহায্যে বিনয়পিটকের সঙ্কলন সম্পন্ন হয়। তিনি রাজগৃহ নিবাসী

এক সম্পন্ন গৃহস্থের পুত্র ছিলেন। বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে, জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, এই বিষয়ে তাঁহার মাতাপিতা গভীর চিন্তা করেন। তৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোনও একটীও তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই। পরিশেষে তাঁহারা বৌদ্ধ সন্নাসী সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ করিলেন; কারণ ঐ সকল সন্ন্যাসী সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহাদের আহার বিহারের কোনই কষ্ট হইত না এবং তাঁহারা জন সাধারণের সম্মান লাভ করিতেন। মাতাপিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, উপালি সহচরগণ সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই বিংশতি বর্ষের অনধিক ছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা ভিক্ষুদিগের পালনীয় কঠোরতা সহ্য করিতে পারিলেন না এবং বিশেষরূপ সুখ সুবিধার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব এই ব্যবস্থা করেন যে, বিংশতি বর্ষের অনধিক ব্যক্তিকে সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইবে না।

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী—বাঙ্গালা শিশু সাহিত্যের একজন প্রথম পর্য্যায়ের লেখক ও সাহিত্যিক। ১২৭০ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় এক খ্যাতনামা জমিদার বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতা কালীনাথ রায় সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপন্ন ছিলেন। কালীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদারঞ্জন ও মধ্যম পুত্র কামদা রঞ্জন। এই কামদারঞ্জনই বাল্যকালে স্বীয় খুল্লতাত হরিকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহিত হইয়া, উপেন্দ্রকিশোর নামে পরিচিত হন। তিনি বাল্যকালেই মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। সাধারণ পাঠ ভিন্ন চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার কলাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি পনের টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। ময়মনসিংহে থাকিবার সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে পড়েন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং কিছুকাল পরে স্বনাম খ্যাত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্র কিশোরের দান বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার রচিত ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত ও মহাভারতের গল্প, এই শ্রেণীর পুস্তকের পথপ্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদ্ভিন্ন বিবিধ শিশু পাঠ্য পত্রিকায় বহু আনন্দ-

প্রদ গল্পও তিনি প্রকাশ করেন। "সন্দেশ" নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাও ঐ শ্রেণীর মাসিকের অগ্রদূত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বিজ্ঞানানুশীলনে রত থাকিতেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সরল সুবোধ্য ভাষায় বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতেন। বাল্যকালের চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। নিজ রচিত গ্রন্থগুলিতে তিনি নিজেরই অঙ্কিত অতি মনোহর চিত্র সংযোগ করিতেন। রঙিন অথবা নানারঙ্গের হাফটোন ছবি ছাপার বর্ত্তমানে যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে উপেন্দ্রকিশোরের কৃতিত্ব বর্ত্তমান। এই বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত অনেক রীতি পাশ্চাত্য দেশেও গৃহীত হইয়াছে।

তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট বেহালা বাজাইতে পারিতেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ, বিনয়ী, স্বাধীনচিত্ত ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায়ও পিতার ন্যায় শিশু সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে পৌষমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপেন্দ্রনাথ দাস—বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালে কলিকাতা নগরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীনাথ দাস। কৈশোরেই উপেন্দ্রনাথ স্বধর্ম্মবিরাগী, স্বেচ্ছাচারী ও পিতার অবাধ্য সন্তান ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ইনি গৃহত্যাগী হন এবং বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া নানা স্থানে ঘুরিতে থাকেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, নিজে এক উগ্রক্ষত্রিয়া জাতীয়া নারীকে বিবাহ করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে, থিয়েটারে যোগ দিয়া "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নামক দুইখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির বিবরণ লিখিত থাকায়, একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইলে হাইকোর্টে আপীল করিয়া মুক্তি লাভ করেন। পরে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১২ বৎসর সেখানে কেবল বক্তৃতা প্রদান ও অবান্তর কাজে সময়ক্ষেপ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং থিয়েটার খুলিয়া "দাদা ও আমি" নাটক রচনা করেন। তাঁহার নাটকগুলি বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট সামগ্রী। থিয়েটারে তাঁহার অনেক অর্থনাশ হওয়ায় তিনি যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও প্রখর ধীশক্তি সুপথে

চালিত না হওয়ায়, তাঁহার জীবন সুফল-প্রসূ হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। ১৩০২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে প্রসিদ্ধ বোমার মামলার রাজনৈতিক বন্দীরূপে ইনি পরিচিত। বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথমে শিক্ষকতা করেন। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত মামলায় জড়িত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি "আত্মশক্তি" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। ১৩২৮-২৯ সালে "জাতের বিড়ম্বনা", "বর্ত্তমান সমস্যা", "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ সাউ, রায় বাহাদুর — যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের কর্ম্ম শক্তি ও বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া এদেশে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, রায় বাহাদুর উপেন্দ্র নাথ সাউ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের মত লোকের সম্বন্ধেই বলা যায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" যে সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলী বর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীদের লুট পাটে অস্থির হইয়া, তাঁহাদের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন, সেই দুর্যুগের সময়ে উপেন্দ্র নাথের পূর্ব্ব পুরুষ মাধব রাম ও যাদব রাম নামক দুই সহোদর স্বীয় জন্ম স্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত ফতেপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু কষ্ট ভোগ করিয়া ২৪পরগণার অন্তর্গত ধান্য কুড়িয়া গ্রামে আশ্রয় লাভ করিলেন। এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বে ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধর পতিতচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া অতি কষ্টে কিছু মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক চিনি, তিসি ও পাটের কারবার আরম্ভ করিলেন, সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ১২৫০ সালের পূর্ব্বে। এতদিনে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর শোভ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। অদম্য উৎসাহ, অনন্য সাধারণ কর্ম্মশক্তি, অনাবিল সাধুতার গুণে স্বীয় ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ধান্য কুড়িয়া নিবাসী তাঁহারই স্বজাতীয়, অন্যতম ব্যবসায়ী গোবিন্দচন্দ্র গাইন মহাশয় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই উভয়ের সংযোগকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা যায়। ক্রমে তাঁহাদের ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। পতিতচন্দ্র আড়বেলিয়ার জমিদারদের নিকট হইতে ধান্য কুড়িয়া ক্রয় করিলেন। তাঁহারই সুযোগ্য স্বনাম খ্যাত পুত্র উপেন্দ্র নাথ ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। উপেন্দ্র

নাথ প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া ফ্রিচার্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। এই কলিকাতার বাণিজ্য ব্যবসায় দৃষ্টে তাঁহার মনে উচ্চ ও উন্নততর ব্যবসায় লিপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। এদিকে জাহাজ ও রেল প্রভৃতি দৃষ্টে তাঁহার মনে অনুরূপ ভাবের উদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন বিদ্যার্জ্জন ব্যতীত এসকল উন্নতি সম্ভবপর নহে। তিনি পিতাকে গ্রামে একটী মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে উৎসাহিত করিলেন। ১২৯১ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ধান্য কুড়িয়া মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের গৃহ-প্রবেশ হইল। পরবর্ত্তী সময়ে ইহা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উপেন্দ্র নাথের পিতা পতিতচন্দ্র ১২৮৫ সালে গতায়ু হইলেন। এই সময়ে উপেন্দ্র নাথ ১৯শ বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে স্ব গ্রামে বাস করিতে হইল। উপেন্দ্র নাথের ভাগিনীপতি শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় কলিকাতা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে শ্যামাচরণ বাবু ও উপেন্দ্র বাবু পরস্পর পরস্পরের নানা সৎ কার্য্যেও সহযোগী হইলেন। শ্যামাচরণের চেষ্টায় কলিকাতার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। উপেন্দ্র নাথের চেষ্টায় জমিদারির বিশেষ উন্নতি হইল। প্রজাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। জমিদারী ও ব্যবসায় উভয়দিকহইতে যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, তেমনই তাঁহাদের সদ্ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশের উন্নতির জন্য যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে নিহিত ছিল, এতদিনে তাহাকে ফলবতী করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক স্থাপিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে কেবল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে পড়িতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে রোগে ঔষধ পাইতে পারে এবং সুচিকিৎসা পাইতে পারে, তাহার জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, সেইজন্য স্বগ্রামে শ্রীশ্রী রাধাকান্ত জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বহু ব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। স্বধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দু হইলেও পরধর্ম্ম মতের প্রতি তিনি কখনও বিরূপ ছিলেন না এবং সেইজন্য মুসলমান প্রজাদিগের মসজিদের জন্য ভূমি দান করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। দেশের অভাব,

অনটন, বিপদাপদাদিতে তিনি মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেন।

আকস্মিক বিপদাদিতে সাহায্যের জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইতেন। ১৩০৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকগণের সাহায্যের জন্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ এবং মহেন্দ্র নাথ গাইন মহোদয়দিগের সহযোগে একটী অন্নছত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৎসরাধিককাল প্রত্যহ প্রায় তিন সহস্র নরনারীকে আহার্য্য প্রদান করেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং সব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহার সহিত তিনি পীড়িতকে ঔষধ পথ্যাদি দান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিতেন। এই অন্নছত্রে যাহাতে হিন্দু মুসলমান স্বধর্ম্মানুযায়ী সুরুচি সঙ্গত ভাবে আহার্য্যাদি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ছিল। কেবল কি ইহা করিয়া ক্ষ্যান্ত হইলেন? না তাহা নহে। যে সমস্ত আসন্নপ্রসবা অথবা নব প্রসূতা নারী অন্নালাভার্থ আগমন করিয়াছিল, তাঁহাদের শুশ্রূষা ও পথ্যেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পুণ্য কীর্ত্তি বাস্তবিক তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার অনন্য সাধারণ জন-সেবার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সার্টিফিকেট অফ্ অনার (Certificate of honour) দান করেন। সাধারণের হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। বেঙ্গল হ্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের পরিচালন কার্য্য যখন তাঁহার পুনঃ পুনঃসতর্কীকরণ সত্ত্বেও অনাচার কলুষিত হইতে লাগিল, তখন তিনি প্রতিবাদে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থায়িত্বের জন্য ব্যবস্থা করেন। উপেন্দ্রনাথের বংশধরগণও পিতার আদর্শের অনুগমন করিয়া বিবিধ সৎকার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন। বসিরহাট সাধারণের সভাসমিতির জন্য কোন সম্মিলন স্থান ছিল না। তাঁহার বংশধরগণ ও ভাগিনেয় রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর বহু ব্যয়ে একটী টাউন হল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া, উপেন্দ্রনাথের পুণ্য নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।—

বংশাবলী—

বিশ্বনাথ তৎপুত্র মাধবরাম ও যাদবরাম; মাধবরামের পুত্র নবকুমার, তৎপুত্র আত্মারাম, তৎপুত্র রামজয় ও প্রীতরাম। রামজয়ের তনয় গোবিন্দ, গোবিন্দের তনয় পতিত চন্দ্র, পতিত

চন্দ্রের তনয় উপেন্দ্র নাথ। উপেন্দ্র নাথের পুত্র—(১) শ্রীধীরেন্দ্র, (২) ৺ নৃপেন্দ্র, (৩) শ্রীপুলিন বিহারী, (৪) শ্রী হেমচন্দ্র, (৫) শ্রীশরচ্চন্দ্র, (৬) শ্রীবসন্তচন্দ্র, (৬) শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র, (৮) ৺নিতাই চন্দ্র, (৯) শ্রীপার্ব্বতীচন্দ্র, (১০) শ্রীপান্নালাল। শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্রের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণপদ, শ্রী কাণাই, শ্রীগিরিধারী। ৺নৃপেন্দ্র চন্দ্রের পুত্র শ্রীকার্ত্তিক। শ্রীপুলিনবিহারীর পুত্র শ্রীপ্রভাত কুসুম, শ্রীঅরুণ কুসুম। শ্রীহেমচন্দ্রের কন্যা—শ্রীমতী নমিতা। শ্রীশরচ্চন্দ্রের পুত্র—দেব প্রসাদ। শ্রী বসন্তের পুত্র—শ্রীমোহন বেণু, শ্রীবংশী, শ্রীতপন। শ্রীপ্রবোধের পুত্র—শ্রীমিহির কুমার, শ্রীশিশির কুমার। শ্রীপার্ব্বতীর দুই কন্যা। শ্রীপান্নালালের তনয়—শ্রীরাতীন্দ্র কুমার, শ্রীরতীন্দ্রকুমার।

উপেন্দ্রনাথ সেন—ইনি জয়পুর শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তদানীন্তন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যুবরাজরূপে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে যে অভিনন্দনপত্র প্রাপ্ত হন, তাহার রৌপ্যাধারটী উপেন্দ্র বাবুর তত্ত্বাবধানে উক্ত বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রৌপ্যাধারটী জাতীয় কলাকৌশলের একটী অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল। উপেন্দ্রনাথের পিতা হরিমোহন সেন জয়পুররাজের অমাত্য ছিলেন।

উবট—ইনি একজন বেদের প্রাচীন ভাষ্যকার। তিনি যজুর্ব্বেদের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার নাম "মন্ত্রভাষ্য"। ভাষ্যের শেষে আত্মপরিচয় চ্ছলে লিখিয়াছেন—"ভোজের রাজত্বকালে অবন্তী নগরে অবস্থানপূর্ব্বক আমি এইভাষ্য রচনা করিলাম।" খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরের অন্তর্গত আনন্দপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বজ্রট। মম্মট ও কৈয়ট তাঁহার পুত্র। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ উবটের দৌহিত্র ছিলেন।

উভয় ভারতী — প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের বিচারকালে তিনি মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিতা হইয়া শঙ্করের শিষ্যা হন।

উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় — তিনি ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে "কাব্য রত্নাকর" নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। কেবল ব্যঙ্গ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কিছুদিন সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইয়াছিল।

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য—তিনি ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে 'জ্ঞান দর্পণ' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বারাণসী হইতে 'চন্দ্রোদয়' নামে আর একখানি পত্রিকা বাহির করেন। ইহা দুই বৎসর চলিয়াছিল। তিনি তথা হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে 'ভৈরবদণ্ড' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। 'রসমুদ্গারের' সঙ্গে ইহার তুমুল যুদ্ধ চলিত।

উমাচরণ গুরুঠাকুর — চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কোয়েপাড়া তাঁহার বাসস্থান। ইনি অন্দেশ্বরীর পাঞ্চালী নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম্য মহিলা সমাজে অন্দেশ্বরী ব্রত নামে এক ব্রত বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। গুরুঠাকুরের পাঞ্চালিতে 'অন্দেশ্বরী ব্রতে'র নিয়মাদি অবগত হওয়া যায়।

উমাচরণ ভদ্র— তিনি 'হিন্দুবন্ধু' নাম দিয়া ১৮৪৭ খ্রীঃঅব্দে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইহার প্রবন্ধাদি লিখিত হইত এবং ইহাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় — উত্তর-পশ্চিম প্রবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালীদের অন্যতম। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে কাশীতে ইহার জন্ম হয়। তথাকার কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিবিধ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ক্রমে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং কুইন্স কলেজ ও আগ্রা কলেজে কিছু-কাল অধ্যাপনা করেন। তদনন্তর ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ঢোলপুরের নাবালক রাণা নিহাল সিংহের শিক্ষক হইয়া ঢোলপুর গমন করেন। পরে ঐ রাজ্যের নানা বিভাগে বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু কুচক্রীদের চক্রান্তে, যোগ্য হইয়াও কোনও উচ্চপদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে রাণার ইংরেজ প্রাইভেট সেক্রেটারীর মৃত্যু হইলে, উমাচরণ ঐ পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে রাণা প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে সম্মানজনক 'সর্দ্দার' উপাধি প্রদান করেন। রাজবংশীয় লোক এবং অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা মাত্র ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজি এবং ভারতীয় কয়েকটি ভাষা ব্যতীত ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায়ও উমাচরণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং গণিতশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কোমলপ্রকৃতি ও সাধুস্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। ঢোলপুরে এখনও তাহার নাম বিশেষ সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

উমানন্দন ঠাকুর —ইনি কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ইনি পণ্ডিত ছিলেন। পাষণ্ড পীড়ন প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং নিজ বাটীতে ইংরাজী ভাষার আলোচনার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে 'জ্ঞানসন্দীপন' সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শতাধিক বর্ষ

পূর্ব্বে তাঁহার এই বিদ্যোৎসাহিতা তদানীন্তন সমাজের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।

উমানাথ গুপ্ত— ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম সহচর ও প্রচারক দলের অন্যতম। কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত 'সুলভ সমাচার' নামক সুলভ সংবাদ পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রায় আশী বৎসর বয়সে ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমাপতি—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি শ্রীপতিভট্ট কৃত 'জ্যোতিষ রত্ন মালা'র এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

উমাপতি ধর—বঙ্গ সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সভায় গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ধর ও কবিরাজ ধোয়ী নামে যে পাঁচ জন সভাসদ্ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক পদাবলী ও বৈষ্ণবতোষিণীতে পাওয়া যায়। তিনি সুবর্ণগ্রাম নিবাসী বৈশ্য কুলোদ্ভব কাঞ্জিলাল দত্ত মহাশয়ের পুত্র। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে সকল তাম্র ফলক খোদিত হইয়াছিল, তাহার অনেক গুলিতে উমাপতি ধরের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উমাস্বাতি—একজন জৈনাচার্য্য। তিনি যাচকমুখ্য 'তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র' নামক জৈন দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে সমন্তভদ্র খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৫০ সালে উমাস্বাতি জ্যামিতি শাস্ত্রের 'ক্ষেত্র' সংজ্ঞা দিয়াছেন। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতির পিতার নাম স্বাতি ও মাতার নাম উমা ছিল। তাঁহার জন্মস্থানের নাম ন্যগ্রোধিকা। পাটলীপুত্র নগরে তিনি স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' রচনা করেন। জিনপ্রভ সূরী তাহার 'তীর্থকল্প' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যে উমাস্বাতি পাঁচ শতাধিক সংস্কৃত প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মতে তাঁহার নাম উমাস্বামী। তিনি অপর জৈনাচার্য্য কুন্দকুন্দের শিষ্য ছিলেন।

উমিচাঁদ—ইনি একজন শিখ বণিক। ইহাঁর প্রকৃত নাম আমিন চাঁদ। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইনি উমিচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে অপর একজন শিখ বণিকের সহিত তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বৈষ্ণবদাস ও মাণিকচাঁদ শেঠের বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রধান বণিকরূপে প্রচুর ধনসম্পত্তি ও নবাব সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বাণিজ্যসূত্রে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক সময় নবাব ও ইংরাজদের গোলযোগে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন। নবাব সৈন্তের কলিকাতা আক্রমণ সময়ে লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধনরত্ন না পাইয়া, উমিচাঁদের বাড়ী লুণ্ঠন করে এবং চারিলক্ষ টাকার জহরতাদি অপহরণ করিয়া লয়। মীরজাফর প্রভৃতি যখন সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন, উমিচাঁদ তখন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া, ত্রিশলক্ষ টাকা দাবী করেন। প্রথমে ক্লাইভ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে না দেওয়াতে অত্যন্ত হতাশ হইয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় হন এবং ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ৫ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

উমেদ সিংহ—তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দির রাজা বুধসিংহের পুত্র। বুধসিংহ প্রথমে অম্বররাজ জয়সিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায়, তিনি বৈগুরঅধিপতি কালমেঘের কন্তাকে বিবাহ করেন। এই রাণীই উমেদসিংহ ও দীপসিংহ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কোন কারণে স্বীয় শ্যালক অম্বরপতি জয়সিংহের সহিত বুধসিংহের শত্রুতা জন্মে। বুধ সিংহ পরাজিত হইয়া বৈগু নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। বালকদ্বয় মাতুলালয়েও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। এস্থান হইতে তাড়িত হইয়া উমেদসিংহ পুচাইল নামক বিজন গিরিকাননে আশ্রয় লইলেন। ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে অম্বরপতি জয়সিংহ কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে উমেদসিংহের বয়স মাত্র তের বৎসর। তিনি কোটার অধিপতি দুর্জন শালের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্জনশাল সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। অম্বররাজ জয়সিংহের মৃত্যুর পরেই উমেদসিংহ স্বীয় সৈন্য সামন্ত একত্রিত করিয়া পত্তন ও গৈনোলি অধিকার করিলেন। তাঁহার বিজয়বার্ত্তা চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়া মাত্র, দলে দলে হারবংশীয় বীরেরা তাঁহার পতাকা মূলে সম্মিলিত হইল। অম্বররাজ জয়সিংহের পুত্র ঈশ্বরী সিংহ তাঁহাকে দমন করিতে যাইয়া প্রথমে পরাজিত হন। দ্বিতীয় বারে উমেদসিংহ পরাজিত হন। তখন উমেদসিংহ মলহররাও হোলকারের সাহায্যে বুন্দি অধিকার করেন। এখন পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া উমেদসিংহ তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর, উমেদসিংহ আবার পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার পরেই, আবার অম্বররাজ মধুসিংহের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইল। উমেদ-

সিংহ স্বীয় ভগিনীর সহিত অম্বররাজ মধুসিংহের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া স্বীয় সর্দ্দার ইন্দ্রগড়পতি দেবসিংহের দ্বারা নারিকেল ফল, মধুসিংহের নিকট প্রেরণ করেন। দেবসিংহ প্রকাশ্য রাজসভায় উমেদসিংহের ভগিনীর চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন। সুতরাং নারিকেল ফল প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহার ফলে দেবসিংহ সবংশে উমেদসিংহের হস্তে নিহত হন। এই ঘটনার পনর বৎসর পরে, তিনি পুত্র অজিতসিংহের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া, ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন, (১৭৭১ খ্রীঃ)। এই সময়ে এই রাজযোগীকে সকলে শ্রীজী বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারতের সকল তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে একটা বিভৎসকাণ্ড সংঘটিত হইল। অম্বররাজ অরিসিংহকে এক উৎসব ক্ষেত্রে বুন্দি রাজ অজিতসিংহ অন্যায়রূপে হত্যা করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীজী (রাজযোগী উমেদসিংহ) স্বীয় পুত্র অজিতসিংহকে অতিশয় তিরস্কার করেন। এই ঘটনার দুই বৎসর মধ্যেই অজিতসিংহ মনস্তাপে পরলোক গমন করেন। তাঁহার শিশু পুত্র বিষণসিংহ রাজা হইলেন। একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া আবার তিনি তীর্থ পর্য্য-টনে বহির্গত হইলেন। মধ্যে মধ্যে পৌত্রকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে স্বীয় রাজ্যে পদার্পণ করিতেন। এহেন উপকারী পিতামহের প্রতি কুলোকের পরামর্শে রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী বলিয়া অপবাদ দিতে বিষণসিংহ ইতস্ততঃ করেন নাই। পরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। শ্রীজী রাজস্থানে এত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন যে, কাহারও রাজ্যে অথবা ভবনে তিনি উপস্থিত হইলে, তাঁহারা আপনাকে অতি-সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেন। পরিশেষে তিনি কেদারনাথ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৌত্রের অতিশয় অনুরোধে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বীয় নগরে আগমন করেন। যেদিন তিনি স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন, সেইদিন রাত্রিতেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। (১৮০৪ খ্রীঃ)

উমেদ সিংহ—ইনি চম্বারাজ উগ্র-সিংহের পুত্র। অমাত্যেরা উগ্রসিংহকে হত্যা করিয়া উগ্রসিংহের পিতৃব্যপুত্র দলেল সিংহকে রাজা করিলে, উমেদ-সিংহ স্বীয় পিতৃরাজ্য লাভ করিবার জন্য দলেলসিংহকে আহ্বান করেন। কিন্তু দলেলসিংহ নিরাপত্যে উমেদ-সিংহকে রাজ্য অর্পণ করেন। উমেদ-সিংহ ১৭৪৮—১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র রাজা রাজসিংহের নাম চম্বার ইতিহাসে বিখ্যাত।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যারত্ন—তাঁহার জন্মস্থান খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রামে ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ময়মনসিংহ সহরের হার্ডিঞ্জ স্কুলে ২০৲ টাকা বেতনের পণ্ডিত ছিলেন। তৎপরে মোক্তারী পাশ করিয়া উক্ত সহরেই মোক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। এই আইন ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তাঁহার সুন্দর অট্টালিকা ও গ্রন্থালয় ছিল। ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই সমস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তিনি তৎপরে কলিকাতা প্রবাসী হন এবং এই স্থানে কঠোর দারিদ্রতার মধ্যে তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় ব্রতী হন। একজন অসামান্য বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন; বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত শুধু বাংলায় নহে, ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। 'মানবের আদি জন্মভূমি' ও 'জাতিতত্ত্ববারিধি' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত মণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, তিনি অনায়াসে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োজন মত ভূরি ভূরি শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। এরূপ ক্ষমতা অনেকের থাকে, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে প্রাচীন সাহিত্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করার শক্তি, পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি নির্ভীক ও তেজস্বী লোক ছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সাংসারিক ক্ষতি বা দৈহিক আঘাত প্রাপ্তির ভয়ে, তাহা বলিতে তিনি বিরত হইতেন না। তাঁহার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি আরও যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, শেষজীবনে দারিদ্র্যবশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি বেদের এক নূতন ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই ১৩০০ সালের ৯ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্র দত্ত—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম হর মোহন দত্ত। মাতা সর্ব্বমঙ্গলা ধর্ম্মশীলা

সুগৃহিণী ছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে সুখ্যাতির সহিত প্রথম বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইহাতে ইংরাজী পড়ার কথঞ্চিত সুবিধা হয়। তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াও বৃত্তি পান। এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারের ব্যয় বহন করিবার জন্য ছাত্র পড়াইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইত। এজন্য নিজ পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইত। এ সময়ে এক বাড়ীর নিম্নতলে একটি ঘর ভাড়া করিয়া স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন, কেবল নিজের নয় আরও ২।৩ জনের রান্না করিতে হইত। রান্না করিয়া ও ছেলে পড়াইয়া যে সময়টুকু বাঁচিত তাহাতেই কোন প্রকারে নিজের পড়া করিতেন। বাটীর অন্যান্য লোক সুরাপান করিয়া মত্ততাবশে নানাপ্রকার উপদ্রব করিত ইহাতে কেবল পড়ার ক্ষতি নয় মনও ব্যথিত হইত। কিন্তু ইহাতে তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা লাভ করেন। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার বৃত্তি ও অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের কথা জানিয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। তিনি অবিকৃত চিত্তে সকল ভার বহন করিয়া নিজ পাঠ চালাইতে লাগিলেন। এই ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত জীবন এই শিক্ষকতায়ই কাটিয়াছে।

এই অবস্থাতেই ১৮৬৭ সালে বি, এ, পাশ করিতে হয়। নানা বিদ্যালয়ে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত থাকিয়া হরিনাভি স্কুলে আসেন। এইস্থানেই তাঁহার চরিত্রের সম্যক বিকাশ হয়। জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্যাকুলাত্মাগণের সঙ্গলাভ তাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী করে। এই সময়ে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ এই বিবাহের বিরোধী হইয়া, নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। পিতামহীর মৃত্যু হইলে সৎকারের জন্য কাষ্ঠ পাইলেন না। গ্রামবাসীদের প্ররোচনায় দোকানদার কাষ্ঠ বেচিল না। অগত্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একটী আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া সৎকার করিলেন। শ্রাদ্ধকালেও তিনি যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হরিনাভিতে প্রধান শিক্ষকরূপে থাকাকালীন অনেক কল্যাণকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার

অকৃত্রিম ভালবাসায় ছাত্রগণ মুগ্ধ ও অনুরাগী হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে গুরু হইলেও, ব্যবহারে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ছিলেন। তথায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্র একত্র মিলিত হইলে বিরোধীগণের প্রহারে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতে হয় এবং বিরোধীগণ কর্তৃক ব্রহ্মোপাসনা গৃহে এক কালী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী কালে বিরোধীগণই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ভূমিদান করে ও সেইস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

কলিকাতাই তাঁহার প্রধান ও শেষ কর্ম্মক্ষেত্র। সিটি কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং মূকবধির বিদ্যালয় তাঁহার নীরব প্রাণপাতের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে, অনাথবন্ধু সমিতিতে, ভারত সভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কাজে লিপ্ত থাকিতেন। অথচ আড়ম্বর নাই, কোলাহল নাই। তাঁহার ন্যায় নিস্পৃহ, নিষ্কাম, শান্ত, আত্মসংযমী, কর্ম্মযোগী বিরল। নারীচরিত্রে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মহিলাদের উপযোগী পত্রিকা ৪৫ বৎসর নীরবে নারী জাতির কল্যাণের জন্য পরিচালিত করিয়াছেন। ইহাতে সহানুভূতি করার লোক বড় একটী ছিল না। কলিকাতায় মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপনও তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ইহার জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি দুইটী মূক ও বধির ছাত্র লইয়া সিটিকলেজে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরদুঃখ মোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। মাদক-নিবারণী সভার জন্যও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। নিজে জ্ঞানার্জ্জনে সুখী হইয়া তৃপ্ত থাকেন নাই, সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন এবং সমাজের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর করার জন্য আজীবন প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কর্ম্মের পশ্চাতে ছিল তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব। প্রতিদিনের জীবনের সহিত তাঁহার উপাসনার সামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার ভিতরও বাহিরের জীবন একই ছাঁচে গঠিত ছিল। প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির সহিত তিনি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আন্তরিকতা তাঁহার সকল কার্য্যের প্রাণ ছিল। তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে, সমস্ত সংসার ও শিশুসন্তানগণের ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি জননীর ন্যায় তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ঘরে তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত যেমন পালন করিতেন, বাহিরের নানাবিধ সৎকার্য্যও তেমনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। ১৩১৪

সালের ১১ই আষাঢ় এই সাধু পুরুষের নশ্বর দেহের অবসান হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুন নদীয়া কৃষ্ণনগরে ইহার জন্ম হয়। পিতা দুর্গাদাস দত্ত পুত্রকে দুই বৎসরের রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, দারিদ্র্য নিবন্ধন উমেশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ কৃষ্ণ নগরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য প্রার্থী হন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পাঠ করিয়া উমেশচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপর নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে ২১শে জুন তিনি পরলোক গমন করেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—জন্মস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত রামনগর গ্রাম। জন্ম ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ভাদ্র। পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। শিক্ষা সমাপনান্তে উমেশচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। পঠদ্দশায়ই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া দশ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। এই প্রতিভাশালী বঙ্গ সন্তান মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে মাতা পিতার জীবদ্দশায় ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ১লা শ্রাবণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম 'সাংখ্য দর্শন', 'বেদ প্রবেশিকা' এতদ্ব্যতীত বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় বৈদিক প্রবন্ধাবলী, গৌরাঙ্গ চরিত লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার বিনম্র স্বভাব সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত। তিনি কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন না। বাহ্যাড়ম্বর তিনি ভালবাসিতেন না। বৈদেশিক পরিচ্ছদে তিনি অনুরাগী ছিলেন না।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — তিনি ব্যারিষ্টার ডাব্লিউ, সি, বানার্জ্জি নামে সমধিক খ্যাত। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে ডিসেম্বর ইনি খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরীশচন্দ্র হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত এটর্ণী ছিলেন। উমেশ চন্দ্র বাল্যকালে পাঠে অমনোযোগী ছিলেন। থিয়েটার করিয়াই সময় কাটাইতেন। পুত্রের পাঠে অবহেলা দেখিয়া পিতা একজন বিখ্যাত ইংরাজ এটর্ণীর অফিসে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া দেন। পিতার পরম বন্ধু ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ গিরীশচন্দ্র ঘোষের নিকট যাইয়া উমেশচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। গিরীশচন্দ্রের

সাহায্যে তাঁহার অসাধারণ উন্নতি হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর পিতার উদ্যোগে ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল ব্যারিষ্টারী করিয়া তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও তর্ক শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি চারিবার ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিলের (Standing Counsel) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতি পদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রত্যাখান করেন। ব্যারিষ্টারী করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। অষ্টম অধিবেশনেও তিনি সভাপতি পদ লাভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারালয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, এবং স্বদেশসেবায় প্রবল উৎসাহ ছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার সুন্দর আকৃতি ও সরল অমায়িক ব্যবহার সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত। লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে "খিদিরপুর হাউস" নাম দিয়া একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ক্রয়ডনের নিজ বাটীতে ইনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার চিতাভস্ম ক্রয়ডনের বাটীর এক প্রান্তে প্রোথিত রাখিয়া তাহার উপর স্মৃতি ফলক স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে "হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" এইরূপ খোদিত আছে।

উমেশচন্দ্র মিত্র—তিনি ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে 'বিধবা বিবাহ' নামে একখানা নাটক লিখিয়া যশস্বী হন। তৎকালীন সাময়িক পত্রে এই বিয়োগান্ত নাটকের বিশেষ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে বড় বাজার সিন্দুরিয়া পটীস্থ গোপাল লাল শীল মহাশয়ের ভবনে একবার ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

উয়াং হিউয়েনসি — চীন দেশের অধিপতি উয়াং হিউয়েন সি ৬৪৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময়ে উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার মন্ত্রী অর্জ্জুন থানেশ্বরের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। হর্ষ বর্দ্ধনের বন্ধু চীন দেশাধিপতি অর্জ্জুনকে বন্দী করিয়া চীন দেশে লইয়া যান। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্ত্তমান আসাম) অধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা বহু মূল্যবান্ উপহার প্রেরণ করিয়া চীন সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

উরুবিল্ব কশ্যপ — ভগবান গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। উরুবিল্ব কশ্যপ, নদী কশ্যপ ও গয়াকশ্যপ, তাঁহারা তিনজন জটিল সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বহু শিষ্য ছিল। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে, বুদ্ধদেব এই তিনজন জটিল ভ্রাতার সন্ধান পান এবং তিন-জনকেই স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে উরুবিল্ব কশ্যপ বুদ্ধের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন। তথাগত তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কতিপয় দিন তাঁহার আলয়ে বাস করেন। ঐ সময়ে তিনি কয়েকটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

উরু সিংহ—অন্য নাম সগ্রব্ধা। তিনি মণিপুরের মহারাজা কুলচন্দ্র সিংহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের মণিপুর বিদ্রোহের প্রথম ভাগে তিনি বিপন্ন অনেক ইংরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বিচারে তিনি ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

উল্লাল রঘুনাথায়্য়া— ইনি দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত ম্যাঙ্গা-লোরের প্রধান ধর্ম্ম সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। যে সকল জাতিকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও মানবিকতা বিরুদ্ধ "অস্পৃশ্য" নাম দেওয়া হয়, ইনি তাহা-দের সহিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের উন্নতির জন্য বহু বৎসর ব্যাপী আন্তরিক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাহার সুফলও ফলিয়াছে। ইনি এক বৎসর কলিকাতায় সমগ্র ভারতের একেশ্বর-বাদীদিগের সম্মিলনে সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। আশী বৎসর বয়সে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

উষবদাত—তিনি শক বংশীয় নরপতি ছিলেন। তিনি নরপতি নহপাণের জামাতা ছিলেন। শক নরপতিগণ একদিকে যেমন অতিশয় ব্রাহ্মণ ভক্ত, অপরদিকে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের প্রতিও উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের সাম্যনীতি ছিল। এই কারণে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সমাজেই শক নরপতি সমাদর লাভ করেন।

উষ্ট্র নাথ—নাথপন্থীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

উসমান—ইনি বঙ্গীয় পাঠানদের মধ্যে শেষ রাজা। তাঁহার অতুলনীয় বীরত্বে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এই বীর রাজা অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে হত হন। "বহারিস্তান" নামক ফার্সী হস্তলিপিতে উসমানের পতনের সুদীর্ঘ বিবরণ আছে। ইহা মোগল সেনাপতি মীরজা নহনের আত্মকাহিনী

এবং তাঁহার স্বহস্তে সংশোধিত। অভিযানে ইনি আদ্যোপান্ত উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং উসমানের সহিত শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। 'উহার' উসমানের রাজধানী ছিল। এই রাজধানী বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজার থানার অন্তর্গত বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। উসমান ৪০ বৎসর বয়সে রণক্ষেত্রে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দশা সৈন্যদিগের নিকট গোপন ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও অনেকক্ষণ তাঁহার শব লইয়া হস্তী রণব্যূহে দণ্ডায়মান ছিল। উসমান প্রথমে প্রকৃতই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি এত শীঘ্র মারা না গেলে সেইখানে মুঘলদের ভয়ঙ্কর পরাজয় হইত। ১৬১২ সালের মার্চ্চ মাসে এই যুদ্ধ ঘটে। উসমানের পিতা ঈশা খাঁ লোহানী মিয়ান খেল, কৎলু খাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং কৎলু খাঁর মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। উসমান পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন।

ঊর্দ্ধধনুষ নাথ— নাথপন্থীদের ৮৪জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। আপাননাথ দেখ।

ঊর্দ্ধসংযুক্ত পাদনাথ— নাথপন্থীদের ৮৪জন সিদ্ধপুরুষের অন্যতম। আপান-নাথ দেখ।

ঋদ্ধিনাথ— দশনামী সন্ন্যাসীরা ৫২টী মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক একজন সিদ্ধপুরুষ এক একটী মড়ির প্রতিষ্ঠাতা। ঋদ্ধিনাথও একটী মড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

ঋষভদাস—ইনি একজন জৈন কবি। "হীর বিজয় স্থরিরাস" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ঋষভদেব, তীর্থঙ্কর — জৈনীদের আদি গুরু। জৈনারা বলেন তাঁহাদের ধর্ম্মমত বহু পুরাতন। তাঁহাদের ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা গুরু জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের আদিগুরু ঋষভদেব। খৃষ্টের জন্মের আটশত বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ স্বামী চাতুর্য্যম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার বহু পূর্ব্বে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈনমত সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ঋষিপুত্র—তিনি অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঋষি। তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু বরাহের বৃহৎ সংহিতায়, উৎপল ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে, তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ঋষিপুত্র শব্দে ব্রহ্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিসৃত, সুতরাং ব্রহ্মা হইতে জ্যোতিষ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঋষি শর্ম্মা — 'জ্ঞান মঞ্জরী' নামক ফলিত জ্যোতিষগ্রন্থ তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঋষিবরমুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর —ইংরাজী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। গত শতাব্দিতে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়া সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এবং কিছুকাল জম্মু প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পরও কাশ্মীর মহারাজের অনুরোধে তিনি বর্ত্তমান মহারাজ স্যার হরিসিংহের সহিত বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ার ম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাঁকুড়ার প্রকাণ্ড বাড়ী ও জমিদারী বাঁকুড়া সহরে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে

তিনি বহু সম্পত্তি কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান; তাঁহার কন্যার সহিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নেতা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মে সোমবার কাশ্মীররাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ব্যারিষ্টার রায় বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটীতে পরলোক গমন করেন।

এ

এইটকেন রবার্ট হোপ মনক্রিফ (Aitken Robert Hope Moncrieff,—তিনি সৈন্য বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন; ১৮৪৮—৪৯ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাব সমরে তিনি লিপ্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি লক্ষ্ণৌ, কানপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যার ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিসের পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি কর্ণেলের পদ লাভ করেন. ১৮৮৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর (১২৯৪ সালের ২রা আশ্বিন) তিনি পরলোক গমন করেন।

একদিল শাহ— ইনি একজন ইসলাম ভক্ত পীর বা সাধু পুরুষ ছিলেন। ইঁহার সরল ধর্ম্মমত ভারতীয় ভাবানুকূল ছিল, এজন্য তিনি বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী হইয়া ছিলেন। পশ্চিম দেশের সাহানা নদীর তীরে, সাহানা গ্রামে সাহনীর সওদাগরের পত্নী পুণ্যবতী আশকনুরীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ছত্রাজিত রাণা সেই সময়ে রাজা ছিলেন। বৈরাট নগরের মোল্লা আতার নিকট একদিল শিক্ষালাভ করেন। চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ বদর, একদিল শাহের দীক্ষাগুরু ছিলেন; উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্রই তাঁহার রচিত গান প্রচলিত আছে। পুঁথির সাহায্যে একদিল সাহের দেহত্যাগের সময় ও স্থান নিরূপণ করা কঠিন। ২৪ পরগণার বারাশত মহকুমার এলাকায় কাজি পাড়ার নিকট একদিল সাহের এক সুপরিচিত দরগা আছে। এই দরগাই উল্লিখিত একদিল সাহের দরগা

কিনা তাহা এখনও সুনিশ্চিতরূপে মীমাংসা হয় নাই।

একনাথ—নাথ পন্থীদের গোরক্ষপন্থী শাখার নবনাথের অন্যতম। উদয়নাথ দেখ।

একনাথ স্বামী — মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ সাধু। ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে গোদাবরী তীরস্থ পৈঠন নামক স্থানে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সূর্য্যাজী। একনাথ ভাগবত অনুবাদ করিয়া ছন্দে প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত ভাগবত গ্রন্থ মহারাষ্ট্রে অতি সমাদরে পঠিত হয়। তিনি ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই ধর্ম্ম প্রচারে সকল প্রকার নির্য্যাতন অকাতরে বহন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে মাহার নামে এক অতি নিকৃষ্ট জাতীয় লোক আছে। তিনি তাহাদের সঙ্গে আহারাদি করিতেন; তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, বহু লোক তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

একপাদ বৃক্ষ নাথ—নাথপন্থী ৮৪জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। আপান নাথ দেখ।

একাঙ্গ বীর—বঙ্গাধিপ বিজয়সেনের অন্য নাম। বিজয়সেনের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, কর্ণাটরাজ্য লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের ধ্বংসসাধন করিয়া তিনি এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।

একাম্র নাথ অবধান সরস্বতী—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'আয়ুর্ব্বেদ সুধানিধি'গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

এক্কোজি—শাহজি ভোঁসলার পুত্র। শিবাজির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঞ্জুর রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি এই প্রদেশ ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রাপ্ত হন।

এক্তিয়ার খাঁ-খুলনা জিলায় এই ফকির শাহ প্রসিদ্ধ দরবেশ খাঁ জাহান-আলীর সহিত আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার খনিত দীঘি, নির্ম্মিত মসজিদ তাঁহার নাম বহন করিয়া বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগর গ্রামে এখনও বর্ত্তমান আছে।

এক্রাম উদ্দৌল্লা — ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসিটী বেগমের ইনি পালিত পুত্র ছিলেন। তিনি নোয়াজিস্ মোহাম্মদের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান বলিয়া এক্রাম উদ্দৌল্লাকে স্নেহে লালন পালন করিতেন। এক্রাম উদ্দৌল্লা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, শোকে নোয়াজিস্ মোহাম্মদ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নোয়াজিস মোহাম্মদ এক্রামের শিশু পুত্রকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন।

এক্রাম খাঁ (১)—সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজলের ভাগিনেয়। তাঁহার পিতার নাম ইস্লাম খাঁ ও মাতার নাম

লাড্‌লি বেগম (ইস্‌লাম খাঁ দেখ) (২) দিল্লীর মুঘল বংশীয় সম্রাট আওরঙ্গ-জীবের অন্যতম সেনাপতি এক্রাম খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন। তিনি বিগ্রহের চক্ষুস্থিত দুইটী বহুমূল্যবান মণি অপহরণ করেন এবং মন্দির স্তম্ভাদি বিনষ্ট করেন (১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দ)।

এক্রাম খাঁ, সৈয়দ—তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নবাব মুরশিদ্‌ কুলী খাঁর সময়ে প্রতিনিধি দেওয়ান ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, উক্ত পদে নবাবের দৌহিত্রীপতি নাজির আহাম্মদ নিযুক্ত হন।

এগনিউ, পেট্রিক আলেকজাণ্ডার ভানস্‌ — (Patrick Alexander Vans Agnew,) ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে তাহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পেট্রিক ভানস্‌ এগনিউ (Lt. Colonel P. Vans Agnew)। ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়া আগমন করেন এবং প্রথমে পাঞ্জাব প্রদেশে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি লাহোরের রেসিডেন্টের সহকারী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি লেপ্টেনেণ্ট এণ্ডার্সনের সঙ্গে মুলতানে গমন করেন। ঐ সালের ২০শে এপ্রিল মুলতানপতি মুলরাজের প্ররোচনায় তাঁহারা নিহত হন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের ইহাই অন্যতম কারণ।

এগনিউ, সার উইলিয়ম ফিশার—(Sir William Fischer Agnew,) ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জেনারেল এগনিউ (General Agnew) ভারতে সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি Indian Law Reports সম্পাদন করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪—১৯০০ সাল পর্য্যন্ত রেঙ্গুনের রেকর্ডার এবং ১৮৮৫—১৯০০ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি সার উপাধি প্রাপ্ত হন। কতকগুলি আইনের বই তিনি লিখিয়াছেন। তিনি ১৯০৩ সালে পরলোক গমন করেন।

এচিসন, সার চার্লস আমফারষ্টোন—(Sir Charles Umpherstone Aitchison.) ১৮৩৩ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হিউ এচিসন (Hugh Aitchison)। তিনি স্বদেশ স্কটলণ্ড দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৬ সালে তিনি ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়া

আসেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি হিসারে ছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান; কিন্তু সেই স্থানের অন্যান্য ইউরোপীয়েরা নিহত হন। ভারত সরকারের অধীনে বিদেশীয় রাজ্য সম্বন্ধীয় বিভাগে ১৮৫৯—৬৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। তৎপরে ১৮৬৮—১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেক্রেটরী ছিলেন।

তিনি ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ হইতে ১৮৮০ সালের জুলাই পর্য্যন্ত, ব্রিটিশ বর্ম্মার চিফ কমিশনার ছিলেন। ১৮৮২-৮৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাবের লেঃ গবর্ণর ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালের এপ্রিল হইতে ১৮৮৮ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত সুপ্রিম কাউনসিলের মেম্বর ছিলেন। ১৮৮৮ সালের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৮১ সালে তিনি সি, আই, ই, এবং ১৮৮২ সালে কে, সি, এস্ আই, উপাধি লাভ করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল্. এল্. ডি, উপাধি লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত এম্, এ, উপাধি প্রদান করেন। Treaties, Engagements and Sanads নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত The Native States of India এবং Lord Laurence নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত। ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ড নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এডাম উইলিয়াম পেটি ক—(William Patric Adam)—১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে (১২৩১ সালে) তাহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম এডমিরেল স্যার চার্লস্ এডাম (Admiral Sir Charles Adam)। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করিয়া ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিষ্টার হন। বোম্বাই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা লর্ড এলফিনষ্টোনের (Lord Elphinstone) ১৮৫৩-৫৮সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তৎপরে স্বদেশে যাইয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হন এবং আরও কোন কোন স্থানে কাজ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে উতকমন্দ নগরে পরলোক গমন করেন।

এডাম, জন — (John Adam) ১৭৭৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম এডাম (Right Hon. W. Adam)। স্বদেশে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণীর পদ গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বৎসর পাটনায় কাজ

করিয়া ১৮০২ সালে গবর্ণর জেনেরেলের প্রধান কর্ম্মচারী হন। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজনীতির গোপনীয় বিভাগে ডেপুটী সেক্রেটারী হন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক বিভাগের সেক্রেটারী হন। ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে রাজনৈতিক বিভাগের বিদেশীয় অংশে সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮১৭ সালে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস (Marquis of Hastings) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। ১৮১৯-২৫ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রিম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী হইতে লর্ড হেষ্টিংসের ভারত ত্যাগের পর তিনি আগষ্ট পর্য্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্টের আগমন পর্য্যন্ত, বড় লাটের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া এক আইন পাশ হয়, সেই আইন পাশের ফলে ক্যালকাটা জার্ণেল (Calcutta Journal) পত্রের নির্ভিক সম্পাদক জন সিল্ক বাকিংহাম (John Silk Buckingham) এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। এডাম সাহেবই এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য প্রথম এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

এডাম, সার ফ্রেডারিক — (Sir Frederick Adam,) — তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম এডাম (Right Hon. William Adam)। ১৭৯৫ সালে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া, ভারতের বাহিরে মিসর, সিসিলি প্রভৃতি নানাস্থানে কর্ম্ম করেন। তৎপরে ১৮৩২-৩৭ সাল পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

এডামস্, সার্ জন ওয়ার্দিংটন, (Sir John Warthington Adams,) —১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং সার রবার্ট এবারক্রম্বির অধীনে রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ অব্দে শ্রীরঙ্গ পত্তন অবরোধ করেন। ১৮০৯ সালে তিনি চিত্রল যুদ্ধে সৈন্যপরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে বান্দা অধিকার করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভরতপুর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া কর্ণেল পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ তিনি পরলোক গমন করেন।

এডামস্, রেভাঃ জেমস উইলিয়মস — (Rev. James Williams Adams) ১৮৪০ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার জন্ম।

হয়। ডবলিন নগরের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি ধর্ম্মযাজকরূপে ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত কাজ করেন। কাবুল যুদ্ধে লর্ড রবার্ট্স এর সঙ্গে ধর্ম্ম যাজকরূপে গমন করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটী বিপন্ন ও আহত সৈন্যের প্রাণরক্ষা করিয়া, ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রাপ্ত হন। কিছুদিন ব্রহ্মদেশেও কাজ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালের ২০শে অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

এডাম্‌স টমাস — (Adams Thomas) তিনি ক্লাইবের সমসাময়িক ছিলেন। ১৭৬৩ সালে তিনি বঙ্গদেশে সৈন্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি মীর কাশিমের সেনাপতিকে পরাজিত করেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন এবং ঘেরিয়া, উদয়নালা অধিকারপূর্ব্বক পাটনায় উপস্থিত হন। মীর কাশিম নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তিনি অসুস্থ শরীরেই তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। কিন্তু ১৭৬৪ সালে পরলোক গমন করেন।

এডি, সার জন মিলার — (Sir John Miller Adye, ১৮১৯ সালের ১লা নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মেজর জে, পি, এডি (Major J. P. Adye) ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি জেনেরেল উইণ্ডহামের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৫৯ সালে মান্দ্রাজে ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ডেপুটী এডজুটেণ্ট জেনেরেলের পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ২৬ আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকখানা বই লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে The Defence of Cawnpur, Sitona, Mountain Campaign ও Indian Frontier History প্রধান।

এড়ুমিশ্র—হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পরা যায় যে, কনৌজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমনের অল্পকাল পরে, পাল রাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়া ছিলেন। এই এড়ুমিশ্র বল্লালসেনের পৌত্র, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেশব সেন মুসলমান নরপতি হইতে দূরে অবস্থান করিবার জন্য, পূর্ব্ববঙ্গের রাজা বিশ্বরূপ সেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এই স্থানেই তাঁহার গ্রন্থ রচিত হয়।

এণ্টনি— ইনি একজন কবিওয়ালা। তাঁহার পুরা নাম হেন্সমান এণ্টনি। ইনি প্রথম জীবনে একজন পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে

বঙ্গদেশে আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। কিছুকাল পরে এক ব্রাহ্মণ, বিধবা যুবতীর প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে লইয়া গরুটির নিকট বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বিস্তৃত বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান। ইহা গরুটির বাগানবাটী বলিয়া খ্যাত ছিল। ঐ ব্রাহ্মণকন্যার সংস্পর্শে আসিয়া ইনি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। আচার, ব্যবহার ও ভাষা পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইনি কবির দল গঠন করেন। প্রথমতঃ অন্যের রচিত সঙ্গীত গাইয়া বেড়াইতেন। চন্দননগর, গোন্দলপাড়া নিবাসী গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, শেষে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটিলে নিজেই উত্তম গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কবিওয়ালা হিসাবে এন্টনি সাহেব যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ভোলা ময়রা তাঁহাকে 'হেস্নুন' বলিত। কবিদের তুলনায় তিনি যে অধিকতর গুণসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাহা নহে। বোধ হয় তিনি বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গি ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার নাম এত অধিক বিখ্যাত হইয়াছিল। প্রকৃতই বিধর্ম্মী হইয়াও তিনি যেরূপ ভক্তিভাবের গীত রচনা ও গান করিয়াছেন, তাহা অনেক কবির গানের মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার ভ্রাতা কেলি সাহেব সে সময়ের একজন অর্থপ্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উপস্থিত কবিতা রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একবার কবির আসরে প্রতিপক্ষদলের নেতা ঠাকুর সিংহ ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন:—

"বলহে এন্টনি আমি একটি কথা
জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে
কেন কুর্ত্তা • 'ই?

উত্তর:—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে
আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই,
কুর্ত্তা টুপি ছেড়েছি॥

আর একবার প্রতিপক্ষ রাম বসু প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা
মুড়ালি।
ও তোর পাদ্রী সাহেব শুনতে পেলে
গালে দেবে চূণ কালী॥

তখন তিনি গাহিয়াছিলেন—

উত্তর—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নেই
রে ভাই!
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই।

আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ স্থাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে
রাঙ্গা চরণ যদি পাই।

কথিত আছে কলিকাতা বৌবাজারে এক মন্দিরে ফিরিঙ্গী কালী নামে যে বিখ্যাত কালীমূর্ত্তি আছে, উহা এই ফিরিঙ্গী এন্টনির ব্রাহ্মণী পত্নীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সাহেবের ভবানী বিষয়ক গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও ভাবোদ্দীপক। গরুটীর বকুলতলায় তাঁহার বাগানের উপর এখন পাটকলের সাহেবদের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

এণ্টোনিও কার্ডিম ফ্রোজ — (Cardim Froes Antonio)—গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়া বাজীরাও কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তখন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি এণ্টোনিও কার্ডিম ফ্রোজের বীরত্বে তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সামান্য পদ হইতে ক্রমে প্রধান সেনাপতির পদ অধিকার করেন।

এণ্টোনিও ডি সিলভিরা (Antonio de Silvira)—তিনি একজন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে বান্দারা হইতে সুরাট পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম সমুদ্র উপকূলভাগ তিনি লুণ্ঠন করিয়া প্রায় দুই হাজার লোককে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এতকাদ খাঁ—রাজকুমার মোহাম্মদ সুজা ১৬৩৯—১৬৬১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু মধ্যে ১৬৪৭-১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত দুই বৎসর এতকাদ খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর অন্যতম পুত্র ও শায়েস্তা খাঁর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। তিনি আমোদপ্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশে অবস্থানকালে শাসনপ্রণালীর কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই।

এনায়েৎউল্লা সরকার, মুন্সী—তিনি একজন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। 'জরাসুন্দার পুঁথি' নামক পুস্তক তাঁহার রচিত।

এনায়েৎ উল্লা — তাঁহার জন্মস্থান রংপুর জিলার শীতলগাড়ী গ্রাম। ১২৯৯ সালে তিনি 'ফকির বিলাস' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

এনায়েৎ উল্লা খাঁ—নিশাপুরের সৈয়দ্ জামালের বংশধর স্কুর উল্লা খাঁর পুত্র। তাঁহার মাতা হাফেজ মরিয়াম সম্রাট আলমগীরের কন্যা জেবউন্নীসা বেগমের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যে তাঁহার পুত্র এনায়েৎ উল্লা আড়াই হাজার সৈন্যের নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া সম্রাট

মোহাম্মদের সময়ে তিনি সাত হাজার সৈন্যের নায়ক হন। তিনি কয়েক খানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এনায়েৎ উল্লা, শেখ—তিনি দিল্লীর অধিবাসী। তিনি অতি উৎকৃষ্ট আমোদ-প্রদ 'বাহার দানিস' নামক গল্পের বই লিখিয়াছেন। জুনাথন স্কট (Jonathan Scott) এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে অনুবাদ করেন।

এনায়েৎ খাঁ—তাঁহার কবিজন সুলভ নাম আসনা। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ তাহির। তিনি জাফর খাঁর পুত্র। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'শাজাহান' নামক গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। ইহা সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের ইতিহাস। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এনি বেসান্ত — (Mrs. Annie Beasant) যে সকল ইংরেজ মহিলা ও পুরুষ ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং নিঃস্বার্থভাবে ভারতের উপকারের জন্য পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এনি বেসান্ত তাঁহাদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়াম পেজউড। তিনি ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বিংশতি বৎসর বয়সে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেসান্ত (Rov. Frank Beasant) নামক ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু কতিপয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। তাহার পর কিছুকাল বিখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী ব্রাডল (Bradlaugh) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি নাস্তিকতা প্রচার করিতে থাকেন। তাহার পর ম্যাডাম ব্লাভাস্কি (Madamme Blavasatsky) নামক এক মহিয়সী মহিলার রচিত 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিন' (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থ পাঠে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তিনি গ্রন্থকর্ত্রীর শিষ্যা হন। অতঃপর, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'তত্ত্ববিদ্যা সমিতি' (Theosophical Society) তে যোগদান করেন এবং তদবধি আমরণ ঐ সমিতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও তত্ত্ববিদ্যার (Theosophy) প্রচারের জন্য সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন। কর্ণেল অলকটের (Colonel Olcott) মৃত্যুর পর, তিনি উক্ত সমিতির পরিচালিকা হন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সমিতির মুখপত্র থিয়সফি (Theosophy) নামক পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন, এবং উক্ত সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুবার পর্য্যটন করেন। তাঁহার পরিচালনার কৃতিত্বে ভারতে এবং জগতের অন্যান্য

স্থানেও উক্ত সমিতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এনি বেশান্ত ভারতের—বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির—প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। হিন্দুগণ যাহাতে নিজ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্যও তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। প্রবন্ধপ্রকাশ ও বক্তৃতার দ্বারা তিনি এই বিষয়েও প্রভূত পরিশ্রম করেন। তিনি বেশভূষা ও আহারাদি বিষয়েও হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। ভারতীয় বালকবালিকাগণ যাহাতে সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের সহিত জাতীয় ধর্ম্ম ও সন্নীতি শিক্ষালাভ করে, তদ্বিষয়েও তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। প্রধানতঃ ধর্ম্মবিষয়ক প্রচারিকা হইলেও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সংস্রবে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'কমন উইল' (Common Weal) নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পরে মাদ্রাজ উদার নৈতিক দলের মুখপত্র স্বরূপ 'সিটিজেন' (Citizen) নামক পত্রিকা প্রকাশ হইলে, 'কমন উইলে'র প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১৯১৪ সালের মধ্যভাগে তিনি 'মাদ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড' (Madras Standard) নামক দৈনিক পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহা 'নিউ ইণ্ডিয়া', (New India) এই নূতন নামে প্রকাশ করিতে থাকেন। উক্ত পত্রিকায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধাদি অনেক সময়েই ভারত সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে দুই হাজার টাকা জামীন চাওয়া হয়। তদুপরি বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর এক নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়।

অন্যান্য ব্রিটীশ উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষও যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপে স্বায়ত্বশাসন (Home Rule) লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে 'হোম রুল' সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচার ও দেশের নানা স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। তাহার কিছুকাল পরে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ নগরে তিনি 'হোম রুল লীগ' (Home Rule League) নামে এক রাজনৈতিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজকেই উক্ত সঙ্ঘের মুখপত্র করিয়া এতদ্বিষয়ে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঐ প্রচার কার্য্যের ফলস্বরূপ তিনি এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী অন্তরীণ হন। তাঁহাদের মুক্তির জন্য

দেশের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তৎফলে কিছুকাল পরেই তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনরায় 'নিউ ইণ্ডিয়ার' কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন।

গবর্ণমেণ্টের দমনমূলক সকল প্রকার কার্য্যেরই তিনি অতি তীব্র সমালোচনা করিতেন; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ এবং অসহ-যোগ আন্দোলনের সহিত তাঁহার সবিশেষ সহানুভূতি ছিল না। সেই কারণে পরে কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ-যোগ রক্ষা করিতে না পারিয়া, উদার-নৈতিক দলের (National Liberal Federation) সহিত যোগদান করেন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর শ্রীযুক্তা বেসান্তের আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯২৫ সালে, 'কমন ওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিল' (Commonwealth of India Bill) নামে একটী বিলের খসড়া রচিত হয়। উক্ত বিলে ভারতবর্ষকে পূর্ণ ঔপনিবে-শিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটীশ শ্রমিকদল এই বিলটী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একজন শ্রমিক-সদস্য উহা প্রথমদফা আলোচনার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আর দ্বিতীয়দফা আলোচনা হয় নাই, সুতরাং বিলটী বাতিল হইয়া যায় এবং শ্রীযুক্তা বেসান্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি থিয়সফিক্যাল (Theosophical) সম্মিলনে এক বক্তৃতা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ সাধারণ বক্তৃতা।

১৯১০ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজ নিবাসী এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক তাঁহার দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সমুদয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় এনি বেসান্তের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তিনিও আনন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পরেই, বালকদ্বয়ের পিতার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি এনি-বেশান্তকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার পরাজয় হয় কিন্তু এনিবেসান্ত প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিয়া নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। ঐ বালক দুইটীর অন্যতম জে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, পরে 'তত্ত্ববিদ্যা সম্প্রদায়ের' একজন নেতৃ-স্থানীয় হইয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতাতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভানেত্রীর পদে বৃতা হন এবং কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট রূপে ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৫ সালে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি ভারতের জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবী

করিয়া উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বরাবরই নির্ভীকভাবে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী-দিগের অনুরোধ বা ভয় প্রদর্শন কিছুই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ভারত-বাসীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজ-নৈতিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য আমরণ যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া এই মনস্বিনী মহিলা ১৯৩৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

এবট অগস্টাস্ — (Augstus Abbott) তাঁহার জন্ম ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার পিতা এইচ, এ, এবট (H. A. Abbott) এবং ভ্রাতা সার ফ্রেডারিক এবট (Sir Frederick Abbott) ও সার জেমস্ এবট (Sir James Abbott) তিনি উইনচেষ্টার, ওয়ারফিল্ড প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালার সৈন্য দলে প্রবেশ করেন। ১৯২৫-২৬ সালে তিনি ভরতপুর যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৮-৩৯ খ্রীঃ অব্দে কান্দাহার যুদ্ধে, তিনি সিন্ধুর সৈন্য দলে নিযুক্ত ছিলেন এবং গজনী আক্রমণে, কাবুল অধিকারেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। কোহিস্থান যুদ্ধে তিনি সেলের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে জালালাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে জালালাবাদ আক্রমণে তিনি সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। ...জিনে পোলকের সাহায্যকারী সৈন্য দলে তিনি সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। তিনি গবর্ণর জেনারেলের দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব অর্ডিনেন্স (Inspector General of Ordinance) পদ লাভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে মেজর জেনারেল পদ লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এবট, ফ্রেডারিক, সার — (Sir Frederick Abbott)—সার জেইমস্ এবটের ভ্রাতা। তাহার পিতা হেনরি (H. A. Abbott) এলেকছিয়াস এবট কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮০৫ সালে কলিকাতাতে ফ্রেডারিকের জন্ম হয়। তিনি ওয়ার ফিল্ড এবং এডিকম্বে নামক স্থানে শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৩ সালে তিনি ভারতে আগমন করিয়া বাঙ্গালার পূর্ত্ত বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৫৮ তিনি মেজর জেনারেল হন। ১৮২৪-২৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় গেরিসন ইন্‌জিনিয়ার (Garrision Engineer) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২

খ্রীঃ অব্দে কাবুল পুনঃ অধিকারে তিনি পোলকের সাহায্যকারী সৈন্যের প্রধান চালক ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এবট, সণ্ডার্স এলেকসিয়াস—(Saunders Alexius Abbott)—১৮১১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হেন্‌রী এলেকাসিয়াস এবট (Henry Alexius Abbott) কলিকাতার একজন বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক-বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ সালে তিনি সার হেন্‌রী লরেন্‌সের অধীনে (Sir Henry Lawrence) 'রেভিনিউ সার্ভে' বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে মুদকিযুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের এডিকং নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিখ-যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত হইয়া শয্যাশায়ী হন। আরোগ্যলাভ করিয়া ১৮৪৭ সালে অম্বালার ও ১৯৪৯ সালে হুশিয়ারপুরের ডিপুটী কমিশনার হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও হুশিয়ারপুরে ছিলেন। ১৮৫৮-১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌএর ডিপুটী কমিশনার ছিলেন। ১৮৬৪ সালে সৈনিক বিভাগে ব্রিবেট মেজর হন। ঐ সালে তিনি কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল সিন্ধু-পাঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের এজেণ্টের কার্য্য করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

এবট, সার জেমস্—(Sir James Abbott)—১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হেনরী এলেক্সিয়াস এবট (Henry Alexious Abbott) কলিকাতার একজন সওদাগর ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের ব্লেকহেথ (Blackheath) ও এডিকম্বি নামক স্থানে (Addescambe) শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮২৫-২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভরতপুর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৩৮-৩৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিন্ধু সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া কান্দাহারে গমন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে ডি, আরসি-টডের অধীনে (D. Arcy Todd) হিরাট নগরে গমন করেন। তথা হইতে মধ্য-এসিয়ার খিবা নগরে গমন করেন। সেই সময়ে খিবার অধিপতি কতকগুলি রুসীয় ভদ্রলোককে বন্দী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুক্তির জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তৎপরে খিবা-পতির কার্য্য ব্যপদেশে রুসীয় রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করেন। তৎপরে ১৮৪০ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। কিছুদিন অন্যত্র চাকুরী করিবার পরে, ১৮৪৫-১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত হাজরা

অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এইরূপে নানাস্থানে কাজ করিয়া তিনি যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়া কর্ম্ম হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন কবি ও লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত A Narrative of a Journey from Herat to Khiva, Moscow and St. Petersburg, Alexander the Great in the Panjab প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

এবাতুল্লা—ইঁহার বাসস্থান চট্টগ্রাম বলিয়া অনুমান করা হয়। ইনি কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন।

এবারক্রম্বি, সার জন — (Sir John Abercromby — ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা (Sir Ralph Abercromby)। স্বদেশে ইংলণ্ডে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া, নানাস্থানে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একবার প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের ২১ শে মে হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনি মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য হন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, তিনি পরলোক গমন করেন।

এবারক্রম্বি, সার রবার্ট — (Sir Robert Abercromby) — তিনি ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া উত্তর আমেরিকায় কর্ম্ম করিতেছিলেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে আগমন করিয়া, ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ও পরে প্রধান সেনাপতি হন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে তিনি ভারতের তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিসের (Lord Cornwallis) সহকারী ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি রোহিলখণ্ডের বাতিনা নামক স্থানে রোহিলাদিগকে পরাস্ত করেন। পরে ইংলণ্ডে প্রত্যা-গমন করিয়া ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

এবেডি, হেনরি রিচার্ড—(Henry Richard Abadie)—তিনি ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্দে আফগান যুদ্ধে ও কান্দাহার অবরোধে তিনি লিপ্ত ছিলেন

এবেরিগ মেকে, জর্জ রবার্ট—(George Robert Aberigh Mackay)—১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রেভাঃ ডাঃ জেমস্ এবেরিগ মেকে (Rev. Dr. James Abirigh Mackay) তিনি স্বদেশ স্কটলণ্ড দেশে, প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা-লাভ করিয়া ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রথমে বেরিলি সহরে তৎপরে ১৮৭১ সালে দিল্লী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে বলরাম-পুর কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও বলরাম-পুরের রাজার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্যতম সদস্য (Fellaw) নিযুক্ত হন। তিনি এইসময়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। (1) A Hand book of Hindustan (2) Mannual of Indian Sports (3) Native chiefs and their States. (4) The sovereign Princes anb chiefs of Central India. Twenty-one days in Judya being the tow of Sir Ali Baba প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সাময়িক পত্রে The Pelitical Orphan এই ছদ্ম নামে বহুপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি অতিউচ্চ হৃদয়ের লোক ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করেন।

এমাম উদ্দিন — একজন বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরতশাহ জালালএমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য ছিলেন।

এমাম উদ্দিন—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ইনি হুগলীতে একজন সুদক্ষ কোতয়াল ছিলেন। তিনি একজন মুঘলের কন্যাকে বলপূর্ব্বক পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাওয়ার অপরাধে হুগলীর ফৌজদারের নিকট অভিযুক্ত হন কিন্তু ফৌজদার সুবিচার করেন নাই। কন্যার পিতা অতঃপর নবাব দরবারে প্রার্থী হন। অভিযোগ সত্য প্রমাণীত হওয়ায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কোরাণের নির্দ্দেশমতে অপরাধীকে লোষ্ট্র-নিক্ষেপে হত্যা করিবার আদেশ করেন।

এমাম স্কুর উল্লা—একজন বিখ্যাত দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহজালাল এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। আনওয়ার-উল-আওলিয়া দেখ।

এরকান শাহ — একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পীর। লোহজঙ্গ দেখ।

এরমন্তক—তিনি একজন পরিহাসপুর নিবাসী। কাশ্মীরের অধিপতি ক্ষেম-গুপ্তের মহিষী দিদ্দার সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজবিদ্রোহী হইলে

মহারাণী দিদ্দা তাঁহার গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া বিতস্তা-সলিলে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিহত করেন।

এরাসাদ উল্লা—(**এসাদুল্লা**)—ইহাঁর বাসস্থান চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বংশখালী থানার অধীন ওলকাইন গ্রাম। ইনি "জ্ঞানসাগর" "সিরাজ-কুলুল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন কর্ত্তা আলি রাজার পুত্র। 'পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ে' ইনি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। পিতার-ন্যায় ইনিও একাধারে ফকির ও কবি হইয়াও সংসার পরিত্যাগ করেন নাই।

এরিয়ান—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন গ্রীক্ গ্রন্থকার। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে অনেক বিষয় জানা যায়।

এরি, সার জেমস্ টেলবট—(Sir James Telbot Airey)—১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সার জর্জ এরি (Lt. General Sir George Airey) এবং ভ্রাতার নাম লর্ড এরি। ১৮৩০ সালে তিনি সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। ১৮৪১ সালে তিনি জেনারেল এল্‌ফিনষ্টোনের এডিকং হইয়া কাবুলে গমন করেন। তিনি আকবর খাঁর নিকট জামিন-স্বরূপ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৪২ সালে তাঁহাকে মুক্ত করা হয়। ১৮৪৩ সালে গোয়ালিয়র যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে কর্ণেল, ১৮৮৭ সালে লেঃ জেনারেল এবং ১৮৮১ সালে জেনারেল পদলাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

এলগিন, লর্ড (**প্রথম**)—(James Bruce, Eighth Earl of Elgin and Kincardine)—১৮১১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি জামাইকা দ্বীপের শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৪৬-১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কানাডার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৫৭ সালে চীনদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি একদল সৈন্যসহ যাত্রা করেন। পথে ভারতবর্ষে আসিয়া সিপাহী বিদ্রোহের কথা অবগত হন। তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এর অনুরোধে তিনি সেই বিদ্রোহদল দমনে নিযুক্ত হয়েন। বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ সালে সেই সৈন্যসহ চীনদেশে গমন করেন এবং তথাকার বিদ্রোহ দমন করেন। তৎপরে তিনি বিলাতে পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল (Post Master General) কাজে নিযুক্ত হন। ইহার পরে, ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে আবার তিনি চীনদেশে গমন করেন। সেই স্থানের

চীনাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল প্রদানপূর্ব্বক আবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৬২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আগমন করেন। ১৮৬৩ সালের গ্রীষ্মকাল সিমলায় যাপন করিয়া, দেশ পরিদর্শনে বহির্গত হন এবং ১৮৬৩ সালের ২০শে নবেম্বর ধরমশালা নামক স্থানে গতাসু হন।

এলগিন, লর্ড ২য়—(Victor Alexander Bruce ; Ninth Earl of Elgin and Kincardine) — তিনি প্রথম লর্ড এলগিনের পুত্র। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৪-৯৯ খ্রী: অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের বড় লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী চিত্রলপতি ওমরখাঁর সহিত যুদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় হয়। ১৮৯৬ সালে বোম্বে নগরে প্রথম প্লেগ মহামারীর আবির্ভাব হয়। ক্রমে ইহা ভারতের বহু নগরে প্রবেশ করিয়া বহু লোকের প্রাণনাশ করে। কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দিলে বহু লোক ভয়ে সহর ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই আতঙ্ক দূর হইতে না হইতেই ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে প্রবল ভূমিকম্প হইয়া আসাম ও উত্তরবঙ্গের বহু ক্ষতি হয়। তারপর আবার আফগান সীমান্তে আফ্রিদি জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বহু অর্থব্যয়ে ইহা প্রশমিত হয়। তাঁহার পরে লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আগমন করেন।

এলফিনষ্টোন, মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট—(Mountstuart Elphinstone) — তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অক্টোবর। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটা কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎপরে বারাণসীতে গমন করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারীতে অযোধ্যার নবাব উজির আলীর আদেশে বেরী প্রভৃতি সাহেবেরা নিহত হন। সেই সময়ে তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে সার বেরী ক্লোজের সহকারীরূপে পেশোয়া বাজারাও এর দরবারে পুনা নগরীতে ছিলেন। তৎপরে তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি কাবুলে একবার দৌত্যকার্য্যে গমন করেন। ৫ই মার্চ্চ (১৮০৯) কাবুলের আমীর শাহসুজা অতি সমাদরের সহিত পেশোয়ার নগরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু কিছুই কৃতকার্য্য হইলেন না। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি

পেশোয়ার দরবারে পুনা নগরে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের শেষ মহারাট্টা যুদ্ধের ফলে পেশোয়া বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহারই পুত্র সিপাই বিদ্রোহের নেতা প্রসিদ্ধ নানাসাহেব। এই যুদ্ধের পরে ১৮১৯—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এলফিনষ্টোন বোম্বের গবর্ণর ছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি কার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। ১৮১৭-১৮২০ খ্রীঃ অব্দ তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাপন করেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষের বড়লাট হইবার জন্য দুইবার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। History of India, Rise of the British Power in the East প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ২০শে নবেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

এলবুকার্ক — একজন পর্ত্তুগীজ সেনানায়ক। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্য নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এলবুকার্ক দেখিলেন এই যে, রাজাদের ভিতর যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে তাঁহার ও তাঁহার স্বদেশবাসী ও স্বধর্ম্মালম্বী খৃষ্টানদিগের সমধিক অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া তিনি বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়কে প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন, এবং সৈন্যের ব্যয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলে যুদ্ধে সাহায্য করিতে সম্মত হন। বিজয় নগরের সহিত তখন পর্ত্তুগীজদিগের পারস্য ও আরবদেশীয় ঘোটকের ব্যবসা ছিল। এই সব ঘোড়া অন্য রাজারা পাইতেন না। এক একটী ঘোড়ার জন্য তাহারা রাজার নিকট হইতে প্রায় হাজার টাকা পাইত। এলবুকার্কের অনতিবিলম্বে মৃত্যু হইলে, অপর একজন পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষের সাহায্যে রাজা কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুররাজকে ১৫২০ খ্রীঃ অব্দে পরাজিত করেন।

এলাহিবক্স — গোলাম হোসেনের প্রশিষ্য। ইনি ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি 'খুরসেদ জাহানামা' নামক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করেন। তাঁহার জন্মস্থান মালদহ জিলায়।

এলিস — পাটনার ইংরেজ অধ্যক্ষ। ইনি বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ইনি উদ্ধতস্বভাবের লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নবাব বাণিজ্যশুল্ক রহিত করায় ইংরাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এলিস সাহেব জোর করিয়া পাটনা অধিকার করেন। নবাব অনুচরগণ সহ এলিসকে কারারুদ্ধ

করেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া পাটনার বন্দীগণকে হত্যা করেন।

এলেনবরা, লর্ড—(Edward Lord, first Earl of Ellenborough) ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের তিনি সভাপতি হন। প্রথমবার ১৮২৮-৩০ খ্রীঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার ১৮৩৪-৩৫ এবং তৃতীয়বার ১৮৪১ সালে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দান করেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট লর্ড অক্‌লাণ্ড আফগান যুদ্ধে যে দুর্নাম অর্জ্জন করেন তিনি তাহার স্খালন করেন। ইংরেজ দূত সার আলেকজাণ্ডার বার্ণস ম্যাকনাটনের হত্যার পরে বাকী চারি হাজার সৈন্য ও ১২ হাজার অনুচর জালালাবাদের পথে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কতক শীতে ও কতক বিশ্বাসঘাতক আফগানদের হস্তে নিহত হয়, কেবল ডাক্তার ব্রাইডন (Dr. Brigdon) ফিরিতে সমর্থ হন। কেবল কতক বন্দী (কতক স্ত্রীলোক, বালক বালিকা সাধারণ কর্ম্মচারী) আকবর খাঁর নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জেনারেল নট, (General Nott) জেনারেল কিন (General Kine) ও জেনারেল, পোলক (General Pollock) ভিন্ন ভিন্ন পথে কাবুলে উপস্থিত হইয়া তথাকার বাজার পুড়াইয়া দিলেন। বন্দীদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গজনীস্থিত সুলতান মামুদের সমাধি হইতে ইংরেজ সৈন্য একজোড়া কবাট খুলিয়া আনিয়াছিল, তাহাই সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠিত কবাট বলিয়া বড়লাট পাঞ্জাবের বড় বড় নগরে প্রদর্শন করিয়া বাহাদুরী নিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা সোমনাথের কবাটের অনুকরণে নির্ম্মিত ছিল। তাঁহার সময়ে সিন্ধু দেশের আমীরেরা ইংরেজদের বন্ধু নহে, এই সন্দেহে তাঁহাদের রাজ্য ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। গোয়ালিয়ারের গোলযোগ নিবন্ধন সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধ হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের সন্ধিতে তাহার পর্য্যাবসান হয়। তিনি চলিয়া গেলে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার স্থানে আগমন করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ২২শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

ঐখেক — আসামের আহমবংশীয় নরপতি সুখাংফা ১৫৫২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেনাপতি বুড়া গোহাই ঐখেক সেই সময়ে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সুখাংফার পুত্র সুশেংফা (অন্য নাম প্রতাপ সিংহ) ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাছারদেশ জয় করেন এবং রাহা নামক স্থানে সেনাপতি সুন্দরের অধীনে একদল সৈন্য রক্ষা করেন কিন্তু সুন্দরের পুত্র ঐখেক অবহেলা করায় কাছরীরাজ পুনঃ অধিকার করেন ও সুন্দর নিহত হন। রাজা প্রতাপ নারায়ণ যখন জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তিনি প্রথমে কোন কোন সামন্ত নরপতির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তৎপরে অকৃতকার্য্য হইয়া কুচবিহারপতি পরীক্ষিতের আশ্রয়গ্রহণ করেন। তৎপরে বাঙ্গালার মুসলমান নবাবের আশ্রয়গ্রহণ করেন; এই সময়ে বাঙ্গলার নবাব আহমরাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে ঐখেক নবাব সৈন্যদলে ছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলে, ঐখেক নবাবপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার প্রতাপসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং নবাবসৈন্যকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিলেন। কৃতঘ্ন রাজা প্রতাপ ঐখেককে নিহত করিলেন।

ওউকোং—একজন চীন পরিব্রাজক। ইনি ৭৫৭—৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে আসিয়া চন্কুন বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ওঙ্কার নাথ — দশনামী সন্ন্যাসীরা বায়ান্নটী মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক একজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সন্ন্যাসী এক একটী মড়ির স্থাপন কর্ত্তা। ওঙ্কারনাথ একটী মড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

ওক্কাক (ইক্ষাকু)—পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে ওক্কাক নামে এক পরাক্রান্ত নরপতির উল্লেখ আছে। তাঁহাকে শাক্যবংশের আদি পুরুষ বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত

সন্তানকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায় ওক্কাক, করণ্ডু, হস্তিনীয় ও শীনীপুর নামক অপর চারি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। রাজপুত্রগণ পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া হিমালয় প্রদেশে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, তাঁহারা নিজ নিজ ভগিনীদিগকেই বিবাহ করেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের পিতার অনুমোদন লাভ করেন। তজ্জন্য ঐ রাজপুত্রগণের বংশ শাক্যবংশ নামে খ্যাত।

ওড়য়দেব বাদীভ সিংহ—দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'গদ্য চিন্তামণি' ও 'ক্ষত্র চূড়ামণি' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

ওমদাদ ওল ওমরা—কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ১৮০২ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইংরেজ সরকার রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত অধিকারী ইংরেজ সরকারের সকল সর্ত্তে সম্মত হইতে রাজি না হওয়ায়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমউদ্দোল্লা সিংহাসন প্রাপ্ত হন কিন্তু শাসনভার ইংরেজ সরকারের হাতেই থাকে।

ওমর খাঁ খিলিজি—সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজির কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে মালিক কাফুর খোজা, ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭১৬) সাত বৎসর বয়সে তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু মালিক কাফুর ৩৫দিন পরেই নিহত হইলেন এবং ওমর খাঁকে তাঁহার ভ্রাতা মবারক খাঁ, ১৩১৭ সালে (হিঃ ৭১৬) সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করেন।

ওমর খাঁ—বাহমনি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ছয়জন দরবেশ গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা ওমর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে ইন্দ্রায়নি প্রদেশে লৌহগড় দুর্গে এক হিন্দুসন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার প্রভাবে ওমর খাঁ ধর্ম্মপ্রচারে অসমর্থ হন। অবশেষে ওমর খাঁ তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে সমর্থ হন।

ওয়াং খাই লাক্‌পা—অন্য নাম লোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ। তিনি মণিপুরের মহারাজা শূরচন্দ্র সিংহ ও কুলচন্দ্র সিংহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ১৮৯১ সালের মণিপুর বিদ্রোহে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিশেষ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ওয়াজিদ আলি খাঁ পনি—করটিয়ার খ্যাতনামা জমিদার ও জননায়ক। সাধারণের নিকট তিনি চাঁদমিঞা নামেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মুসলমান বাদশাহ্-গণের আমলে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সম্পত্তিশালী হন। ওয়াজিদ আলি খাঁ আদর্শ জমিদার ছিলেন। স্কুল স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজে তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি ওয়াকফ্ করিয়া তাহার আয় জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত কারাবরণ করেন। ধনীসুলভ বিলাসিতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সারাজীবন গ্রামে বাস করিয়া গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের অংশীদাররূপে তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ, দুর্দ্দশার প্রতীকারে সচেষ্ট ছিলেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে অল্প বয়সেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ওয়াজিদ আলী শাহ — তিনিই অযোধ্যার শেষ নবাব। ১৮৪৭ সালে (হিঃ ১২৬৩) তাঁহার পিতা আমজদ আলী শাহের মৃত্যুর পর, তিনি লক্ষ্ণৌএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ইংরেজ সরকারের বৃত্তিভোগী হইয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কবিজন-সুলভ নাম আক্তার। তিনি কয়েক-খানা কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। গীত, বাদ্য এবং কবিতা রচনায় তিনি নিপুণ ছিলেন। নবাব তাঁহার ক্ষৌরকার আজীম উল্লা খাঁর একটী বৃহৎ অট্টালিকা চারি লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন, তদবধি ইহার চৌলক্কি মহল নাম হয়। নবাবের বাসস্থানরূপে পরে উহা চৌলক্কি মহল "সরাই ইজ্জৎ মহল" নামে পরিচিত হয়। তাঁহার আমলে বঙ্গবাসীরা নবাব সরকারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন।

ওয়াটসন (Watson)—ইনি একজন ইংরেজ নৌসেনাপতি ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা-কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকৃত হইলে, ক্লাইভের সঙ্গে তিনি কলিকাতা নগরী পুনরধিকার করেন। পরে ২২শে মার্চ্চ চন্দননগর আক্রমণ করিয়া নয় দিন পর, একজন ফরাসী কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায়, উহা জয় করেন। ঐ সালের ১৬ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয় এবং কলিকাতা সেন্ট-জর্জ্জ গির্জ্জার সমাধি ক্ষেত্রে তিনি সমা-হিত হন।

ওয়ারিস আলীশাহ (হাজী)—ইনি একজন ধর্ম্মগুরু। অযোধ্যার অন্তর্গত কারাবাকী সহর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে দেবা নামক গণ্ডগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। হাজীসাহেব হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে শিষ্য করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ভারতের শিখ ও ব্রাহ্মণ, ধোবী ও ভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল জাতি ও বর্ণের লোক দেখা যায়। আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উকিলবাবু কানাইয়া লাল, আমীন হাফিজ হোসেন খাঁ, দ্বারবঙ্গের পণ্ডিত চতুর্ভুজ মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লাল মিশ্র কলিকাতার হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং পাটনার পরলোকগত জজ সয়েফ উদ্দীন, ধরমপুরের নবাব আবদুল গফুর খাঁ, পাটনার বাবা মুরলীধর, গয়ার সৈয়দ আবদুল্লা শাহ, ভূপালের হাফিজ পেয়ারে এবং গয়ার ভূতপূর্ব্ব তহশীলদার ফজিহৎ শাহ, আলফ শাহ প্রমুখ প্রায় চারি হাজার হিন্দু এবং অত্যধিক সংখ্যক মুসলমান গৃহস্থ ফকির হাজীশাহের শিষ্য। হাজীসাহেব মুসলমানকে হিন্দুর মন্ত্র দীক্ষা দিতেন এবং হিন্দু শিষ্যকে মুসলমানের কলমা দিয়া বলিয়া দিতেন, চিত্তশুদ্ধি না হইলে নেমাজ পড়িয়া কোন ফল নাই। তাঁহার উপরোক্ত শিষ্য কানাইয়া লাল বলিতেন গুরু তাঁহাকে মুসলমানের কল্‌মাই দিয়াছেন। তিনি কল্‌মা পড়েন বলিয়া মুসলমান বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না। তিনি প্রেমপন্থী এবং গৃহপন্থী। হাজী ওয়ারিস আলীশাহের ধর্ম্ম মতাবলম্বীরা ওয়ারিস সম্প্রদায় নামে অভিহিত। এই সম্প্রদায় প্রেমপন্থী নামেও পরিচিত। হাজী সাহেব বিবাহ করেন নাই। তিনি জীবনে কখনও পাদুকা ধারণ করিতেন না। পশু বাহনে কখনও যাতায়াত করেন নাই। তিনি রেলেই যাতায়াত করিতেন এবং অতি বৃদ্ধাবস্থায় পাল্কীতে যাতায়াত করিতেন। তিনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। আলীগড়ের নিকটবর্ত্তী ধরমপুরের নবাব আবদুল গফুর খাঁর গফুরগঞ্জ কুঠিরউদ্যানে তাঁহার সমাধি আছে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি, শিষ্য নবাব সাহেবকে স্বীয় সমাধি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। হাজী সাহেবের অলৌকিক জীবন কাহিনী তাঁহার শিষ্যদের প্রমুখাৎ শোনা যায়। তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

ওয়াঙ্কা রাইপো — মণিপুরপতি মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের ভুবন সিংহ নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র ওয়াঙ্কা রাইপো। তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্রোহী হইয়া মণিপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বুদ্ধি-

কৌশলে তিনি পরাজিত ও পুত্রদের সহিত নিহত হন।

ওয়াহেদ হোসেন — খ্যাতনামা মুসলমান ব্যবহারজীবী ও লেখক। তিনি কলিকাতার পুলিস আদালত ও হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট ব্যবহার-জীবী ছিলেন। রাজনীতি আন্দোলনেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি কিছুকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এক সময়ে কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডার ম্যান (Alderman) এবং কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁহার চিন্তাশীলতার পরি-চায়ক ছিল। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ঔড়ুলোমি — তিনি বাদরায়ণের (ব্যাসের) পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত। তিনি ভেদাভেদ বাদী ছিলেন।

ঔপধেনব — তিনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা কাশীরাজ দিবোদাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় নামে একখানা সংহিতা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না।

ঔরভ্র—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ঋষি। তিনি প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বেত্তা কাশীরাজ দিবোদাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় নামে এক খানা সংহিতা রচনা করেন

(যে সমস্ত নাম যথাস্থানে যায় নাই তাহা অকারাদি ক্রমে এইস্থানে দেওয়া গেল।)

অ

অক্‌টারলোনী সার, ডেভিড—(Sir David Ochterlony) ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেনাপতি কুটের (Col. Coote) অধীনে তিনি ১৭৮১-১৭৮৩ সাল পর্য্যন্ত কাজ করেন। দাক্ষিণাত্যে হায়দর আলীর সহিত যুদ্ধে কোডালরে তিনি ১৭৮৩ সালে বন্দী হন। কিন্তু পর বৎসরেই মুক্তি লাভ করেন। ১৮০৩ সালে তিনি সেনাপতি লেকের (Lake) অধীনে কাজ করেন। তৎপরে দিল্লীতে রেসিডেণ্ট হন। ১৮০৪ সালে হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে তিনি দিল্লী রক্ষা করেন। ১৮০৮ সাল শতদ্রু তীরে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮১৪ সালে তিনি মেজর জেনারেলের পদ পান। সেই বৎসরই তিনি নেপাল যুদ্ধে গমন করেন। নলগড় দুর্গ অধিকার করিয়া গুরখা সেনাপতি অমর সিংহকে পরাস্ত করেন। ১৮১৬ সালে নেপাল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া, নেপাল রাজধানী কাটমুণ্ড নগরের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে নেপাল রাজের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে পিণ্ডারি সর্দ্দার আমীরখাঁকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে রাজপুতানা, দিল্লী, মালব প্রভৃতি স্থানে ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮২৫ সালে ভরতপুরের জাঠ জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজা বলদেব সিংহ পরলোক গমন করিলে, তাহার ছয় বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র বলবন্ত সিংহ রাজা হন। কিন্তু বলদেব সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। সেনাপতি অক্‌টারলোনী বলবন্ত সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুর্জ্জনশালকে পরাস্ত করেন। কিন্তু তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট ইহা অনুমোদন না করিয়া, একটী অনুসন্ধান কমিটী নিযুক্ত করেন। তেজস্বী অক্‌টারলোনী ইহাতে অপমান বোধ করিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই বীরপুরুষ ১৮২৫ সালে পরলোক গমন করেন। কলিকাতার গড়েরমাঠের 'অক্‌টারলোনী কলাম' নামক স্তম্ভ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

ক্ষ—কাশ্মীরপতি দ্বিতীয় নর পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র অক্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪২৯ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র গোপাদিত্য রাজপদ প্রাপ্ত হন।

অক্ষয় কুমার বড়াল—বিখ্যাত কবি। কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে হেয়ার স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া, অল্প বয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যানুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। কবি-গুরু বিহারীলালের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার প্রথম কবিতা "রজনীর মৃত্যু" ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তাহার এক বৎসর পরে, তাঁহার প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' পত্নী বিয়োগের পর রচিত হয়। তাঁহার অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের নাম 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯২) ও 'শঙ্খ' (১৩১৭)। 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি ওমর খৈয়ামের অনুকরণে অনেক গুলি কবিতা প্রকাশ করেন। অক্ষয় কুমারের কবিতার ভাষা অনাড়ম্বর এবং তিনি তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, তাহা এত আদৃত। বিহারী লালের প্রভাব অক্ষয় কুমারের কাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি শব্দ কুশলী ছিলেন। কাব্য রচনা কালে মনোমত পদের অনুসন্ধানে অনেক সময়ে সুদীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিতেন। তিনি পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, অনাড়ম্বর ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামী—বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থাপনাবধি যাঁহারা অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন, প্রথম ছিলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয় স্বামী শিবানন্দ।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম গঙ্গাধর ঘটক। ইনি পল্লীর শ্রীমন্ত ঘটক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা গঙ্গোপাধ্যায় বংশসম্ভূত।

গঙ্গাধর মহারাজ শ্রীমৎ হরি মহারাজের (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—স্বামী তুরীয়ানন্দ) বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারই সহিত একত্রে দীননাথবাবুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ দর্শনে যাইতেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই খুব নিষ্ঠাবান্, সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার দুই বৎসর পরে গঙ্গাধর একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথকেও না জানাইয়া, এক সাধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। তখন তিনি মাত্র ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষীয় বালক।

ভারতের নানা তীর্থ দর্শন অভিলাষে সাধুর সঙ্গে বাটী ত্যাগ করিবার পর, তাঁহার মনে পিতামাতার স্নেহের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায়, একমাস পরে ভ্রমণসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে ফেরেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থায় বহুবার সঙ্গী ও সহচররূপে ভারতের নানা তীর্থে, সহরে ভক্তগণের আবাসে এবং হিমালয়ের নানা উচ্চশিখরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একেলাও তিনি অনেকবার পরিব্রাজকরূপে তীর্থপর্য্যটনাদি করিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই প্রথম তিব্বতে যাইয়া তিন বৎসরকাল বাস করেন এবং সেখানকার ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'তিব্বতে তিন বৎসর' নামক প্রবন্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্ম প্রতিমার তিনিই প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং এই জন্য তিনি স্বামীজীর নিকট হইতে বহু সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লিখিত স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের অনেক কর্ম্ম প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িয়া, যখন মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটী স্থান হাহাকার করিতেছিল, তখন ইনি প্রথমে মহুলা নামক গ্রামে, পরে সারগাছিতে স্থিত হইয়া এই দরিদ্রনারায়ণ জনসঙ্ঘের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। পরে সারগাছিতে একটী স্থায়ী আশ্রম ও কলাশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, স্থানীয় সহায় সম্বলহীন দরিদ্র নারায়ণগণের স্থায়ী কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ জ্ঞানী, পণ্ডিত, ত্যাগী এবং আড়ম্বরহীন উচ্চস্তরের সাধু ছিলেন। তিনি মান, যশোলিপ্সায় কখনও অভিভূত হন নাই। কিন্তু তিনি বহুলোকসঙ্গ ও বহুলোকের সহিত নানারূপ আলাপ করিয়া সময় ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় বা অল্পলোকের সহিত আলাপ আলোচনায় তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। রামকৃষ্ণের প্রধান সপ্তদশ জন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর, ইনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়া, প্রায় তিন বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৫শে মাঘ রবিবার তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অগ্নিব্রহ্ম—তিনি মৌর্য্যভূপতি অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সুমন তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অঘোর তত্ত্বনিধি—ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের প্রথম যুগের একজন লেখক। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত কবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক অবলম্বনে "চারুচরিত" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। উহা মূল গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ মাত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হয়।

অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়—লেখক ও সমালোচক। প্রথম জীবনে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের আচার্য্য ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাধনা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, প্রভৃতির জীবনচরিত রচনা করেন। ঐ সকল পুস্তক ভক্তগণের আদরণীয় হইয়াছিল। তাঁহার 'মেয়েলী ব্রত' নামক পুস্তকে বাঙ্গালী মেয়েদের অনুষ্ঠিত বহু ব্রতের বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ বয়সে তিনি নলহাটীতে বাস করিতেন। তথাকার নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অচল সিংহ—মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপসিংহের সহোদর ও রাঠোর শনিগুরু সর্দ্দার অখিল রাওয়ের দৌহিত্র শক্তসিংহ ছিলেন। শক্তসিংহের সপ্তদশ পুত্রের অন্যতম অচল ছিলেন। তাঁহারা শক্তাবৎ নামে খ্যাত। তাঁহাদের অতুল বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ মিবারের ইতিহাস পবিত্র করিয়াছে।

অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ— কাবেরী নদীতীরস্থ নীলকণ্ঠেশ্বর নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতানন্দের শিষ্য স্বয়ংজ্যোতিঃ, স্বয়ংজ্যোতির শিষ্য অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ। তিনি অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর 'কৃষ্ণালঙ্কার' নামক এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্করভাষ্যের উপর 'বনমালা' নামক তাঁহার টীকাও অতি প্রসিদ্ধ।

অজপাল—তিনি চৌহানবংশীয় এক জন বীর। তিনি মকাবতী নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কতিপয় সৈন্য ও সামন্ত সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া অজয়মেরু জনপদে তারাগড় নামক দুর্গ স্থাপন করেন এবং (১১৮৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) অক্ষুন্নপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রচণ্ড ভুজবিক্রমের সাহায্যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। নিঃসন্তান অজয়পাল পৃথ্বীপাহার নামক স্ববংশীয় এক যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া পরলোকগত হন।

অতুল প্রসাদ সেন—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালীদের অন্যতম। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ঢাকানগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন। ঢাকাতে স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতায় গমন করেন। তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিছুকাল কলিকাতায় আইন ব্যবসা করেন। পরে লক্ষ্ণৌনগরীতে গমন করিয়া, তথায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তদবধি আমরণ লক্ষ্ণৌতেই ছিলেন। ব্যবহারজীবীরূপে তিনি প্রভূত যশঃ ও অর্থের অধিকারী হন। কিছুকাল অযোধ্যার ব্যবহারজীবীদের সঙ্ঘের (Bar Association) সভাপতিও হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিতেন। শিক্ষা বিস্তার কার্য্যেও তাঁহার সবিশেষ উৎসাহ ছিল এবং অনেক গুরুতর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে একাধিক বার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষের (Vice Chancellor) পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু তিনি ঐ দায়ীত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

তিনি সুকবি ও উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার "বল বল বল সবে, শত বীণাবেণু রবে," "মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাঙ্গলা ভাষা" "উঠ গো ভারত লক্ষ্মী" প্রভৃতি সঙ্গীত চিরকাল বাঙ্গালীকে আনন্দ দান ও জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে। জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন, তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত ও কীর্ত্তন গুলিও অতি উচ্চ ও মধুর ভাবের আকর। তাঁহার কবিতা ও সঙ্গীতাবলী 'কাকলি,' 'গীতিকুঞ্জ,' 'কয়েকটি গান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'উত্তরা নামক মাসিক পত্রিকার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দেশের রাজনীতি আন্দোলনের সহিতও তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি উদার নৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন। নিখিল ভারত উদার নৈতিক সংঘের এক অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের উদারনৈতিক সম্মেলনেও দুইবার সভাপতির পদলাভ করেন। তিনি মনপ্রাণে খাঁটি স্বদেশী ছিলেন।

তিনি পশ্চিমোত্তর প্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের সর্ব্বপ্রকার শুভ প্রচেষ্টার উৎসাহদাতা ও তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতা ছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধর লাল সেন — একজন কবি ও রাজকর্ম্মচারী। ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৫ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামগোপাল সেন। অধর লাল বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া ১৮৭২ সালে, অধর লাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ৪র্থ স্থান লাভ করিয়া এফ্.এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ডাফ (Duff) বৃত্তি পান এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া নানা স্থানে রাজকার্য্য উপলক্ষে গমন করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। তিনি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির (Asiatic Society) সদস্য ছিলেন। "Shrines of Sitakundu" নামে বহু তথ্য পূর্ণ একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি সঙ্কলন করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি কাব্য চর্চ্চায় লিপ্ত ছিলেন। 'ললিতা সুন্দরী' ও 'মেনকা' নামে দুইখানি কাব্য গ্রন্থ ঐ সময়েই রচনা করেন। পরে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া "লিটোনিয়ানা" নাম দিয়া লর্ড লিটনের (Lord Lytton) অনেক কবিতার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে অশ্বহইতে পতনজনিত ধনুষ্টঙ্কাররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনঙ্গ সুরী — একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'রসায়ণ প্রকরণ'।

অনন্তদেব সুরী — তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'রসচিন্তামণি'।

অনন্তবীর্য্য—একজন জৈন গ্রন্থকার। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে তিনি মাণিক্যনন্দী বিরচিত 'পরীক্ষা মুখসূত্র' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তিনি 'ন্যায়াবতার' গ্রন্থেরও এক টীকা রচনা করেন। মাণিক্য নন্দী দেখ।

অনন্তরাম ওঝা—তিনি বাংলার সেনবংশীয় নরপতি বল্লাল সেনের পুরোহিত, ভীম ওঝার পৌত্র। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে, ভীম ওঝা স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান পাবনা জিলার পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে ছাতক নামক স্থানে গমন করেন। ভীম ওঝার বংশধরেরা কালীয়াই গোষ্ঠি নামে খ্যাত। অনন্তরাম ওঝা রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুর ও শাখিনী নামক দুই পরগণা নিষ্কররূপে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তরাম ওঝা বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে এইস্থানে বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরাই বাঙ্গালার প্রচীন জমিদার বংশ।

অনন্ত সুরী—একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত। তাঁহার পিতামহ অনন্তসোম-রাজি রামানুজাচার্য্যের চৌহাত্তর (৭৪) জন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন। অনন্ত-সুরীর পত্নী তোতারম্বা, বাদি হংসাম্ব-বহের (নামান্তর রামানুজাচার্য্য দ্বিতীয়) ভগিনী ছিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র কাঞ্চী নগরে বাস করিতেন। অনন্তসুরীর পুত্র বেঙ্কটনাথও একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

অনহল—তিনি রাজপুত চৌহান বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষকগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করেন। অনহল মকাবতী (গড় মণ্ডল) নগরী স্থাপন করেন। তিনি কঙ্কন, গোলকুণ্ডা, অশির প্রভৃতি স্থান স্বাধিকার ভুক্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

অনাদি বর সিংহ — উত্তর রাঢ়ীয় সিংহ উপাধিধারী কায়স্থ বংশের আদি পুরুষ। তিনি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরস্থিত অরণ্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া কান্দি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গের তৎ-কালীন অধিপতি আদিত্য শূর তাঁহাকে গঙ্গার পশ্চিমকূলে ভূমি দান করিয়া, সামন্ত নরপতি শ্রেণীতে স্থান দান করিয়াছিলেন। তিনি সিংহপুর হইতে কণ্টক নগর (কাটোয়া) পর্য্যন্ত চারি শত খানি গ্রামের অধিপতি ছিলেন।

অনিল কুমার রায় চৌধুরী—দেশ-হিতৈষী কর্ম্মী। চব্বিশ পরগণার অন্ত-র্গত টাকীর জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি এটর্ণির কাজ শিখিতে যান। কিন্তু অল্পকাল পরেই দেশের কাজ করিবার জন্য উহা পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে মতানৈক্যবশতঃ প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সহিত আ-যোগ রক্ষা করিতে না পারিলেও দেশ-সেবায় কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বাঙ্গালা দেশে নারীহরণ প্রভৃতি নিবারণ কল্পে এবং নির্য্যাতীত নারীদের উদ্ধার, আশ্রয়দান, অপরাধীদের দণ্ড প্রদান প্রভৃতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। এই পরিশ্রমের ফলেই অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে উৎপীড়িত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য, তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। "হিন্দু সঙ্ঘ" নামে একখানি পত্রিকা তিনি কিছুকাল পরি-চালনা করেন। শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস মহাশয়ের সহযোগে তিনি নানা স্থানে ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বত্রই হিন্দুদের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি সচেষ্ট থাকিতেন

এবং তজ্জন্য কোনওরূপ পরিশ্রমেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি পরদুঃখ-কাতর, অমায়িক বন্ধুবৎসল, সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে জুলাই মাসে, মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস-রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অনুজ নারায়ণ রায়—পাঠান রাজ শেরশাহ বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করিলে ভাদুড়িয়া একটাকিয়ার জমিদার অনুজ নারায়ণ রায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। শেরশাহ তাঁহাকে নিজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পরে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শেরশাহ যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ নারায়ণকে পাঁচ হাজার সৈন্য ও পাঁচ লক্ষ টাকা সহ, শের-শাহের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অনুপ নারায়ণ রায়, রাজা—তিনি ভাদুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশের পৌত্র ও যদু নারায়ণের (পরে জালাল উদ্দিন) পুত্র। যদু নারায়ণ ১৪১৪-১৪৩১ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিন বৎসর রাজত্ব করার পর, যদু নারায়ণ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক গৌড়ের তৎকালীন নবাবের কন্যা আসমান তারাকে বিবাহ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় জালাল উদ্দিন। যদু নারায়ণের মাতা রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও পত্নী রাণী নবকিশোরী, তখন যদুর একাদশ বর্ষীয় পুত্র অনুপ-নারায়ণকে সাতগড়া নামক স্থানে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। যদু পর-লোক গমন করিলে, তাঁহার মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র আহাম্মদ শাহ গৌড়ের নবাব হন। আহাম্মদ শাহ ও অনুপনারায়ণের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। অনুপনারায়ণ ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া, পরলোক গমন করেন।

অনুরাজ—চৌহান বংশীয় নরপতি বিশালদেবের পুত্র। এই অনুরাজ হইতেই হারকুল উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি অশি দুর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইষ্টপাল আরব সাগর তীরবর্ত্তী খিচিরপত্তনের প্রতিষ্ঠাতা। অনুরাজ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ জীবন ও অশি নগর শত্রু করে অর্পণ করেন (১০২৫ খ্রীঃ অব্দ)।

অনুরাজ সিংহ—রাজপুতানার অন্ত-র্গত বুন্দির রাজা। তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের সমসাময়িক ছিলেন। রাও ভাও অপুত্রক ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা ভীমসিংহের পৌত্র ও কিষণ সিংহের পুত্র অনুরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব দাক্ষি-ণাত্যে যে সকল অভিযান করেন, তাহার অধিকাংশগুলিতেই তিনি সম্রাটের অনুগামী ছিলেন। একবার সম্রাটের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সম্রাটের

বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। বুধসিংহ ও যুধসিংহ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ বুধসিংহ রাজ্যাধিকারী হন।

অনোমদর্শী — থেরবাদী বৌদ্ধগণের মতে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল বুদ্ধ আবির্ভূত হন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বুদ্ধ দেখ।

অন্নদা প্রসাদ সরকার, রায় বাহাদুর — ১৮৫৭ সালে হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল মৌড়িতে তাঁহার জন্ম হয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া সরকারের পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে এইরূপ উচ্চপদ লাভ অপেক্ষাকৃত বিরল। তিনি বিনয়ী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অন্নদা প্রসাদ সরকার, রায় সাহেব—(১) যুক্ত প্রদেশ প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের অন্যতম। ১৮৮২ সালে কসৌলী নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পাঞ্জাবের একাধিক স্থানে স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, এলাহাবাদ হইতে স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯০৪ সালে রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভপূর্ব্বক ডি, এস্‌-সি, উপাধি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার ফলস্বরূপ তিনি একাধিক পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিন বৎসর মাসিক একশত টাকা করিয়া গবেষণা-বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, রসায়ন বিদ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একাধিকবার তিনি অস্থায়ী ভাবে আবহ-বিদের কার্য্যও করিয়াছিলেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে নানা গবেষণা করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেন। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় — খ্যাতনামা নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি যশোহর জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কিছুকাল 'কৃষক' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাল্যকালেই অভিনয় করার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে একটি সখের থিয়েটারে প্রবেশ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে একজন সুদক্ষ অভিনেতা এবং নাট্যকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বৈদেশিক নাটকগুলির ছায়াবলম্বনে তিনি যেসকল নাটক রচনা করেন, সেগুলি তাঁহার রচনা-

কৌশলে সম্পূর্ণভাবে দেশীয়রূপ লাভ করিয়াছিল। তিনি অভিনয় শিক্ষাদান কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জন্ম ১২৮২ শ্রাবণ, মৃত্যু ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব, রাজা বাহাদুর— কলিকাতার শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদারবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও শিক্ষাবিস্তারেও যত্নশীল ছিলেন। তিনি ফার্শী ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তদানীন্তন দিল্লীর মুঘল বাদশাহকর্ত্তৃক তিনি 'রাজকবি' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার পিতামহ এবং মহারাজা রাজকৃষ্ণ তাঁহার পিতা ছিলেন।

অপ্পর—তামিল সাধক। মান্দ্রাজ প্রদেশের কুড্ডালোর জিলার অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে জৈন সাধুদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি জৈন মত অবলম্বন করেন। পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জৈন সন্ন্যাসীদের প্ররোচনায় পল্লববংশীয় নৃপতি কডবকর্ত্তৃক বিশেষ নির্য্যাতিত হন। রাজা তাঁহার অসামান্য ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং অপ্পরের শিষ্য হইয়া শৈব মত গ্রহণ করেন। অপ্পরের রচিত গাথা সকল দাক্ষিণাত্যে বহুল প্রচলিত আছে। তিনি অতি গভীর ভাবপূর্ণ সঙ্গীতাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের জন্য তিনি সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ — খ্যাতনামা বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ। ধ্রুপদ গায়করূপে অবিনাশবাবু সর্ব্বত্র গুণীগণের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিতেন। সঙ্গীতচর্চ্চা ব্যপদেশে তিনি ভারতের নানাস্থানে গমন করিয়া ছিলেন। সেই সূত্রে নানা ভাষায় তাঁহার অধিকার জন্মে। তিনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শেখ মুরাদ আলি খাঁর শিষ্য ছিলেন। যৌবনে তিনি শারীর চর্চ্চায়ও কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে সৎ সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি নানারূপ উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্রও স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। জন্ম ১২৭৪ বঙ্গাব্দ; মৃত্যু ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ১২৬১ বাংলার বৈশাখ মাসে ২৪পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে কঠোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা লাভ করেন। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বাংলা পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতা ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। মাত্র ছয় বৎসর তথায় অধ্যয়ন করিয়া, মেধা ও অধ্যবসায় বলে ৫ম স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মেডিকেল

কলেজে প্রবেশ করেন। সেই স্থানেও অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায় বলে, একাধিক বৃত্তি লাভপূর্ব্বক সকল পরীক্ষায়ই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এলাহাবাদে গমনপূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হন। অল্প কাল মধ্যেই তথায় সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতাবশতঃ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অতিশয় দরিদ্রবৎসল ছিলেন। বহু দুঃস্থ পীড়িত নরনারীকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন। শিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ ধরমপুর ক্ষয়রোগ চিকিৎসাশ্রমে তিনি অনেক দিন বিনা বেতনে রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। খেরি জিলার অন্তর্গত পানাপুর গ্রামে, প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, একটী রোগ প্রতিষেধ ভবন (Preventorium) নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষয়রোগীদের থাকিবার জন্য নানা প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক সহস্র টাকা দান করেন। ঐ টাকার সুদ হইতে B.Sc. পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোত্তম ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

অমোঘ বজ্র—একজন বৌদ্ধতন্ত্রাচার্য্য। তাঁহার গুরুর নাম—বজ্রবোধি। একুশ বৎসর বয়সে অমোঘ বজ্র গুরুর সহিত চীন দেশে গমন করেন। তাঁহারা গুরু-শিষ্যে সেই দেশে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেন। চীন দেশে উহার আলোচনা বহু ব্যাপক হইয়াছিল। চীন সম্রাটের আদেশে তিনি অধিক সংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একবার ভারতে আগমন করেন। গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, চীন সম্রাট তাঁহাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। অমোঘবজ্র শতাধিক তন্ত্রগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সেখানে বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। অমোঘবজ্র খ্রীঃ অষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত— তাঁহার জন্ম স্থান হুগলী জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রাম। 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া,' 'পুরাণ কাগজ,' 'জয়কৃষ্ণ চরিত,' 'হুগলীর ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

অম্বিকা চরণ লাহা--কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা বংশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী জয়গোবিন্দ লাহার পুত্র। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্সী জেলের পরিদর্শক প্রভৃতি নানাবিধ সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র পক্ষীতত্ত্ববিদ সত্যচরণ লাহা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ বিমলা চরণ লাহা।

অর্থদর্শী — বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের থের-

বাদীদের মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে আবির্ভূত চব্বিশ জন বুদ্ধের অন্যতম। বুদ্ধ দেখ।

অশ্বলায়ন—জনৈক ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সমবিশ্বাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় তিনি বুদ্ধদেবের সহিত ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গমন করেন। বুদ্ধদেবের যুক্তি বলে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। অম্বষ্ঠ নামক অপর এক ব্যক্তির সহিতও বুদ্ধদেবের জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হয়। এই বিচারেও বুদ্ধদেব জয়লাভ করেন।

আ

আকমল্ উদ্দিন, মোহাম্মদ বিন্ মোহাম্মদ — মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র 'হিদায়া'র একজন ভাষ্যকার। উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে (৭৮৬ হিঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়

আকা বাবা, কুচক খাঁ—বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর (১৭০৯-১৭৪০ সাল) অন্যতম পুত্র। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে আলীবর্দ্দীই বাঙ্গালার নবাব হন। তখন সরফরাজ খাঁর ভগিনী, আলীবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নোয়াজিস মোহাম্মদের অন্তঃপুরে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম লুৎফিসা বেগম ছিল। তিনি আকা বাবাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ, খাস তালুক হইতে তাঁহাদের জীবিকার উপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আচ্ছে—নামান্তর বলন্দ আখতার। দিল্লীর মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের ভ্রাতা। তিনি সাধারণতঃ আচ্ছে সাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'নাহিদ-ও-আখতার ১৭২৬ সালে সমাপ্ত হয়।

আজমল খাঁ, হাকিম জাতীয়তাবাদী নেতা ও প্রসিদ্ধ ইউনানী চিকিৎসক। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সম্রাট বাবরের সময়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার পিতামহ এবং পিতাও পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। হাকিম আজমল খাঁ ইসলামিক রীতি অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় এবং সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আরব ও ইরাকের বহু প্রসিদ্ধ এবং তীর্থ স্থান ভ্রমণে গমন করেন এবং তথা হইতে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। তৎপরে ১৯১১ সালে তিনি আবার ইয়োরোপ ভ্রমণে গমন করেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি

দেশে চিকিৎসালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তুরস্কের রাজধানীতে তিনি বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে তিনি মিসরও পরিভ্রমণ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। দিল্লীতে ইউনানী মতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উহা তাঁহার জীবনের এক প্রধান কীর্ত্তি। ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় মতের সংমিশ্রনে এক চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন তাঁহার জীবনের এক চেষ্টা ছিল। ১৯১৮ সালে তিনি প্রকাশ্য ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দান করেন। ঐ বৎসরে দিল্লিতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক আন্দোলন অতি গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই সময়ে জনসাধারণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি, এবং ধীর প্রকৃতি লোক জননায়করূপে না থাকিলে, তখন পঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা আরও গুরুতর অবস্থায় উপস্থিত হইত। ১৯২০ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর কারাবাস কালে তিনি জননায়করূপে অনেক গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় পরিচালনা করেন।

তিনি উদার মতাবলম্বী নেতা ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের উপরই তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং তিনি বরাবরই তাহাদের মিলনকামী ছিলেন। ১৯২১সালে আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে তিনি সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু তিনি সাময়িক ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য লাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

আড়বক — হস্তক আড়বক গৌতম বুদ্ধের গৃহী শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। যাঁহারা ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য চারি প্রকার দ্রব্য প্রদান করিতেন, আড়বক তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি সাতটী বিশেষ গুণেরও অধিকারী ছিলেন।

আতম্বন -- দশনামী সন্ন্যাসীরা বায়ান্নটী মড়ি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ক একজন সিদ্ধ পুরুষ এক একটী মড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাত্মা আতম্বন এইরূপ একটী মড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

আতা হোসেন খাঁ—তাঁহার কবিজন সুলভ নাম তহশীল। তিনি 'চাহার দরবেশ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে ফার্শী ও আরবী শব্দ অধিক থাকায়, লোক সমাজে তাহা তত আদৃত হয় নাই। দিল্লীর মীর আসমান, চাহার দরবেশের একটী সরল অনুবাদ উর্দ্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই সর্ব্বজন সমাদৃত হয়। আতা হোসেন লক্ষ্ণৌ নগরীর নবাব আসফ উদ্দৌলার সমসাময়িক ছিলেন।

আদম হাফিজ—একজন মুসলমান ফকির তিনি শিখগুরু তেগবাহাদুরের সমসাময়িক ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব তেগ বাহাদুর দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তেগবাহাদুর ও আদম হাফিজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। পরে আদম হাফিজ নির্ব্বাসিত ও তেগবাহাদুর ঘাতক হস্তে নিহত হন।

আনন্দ চন্দ্র রায়, রাজা—বীরভূমের অন্তর্গত মল্লারপুরের নিকটবর্ত্তী, ডামরা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাখড় চন্দ্র। ভবানীমঙ্গল কাব্যের কবি গঙ্গা নারায়ণ তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

আপাজী—মহারাষ্ট্রপতি রাজারামের পত্নী তারাবাই অতি তেজস্বিনী রাণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর পক্ষে কিছুদিন মহারাষ্ট্র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মুঘলেরা সেতারা দুর্গ অধিকার করিলে, তারাবাই তাহার প্রধান সেনাপতি পরশুরাম ত্রিম্বককে পুনঃ সেতারা অধিকার করিতে আদেশ করেন। পরশুরাম আপাজী নামক এক ব্রাহ্মণকে তাহা অধিকার করিতে নিযুক্ত করেন। আপাজী সন্ন্যাসী বেশে অতি কৃচ্ছ সাধন দ্বারা মুঘলদের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক দুর্গে প্রবেশ করেন। অতি কৌশলে দুর্গস্থ হিন্দু সৈন্যদিগকে তিনি স্বপক্ষে আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে সংবাদ প্রেরণ করেন। পরশুরাম রাত্রিকালে দুর্গ আক্রমণ করিয়া অতি সহজে অধিকার করেন।

আপা সাহেব—নাগপুরের ভোঁসলে বংশীয় একজন রাজা। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় রঘুজীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আপা সাহেবের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পরিশেষে আপা সাহেব সিংহাসন লাভ করেন ইংরেজদের সহিত প্রথমে তাঁহার সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সিংহাসন লাভ করার পরে, তাঁহার মনোভাবের ব্যতিক্রম হয় তিনি তৎকালীন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের সীতাবলদির সমরে তিনি পরাজিত হন। প্রথমে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে রাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার বিরুদ্ধ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলেকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। আপা সাহেব রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রস্থান করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে জয়পুররাজ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আফতাব চাঁদ, মহারাজা—তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদের পোষ্য পুত্র। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি সম্পত্তি পরিচালনের অধিকারী হন। তিনিও মহারাজ মহতাব চাঁদের ন্যায় নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন। মহতাব চাঁদ মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদ ও মুদ্রণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র আফতাব চাঁদ তাহা সম্পন্ন করেন। তাঁহারই সময়ে বর্দ্ধমানে কলেজ, সাধারণ পাঠাগার, দরিদ্র ছাত্র নিবাস, ব্রহ্ম মন্দির প্রভৃতি জনহিতকর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

আবদুর রহিম, মুন্সী—বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। মুসলমানদিগের মধ্যে তিনি অতি পূর্ব্বেই সাহিত্য আলোচনা করিতে থাকেন। 'মিহির ও সুধাকর' এবং 'মুসলিম হিতৈষী' নামক দুইখানি পত্রিকার তিনি কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। ইস্‌লাম ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি কয়েক খানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবদুল আজিজ—(৩) বিজাপুরপতি আদিল শাহের সময় তিনি শিবনার দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। আলী আদিল শাহ ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে সেকেন্দর আদিল শাহ রাজা হন। তাঁহার সময়ে, ১৬৭৫ সালে শিবাজী শিবনার দুর্গ অধিকার করেন। পূর্ব্বে দুইবার চেষ্টা করিয়াও আবদুল আজিজের বীরত্বে মহারাষ্ট্রেরা পরাজিত হইয়াছিল। এই সমল যুদ্ধে সু মহারাষ্ট্র সৈন্য বন্দী হয়। কিন্তু আবদুল আজিজ তাহাদিগকে মুক্তি দেন।

আবদুল বাকী—'ময়াশির-ই-রহিমী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজ দরবারের সমুদয় বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক, কবি, গ্রন্থকারের জীবন চরিত বর্ণিত আছে। ১৬১৭ সালে এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। গ্রন্থকার ১৬২৬ সালে পরলোক গমন করেন।

আবদুল সমাদ খাঁ—দিল্লীর সম্রাট ফিরোকশিয়ারের সময়ে তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাটের আদেশে তিনি শিখগুরু বান্দাকে দমন করিতে যাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করেন। বান্দা অতি নিষ্ঠুর-ভাবে ১৭১৬ সালে নিহত হন। আবদুল

সমাদ খাঁ ও তাঁহার বংশধরদের অত্যা-চারেই শিখশক্তি আরও উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবদুল্লা সুহ্‌রাওয়ার্দ্দী, সার—১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হজরত মৌলানা ওবায়েদ উদ্দৌলা। তিনি ঢাকা মাদ্রাসা, ঢাকা কলেজ, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া লণ্ডনে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি ইউরোপের ফ্রান্স, জার্ম্মানি, অষ্ট্রীয়া, তুরস্ক এবং মিশর, ইটালি প্রভৃতি [illegible] করেন। তিনি বি এ, ও এম্ [illegible] পরীক্ষায় আরবীতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহা ছাড়া ইংরেজী, দর্শন, ও ফার্শীতেও এম, এ, পাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথম Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হন। মুসলমান রাজ্যসমূহের দুর্দ্দশা দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া, তিনি ছাত্রজীবনেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া, তুরস্ক ও পারস্যের রাষ্ট্র নায়কেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তুরস্ক হইতে 'এফতেখা উরুল মিল্লৎ' ('মুস্‌লেম জাতির গৌরব') উপাধি প্রাপ্ত হন। ত্রিপলি ও বল্কান যুদ্ধকালে তিনি 'হেলালে আহমর' ফণ্ডের জন্য যথেষ্ট সেবা করেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি ঠাকুর-ল প্রফেসার ছিলেন, এবং পরে সেনেটের একজন সদস্য হয়েন। তিনি টিপুসুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে হায়দরের পৌত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর মীরজা মোহাম্মদআলী কলিকাতার সেরিফ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। স্যার আবদুল্লা ১৯১০-১৯২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। [illegible] খেলাফত [illegible] সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারিলেও, তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তিনি বহুকাল কলি-কাতা খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। তৎপরে খেলাফত কমিটির উৎসাহ মন্দীভূত হইলে, তিনি পরলোক-গত চিত্তরঞ্জনের প্রবর্ত্তিত স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন। স্বরাজী সদস্য হিসাবেই তিনি ১৯২৪ সালে নির্ব্বাচনের পর, বাংলার ব্যবস্থাপক সভার ডিপুটী সভাপতি নিযুক্ত হন। নিখিল-বঙ্গ প্রজা সমিতির মনোনীত প্রার্থীরূপে তিনি পরে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি সাউথবরো কমিটির এবং সাইমন কমিশনের সদস্য

ছিলেন। ১৯২০ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৬ সালের কলিকাতার দাঙ্গা, হাঙ্গামার পর, বাঙ্গালার রাজ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলে, তিনি ইণ্ডে-পেণ্ডেণ্ট মুসলমান পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, তিনি তাহাতে যোগদান করেন। তিনি মুসলমান আইন ও ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েক খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষজীবনে তিনি সরকারের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এককালে তাঁহাকে বাঙ্গালা সরকার অনভিপ্রেত ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি-তেন। তাই তাঁহাকে একবার মিঃ এ, রসুল ও জয়শোয়ালের সহিত এক-যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি দার্শনিক ও বহু প্রাচ্য প্রতীচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

আবু আলী কলন্দর, শেখ—তিনি সাধারণতঃ আবু আলী কলন্দর শেখ সরাফ উদ্দিন পানিপথী নামে খ্যাত ছিলেন। পারস্যের অন্তর্গত ইরাক তাঁহার জন্মস্থান। কিন্তু ভারতে আগমন করিয়া তিনি পানিপথেই অবস্থান করিতেন। এই স্থানেই প্রায় একশত বৎসর বয়সে ১৩২৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়! তিনি একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার সমাধিক্ষেত্র পবিত্র স্থানে এখনও বহু মুসলমান দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন।

আবুল আলা, মীর—আগ্রার অধি-বাসী মীর আবুল ওয়াফা হাসনীর পুত্র। ১৫৮২ সালে তাঁহার জন্ম হয়। রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন, তখন তিনি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক রূপে তাঁহার সহিত এদেশে আসেন। কিছুকাল পরে তিনি আজমীরে, পরে আগ্রায় চলিয়া যান। ১৬৫১ সালে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন নক্সবন্দী ও খাজা আহরার বংশধর ছিলেন। এখনও বহু মুসলমান তাঁহার সমাধি দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়া থাকেন।

আবুল হোশেন, মীর—তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে প্রসিদ্ধ প্রথম কালাপাহাড় (অন্য নাম মোহাম্মদ ফর্মুলী) ধৃত ও বন্দী হইয়া দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। 'কালাপাহাড় প্রথম' দেখ।

আভড়—গুর্জ্জরপতি সিদ্ধরাজ জয়-সিংহ দেবের রাজত্বকালে (১০৯৪-

১১৪৩ সাল) আভড় নামে একজন প্রচুর ধনশালী বণিক ছিলেন। অনহিল-পুর পত্তন নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান হইয়াও সাধুতা ও অধ্যবসায় বলে প্রচুর ধনলাভ করেন। তিনি বহু জৈনতীর্থে বহুসংখ্যক মন্দিরের জীর্ণ সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

আমীর খসরু—মুসলমান অধিকারের প্রথম ভাগের একজন খ্যাতনামা হিন্দি কবি। তাঁহার রচিত, কবিতা ও গান হিন্দুস্থানে খুব প্রচলিত। তিনি নিজ প্রতিভাবলে হিন্দি কবিতায় অনেক নূতন ছন্দের অবতারণা করেন।

আর্য্যাবর মণ্ডল—ইদ্রাকপুর জমি-দারীর রাজা। জমিদারীর অধিপতিগণ রাজা নামে খ্যাত। দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার কতক অংশ লইয়া ঘোড়াঘাট সরকার অবস্থিত। ইহা ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্গত। আর্য্যাবর মণ্ডল ইহাঁরই বংশধর। আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান এই বংশের শেষ রাজা। এই রাজবংশ বর্দ্ধন কুটীর রাজা নামে পরিচিত।

আলী আমজদ খাঁ—১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী আলী আমজদ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলী আহাম্মদ খাঁ। আলী আমজদ খাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীহট্টেই বাল্যকালে গভর্ণ-মেণ্ট স্কুলে পড়িতেন কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই জমিদারীর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন। বড় বড় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া তিনি স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সদাশয়, উদার প্রকৃতি ও দানশীল জমিদার ছিলেন। যাহারা তাঁহার সংস্রবে একবার আসিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। একবার ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিয়া-ছিলেন। খাঁ সাহেব ও তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে ঐ অঞ্চলের প্রজাদের তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক গমন করেন।

আলি ইমাম, সৈয়দ—জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা। বড়লাট লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ভারত শাসন বিষয়ে যে নীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তৎফলে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়কে বড়লাটের শাসন পরিষদের (Viceroy's Executive Council) সদস্য করা হয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (পরে লর্ড) সিংহ সেই পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য। অল্পকাল পরে তিনি

পদত্যাগ করিলে, সৈয়দ আলি ইমাম তাঁহার স্থলে মনোনীত হন। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে পাটনায় আইন ব্যবসায় করিতেন। তথায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলী মহায়েমী — দাক্ষিণাত্যের মহায়েম নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁহার পিতার নাম শেখ আহাম্মদ। তিনি তপশির রহমানী নামক কোরাণের ভাষ্য লিখেন। ১৪৩১ খ্রীঃ অব্দে হিঃ (৮৩০) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ই

ইম্পে, সার এলিজা—(Sir Elijah Impey) তাঁহার পিতা এলিজা ইম্পে একজন সওদাগর ছিলেন। ১৭৩২ খ্রীঃ ১৩ই জুন তাঁহার জন্ম হয়। ভারতের বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস (Warren Hastings) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে (Westminster) শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ইম্পে ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) প্রধান বিচারপতি হইয়া আগমন করেন। মহারাজ নন্দ কুমার রায়ের ফাঁসির হুকুম দিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। বারওয়েল নামক (Barwell) এক সাহেব নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল তৈয়ার করার অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অপরাধে জুরিরা তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্থ করিলে, তৎকাল প্রচলিত ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। কেহ কেহ বলেন এই বিষয়ে হেষ্টিংসের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ইহা এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে লর্ড মিণ্টো কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিত হয়। তিনি সেই মোকর্দ্দমায় স্বয়ং প্রতিবাদ করিলে, তাহা উঠাইয়া লওয়া হয়। ১৮০৯ সালের ১লা অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন। 'নন্দকুমার রায়, মহারাজা' দেখ।

ইস্‌মাইল হোসেন শিরাজী— জাতীয়তাবাদী মুসলমান দেশকর্ম্মী। তিনি প্রকৃত স্বদেশ সেবক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে ও আচরণে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ছিল না। তিনি সুলেখক ও বাগ্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে বল্কান সমরে (১৯১১ সালে) ডাঃ আন্‌সারীর সহিত চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী দল সহ তুরস্কে গমন করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারারুদ্ধ হন। বল্কান যুদ্ধে তাঁহার কৃত কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর, তুরস্ক দেশ নেতা মুস্তাফা কমালপাশা

তাঁহার পুত্রকে তার যোগে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বায়ান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈ

ঈশানচন্দ্র ঘোষ—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলার খরসুতী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ছাত্র পড়াইয়া এবং সংবাদ পত্রে কাজ করিয়া প্রথমতঃ জীবিকার্জ্জন আরম্ভ করেন। ইংলিশম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করিয়া, তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। ১৯০৩ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন ঐ পদে নিযুক্ত হন, তখন উহার বিশেষ দুরবস্থা কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় অচিরকালমধ্যেই স্কুলটি বাঙ্গলার অন্যতম প্রধান স্কুলে উন্নীত হয়। ঘোষ মহাশয় ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় এবং গণিত, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইতিহাসেই তাঁহার সর্ব্বাধিক অনুরক্তি ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি পালি জাতকসমূহের বাঙ্গলায় অনুবাদ। ইংরাজীতে জাতকের অনুবাদ কার্য্যে ৬ জন বিখ্যাত পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অথচ বাঙ্গলায় ঘোষ মহাশয় একাকী সেই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি পূর্ব্বে পালি জানিতেন না; পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জাতক অনুবাদ করিবার জন্যই যৌবনোচিত উৎসাহে পালিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর নানা দেশের প্রাচীন সাহিত্য, বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিবেন। তিনি ইলিয়াড ও বিক্রমোর্ব্বশী আংশিক অনুবাদও করিয়াছেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি শিক্ষা ব্যবসায়ী ও সাহিত্যিক হইলেও, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্ত জটীলতা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ঘোষ মহাশয় দাতা ছিলেন; কিন্তু নীরবে দান করিতেন। তিনি বহুব্যয়ে তাঁহার ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পৈত্রিক গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তথায় জননীর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পিতার নামে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পুষ্করিণী খনন, টিউব ওয়েল স্থাপন,

রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতির দ্বারাও তিনি গ্রামবাসীদের উপকার করিয়া গিয়াছেন। কসৌলী ছাড়া যখন উত্তর ভারতের আর কোথাও জলাতঙ্ক রোগীর চিকিৎসালয় ছিল না, তখন তিনি বাঙলার রোগীদের অবস্থানের নিমিত্ত তথায় তাঁহার পত্নীর নামে একটি বাঙলো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা নিবাসে তিনি তাঁহার কন্যার নামে একটি রোগীর জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উইলেও তিনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের জন্য বহু টাকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু শোক পাইয়াছেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কালে তিনি মাতৃশোক পান। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হন; তাহার তিন বৎসর পর, তাঁহার প্রথম পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র সন্তান), ১৯১৫ সালে তাঁহার একমাত্র কন্যা ও ১৯৩১ সালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ও কয়েকটি পৌত্র-পৌত্রী বর্ত্তমান; পুত্রদ্বয়ের একজন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং অপর জন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র ঘোষ।

ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—জয়পুর প্রবাসী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তিনি জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী প্রসিদ্ধ কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং তথাকার একজন প্রধান অমাত্য ও জায়গীরদার ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি জয়পুর নগরেই জন্মগ্রহণ করেন। জয়পুরেই শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্বীয় পিতার নিকট রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করেন। পরে জয়পুরের মহারাজা কর্ত্তৃক আপীল কোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৯০১ অব্দের জানুয়ারী মাসে কান্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, কয়েক মাসের মধ্যেই মহারাজা ঈশানচন্দ্রকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক শাসন পরিষদের সদস্য পদ প্রদান করেন। তিনি অতি দীর্ঘকাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত জয়পুর রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বহুবিধ গুরুতর দায়ীত্ব পূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জয়পুরের মহারাজা এবং ভারত সরকার উভয়েই তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি অতিশয় জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। বহু ভাষার গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করিয়া নিজ বাটীতে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ তাঁহার বিশেষ সখ ছিল।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তিনি পিতার নামে কান্তিচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ও সাহায্য ছিল।

জয়পুর প্রবাসী বাঙ্গালীদের তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন, বিপদে সাহায্য দান প্রভৃতি তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি সনাতন পন্থী ছিলেন। জয়পুরে নানারূপ পূজা-পার্ব্বণ সম্পাদন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দ দান করিতেন।

বাল্যকালেই তাঁহার দুই অগ্রজের মৃত্যু হওয়াতে তিনি পৈতৃক বিস্তীর্ণ জায়গীর স্বর্ণগদালঙ্কার ভূষিত.তাজিমী, সরদারী ও গুরুপদের অধিকারী হন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরী প্রতাপ নারায়ণ রায়, রাজা — একজন খ্যাতনামা প্রাচীন হিন্দী কবি। তিনি পড়রৌনার জমিদার ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতাগুলি বিশেষ সমাদৃত।

উ

উড্রফ সার জন — (Sir John Woodrof) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচারপতি এবং ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের বিশিষ্ট অনুরাগী পণ্ডিত। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে এদেশে আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্রমে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহর সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রমত সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেন। আর্থার এভেলন (Arthur Avalon) এই ছদ্ম নামে একাধিক তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার এই কার্য্যে হাই-কোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী অটলবিহারী ঘোষ বিশেষ সহায় ছিলেন। বস্তুতঃ অটলবাবু ও উড্রফ সাহেব পরস্পর সহোদর তুল্য ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একযোগে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার ও ব্যাখ্যা ক্যার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহাদের গুরু স্থানীয় ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! মাত্র চারি দিনের ব্যবধানে নিজ নিজ স্বদেশে এই দুই মহাত্মা অটলবাবু ও সার জন উড্রফ পরলোক গমন করেন। (পৌষ ১৩৪২, ডিসেম্বর ১৩৩৫)

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বসুমতী নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র পরিচালক। বসুমতী পত্রিকা পরিচালনা সূত্রে প্রথিতযশা লেখক লেখিকাদের গ্রন্থাবলী সহজমূল্যে সাধারণের লভ্য করিবার এক বাসনা তাঁহার হয়। তদনুসারে প্রথমতঃ বসুমতীর গ্রাহকবর্গকে ঐরূপ গ্রন্থাবলী অল্পমূল্যে দিবার আয়োজন হয়। ক্রমে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বাঙালাদেশের প্রায় সমুদয় শ্রেষ্ঠলেখক ও লেখিকাদের গ্রন্থাবলী অল্পমূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইভাবে সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা উপেন্দ্রবাবুর জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ৺ব্যোমকেশ মুস্তৌফী, ৺[illegible]চন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত জলধর সেন ৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীগণ এককালে বসুমতীর সম্পাদনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উপেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

উপেন্দ্রনাথ সেন — (কবিরাজ) কলিকাতার কলুটোলার প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশ সম্ভূত চন্দ্রকিশোর সেনের পুত্র। হিতবাদী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এবং অন্যান্য প্রকার সাহায্যেই হিতবাদী দীর্ঘকাল পরিচালিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ প্রতিষ্ঠার তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল উহার পরিচালন কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

উমাচরণ মিত্র [illegible] প্রথম যুগের একজন লেখক। ১৮৫[illegible] [illegible] "চাহার দরবেশ" এবং [illegible]৮৫[illegible] [illegible] "গোলে বকাওলী" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন। উভয় পুস্তকই তৎকালে জনসমাজে আদৃত হইয়াছিল।